

# সচিত্র জাহায্য

✓  
৪৬শ বর্ষ

১ম সংখ্যা

আষাঢ়, - ১৩৭৩

১৩৭৩-৭৪



১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ফোন : ২৩-৫৩১৪, ৫৩১৫



# সচিত্র জাহায্য

✓  
৪৬শ বর্ষ

১ম সংখ্যা

আষাঢ়, - ১৩৭৩

১৩৭৩-৭৪



১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ফোন : ২৩-৫৩১৪, ৫৩১৫



সত্য কাহিনী—উপন্যাস অপেক্ষাও রোমাঞ্চকর।

সত্যই কি পরলোক আছে? পরলোকের আশ্রিতদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের কোন সম্ভাবনা আছে কি? এই সম্পর্কে প্রবীণ সাহিত্যিকেরা তাঁদের অর্ধ শতাব্দীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। প্লানচেট, টেবল্ টাণিং, মিডিয়ম, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, সত্য কাহিনী সব কিছুই এমন মনোরম গল্পের মাধ্যমে মনমাতান ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যে, উপন্যাস ফেলে এই গ্রন্থ পড়তে হবে।

এই বইগুলি পড়লে সত্যের আলোকে বড়রাও যেমন অন্ধকারে পথের সন্ধান পাবেন—ছোটদের মন হতেও ভেমনি অমা-নিশার ঘোর ও ভূতের ভয় কেটে যাবে।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত

(১) পরলোকের গল্প (২) পরলোকের বিচিত্র কাহিনী

পঞ্চাশটি সত্য হলও রোমাঞ্চকর ও অপূর্ণ রহস্যময়। গ্রন্থেরে বাঙালার বহু বিখ্যাত লোকের বিচিত্র অভিজ্ঞতা পড়ুন।

ভূতে পাওয়ার কাহিনী

দেশী প্রচার তত্ত্ব-মন্ত্র দ্বারা ভূত তাড়ানর অদ্ভুত সব কাহিনী ছাড়াও বিলাতে বিজ্ঞানীরা তাদের তাড়বার বিধিব্যবস্থা কতখানি সার্থক করেছেন রও বহু বিচিত্র কাহিনী পড়ুন।

মৃত্যুহীন-প্রাণ

দেহাবসানেই যে মানুষের সব শেষ হয় না। তার পরেও যে জড়-জগতের সঙ্গে যোগাযোগ কত অদ্ভুত উপায়ে হয়ে থাকে, তার বহু বিচিত্র আখ্যান পড়ুন।

ওপার থেকে আসেন

জড়জগতে এসে আশ্রিতদের বিচিত্র সব কার্যকলাপ—দেশী, বিদেশী দুটো দ্বারা অজ্ঞাত জগতের বহু তথ্য উন্মোচিত।

অলৌকিকতা

মানুষের মূল-বুদ্ধিতে দার ব্যাখ্যা চলে না এমনি সব বৈচিত্র্যময় চমকপ্রদ সত্য কাহিনী।

অমর জীবন

জীবন অবিনশ্বর, মৃত্যুর পরও যে তার অস্তিত্ব থাকে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি রোমাঞ্চকর সত্য কাহিনী।

১। ওপারের খবর

২। অদৃশ্য-লোক

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত

অঘটন যা দেখছি

অবিস্মৃত মনে হলও সবই সত্য কাহিনী—লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। পড়তে পড়তে আপনি বিষয়ে অভিভূত হবেন।

ওপারের আলা

পরলোক সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা ও ব্রাহ্মধর্মের বিশিষ্ট প্রচারক ও মিডিয়াম কতৃক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সংঘটিত বহু রোমাঞ্চকর ঘটনার বিবরণ পড়ুন।

মরণের পরে

মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়, কেমন থাকে, তার চিন্তাবৃত্তির কোন পরিবর্তন হয় কিনা—পড়ুন—মিনার্ভা থিয়েটারে অগ্নীম গিরিশচন্দ্র ও দেবকঠ বাগচীর সম্মুখে ব্রহ্মদেতা কতৃক সঙ্গীতে অপূর্ণ হরসংযোজন নিদীপ রায়ে অগ্নীম বক্তৃতাচক্রের হৃদয়ী তরুণী ছায়াশ্রুতি ধরবার বৃথা চেষ্টা ম হর্ষি বিজয়কৃষ্ণের সমক্ষে মনোরঞ্জন ওহর অপূর্ণ অভিজ্ঞতা।

এপার ওপার

বিজয়কৃষ্ণ গোষাঈ, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, প্রভৃতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বহু অলৌকিক ঘটনা এবং বিখ্যাত থিওসফিস্ট মাদাম ব্রাভাঙ্কির আশ্রিত-তথ্যসম্মান কাহিনী পড়ুন এই গ্রন্থে।

জীবনে মরণে

লেখক ও অধ্যাপক বহু তথ্যবর্ণী মহাপুরুষদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, মিনার্ভা থিয়েটারে ভৌতিক কাণ্ড, অশরীরীদের ইচ্ছার চরিতার্থতা, প্লাগেট বোগসিঙ্ক গল্পাসীর অদ্ভুত কাণ্ড ইত্যাদি এই গ্রন্থে পড়ুন।

মৃত্যু-নদীর পারে

অভিনব গ্রন্থ। এতে বহু আশ্চর্য ঘটনার ইতিবৃত্ত আছে। মৃত-পত্নীর বিদেহ, সপত্নী বিদেহ, বরধাত্রী ভূত, বৈজ্ঞানিকধামের পিশাচ, অমৃতবাজার পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক দেশবরেন্দ্র শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের এবং লেখকের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বৈজ্ঞানিকধামের পিশাচ এক অপূর্ণ কাহিনী। এতদ্ব্যতীত চক্র-বৈদ্যকে প্রেতাগ্নার আগমন, যোগেশ্বরী সাধনা, পিশাচ সাধক, কৌশল্যাতলার সাধক, সার্কাসে ভূত প্রভৃতি বিবিধ সত্য ও প্রত্যক্ষ পারলৌকিক গল্প—এই গ্রন্থের কলেবর অনঙ্কিত করেছে। প্রত্যেকটি কাহিনী সত্যমূলক, প্রত্যক্ষদৃষ্ট এবং অভিনব রস-সমৃদ্ধ। যোগেন্দ্রবাবুর প্রত্যেকটি কাহিনীর মধ্যে সত্যের





৪৬শ বর্ষ

আষাঢ়, ১৩৭৩

১ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণ-অভিযোগের প্রতিকার

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিযোগ থাকা খুবই স্বাভাবিক। এবং সে অভিযোগের যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকা সূস্থ গণ-তন্ত্রের পরিচায়ক। শান্তিপূর্ণ ও সংবিধান সম্মত উপায়ে অভিযোগ জানানর ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকলে গণতন্ত্রের বনিয়াদ শক্ত হয় এবং জনসাধারণও তাদের অভিযোগের প্রতিকার আদায় করে নিতে পারেন।

ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীগজেন্দ্র গদকরের মতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হিংসাত্মক বিকোভ কিংবা অহিংস অনশন কোনোটাই গণ-অভিযোগ জানাবার সম্ভব পন্থা হতে পারে না। শ্রীগদকর একজন আইনজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তি। তাঁর মতে, সরকারের কাছে জনতার অভিযোগ পৌঁছাবার

এবং তার দ্রুত প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকা খুবই সমীচীন। তিনি জানেন যে আমাদের দেশে কাগজে কলমে নে সুরোগ স্বীকৃত হলেও বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই। তাই দেখা গেছে যে, রাস্তায় নেমে বিকোভ না জানিয়ে কিংবা শান্তিপূর্ণ ভাবে অনশনের পথে না গিয়ে কোন গণ-অভিযোগের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ও তার প্রতিকার আদায় করা সম্ভব হয়নি।

নিরস্ত জনতার অমোঘ অস্ত্র হিসাবে স্বাধীনতা-পূর্ব কালে গান্ধীজী অনশনকে রাজনৈতিক সংগ্রামে ব্যবহার করে-ছিলেন। বর্তমানে তার পটভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে গেছে ঠিকই। কিন্তু আবেদন-নিবেদন ও শান্তিপূর্ণ বিকোভ প্রদর্শন করেও যখন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় না, তখন



অনশনকে দাবি আদায়ের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে হয় বই কি ! যদিও অবশ্য সরকারী কর্ণধারেরা অনশনকে সুনজরে দেখেন না, এবং এটাকে জবরদস্তি বলেই মনে করেন ! কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অভিযোগ জানাবার অধিকার স্বীকৃত হলেও তার দ্বারা সমস্তার প্রতিকারের খুব বেশী দৃষ্টান্ত সরকার স্থাপন করার সুযোগ দেননি ।

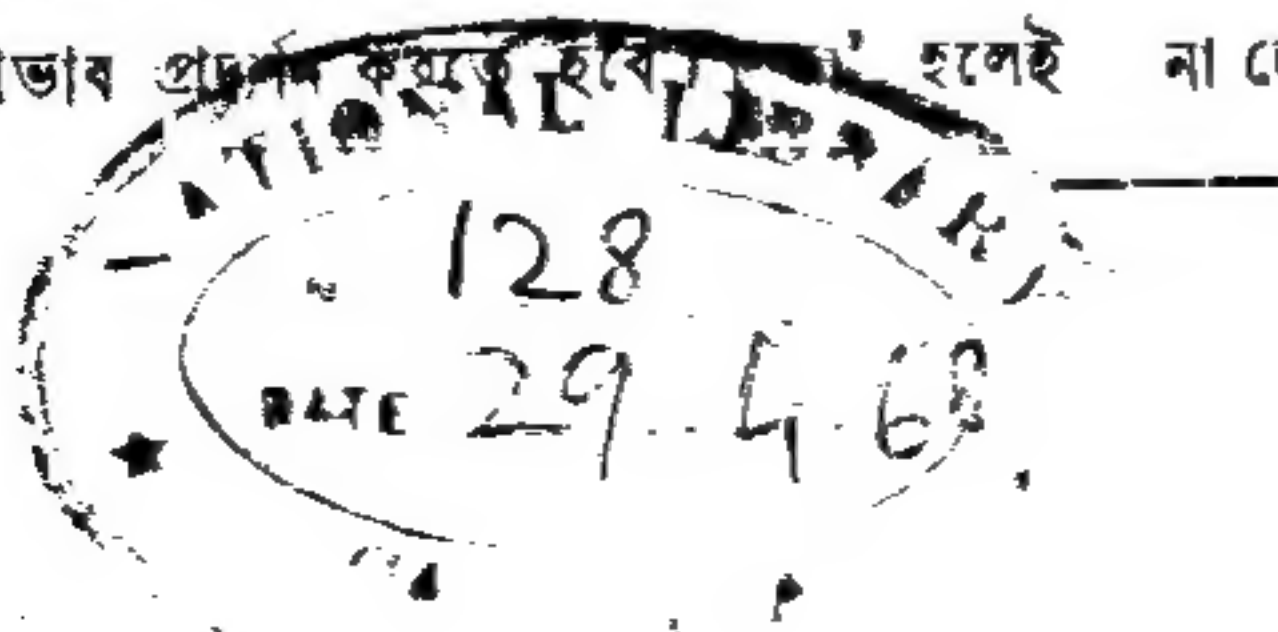
আবেদন-নিবেদন-বিক্ষোভ প্রদর্শন কিংবা অনশনও যখন ব্যর্থ হয়, তখন হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া আর কি কোন উপায় থাকে ? দেখা গেছে যে, জনসাধারণের ন্যূনতম ত্রাণ দাবি যখন ক্রমাগত উপেক্ষিত ও অবহেলিত হতে থাকে এবং শত আবেদন-নিবেদন করেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় না, তখন বাঁচার তাগিদে বাধ্য হয়ে জনসাধারণকে হিংসার মোক্ষম অস্ত্র ব্যবহার করতে হয় । এর জন্ত রাজনৈতিক দলগুলির কিছুটা সাহায্য হয়ত থাকতে পারে,—কিন্তু প্ররোচনার কোন প্রয়োজন থাকে না । জনসাধারণকে সে প্ররোচনা দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন সরকার নিজেই । জনসাধারণের আজ বন্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে যে গণতন্ত্রসম্মত উপায়ে তাদের অভিযোগের প্রতিকার আদায় করা সম্ভব নয় । এই ধারণার ফলেই ভারতবর্ষে আজ প্রতিটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ, অনশন ও হিংসার পথ অবলম্বন করার ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

যে সর্বনাশা পথে দেশ আজ এগিয়ে চলেছে তার শেষ কোথায়!—এ প্রশ্ন আজ সকলের মনে খুব স্বাভাবিক ভাবেই উঁকি মারছে । শ্রীগজেন্দ্র গদকর এই ছলক্ষণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে এ বিষয়ে অবহিত হতে হবে । সংবাদপত্রে অথবা জনসভার মাধ্যমে জনমতের যে অভিব্যক্তি প্রতিফলিত হয় তার প্রতি সম্মান দেখিয়ে গণতান্ত্রিক সরকারকে সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে ।

বিক্ষোভ বা অনশনের দ্বারা জনসাধারণকে অভিযোগ প্রতিকারের পথ সন্ধান করতে হবে না । গণতান্ত্রিক উপায়ে অভিযোগ প্রকাশ এবং অনতিবিলম্বে তার প্রতিকারে সরকারের সহযোগিতামূলক সন্মতিই এ সমস্যা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় । এদিক থেকে শ্রীগদকর বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন ।

সরকার যদি জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ না করেন, এবং তার মধ্যে সহানুভূতি ও সহযোগিতামূলক মনোভাব যদি না থাকে, তাহলে কখনওই কল্যাণ রাষ্ট্রের বনিয়াদ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না । অনশন অথবা বিক্ষোভ-শোভা-যাত্রাকে জবরদস্তি অথবা হুমুসরূপে গ্রহণ করলেও সরকারী কর্ণধারদের একথা মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অভিযোগ জানাবার অধিকার স্বীকৃত হলেও তার প্রতি কতটুকু মনোযোগ দেওয়া হয়েছে ? ভারতবর্ষের জনসাধারণ আজ বুঝেছে যে বন্ধ-এর আহ্বান না দিলে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাবে না । এ ধারণা জনসাধারণের মনে বন্ধমূল হয়ে গেলে সরকারের প্রতি কতটুকু আস্থা থাকে ? এই থেকেই গড়ে উঠছে জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে বিভেদের ছল্‌জ্ব প্রাচীর,—যা পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র রীতি-বিরুদ্ধ ।

জনমত সংগঠনের এই গুরু দায়িত্বে বুদ্ধিজীবী ও সংবাদপত্রের এক বিশেষ ভূমিকা আছে । কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত । গণতন্ত্রের স্বস্থ আদর্শ রক্ষার জন্ত এর প্রয়োজন অপরিসীম । দেশের স্বাধীন দলমত-শূণ্য বুদ্ধিজীবীদের জনমত সংগঠনের বিরাট ভূমিকা আছে । এবং সরকারেরও সেই সংগঠিত জনমতকে যথোচিত গুরুত্ব ও মর্যাদা দেওয়া কর্তব্য । একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, রাজনৈতিক ভ্রান্তি বুদ্ধির বশে গণতান্ত্রিক পথ যেন আমরা কখনও রুদ্ধ করে না দেই ।





## রঙ্গচিত্র



আজ্ঞে, চেহারা আগে ভালই ছিল। তবে এখনকার বেশনের  
ঠেলায় একটু শুকিয়ে গেছে।



# মুহূর্তের জগৎ

## সংক্ষিপ্ত

উৎসাহের আতিশয্যে ও মুহূর্তের উত্তেজনায় অনেকে এমন কাণ্ড করে বসে যার মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু এই অহেতুক আতিশয্য যদি শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে যায়, সেটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

সম্প্রতি কলকাতায় মার্কিন দূতাবাস, লাইব্রেরী ইত্যাদির উপর সুপারিকম্প্রিভ ভাবে যে উপায়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে, তার দ্বারা আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতাই প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়বস্তু ছিল ভিয়েতনাম; আর তার বিক্ষোভ প্রকাশ হল কলকাতাস্থিত মার্কিন লাইব্রেরী পুড়িয়ে দিয়ে ও মার্কিন পতাকা লাঞ্ছিত করে—এর চেয়ে কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত অবিবেচনা প্রমত্ত কাজ আর কি হতে পারে! বন্ধু রাষ্ট্রের পতাকা লাঞ্ছনা অথবা বৈদেশিক অফিসে অগ্নি সংযোগের ঘটনায় সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক মাত্রেই বিচলিত হবেন, নন্দেহ নেই। উগ্রপন্থী বিক্ষোভ-কারীরা শিষ্টাচার নীতি বিরোধী এই ধরনের ঘটনার অনুষ্ঠানকেই বিক্ষোভ প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বলে ধরে নিয়েছেন।

ক'দিন ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ কর্তৃক আয়োজিত এক অনুষ্ঠান—'ডলারের বন্ধন ছিন্ন কর'—প্রকাশ্য রাজপথের শোভা বর্ধন করছিল। ডলারের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক মোহ ও তার অবশ্রুতাবী কুফল সন্ধান সকলকে অবহিত করাই এই অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয়-বস্তু ছিল।

বন্ধু-রাষ্ট্রের প্রতি শিষ্টাচার বিরোধী এ-ধরনের বিক্ষোভ প্রকাশের মধ্য দিয়ে আমাদের সুনাম কি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না? অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এ-ধরনের বিদ্বেষমূলক মনোভাব গ্রহণ কতদূর বাঞ্ছনীয়, সেটা একটু ভেবে দেখবার বিষয়।

অবশ্য আমাদের সরকার মার্কিন পতাকা লাঞ্ছনার ঘটনায় উদ্বেগ্ন হয়ে কিছুটা কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে-ছেন। এ নীতি কিছু আগে গ্রহণ করলে এ-জাতীয় অপ্রীতিকর ঘটনাগুলি হয়ত এড়ান সম্ভব হত। কিন্তু রাজ-

নীতি ও দলীয় নীতির ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে কূটনৈতিক শিষ্টা-চারকে জলাঞ্জলি দিলে আমাদের গৌরব কি তাতে বৃদ্ধি পাবে?

তামাম ভারতবর্ষে প্রকৃতির বিচিত্র লীলা চলছে। বাঙলা দেশে বিলম্বিত বৃষ্টির জন্ত সাধারণ মানুষ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। ঘেরিতে হলেও বৃষ্টি নামল। আবার আসামে বজ্রার তাণ্ডবে লক্ষ লক্ষ নরনারী, কোটি কোটি টাকার ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট ও বিপর্যস্ত হয়েছে। ওদিকে বোম্বাই-এ জলের জন্ত হাহাকার ধ্বনি উঠেছে। বহু আবেদন-নিবেদন ও প্রার্থনা অনুষ্ঠানের দ্বারা বরুণ দেব প্রীত হয়ে বোম্বাইয়ের জল-সমস্যার সুরাহা করে দিয়েছেন। উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি না নামলে যে কি দুঃসহ অবস্থার উদ্ভব হত, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

এ-ধরনের বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনায় প্রকৃতির কাছে মানুষ যে কত অসহায় তা' বারে বারে প্রমাণিত হচ্ছে। দিলাস-বাসনের প্রাসাদ বানালেও প্রতিটি মৌলিক বিষয়ে এখনও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।

শক্তি ও প্রতিপত্তির দস্তে মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলে। ভুলে যায় মানুষ প্রকৃতির হাতে সে ক্রীড়নক মাত্র। যথেষ্টভাবে বন কেটে বসত গড়ার খেয়াবন্ধ দিতে হবে বই কি! বিজ্ঞানের প্রসারে কল-কারখানার সংখ্যা বহু গুণ বেড়ে গেছে। শিল্প কারখানার জলের রাস্তাসে তৃষ্ণা নিবারণের জন্ত মানুষের প্রয়োজনের জলে টান পড়েছে। তাই একদিকে সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপর দিকে দুঃসহ দুর্দশার সৃষ্টি হচ্ছে। কৃত্রিমতার স্পর্শে মানুষের জীবন থেকে প্রকৃতির সজীবতা একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং তার অবশ্রুতাবী ফলস্বরূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমাদের জীবনে ডেকে এনেছে চরম সঙ্কট ও অনিশ্চয়তা। প্রকৃতিকে বশে আনতে গিয়ে বারে বারে মানুষকে-ই তার কাছে নতি স্বীকার করতে হচ্ছে!



## জড় জগতের পরিবেশ ও আকর্ষণময়ী আলোক মণ্ডল

### চক্রের অভিজ্ঞতা

ছয়

মানব দেহের উপর ভরকারী প্রেতাশ্বারা অনেক সময় প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছার প্রণোদিত হয়; অনেক সময় আবার তারা যে দেহের উপর আশ্রয় গ্রহণ করেছে সেই দেহকেই যন্ত্রণা দিতে শুরু করে—তারা বলে যে সেই দেহ নাকি তাদের ব্যক্তিকে আঘাত করেছে।

এই সব যন্ত্রণাদানকারী প্রেতাশ্বারা (Tormenting spirits) মানব-দেহের উপর ভর ক'রে তাদের অশেষ যন্ত্রণা দেয় এবং ব্যক্তিকে নিজ-দেহের উপর আঘাত করতে বাধ্য করে। কিন্তু দেহের আঘাত-জনিত কোন বেদনাই সেই প্রেতাশ্বারা অনুভব করে না, যদিও অনেক সময় তারা আশ্রয়-গ্রহণকারী দেহকে নিজের দেহ বলেই মনে করে।

মিসেস এল. ডাবলু তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর অধিকাংশ সময়ই বিষাদচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন এবং সেই সময় তিনি বেন কিসের আহ্বান শুনে পেতেন। প্রেতাশ্বার অস্পষ্ট আহ্বানে বিচলিত হয়ে তিনি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতেন এবং আকুল স্বরে ক্রন্দন করতে করতে নিজের চুল ছিঁড়তেন।

এই সময় তাঁর কন্ঠা মায়ের চারিদিকে প্রেতাশ্বার আবির্ভাব দেখতে পেতেন। তাঁর কন্ঠা ছিলেন দিব্য-দৃষ্টির অধিকারিণী (clairvoyant)। তিনি দেখতেন যে একটি ভীষণ-দর্শন বৃদ্ধ তাঁর মায়ের চারপাশে দাঁত খিঁচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রুগিণীও এই সময় চীৎকার ক'রে উঠত, 'ওই আবার সেই ভয়ঙ্কর লোকটা আসছে গো'।

রুগিণীকে স্থান পরিবর্তনের জন্তু সেন্ট লুইসে নিয়ে যাওয়া হ'ল, কিন্তু কোন ফলই হ'ল না; বরং আক্রমণ বেড়েই চলল। আক্রমণের সময় রুগিণী তার হাত কামড়াত, মাথার চুল ছিঁড়ত এবং নিজের পায়ের চটি খুলে নিজের গালে মুখে মারত।

ক্রমশঃই রুগিণীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল এবং তাঁকে পাগল বলে গণ্য ক'রে একটি বাতুলাশ্রমের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রাখা

হ'ল। সেখানে এক বছর অবস্থান করেও তাঁর অবস্থার কোন পরিবর্তন হ'ল না। বাতুলাশ্রম থেকে তিনবার পলায়নের পর, তাঁকে চক্র-বৈঠকে চিকিৎসার জন্তু নিয়ে আনা হয় এবং তিন মাসের মধ্যেই তাঁর উপর আশ্রয়-গ্রহণকারী প্রেতাশ্বাদের তাঁর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নেওয়া হয় এবং তাদের মিসেস উইকল্যাণ্ডের দেহে অনুপ্রবেশ করা হয়। তারপর থেকে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং স্বাভাবিকভাবে গৃহ-সংসারের কাজে যোগদান করেন।

রুগিণীর চারপাশে দৃষ্ট সেই দাঁত খিঁচানো প্রেতাশ্বাটিকে রুগিণীর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, মিসেস উইকল্যাণ্ডের দেহে কয়েক দিন পরে প্রবেশ করান হয়।

প্রেতাশ্বাটি মুক্ত হবার জন্তু ঝটাপটি শুরু করায়, তাকে সংযত করবার প্রয়োজন হয়।

প্রেতাশ্বা : কেন আপনারা আমাকে ধরে আছেন? আপনাদের মত লোকের সঙ্গে আমার কোন কাজই নেই, আপনাদের কাউকেই আমি পছন্দ করি না। আমাকে ধরে রাখবার কি অধিকার আপনাদের আছে? আমি আপনাদের কোন ক্ষতি করিনি—কিন্তু এবার বেরিয়ে এলেই তা' করব বলে রাখছি।

ডাক্তার : আপনি নবাগত অপরিচিত হয়ে এখানে এসেই ঝটাপটি শুরু করলেন। সুতরাং আপনাকে ধরে না রেখে উপায় কি বলুন?

প্রেতাশ্বা : এভাবে ধরে রাখা আমি পছন্দ করি না।

ডাক্তার : আপনি কে?

প্রেতাশ্বা : কে তা' আপনাদের কেন বলব। আপনাদের আমি গ্রাহ্যই করি না। আমার ছেড়ে দিন, চলে যাই।

ডাক্তার : রাগ করছেন কেন বন্ধু? বলুন না কে আপনি? আমাদের মনে হচ্ছে আপনি একটি বেশ শক্ত সামর্থ্য মেখে, তাই না?

প্রেতাশ্বা : আমাকে মেয়ে মনে করবার আগে একবার



আমার দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখুন ত ?

ডাক্তার : কোথা থেকে আপনি আসছেন, কি চান আপনি তা' আমাদের বলুন ।

প্রেতাত্মা : আপনার তাতে প্রয়োজন কি ?

ডাক্তার : আমরা আপনার বর্তমান অবস্থায় সাহায্য করতে পারব ।

প্রেতাত্মা : অত জোরে আমাকে ধরবেন না, বলছি সব ।

ডাক্তার : হ্যাঁ, আপনার সব কথা আমাদের খুলে বলুন ।

প্রেতাত্মা : প্রথমতঃ আমি ওইসব ছুঁচগুলো সহ্য করতে পারি না ( রুগীকে প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ) । তারপর অনেককাল আমাকে বদ্ধ ক'রে রাখা হয়েছে । কেন, কিণের জন্ত আমার গায়ে ওই ছুঁচগুলো বিদ্ধ করেছিলেন বলুন ত ? এখান থেকে যদি মুক্তি পাই, তবে সোজা বাড়ী চলে যাব ।

ডাক্তার : আপনার বাড়ী কোথায় ?

প্রেতাত্মা : কোথায় আবার, যেখান থেকে এসেছি সেখানে ।

ডাক্তার : এখানে কি ক'রে এলেন ?

প্রেতাত্মা : জানি না ।

ডাক্তার : কোন প্রিয়জনকে অনুসরণ করেই কি এখানে এসেছেন ?

প্রেতাত্মা : আমার প্রিয় আমি নিজেই ।

ডাক্তার : সম্প্রতি আপনি কোথায় ছিলেন ?

প্রেতাত্মা : অন্ধকারে, নিবিড় ঘন অন্ধকারে । আমি বাড়ী থেকে চলে এসেছিলাম । তারপর আর কিছুই দেখতে পাই নি—অন্ধকার, সব অন্ধকার । মনে হয়েছিল যে আমি বোধহয় অন্ধ হ'য়ে গেছি ।

ডাক্তার : আচ্ছা যেখানে আপনি ছিলেন এবং সেখানটাকে আপনি বাড়ী বলছেন, সেখানে কি আপনার কোন কিছুই আশ্চর্যবোধ হয় নি ?

প্রেতাত্মা : সেটা আমার আসল ঘর ছিল না ; তবে অনেকটা সেই রকম ।

ডাক্তার : আচ্ছা, সময় সময় কি বিরক্ত হয়ে আপনি কোন বিচিত্র বা অদ্ভুত ব্যবহার করতেন না ?

প্রেতাত্মা : অনেক সময় আমি ঠিক বুঝতে পারতাম

না যে কোথায় আছি । অনেক সময় আমরা হাতাহাতি শুরু করতাম । আমার আশেপাশে অনেকেই ছিল—একদিন সব ব্যাটাকে একসঙ্গে পাব ।

ডাক্তার : তারা কে ?

প্রেতাত্মা : কে জানে কে ? নানা ধরনের নানা লোক ।

ডাক্তার : তাদের মধ্যে কোন নারী ছিল কি ?

প্রেতাত্মা : বহু বহু । নারী ! একদিন আমি সব কটাকে একসঙ্গে ধরে আছাড় মারব, বুঝবেন ।

ডাক্তার : আপনি অপরের ক্ষতি করতে চাইছেন কেন, তা'ত বুঝতে পারছি না ।

প্রেতাত্মা : একের পর এক একটি নারী এসে আমাকে পাগল ক'রে দেয় । একজনের চারপাশে কুদি কয়েক গুণ্ডা মেয়েমানুষ থাকে, সে বেচারী কি করতে পারে বলুন ? ( রুগীর দেহের আলোকে আবদ্ধ অপরাপর প্রেতাত্মারা । )

ডাক্তার : আপনি কোথায় ছিলেন ?

প্রেতাত্মা : বহু স্থানে ছিলাম—এক স্থান থেকে অল্প স্থানে ঘুরে ঘুরে আমি ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠেছি । আমার আশেপাশে খালি জীলোক, জীলোক আর জীলোক । আমি নারীর উপর তিক্ত, বিরক্ত হয়ে উঠেছি । একটাকে আমি কিল চড় লাগি মেরে ফেলে দিয়েছি, তবুও সে আমার জড়িয়েছিল ( রুগিনী মিসেস এল, ডাবলুকে উল্লেখ করে ) । আমার চারপাশে ঝুলে থাকবার তার কোনই প্রয়োজন নেই । একদিন আমি তাকে সুবিধা হলে খুন ক'রে ফেলব, তা' বলে রাখছি ।

ডাক্তার : আপনি কি করছেন, তা' জানেন ?

প্রেতাত্মা : আমার জানবার দরকার নেই, আমি কাউকেই কেয়ার করি না । হ্যাঁ, একদিন তার হাতের কবজিখানা মুচড়ে দিলাম, তবু সে আমার সঙ্গে লেপটে রইল, কিছুতেই ছেড়ে গেল না । তারপর সজোরে তার চুল ধরে টানলাম, কিন্তু তবুও সে আমাকে ছাড়ে নি । তার হাত থেকে কিছুতেই আমি রেহাই পাই নি ।

ডাক্তার : সেই জীলোকটি এখন কোথায় ?

প্রেতাত্মা : কিছুকাল হ'ল আর তাকে দেখছি না ।

ডাক্তার : আচ্ছা সেই জীলোকটি আপনার কি ক্ষতি করেছে বলতে পারেন ?

প্রেতাত্মা : আমার গায়ে লেপটে থাকবার তার কি



অধিকার, কি প্রয়োজন আছে বলতে পারেন?

ডাক্তার : আচ্ছা আমরা যদি উলটো কথাটাই বলি। যদি বলি যে আপনিই তার দেহে আশ্রয় করেছিলেন?

প্রেতায়া : আমাকে নারীর বেশে সজ্জিত করবার, মাথায় নারীর মত বড় বড় চুল রাখবার, তার কি অধিকার আছে?

ডাক্তার : কতদিন হ'ল আপনি মারা গেছেন?

প্রেতায়া : মারা গেছি। (প্রবল হাস্য)।

ডাক্তার : আচ্ছা মাঝে মাঝে অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে কি আপনি পড়েন নি?

প্রেতায়া : অদ্ভুত বলে অদ্ভুত, যাচ্ছেতাই অবস্থার মধ্যে পড়েছি। আপনার হাতটা বড় গরম, ওটা সরিয়ে নিন।

ডাক্তার : আচ্ছা, সেই স্ত্রীলোকটি কিভাবে আপনাকে সজ্জিত করতে পারে, তা' আপনি ধারণা করতে পারেন কি? আপনি খুব স্বার্থপর, তাই না?

প্রেতায়া : সে স্বার্থপর, আমি না।

ডাক্তার : আপনি একটি অজ্ঞ প্রেতায়া, সেই স্ত্রীলোকটির চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বুঝলেন?

প্রেতায়া : আমি স্ত্রীলোকের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াব। না, কখনই না।

ডাক্তার : সত্যই তাই। আপনি একটি মহিলাকে যজ্ঞা দিচ্ছিলেন, আমি ইলেকট্রিক নিয়ে আপনাকে তাড়া করেছি, বুঝলেন।

প্রেতায়া : তাই নাকি! ওঃ, আপনিই তবে আমার বন্দী করেছেন। (আঘাত করতে উত্তত) সেই স্ত্রীলোককে হাতে পেলে আমি টুকরো টুকরো ক'রে কেটে ফেলব। সেই বদমাইশ মেয়েমানুষটা আমাকে জড়িয়ে থেকে কম কষ্ট দিয়েছে।

ডাক্তার : সে নয়, আপনিই তাকে জড়িয়ে ছিলেন। এখন তিনি আপনার কবল থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। আপনি চিন্তা করুন যে আপনি একজন পরলোকগত আত্মা এবং ধীরে ধীরে আপনার চেতনা ফিরে আসছে। আমি আপনাকে সত্যি কথাই বলছি।

প্রেতায়া : সেই মেয়েমানুষটাকে পেলে তার মুখ আমি খেঁতলে দেব, ভেঙে চুরমার ক'রে দেব। তারপর আমি আপনাকেও দেখে নেব।

ডাক্তার : কেন তাকে আপনি আঘাত করবেন? সে ত আপনার কোন অনিষ্ট করে নি। দেখুন আপনি যদি শাস্ত না হন, তা'হলে আবার আপনাকে 'ইলেকট্রিক শক' দেওয়া হবে। হ্যাঁ, দেখুন আপনি বলছেন যে আপনি একজন পুরুষ মানুষ। কিন্তু আমরা আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমরা শুধু একজন স্ত্রীলোককেই দেখছি।

প্রেতায়া : কেন আপনাদের কি চোখ নেই নাকি? দেখতে পাচ্ছেন না আমি পুরুষ মানুষ?

ডাক্তার : আপনার স্ত্রীলোকের বেশ দেখতে পাচ্ছি। (You have woman's clothes on.)

প্রেতায়া : আমি ওটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আবার আমাকে ওটা পরিয়েছে।

ডাক্তার : সেই স্ত্রীলোককে আপনি এখন ছেড়ে এসেছেন। এখন আপনি অগ্র একজন স্ত্রীলোকের দেহে ভর করেছেন।

প্রেতায়া : তার মানে?

ডাক্তার : আপনি জড়-জগতের পরিবর্তনে আবদ্ধ একটি অজ্ঞ প্রেতায়া, একটি স্ত্রীলোকের পিছু পিছু আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এখন আপনি আমার স্ত্রীর দেহে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

প্রেতায়া : আমি কারও দেহে আশ্রয় করি নি। এটা আমার নিজের দেহ। সেই স্ত্রীলোকটা কেন আমাকে জড়িয়ে ছিল?

ডাক্তার : সে নয়, আপনিই তাকে জড়িয়ে ছিলেন। আপনি ছেড়ে যাবার পর এখন তিনি ভালই আছেন।

প্রেতায়া : আপনিই তাহলে আমাকে অন্ধকারে বন্দী করেছেন?

ডাক্তার : না। উত্তম আত্মারা আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। আপনি আপনার অবস্থা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছেন না কেন? আপনি স্বার্থপর, বোরতর স্বার্থপর ব্যক্তি।

প্রেতায়া : একজন স্ত্রীলোক আমাকে জড়িয়ে থাকবে; সে আমাকে স্ত্রীলোকের বেশ পরাবে, এটা ভাবতে গেলেই আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। আমি স্ত্রীলোককে, নারী-জাতিকে ঘৃণা করি।

ডাক্তার : বিচলিত হবেন না। স্থির হোন, সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করুন, তা' হলেই আপনার চেতনা হবে।



আপনি উন্নত ও সুখী হতে পারবেন।

প্রোভাতা : সুখ বলে কিছু নেই।

ডাক্তার : ঈশ্বরকে কখনও উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন কি? জীবনের প্রকৃত সত্য অবগত হবার চেষ্টা কি কোনদিন করেছেন?

প্রোভাতা : ঈশ্বর বলে কিছু নেই।

ডাক্তার : রহস্যর কোন কিছুর যদি অস্তিত্বই না থাকবে, তা'হলে আপনার অস্তিত্ব কি ক'রে সম্ভব হ'ল? কি ক'রে আপনি বেঁচে আছেন? বলতে পারেন কি ক'রে আপনি আমার জীব দেহের মধ্যে থেকে, আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন?

প্রোভাতা : তাহলে কি আপনার জীবী আমাকে সর্বকণ জড়িয়ে থাকত নাকি?

ডাক্তার : না। আপনি অল্প একজন জীলোককে স্তব্ব করেছিলেন। তাঁকে সাহায্যের জন্য এখানে নিয়ে আসা হয়। তাঁকে আমি আপনার কবল থেকে মুক্ত করেছি। উন্নত আত্মারা আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছেন, আপনি এখন আমার জীব দেহকে অধিকার করেছেন, ব্যালেন।

প্রোভাতা : কি আলা! জীলোককে আমি ঘৃণা করি। আমি তাদের উপর ভর করব কেন? আমার ইচ্ছা হয় তাদের প্রত্যেককে আছড়ে চেরে ফেলি।

ডাক্তার : দেখুন বন্ধু, আপনি যদি সুখী হতে চান, তা'হলে আপনার মনোভাবের পরিবর্তন দরকার। আপনি একজন জড়-জগতের পরিমণ্ডলে ভ্রমণকারী প্রোভাতা, আপনার জড়-দেহ নষ্ট হয়েছে। আপনি জড়-দেহের উপর ভর করে তাদের অনিষ্ট করেছেন। আপনি সেই জীলোক-টির উপর ভর করে তাঁকে ৩৪ বছর ধরে কষ্ট দিয়েছেন।

প্রোভাতা : কেনন করে আমি সেই জীলোকটিকে ভর করলাম? জানেন, আমি জীলোককে ঘৃণা করি। কেন তবে তারা আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতে পারেন? সব জীলোকই শঠ, প্রবঞ্চক, স্বার্থপর। বতকণ তাদের পেছনে টাকা খরচ করতে পারবেন, তারা ততক্ষণ আপনার—তার-পর সব শুয়ে মিরে আপনাকে দূর ক'রে দেবে।

জীলোকের উপর আমি প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা নিয়েছি এবং তা' নেবও। জীলোকেই আমার সর্বনাশ করেছে। জীলোকের নাই আমার

হয়েছে। আমি প্রতিশোধ নেবই।

ডাক্তার : মাথা ঠাণ্ডা ক'রে আপনার অতীত জীবনের আলোচনা করুন। দেখুন দেখি, আপনি কি কোন দোষ করেন নি? আপনার কি মনে হয় না যে আপনার বহু দোষ-ত্রুটি ছিল।

প্রোভাতা : কোন মানুষই সম্পূর্ণ সৎ বা অসৎ নয়। আমিও সাধারণ মানুষ ছিলাম।

ডাক্তার : জীবন-রহস্যকে জানবার চেষ্টা করুন। আমার মনে হয় বহুদিন হল আপনি মারা গেছেন। উন্নত আত্মারা এখানে আছেন, তাঁরা আপনাকে অনেক নতুন বিষয়ের শিক্ষা দেবেন। আপনাকে এখানে এনে আমার জীব দেহের উপর আশ্রয় গ্রহণ করান হয়েছে, কেননা আমরা বাতে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

প্রোভাতা : আপনার জীবী খুব নির্বোধ ত! তিনি সম্মতি দিলেন কেন?

ডাক্তার : তিনি সম্মতি দিয়েছেন, কারণ আপনার মত হতভাগ্য প্রোভাতাদের তিনি সাহায্য করতে চান। সব জীলোকই অপদার্থ, অন্তঃসারশূন্য নর (All women are not false)।

প্রোভাতা : আমার মা খুব ভাল ছিলেন। তাঁর কথা স্মরণ করেই ত যে জীলোকের সংস্পর্শে আমি তাঁকে হত্যা করতে পারি না। আমার মা বছর চল্লিশ আগে মারা গেছেন।

ডাক্তার : আপনিও মারা গেছেন, অবশ্য জড়-দেহের দিক থেকে। দেখুন ত কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি না?

প্রোভাতা : আমি আমার মা'কে দেখতে পাচ্ছি। ওঁকে দেখে আমার বড় ভয় করছে। উনি একজন প্রোভাতা।

ডাক্তার : ইয়া, তিনিও আপনার মত প্রোভাতা। শুনুন তিনি কি বলছেন।

প্রোভাতা : তিনি বলছেন, 'জন, আমি অনেক দিন ধরেই তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি'। আরে দেখুন দেখুন, ওই যে আমার বাবাও দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কী আশ্চর্য লিজিও (Lizzie) যে ওইখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। খবরদার, লিজি দূরে থাক, আমার কাছে এস না। তোমাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই; বদমাইশ, শয়তানী কোথাকার!



চাইতেই এসেছে।

প্রেতায়া : কখনো না, কখনো আমি ওকে ক্ষমা করব না। আমি ওকে ঘৃণা করি।

ডাক্তার : ধীর হোন, শান্ত হোন। মন থেকে ঘৃণার জ্বাৰ দূর করুন।

প্রেতায়া : লিজি চলে যাও, চলে যাও এখান থেকে। জুর মণিনীর মত তুই আমাকে দংশন করেছিস বুঝি। না না, আমি কোন কথা শুনতে চাই না, কোন ওজর না। আমি বিশ্বাস হারিয়েছি, তোমার মত শয়তানীকে আর বিশ্বাস করি না। আমি পাগল হয়েছি, ইয়া সত্যিই পাগল হয়ে গেছি।

ডাক্তার : উনি আপনাকে কি বলছেন?

প্রেতায়া : ও বলছে যে, ঈর্ষার জ্বালায় ব্যাপারটা ঘটেছে। কিন্তু আমি কোনদিন ঈর্ষান্বিত ছিলাম না।

ডাক্তার : উনি কি বলতে চান ভাল ক'রে শুনুন না।

প্রেতায়া : ( শুনিতে শুনিতে ) গল্প, চমৎকার একটা গল্প। আমাদের বিবাহ স্থির হয়ে গিয়েছিল, লিজিও ছিল চমৎকার মেয়ে। শুনছেন, ও এখন কি বলছে? ও বলছে যে, আমি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলাম এবং সব কিছুকেই নাকি বাঁকা চোখে দেখতাম।

ডাক্তার : মনে হচ্ছে আপনি নির্বোধ ও গোঁয়ার প্রকৃতির লোক ছিলেন।

প্রেতায়া : লিজি একটা ডায়া মিথ্যাবাদী। সে কি বলছে জানেন? সে বলছে যে, সেদিন সন্ধ্যা বেলায় বাড়ী ফেরবার সময়, ঘটনা-চক্রে সেই লোকটির সঙ্গে রাস্তার একটা গাড়ীর মধ্যে দেখা হয়েছিল। লোকটি তার সঙ্গে বাড়ীর একটা তোলা পর্যন্ত এসেছিল—সেই সময়ই আমি ওদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখে দারুণ সন্দেহ করি এবং ঈর্ষান্বিত হয়ে নাকি নিজেকে ছুরি মারি।

ডাক্তার : আমার মনে হয় আপনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

প্রেতায়া : হ্যাঁ, আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার মৃত্যু হয় নি; হ'লে অবশ্য খুব ভালই হত। যাই হোক, আমি আবার ওই জীলোকটির উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করব।

ডাক্তার : আপনি লিজিকে ক্ষমা করছেন না কেন?

প্রেতায়া : আপনি কি ওর কথা বিশ্বাস করলেন নাকি? নিজেকে ছুরি মেরে আমি কি কস কষ্ট পেয়েছি নাকি? কিন্তু তবুও আমি মরিনি, বেঁচে রয়েছি। ওই দেখুন, লিজি ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর কাঁদছে।

ডাক্তার : আপনার বিবেকের নির্দেশ পালন করুন। হঠকারিতার বশে কাজ ক'রে, যত্না ভোগ ক'রে লাভ কি?

প্রেতায়া : আমি লিজিকে প্রাণের সঙ্গে ভালবেসে ছিলাম। কিন্তু ওর কাছ থেকে কি আমি পেলাম, কি আমি পেয়েছি বলুন। না, ওকে আমি বিশ্বাস করি না। ও অন্য লোকের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। ও কি বলছে জানেন? ও বলছে যে ও অন্য কারও সঙ্গে চলে যায় নি—ওর কথা ও আমাকে বিশ্বাস করতে বলছে।

ডাক্তার : উনিও যারা গেছেন একথা আপনি জানেন ক?

প্রেতায়া : না। যদি তাই হয় তা'হলে ও এখন একজন প্রেতায়া?

ডাক্তার : উনি ও আপনার কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। শুঁকে কি প্রেতায়ার মত দেখাচ্ছে নাকি?

প্রেতায়া : না। আমার মা'ও বলছেন, 'জন, প্রকৃতিই হ, বুঝে দেখ, বিবেচনা কর।'

ডাক্তার : আপনি আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু আপনার সে ধারণা এখনও হয় নি; সেইজন্তই আপনি একে-ওকে-তাকে ভর করে কষ্ট দিচ্ছেন। যে জীলোকের উপর আপনি ভর করেছিলেন, সে আমাদের একজন কৃগিনী—আপনার জন্ত সে বহু কষ্ট পেয়েছে।

প্রেতায়া : আমি কি কারও কেয়ার করি নাকি? আমি জীলোককে ঘৃণা করি, আর সেও আমার ছাড়বে না, আঁকড়ে ধরে আছে। আমি চাই ত্রেক প্রতিহিংসা—

ওই দেখুন, মা আর লিজি দু'জনেই ওখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। কেউ কিন্তু আমার জন্ত চিন্তা করে না—সুতরাং ভাল হয়ে লাভ কি?

ডাক্তার : 'জন' ছাড়া আপনার পুরো নামটা কি?

প্রেতায়া : জন সুপিতান।

ডাক্তার : আপনি অন্য একজন জীলোককে দেওয়ার জন্ত লজ্জিত বোধ করেন না? আপনি কি মনে করেন, আপনার প্রেম প্রকৃত প্রেম? না, তা' নয়—প্রকৃত



প্রেম নয়, এ হচ্ছে স্বার্থপরতা।

প্রেতায়া : লিজি আমার হাতে পারত, হয় নি। আমার প্রেম, ঘৃণা ও বিবোধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। না, না, লিজি কৈন না, কৈদে কোন লাভ নেই। তুমি হাজার বার বললেও আমি তোমাকে ক্ষমা করব না।

ডাক্তার : লিজিকে ক্ষমা করুন। তা'হলেই আপনার বর্তমান অবস্থার উন্নতি হবে।

প্রেতায়া : না, আমি কখনই ওকে ক্ষমা করব না। জানেন, সব সময়ই মেয়েরা আমার পিছনে ঘুরে বেড়াত, আমি দেখতে খুব সুন্দর ছিলাম কিনা।

ডাক্তার : ওই ত আপনার রোগ। ঘরের মায়া যদি আপনার থাকত, তা'হলে কিছু সাধারণ বুদ্ধি বিবেচনাও জন্মাত; এরকম এক গুঁয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠতেন না। বাই হোক এখন একটু শান্ত হয়ে বিবেচনা করুন, এখন আপনি আমার জীব দেহের উপর আশ্রয় করেছেন।

প্রেতায়া : বেশ ত আপনার জীকে সরিয়ে নিন না, কে চাইছে ওঁকে? লিজি, ওখানে দাঁড়িয়ে কৈদে কোন লাভ নেই, ক্ষমা আমি করব না।

ডাক্তার : আপনি যদি এখন ক্ষমা না করেন, তা'হলে এখান থেকে চলে যাবার পর অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ দেখতে পাবেন—যতদিন না আপনি অনুতপ্ত হচ্ছেন, ততদিন সেই অন্ধকার ঘরেই আপনাকে থাকতে হবে, বুঝলেন। সুতরাং ভাল কথাই বলছি। আপনার মধ্যে যে ক্রটি ও বিচ্যুতি রয়েছে, সে সম্বন্ধে অবহিত হবার চেষ্টা করুন। আচ্ছা, কোন্ শহরে বাস করছেন তা' জানেন কি?

প্রেতায়া : সেন্ট লুইস্।

ডাক্তার : আপনি ক্যালিফোর্নিয়ায় তা' জানেন কি? আচ্ছা, এটা কোন সাল?

প্রেতায়া : ১৯১০ সাল।

ডাক্তার : না, আজ ১৯১৮ সালের ১৩ই জানুয়ারী।

প্রেতায়া : মেয়েমানুষকে কঁাদতে দেখলে আমার বিরক্তি ধরে, সহ্য করতে পারি না। লিজি, কাগা থামাও বলছি।

ডাক্তার : আপনার মা কি বলছেন শুনুন না। উনি নিশ্চয়ই আপনাকে সাহায্য করবেন।

প্রেতায়া : মা, তুমিই ত অধিক আদর দিয়ে আমায় নষ্ট করেছ। এখন আমার পক্ষে অন্তরকম হওয়া সম্ভব নয়।

ডাক্তার : দেখুন আপনি লিজিকে ক্ষমা করতে অনিচ্ছুক হ'লে, আপনার অদৃষ্টে কষ্ট আছে তা' বলে দিচ্ছি।

প্রেতায়া : আপনার ওই অন্ধকার ঘর ত? ওকে আমি খোড়াই কেয়ার করি।

ডাক্তার : আপনি বলেছেন যে আপনার মা'কে আপনি খুব ভালবাসেন। কিন্তু কারও প্রতি কোন সমবেদনা বা করুণা কি আপনার নেই?

প্রেতায়া : 'সমবেদনা বা করুণা' এই কথাগুলোকে আমি ঘৃণা করি। আমার বাবা বলছেন যে আমার পরিবর্তন দরকার—কিন্তু আমার পরিবর্তনের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

ডাক্তার : দেখুন, আপনার ছেলেমানুষি ভাব ত্যাগ ক'রে গম্ভীর ও সৎ হওয়া উচিত।

প্রেতায়া : মা বলছেন যে আমার অগ্নায়ের জন্তু তিনিও কিছুটা দায়ী। সরিয়ে নিন (চীৎকারে) আমি অন্ধকার ঘরে যেতে চাই না। আমি লিজিকে ক্ষমা করব, সব কিছুই করব। আমি বড় ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত।

ডাক্তার : পরলোক-ভীর্থে উপনীত হয়ে আপনি অগ্নি লোকের ক্ষতি না ক'রে; তাদের কল্যাণ করবার দিকে মন দেবেন। বাই হোক, জীলোকটির উপর ভর ক'রে তার যে ক্ষতি করেছেন, তা' পূরণ করবার চেষ্টা করুন। (Try to undo the wrong you have done by obsessing this lady.)

প্রেতায়া : সে আমাকে বস্ত্রণা দিয়েছে। আমি জীলোককে ঘৃণা করি, সেইজন্তুই প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমি চটি-জুতো খুলে তার মুখে মেরেছি। জীজাতির উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্তুই আমি এটা করেছি—আমি ওদের সবলকেই দারুণ ঘৃণা করি।

প্রেতায়া : তার প্রকৃত অবস্থার বিষয় কিছুতেই বোঝান গেল না। তারপর তাকে মিডিয়ামের দেহ থেকে বিযুক্ত ক'রে অন্ধকার ঘরে বন্দী ক'রে রাখা হ'ল—যতদিন না তার আত্মচেতনা হয় এবং মানুষের উপর তার বিদ্বেষের ভাব অন্তর্হিত হয়, ততদিন সেখানেই তাকে থাকতে হবে।



# বিস্মৃত-সন্ধ্যা

( গল্প )

সুকুমার রায়

বসন্তের শেষ পর্বের একটা নিরালা সন্ধ্যা। আকাশে অষ্টমীর খণ্ড চাঁদ—পাশে বসন্তের মৃদু দোলায় নৃত্যরত বৃহৎ পুকুরের কৃষ্ণ জলরাশি। পুকুরের পশ্চিম পাশের ঘাসমুক্ত বৃহৎ ভূমিতে এসে বসল সু। আজ দিনের বেলায় বেশ গরম পড়ে দিনান্তের সূর্য তার অগ্নিধরা রশ্মিমালা নিয়ে মিলিয়ে গেল দিগন্ত বেধার নীচে। আর তখনই ধীরে ধীরে বইতে শুরু করেছে মৃদু-মন্দ বিদায়ী-প্রায় বসন্তের বায়ু প্রবাহ। দিনান্তের পাখীদের নীড়ে কেঁরা সমাপ্তি সংগীত আর বিকালের মধুঢালা বায়ু প্রবাহ তরুণ মনকে করে তোলে উন্মুখ, চেতনাকে নিয়ে যায় অজানা-অচেনা রাজ্যের স্বপ্নপুরীতে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ও একা—নিঃসঙ্গ অবস্থায়। তারপর এক সময় শুয়ে পড়ল। মনে ওর আশা-আনন্দের অজস্র বর্ণালী চিত্তা, চোখে নৃতনের শিহরন জাগা বৈপ্লবিক আলো, যৌবনের মায়া কাননে আশার বিভাবরী রাগিনীর রিনিঝিনি, হৃদয়ের গুপ্ত মণিকোঠার কোন অভিসারিকার গুপ্ত অভিসারের হৃদয়-দোলান নুপুর ধ্বনি। হঠাৎ ঠাণ্ডা স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠে বসল সু।—কে?

—আমি।

—ও, দেবীরানী।

—না, দেবলা।

—ঐ হল, ঐ দেবলা হ'ল আমার স্বর্গ রাজ্যের দেবীরানী।

—আমি বাপু স্বর্গ রাজ্যের দেবী-টেবি হতে পারব না। তোমার হৃদয় রাজ্যের রানী ছাড়া আর কিছু আমি হতে চাই না।

—ও, কিন্তু যদি ইংল্যান্ডের মাটিতে গিয়ে মিস্ (Miss) বলি তবে কি তোমাকে মিস করার কোন কারণ হতে পারে।

—ওসব কিছু আমি চাই না, চাই বাংলার মাটিতে বিশেষ একজন মানুষের কাছে মানুষী হয়ে থাকতে।

ওসব কথা ছেড়ে দাও। বল শুয়ে পড়েছ কেন এখানে,—এ স্থানটা ভাল নয়।

—কেন, কিসের ভয়? লোকচক্ষুর ভীতি অথবা সর্প-সংকুল বিরাম কুঞ্জ?

—হুটোই।

—কিন্তু সাপ বলতে মনের কথাটা বুঝছ না ত।

—না, আমাদের অন্তরটাকে অনেক সাপ বলে অভিহিত করলেও এখানে কিন্তু বিষের ভীতুতা নেই। কই ওঠ, আমার খুব ভয় করছে।

—কিন্তু সাপের ভয়-টয় ত আমার নেই—বলে সু আবার শুয়ে পড়ল।

দেবলা উদ্বিগ্ন হ'ল। চঞ্চল হয়ে বলল—একি আবার শুয়ে পড়লে? আমাকে পাগল করে তবে ছাড়বে দেখছি। আজ্ঞা এমন দৃষ্টি তোমার স্বভাব কেন বলত?

—তা না হ'লে ত তোমাকে কাছে পাই না।

—ও তাই বুঝি! হাসল দেবলা—কই, ওঠো বাকি, কি ছয়ছাড়া হচ্ছে দিনের পর দিন। এই ছয়ছাড়া দশটা বা হচ্ছে কেন?

—সঙ্গীর অভাবে।

—তাই বুঝি!—চোখ নাচিয়ে ও বলল—বেশ বুঝলাম। তোমার কথা যদি সত্য হয়, তবে ঐ দোষটা অনেক আগেই ছাড়া উচিত ছিল। কই ওঠো! দেবলা সু-র হাত ধরে টান দিয়ে বলে—রাত বেশ হয়েছে। পাশে ঝোপঝাড় আমার ভয় করছে।

—আমার অন্তে তোমার ভয় করবে কেন?

—জানি না—অভিমান করে দেবলা বলে। তারপর একটু থেমে বলে—কেন তা যদি বুঝতে তা হলে—বাকুগে ওসব কথা। কই ওঠো! বাঃ বেশ অব্যর্থ ছেলে ত! দেখি ওঠো কি না! সু-র হাত ছেড়ে দিয়ে ঝোপের দিকে পা বাড়াল দেবলা।

তাড়াতাড়ি সু উঠে বসল—এই, যেও না। আমি বাপু ভদ্রলোকের মত তোমার আদেশ মেনে চলব। যেও না, গিন্নি।



দেবলা একই ভাবে এক পা এক পা করে হাঁটছিল।  
ছুটে গিয়ে সু দেবলার হাত ধরল। দেবলার মুখের দিকে  
তাকিয়ে বলে—অপরাধ ক'ম দেবী, চলো ভব নির্দেশিত  
Place. মুখে হাসি ধরো, যুচাও মনোক্রম।

দেবলা হাসল। সু-র মুখটা ছ' হাত দিগে উঁচু করে  
ধরে বলে—চল।

—My dearest darling, দেবীরানী চল।

পাশাপাশি চলতে চলতে দেবলা বলে—কেমন উঠবে  
না নাকি। হেরে গেলে বে বড়—ভীতু!

—জেন্তার কি ক'ম ট্রাজেডী। হারজিতের ট্রফিতে  
ট্রাজেডীর চেয়ে হেরে ক'মেডি লাভ করা ভাল। হেরে  
পেল্যাম বলে তোমাকে পেল্যাম। জিতলে—

পাশে উঁচু জমির ওপরের কাঁঠাল গাছ দেখিয়ে বলে—  
ওখানটার চল। সু-র অসমাপ্ত উত্তর শুনবার আগ্রহ প্রকাশ  
করল না একটুও।

—এতে বলার কি থাকতে পারে? I am always  
ready.—নাটকীয় ভঙ্গীতে সু বলল।

দেবলা নীরবে হাসল। গাছের নীচে এসে দাঁড়াল  
ওরা। একটু পরে দেবলা ওর শাড়ীর আঁচল দিয়ে ঘাসের  
ঝলঝল ময়লা পরিষ্কার করছিল। বাধা দিয়ে সু বলল—  
একি, কাপড়টার ময়লা লাগবে না?

—লাগুক। আশা এইটুকু যে তোমার মনে আমার  
স্থান আরও দৃঢ় হবে। তাছাড়া এতে ধুলো লাগবে, ময়লা  
লাগবে না। ধুলোয় ছাৎকণের সৃষ্টি করে বটে, ময়লার মত  
চিরস্থায়ী ছোপ রাখে না। বস এবার।

দেবলার মুখটা একবার অন্ধকারে দেখবার চেষ্টা করল  
সু। তারপর বলে—বসছি, আচ্ছা এক কথা শিখলে কবে  
থেকে? আগে অগ্নিবানে জর্জরিত করলে, তারপর পুষ্প-  
বাণ মারতে। এমন অগ্নিবাণ শিখলে কেমন করে?

—একদমোর সাধনাকে অনুসরণ করে। মাহুষের ত  
একটা ধৈর্যশক্তি আছে। আর কত মুখ বুজে সহ্য করা  
স্বাভাবিক। তাছাড়া বাণ পেয়ে খেয়ে বাণ মারার টেকনিক  
আয়ত্ত করে ফেলেছি। বস না।

—হ্যাঁ বসছি।—আবৃত্তি করতে করতে বসে পড়ে সু।

আমি যেমন করিয়া চাই

আমি যেমন করিয়া পাই

বেদনা বিহীন ঐ হাসি মুখ

সমান দেখিতে পাই।

একটু খেমে দেবলার মুখের দিকে চেয়ে মূহু হেসে সু  
বলে—ঠিক বলেছি না? দেবলা নীরবে হাসে। সু  
বলে—ও বুঝেছি। পুরো না বললে তুমি উত্তর দেবে না।  
তবে শোন—

ওই রূপ রাশি আপসি বিকাশি'

যবেহ পূর্ণ গৌরবে ভাসি'

আমার ভিখারী প্রাণের বাসনা

হোথার না পাই টাই।

সু-র শেষ হাতেই হাসতে হাসতে দেবলা যোগ করে—

ভবে লুকাব না আমি আর

এই ব্যথিত হৃদয় ভার।

আপনার হাতে চাব না রাখিতে—

আপনার অধিকার।

বাঁচিলাম প্রাণে তেয়াগিয়া লাজ

বন্ধ-বেদনা ছাড়া পেল আজ,

আশা নিরাশায় তোমারি যে আমি

জানাইমু শতবার।

দেবলার আবৃত্তি বন্ধ হলে সু দেবলার গায়ে ছোট  
একটা চিল দিয়ে আঘাত করে বলে—তুমিও এটা জান  
নাকি?

—তা না জানলে একের মনের সঙ্গে অপরের মনের  
মিলন কখনও সম্ভব নয়।

—বেশ বুঝলাম, আমাকে বসতে বলে কি দাঁড়িয়ে  
দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করবে।

হাসল দেবলা।—ও তাই বুঝি, বেশ বসছি।

সু-র কাছ থেকে বেশ ব্যবধান রেখে দেবলা বসল।  
সু মাটি থেকে ছোট চিল সংগ্রহ করে অন্ধকারে লক্ষ্যহীন  
ভাবে ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলে—দূরে বসলে কেন?

—নিকটে বা বসব কেন?

—কেন বসবে—

—হঁ—

—দূরে থাকলে মোহ হয় বেশী, উপভোগ করবার ইচ্ছা  
জাগে—মনে ভেমন জোর থাকে না আর হারানার সম্ভাবনা

—ইত্যাদি ইত্যাদি বিস্তীর্ণ উপসর্গগুলি মাথা চাড়া দিয়ে



ওঠে। ফলে সংঘর্ষ, গোলমাল ছোটোই নষ্ট হয় আর তুষা বাড়ে।

—কিন্তু নিকটে গেলে কি তুষা মিটেবে?

—না মিটুক, তবু সাধারণ তুষা আর যুগ-তুষার পরিণত হবে না। সুতরাং জীবন ত্যাগের সম্ভাবনা নেই তাই বলছি।

—বাকুগে বাকুগে বাপু যাচ্ছি কাছে—আর হতাশ হতে হবে না। হতাশ হলে আশ মিটেবে না আর পাস পেলেও সাকসেসফুলের সার্টিফিকেটও পাওয়া বাবে না।—দেবলা নিকটে এসে বসল।

এক সময় ওরা নীরব হয়ে গেল—কেউ কোন কথা বলল না। সু-রাত্রির অম্পট গাছের দিকে মুখ উঁচু করেবু তাকিয়ে রইল। দেবলা নীরব ভাবে মাথা নীচু করে ঘাস ছিঁড়তে থাকে। এত গভীর ভাবে হৃদয়কে ওরা কাছে পেয়েছে এই প্রথম। প্রেমের পথে বড় জালা, বড় বাধা—কিন্তু এই বাধাতে আনন্দ আছে। এই বাধার জন্তে পরস্পর পরস্পরকে গভীর করে চিনতে পারে। প্রেমে মোহ আছে, মাদ্রা আছে, লজ্জা আছে, সংকোচ আছে, ভয় আছে আর আছে নির্ভয়তা। তাই ত চোখে চোখে বেশীকণ তাকিয়ে থাকা যায় না—চোখে নামিয়ে রাখতে হয়। আবার নামিয়েও রাখা যায় না বেশীকণ, আবার একটু তুলতে হয়। চোখে লজ্জা আছে, তুষা আছে আবার সংকোচও আছে।

বেশ কিছুকণ নীরব থাকার পর দেবলা একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে—তুমি নাকি দু'টার দিনের মধ্যে চলে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—বাঃ বাড়ী যেতে হবে না? পাকিস্তানে বসে থাকলে চলবে।

—কিন্তু এখন ত কোন কাজের ভাড়া নেই, পড়ার চাপ নেই। পরীক্ষা দিয়ে এসেছো, রেজাল্ট আউট হতে ত অনেক দেরি।

—তা' দু' মাস—আড়াই মাস হবে।

—তবে বাড়ী গিয়ে চুপটি করে বসে থাকবে, নতুবা

—কথাটা যত জোরে বললে আসলে শব্দ ছাড়া বিষয় বস্তুর অভাব ওতে।

—না-না আমি যেটা বলি সেটায় ও ছোটোই থাকে দেখবে—বলে সু-র একটা হাত নিজের গলায় ধরে বলে—কেমন ক্রমতা যাও ত দেখি! যদি যেতে পার তবে প্রমাণ করতে পারবে যে আমার কথা বাজে।

—দূর, আমি কোন ছার, রাধিকার কর-বন্ধনীতে স্বয়ং ভগবান ফেল মেয়ে গেলেন। এই যে বাধন জোর করে না হয় এর ওপরেরটা ছাড়ান গেল, ভেতরেরটা যে আরও জোরে চেপে ধরে।

—তবে বাজে কথা কেন বল? দু'দিনের জন্তে এসেছ—এসো, থাকো, খাও—তাতে সন্দেহ নেই—মেয়েদের মনটাকেও দখল করা চাই। সুস্থ মনকে পাগল করা চাই, আবার মনটা স্বাভাবিক হওয়ার আগেই পাগলান কাপুরুষ, ভীক।

কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল সু। দেবলা ঝতে পারল না সু-র মনের অবস্থার। যেখানে মন দেওয়া নেওয়ার মধ্যে পাগল হওয়ার পালা, সেখানে আর একটা





মন ভাল থাকে কি করে? প্রেমের ভীত শকে ছোটো মনই  
ত অবশ্য হয়ে যায়। সর্বত্র একই জালা—উপশম করবে কে?

দেবলা মুখ তুলে তাকাল। সু-কে নীরব থাকতে  
দেখে প্রশ্ন করে—এই, কি ভাবছ?

—ভাবছি—একটু নীরব হল সু। তারপর গলাটা  
পরিষ্কার করে বলে—ভাবছি আমাদের ভালবাসার ভবিষ্যৎ,  
আমাদের এই মিলনের ভবিষ্যৎ।

—চির উজ্জ্বল আমাদের এই প্রেম চির অম্লান থাকবে।  
দেখছি, দিনে দিনে তোমার বুদ্ধিটা সংকীর্ণ হয়ে গেছে।

—আমার জায়গায় গিয়ে তোমার বুদ্ধি আরও সংকীর্ণ  
হবে না ত?

দেবলা ও কথায় কান না দিয়ে বলে—তোমার বৌদির  
সঙ্গে যে কথাটি বলেছি সেটা শুনে এখন সন্দেহ হয় ত  
তোমার?

—হ্যাঁ তাইত, ঐ কথাটা আমার একবারও মনে ছিল না।

—ভুলো মন, বাজে মন তোমার।

—ধাম, কথাটা চিন্তা করে দেখি।—‘এক ফুলে  
দেবতার একবার পূজা হয়—ছ’বার নয়,’—এই না!

—তবে এর চেয়ে বড় আশ্বাস আর কি দিতে পারি  
বলত?

—তা ঠিক, আচ্ছা এটা কি তোমার অন্তরের কথা?

—Fool, বোকা। তুমি জড়পদার্থ, যে যাকে তাকে  
একটা মৌখিক মিথ্যা বুলি শোনালুম। অন্তরকে পেতে  
হলে অন্তরের কথা বলতে হয়। তা ছাড়া এক ফুলে ছ’বার  
দেবতাকে পূজা করলে এতে যেমন দেবতাকে অপমান করা

হয় তেমনি দেবতার অভিশাপ কুড়োতে হয়, ফলে জীবন  
ধ্বংস হয়ে যাবে।

গল্পটা শেষ করল সু। পান্থ অবাক হয়ে শুনছিল  
সু-র গল্প। পান্থ বললে—আশ্চর্য! এত প্রতিশ্রুতি  
সত্ত্বেও দেবলা কি ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারল?

পান্থর কথায় সু কান দিল না। কাঁথাটা বুকের ওপর  
টানতে টানতে বলে—এই জ্বর যেন আমার শেষ জ্বর হয়,  
এর চেয়ে মৃত্যু সংবাদও ভাল। যে দিনের কথা বললাম  
ঠিক সেই দিনটিও ছিল ৩০শে চৈত্র। আর আজকের ঐ  
একই তারিখে পেলাম ওর বিয়ের সংবাদ। কি লিখেছে  
আর একবার পড়ত চিঠিটা।

পান্থ বাধা দিয়ে বলে—না, এই অবস্থায় তোকে বেশী  
শোনান উচিত হবে না।

—ওরে, একবার ত শুনেছি, আর একবার পড় না।

—ছাড়বি না বখন তবে শোন।

‘আমাদের ভালবাসা...ওটাকে কি বলব?—বলব  
ছেলেদের পুতুল খেলা। খেলা ঘরের বর-বউ পাতান।  
প্রেমের উত্তেজনায় পথের ভিখারীকে বিয়ে করা যায়। যেই  
উত্তেজনায় একটু ভাঁটা পড়ে, তখন মনে হয় ভুল করেছি।  
তাই পুতুল খেলায় কি একটু করেছি কিনা সেটাকে ত  
চিরদিনের বলে ধরে নেওয়া যাবে না আর ধরাও বুদ্ধিমানের  
কাজ নয়। স্বার্থের চেয়ে প্রেম বড় নয়। যাক্গে সে সব  
কথা। আমি বিরাট বাড়ীর বউ হতে চলেছি। তোমার  
নিমন্ত্রণ রইল।’

—বিশ্বাসঘাতক—বলে পান্থ চিঠি বন্ধ করল।

## বর্ষদেবতা

শ্রীভারাপদ দাশ

নূতন কোরে লও হে আমারে, তোমার নীরব চরণে,  
অন্ধ তমসা বিদূরিত কোরো নবীন প্রভাত বরণে।

দূর হয়ে যাক্ পুরানো ক্লান্তি,

শোক-তাপ-ভরা মলিন ভ্রান্তি,

উৎসবময় নিখিল ছন্দ প্রকাশিত করো জীবনে।

মরুভূ-তপ্ত প্রথরতা নাশো, নিবিড় প্রেমের নিখরৈ,  
মুখরিত করো অন্তর বীণা, মধুর কল্যাণ স্বকারে।

জীবনে-মরণে, পথ-প্রান্তরে,

দিন-রজনী, আলোক-আধারে,

নবাক্ষর রাগে পূর্ণ বিকশি, জেগে র’ব মহা শরণে।



# আমার জন্য

( পর )

কৃষ্ণদাস মণ্ডল

—মাধুরী!

—হ্যাঁ, মাধুরীর কথাই সেদিন ভাবছিলাম।

যে মেয়েটি পৃথিবীতে অসহায়, নিঃসঙ্গ, যার বুকের বেদনা পাথরের মত চেপে বসে আছে—মুক্ত নয়, স্বাধীন নয়। বৈচিত্র্যহীন পৃথিবীর বুকে ছোপ ধরা একটি মেয়ের কথা। একটু ভালবাসা, একটু দয়া, একটু পরশের অভাবে যার জীবন মরুভূমির মত শুক হয়ে গেল, তারই কাহিনী অকপটে মনে স্থান পেয়েছিল।

সাড়ে এগারোটার ট্রেন বেশ কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে। নিস্তরঙ্গ, নিথর রাত্রি। চারিদিকে চাঁদের আলোর ময়্যাবী রূপ। কুয়াশার মত চাঁদের আলো ঝরছে। লেভেল ক্রসিং-এর সিতু পাণ্ডুর ঘরের আলোটা টিপটিপ করে জ্বলছে। ফাঙনের হাওয়ার সোঁ সোঁ শব্দ। বাঁশের বনে মুঠো মুঠো আঁধার এখানে ওখানে ছড়ানো। বিজলী বাতির আলোর রশ্মিটা পুকুরের কালো জলে পড়ে চিকচিক করছে। দখিনা বাতাসের সাথে ভেসে আসছে আশাবরী রাগের সানাইয়ের করুণ ধ্বনি। হঠাৎ এককণ্ঠে মাধুরীর বিয়ে হয়ে গেছে। কিংবা হয়ত শুভদুষ্টি হচ্ছে এককণ্ঠে। একটু চাওয়া,.... একটু হাসি.... একটু রোমান্স!

হঠাৎ পিছনের জানলা দিয়ে আমার নাম ধরে কে যেন ডাক দিলে—শোভেন দা!

চিন্তায় ছেদ পড়ল। এক মুহূর্তে যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে বললাম—কে?

সেই আধো-আলো আধো-আঁধারের মাঝ থেকে বিয়ের শাড়ী পরা, চন্দন চর্চিতা টিপ পরানো একটি মেয়েলী কণ্ঠের জবাব এল—আমি মাধুরী, শোভেন দা।

—তুমি মাধুরী, এত রাতে!—বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম।—আজ না তোমার বিয়ে!

মাধুরী ধরা গলায় উত্তর দিল—হ্যাঁ শোভেন দা, সেই

কিছুতেই মেনে নিতে পারলাম না।

আন্তে আন্তে মাধুরী ঘরের ভিতর ঢুকল। ব্যথার অশ্রু উপছে পড়ল আমার হাতের উপর। পুনরায় প্রশ্ন করলাম—কেন এলে মাধুরী? ফিরে যাও।

মাধুরী আমার ডান হাতখানা চেপে ধরে বলল—তুমি আমাকে গ্রহণ করতে পারো না শোভেন দা? তুমি আমাকে নিরাশ করো না। আমি আর ফিরে যাব না। তোমার পায়ের তলার আমাকে একটু আশ্রয় দাও। তুমি কি আমাকে বাঁচাতে পার না? ঐ ব্যভিচারী, মস্তপ কমল সেনের হাত থেকে! তুমিই একদিন বলেছিলে—‘আমি তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধব’। সেই সেদিন, যেদিন কালী মন্দিরে গিয়েছিলাম আমরা পূজা দিতে।

—হ্যাঁ বলেছিলাম, কিন্তু—

—কি কিন্তু? তুমি আমাকে নিয়ে পালাতে পার না?

—না, তা আর হয় না।

—কেন হয় না? কেন হয় না শোভেন দা?

—কারণ তোমার বাবা মা আমার সাথে বিয়ে দিতে রাজী নন। আর আমি তাঁদের মতের বিরুদ্ধে যেতে চাই নে। সামান্য একজন স্কুল মাস্টার আমি, কোন ভবিষ্যৎ নেই, সেই অর্থ, নেই বিত্ত—কি হবে আমাকে বিয়ে করে? আর তাছাড়া, তোমার বাবা মার অমতে আমি কিছু করতে চাই না।

মাধুরী পুনরায় বলল—আমার শেষ অতুরোধটুকু রাখ শোভেন দা।

—তা হয় না মাধুরী। তোমার বাবা মা যাকে পছন্দ করেছেন তাকে বিয়ে করে সুখী হও। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি।

চোখের জল মুছতে মুছতে মাধুরী বলল—তাহলে আমি কোনদিনই সুখী হতে পারব না। ওর অপমান আমি সহ্য করতে পারব না। বাবা-মা ওর টাকাই চেয়েছেন। ওর

মধ্যে যে একটা পিঁচ, জন্ত লুকিয়ে আছে তা তারা জানেন না।

ওর উদ্গত অশ্রু বিমোচন আমার চোখেও জল আনল। মাথা নিচু করে বইলাম। মনে মনে ভাবলাম, কেন ওকে গ্রহণ করতে পারি না! চলে যাই না এখান থেকে ওকে নিয়ে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, না—আমি শিক্ষক, চুরির অপবাদ আমি সহ্য করতে পারব না। আমি পাল্লাতে পারব না।

—তুমি যাও মাধুরী, দূর থেকে আমি তোমাকে ভালবাসব। আমি জীবনে বিয়ে করব না। এটুকু তুমি সব সময়ই জেনো যে, তোমার কথা চিন্তা করেই আমি বেঁচে থাকব।

—তাহলে মৃত্যু ছাড়া আর কোন উপায়ই আমার নেই।  
—বলেই ঘর থেকে বিদ্যাদেবেগে ঘেরিয়ে গেল।

কিছু সময় পর দরজাটা বন্ধ করে ইজিচেয়ারে গুরে চিন্তা-সাগরে পাড়ি জমালাম। সিগারেটের ধোঁয়ার ঘর কাপনা হয়ে গেল। পেটা ঝড়িতে রাত ৫টা বাজার সংকেত শুনতে পেলাম। আন্তে আন্তে ভেসে উঠল মনের আয়নার সুখ-দুঃখের দোলা লাগানো ঝাপসা অতীত।

আমি বখন ওকে পড়াতাম, ও ছিল দশম শ্রেণীর ছাত্রী। ক্লাসিকরা অবসর দেছে আমার সামনে এসে বসত। মনে হ'ত যেন ব্যাখ্যার পলক নিয়ে বসেছে।

একদিন মাধুরী আমাকে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা শোভেন দা, আপনার মা আছেন?

আমি বললাম—কেন হঠাৎ এ প্রশ্ন?

মাধুরী হাতে ধরা খাতাটার দাগ কাটতে কাটতে বলল—এরনি বললাম।

—হ্যাঁ আমার মা আছেন।

—তিনি আপনাকে খুব ভালবাসেন, না?

—হ্যাঁ তার তো বাসেন বই কি। আর মা তো ছেলেকে ভালবাসবেন-ই। কেন তোমার মা তোমাকে ভালবাসেন না?

—আমার নিজের মা থাকলে হয়ত বাসতেন—বলে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল মাধুরী।

আমি বিষয় প্রকাশ করে বললাম—কেন মিসেস বোস তোমার আপন মা নন!

মাধুরী বলল—না, সৎমা।

আমি প্রশ্ন করলাম—উনি তোমাকে ভালবাসেন না?

ও বেদনার হাসি হেসে বলল—হ্যাঁ, খুব ভালবাসেন,—তার তুলনা হয় না।

বুঝলাম ওর ব্যথা কোথায়। সেদিন থেকে বুঝলাম, ওর হৃদয় বেদনার ভরে গেছে। ও বড় অসহায়—বড় একা। সেদিন থেকে এই অসহায়কে নিজের মনেক অগোচরে একটু একটু করে ভালবেসে কেঁদলাম। প্রতিদিনই ও অসহায় ভাবে আমার সামনে এসে বসত। কেবলে বড় মারা হত। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। পাখীদের কলগুঞ্জে ঘুম ভেঙে গেল।

আজ মনে হল পাখীদের আনন্দ-ধ্বনি যেন ধেমে গেছে। কোন হুঃসংবাদ জানাবার জন্ত চীৎকার করে আমাকে জাগিয়ে দিচ্ছে। পূর্ব দিগন্তে উষা যেন আল প্রথম ভেজ নিয়ে উদ্ভিত হয়েছে। ঘর থেকে বেরবার জন্ত দরজা খুলেই চমকে উঠলাম।

—একি! এ যে মাধুরী! মুখ দিয়ে লাল গড়িয়ে পড়ছে। হাতে ও কিসের শিল্পি! ওমা, এ যে বিদ্য!—প্রায় চীৎকার করে উঠলাম। মুহূর্তে দিশাহারা হয়ে গেলাম। কারার কেটে পড়তে চাইলাম।

—তুমি একি করলে মাধুরী!

ওর মাথার কাছে একটা কাগজ পেলাম। ও লিখেছে :  
কমল সেনকে বিয়ে করার চাইতে আমার মৃত্যু ভাল।  
কিন্তু তুমি কি আমাকে বাঁচাতে পারতে না?.....

মাধুরী।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি তোমাকে বাঁচাতে পারতাম। আমিই তোমার মৃত্যুর জন্ত দায়ী। মাধু! মাধু!—বলে ওকে বুকে তুলে নিলাম। নির্জীব অধরে এঁকে দিলাম প্রেমের জয়টিকা।



# রানীপুরের ডাক্তার

( গল্প )

শ্রীনিরঞ্জন সেন

ডাক্তার সুবিমল সরকার কি কারণে রানীপুরে এসে ডাক্তারখানা খুলল তার কারণ বুঝে ওঠা শক্ত। রানীপুরের লোকেরাই বুঝতে পারল না, তা চারপাশের গ্রামের লোকেরা আর কি করে বুঝবে!

ডাক্তার হিসাবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল—গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। পরোপকারী সদা হান্তময় সুবিমল ডাক্তারের আগমনে ঝিমিয়ে পড়া রানীপুর গ্রাম সহসা প্রাণ ফিরে পেল। রানীপুরের রূপও পালটে গেল আচমকাই!

নদীর নামে গ্রামের নাম। নদীর নাম রানীপুরের নদী। সারা বছর ও ক্রীণ স্রোতা—নীরব ওর ভাষা। বর্ষায় পায় প্রাণ—ঐ সময় ওর ভরা-বোবন। বোবন-ভরা দেহ নিয়ে ছুটে চলে “বেলাকুড়ি”র দিকে। ছন্দময় ওর চলার গতি।—চার পাশের গ্রামগুলো ক করে ভোলে শান্ত গ্রামলা—চাষীরা নতুন করে স্বপ্ন। কত রূপ এই রানীপুরের নদীর। প্রতি ঋতুতেই রূপ পাল্টায়। অদ্ভুত!

ভৈরব স্থানের কাছে বাঁক নিয়েছে নদীটা। ভৈরব স্থানের সামনেই পিচের রাস্তা—কালো দেহটা নিয়ে একে-বেঁকে চলে গেছে শালতোড়ার দিকে। “পাহাড়ীবাবু” প্রায়ই এসে বসে থাকে ভৈরব স্থানে। কখনও বা নদীর কাছে। বসে বসে কি যেন ভাবে। ওর জীবনে প্রেম এসেছিল কিছু সফলতা পায় নি। ব্যর্থ প্রেমিক পাহাড়ীবাবু—সাহিত্যিকও। দেবীর কথা আজও ভুলতে পারে নি—আর পারবেও না। তাছাড়া ভুলতেও পারা যায় না। আমিও তো আরতিকে ভুলতে পারিনি—আর পারবও না। আরতি বিখ্যাস এখন আরতি দাস। পাহাড়ীবাবু “পোপ মন্দিরে”ও আসেন।

ভৈরব বাবার মন্দিরটি একাই দাঁড়িয়ে আছে। তবে কি একটা গাছ আছে ওর কাছে—নিঃসঙ্গতা দূর করেছে। একক মন্দিরটির ব্যথার সমবেদনা জানাচ্ছে। একটা মিষ্টি মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ওদের মধ্যে।

অবাক হয়ে থাকিয়ে থাকেন সুবিমল সরকার। ওর আসল পরিচয় কি, তা’ কেউ জানতে পারেনি। শুধু ডাক্তার এই পরিচয়ে তিনি সকলের কাছে পরিচিত। সবার ডাকেই তিনি যান—তবে পায়ে হেঁটে।—কেবল ছ’ পাঁচটা গাছ বেখানে জটলা করছে সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন—কি যেন ভাবেন—কিছু উপলব্ধির উৎস যেন! ভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির এই পরিবর্তন—এক অদ্ভুত জিনিস—কে এই পরিবর্তনে সহায়তা করে কে জানে!

বিকালে তিনি রানীপুরের নদীর ধারে এসে বসেন। সন্ধ্যা নামার আগেই বাসায় আসেন ডাক্তার। সন্ধ্যাপ্রদীপ আর ধূপ জালিয়ে দেন ঘরে, তারপরে উত্তর ধারের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ান। হরি বোষের তরকারি বাগান, তার কোলেই একটি ফুল বাগান।

রানীপুর সুবিমল ডাক্তারের কাছে কত পরিচিত। রানীপুরের গাছপালা-মাটি, প্রতিটি মানুষই যেন কত দিনের পরিচিত। শেষে সুবিমল সরকার এই নামটা সবাই ভুলে গেল—তারই ফলে হলো—রানীপুরের ডাক্তার।

আমার সঙ্গে ডাক্তারের পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ হলো। আমাকে তিনি স্নেহ করেন অর্ধেক বছর মত মনের দ্বার খুলে সব কথা বলেন। মর্মান্তিক ব্যর্থতায় ডাক্তারের মনটা ভেঙ্গে গেছে। ফুল বড়ড ভালবাসেন ডাক্তার। ডিজিটের পরিবর্তে তিনি ফুল নিয়ে আসেন অনেক ক্ষেত্রে।

সত্যি ডাক্তার আজও ভাবছেন—রানী ঠিকই বলতো—সুবিমলদা, তোমার ডাক্তার না হয়ে কবি হওয়া উচিত ছিল। ডাক্তারের মনটা গিয়ে অতীতের স্মৃতির দেওয়ালে ধাক্কা মারে।

—হারিয়ে যাওয়া দিন কি আর ফিরে পাওয়া যায় না? নিজের মনকে প্রশ্ন করেন ডাক্তার।—না! মন থেকেই উত্তর পান ডাক্তার।

বাইরে এসে বাতাবি নেবুর গাছ থেকে কয়েকটা ফুল

তুলে নেন। অদ্ভুত মন মাতানো গন্ধ। ডালে ডালে  
ফুটন্ত ফুলের সমারোহ!

ঐ দূরে “সাহেব বাঁধের” পাড়ের গাছগুলোর ওপর  
চাঁদের আলো পড়েছে। না—আর না—ঘরে আসেন  
ডাক্তার। মনটাকে জোর করে বশ করতে চেষ্টা করেন।  
এ ভাবপ্রবণতা ওর সাজে না।—কিন্তু সান্ত্বনা কোথায়  
পাবে?—কর্ম ক্লাস্ত দেহের ওপর একটি মিষ্টি প্রেরণাময়  
হাতের স্পর্শ।.....

রাত ফুরিয়ে গেল।

কুরো তলায় আসেন ডাক্তার। আগে যে ঘরটার  
থাকতেন তার দিকে দৃষ্টি দেন। অবহেলিত ঘরটা পড়ে  
আছে। এখন ওর আর কোন প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন  
ফুরিয়ে গেছে। ঘরটার দরজার পাশেই ছ’টি কাঁঠাল গাছ—  
ছ’টি গাছ একই জায়গায়। বেন নির্বাক অথচ সতর্ক গ্রহণী।

পাথরের দেশ.....কেমন একটা রুদ্ধ ভাব। পাহাড়  
আছে একটার পাশে আর একটা। একজন আর এক-  
জনের চেয়ে মাথা উচিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। নির্জন  
পাথুরে পথ—কেবল “পাথর কোয়েলী” থেকে পাথর  
ডাক্তার শব্দ নির্জনতাকে ভেঙ্গে দিচ্ছে—দেবেও। হাতুড়ির  
ধারে পাথরগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে।  
ছিটকেও পড়ছে। ডাক্তারের সংসারকে এমনি এক  
হাতুড়ির ধারে ভেঙ্গে দিয়েছে.....নিয়তির অদৃশ্য ইঙ্গিত।

ফিরে যান ডাক্তার তার আগের জীবনে।

কই আজও তো ডাক্তার ভুলতে পারলেন না রেবাকে।  
রেবা নিয়োগী। আসল নাম সবিতা দত্ত। রেবা নামটি  
ডাক্তারের দেওয়া—রানী নামটিও তাই। রানী বলেই  
বেলী ডাকতেন ডাক্তার সুবিশল সরকার।

মাস রানী ছাড়া তরুণ ডাক্তার সুবিশল সরকারের কোন  
কাজই হতো না হাসপাতালে। অপারেশন টেবিলের পাশে  
রানী না থাকলে অপারেশন করতেন না ডাক্তার।—সব  
কিছুতে রানীকে চাই। শেষে ওরা ঘর বাঁধার স্বপ্ন  
দেখল। নিজেদের মনের অবস্থা ওরা নিজেরা বুঝল।

—আজ তো ডিউটি নেই, চল না একটু ঘুরে আসি—  
অমুরোধ ছড়ানো ডাক্তারের কণ্ঠস্বর।

—চল।

হু’জনে এসে বসে একটা আকাশমণি গাছের তলায়।  
এ এক অল্প জগৎ। রানীর হাতখানা তুলে নেন ডাক্তার  
নিজের হাতের মুঠায়। আবেগ কাঁপা পরিবেশ। রানী  
আরও সরে আসে ডাক্তারের কাছে। ঘোবন-ভরা একটি  
নারী। নিজেকে প্রকাশ করতে চায়—রূপে-গন্ধে।

উদ্ভিন্ন ঘোবনা নারী দেহের উত্তাপ ডাক্তারকে এক  
নেশায় পেয়ে বসে। এ নেশার প্রয়োজন আছে হু’  
পক্ষেরই।—আপত্তিও করেনি রানী। স্বপ্নময় পরিবেশে  
দেহ এলিয়ে দেয় রানী। বেশ রাত করে ওরা ফিরে আসে।

রানীর প্রকৃতি সম্পূর্ণ আগাদা। অল্প পাঁচজন মেয়ের  
মত নয়। হাসপাতালে ওর এক রূপ। অদ্ভুত মারা-খরা  
মিষ্টি কথার যন্ত্রণা কাতর রোগীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে  
তোলে। ফরসা নিটোল হাতের স্পর্শে রোগীরা ভুলে যায়  
রোগ যন্ত্রণা। তারা পায় নতুন করে বাঁচার আশ্বাস—ফিরে  
যেতে চায় নিজেদের শান্তির নীড়ে।

দিন চলে যায়—মাস আসে।—একদিন চৈত্রের বিকাল।

আমের মুকুলের গন্ধে বা গ্রাস কেমন আনমনা। ছাতা  
পাথরের শিবের গাজন আসছে। আবার ভাবছেন ডাক্তার  
আগের কথা। বয়স যুগের প্রকৃতি। এই সময়ে মানুষ



আপন জনের সঙ্গ চায়। বিরহ কাতর হয়ে পড়ে মন।

—কে?—নিটোল হাতের আগতো স্পর্শে ফিরে চান  
ডাক্তার।—তুমি!

জল টলমল করছে রানীর কামনা-কাঁপা ছ'টি চোখে।

—কি হয়েছে রানী—তোমার চোখে জল?—অধীর  
আগ্রহে উত্তরের প্রতীকার থাকেন ডাক্তার।

—মা আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে—জানতে  
পেরেছে আমি মা হতে চলেছি। এ-মাসে আমার মাইনের  
টাকা পর্যন্ত নেয় নি। ও-পথ আমার বন্ধ—চিরদিনের মত।  
তুমি কিছু ব্যবস্থা কর—যতদিন ব্যবস্থা না হয় ততদিন  
আমি মণিমালায় কাছে গিয়ে থাকি। মণিমালা সিংহ।

—বেশ তো, ব্যবস্থা হবে—হাসি টেনে বলেন ডাক্তার।

ওদের বৈজ্ঞানিক ম্যারেজ হয়েছিল—ঘর বেঁধেছিল ওরা।

তারপরে দশ মাস দশ দিন পরে রানী মা হতে গিয়েছিল  
হাসপাতালে। নতুন সৃষ্টি বাইরের ডাকে সাড়া দিয়েছিল  
—একটি মেয়ে হয়েছিল। কিন্তু মা ও মেয়ে কেউই বাঁচেনি।

তারপরে হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই রানীপুরে  
আসেন ডাক্তার সুবিনয় সরকার।—ডাক্তার আজও ভুলতে  
পারেন নি রানীকে।

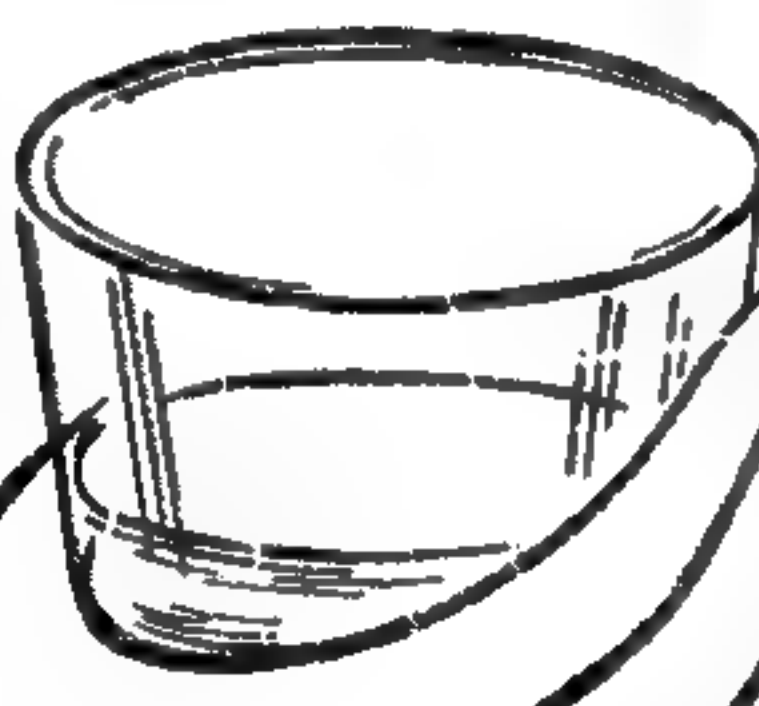
—ডাক্তারবাবু—ডাক এসেছে মণিপুর থেকে। ডাকতে  
এসেছে কুমকি মেঝান।

সক্রিয় হয়ে ওঠেন ডাক্তার। রানীপুরের ডাক্তার...এ  
ছাড়া পৃথিবীতে আর আর ডাক্তার সুবিনয় সরকারের অতুল  
কোন পরিচয় নেই।

আহারের পর  
দিনে দু'বার..

দ্রব প্রাণতুতে  
প্রাণ্য নাড়ের  
শ্রেষ্ঠ উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান



মহাদ্রাক্ষারিষ্ট  
(৬ বৎসরের পুরাতন)

মৃতসঞ্জিবনী

সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র  
ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদ-  
আচার্য, ৩৬, গো স্বা ল পা ডা  
রোড, কলিকাতা-৩৭



অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,  
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস, (লন্ডন),  
এম, সি, এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর  
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

Acc 128 dt. 29. 4. 68

1826b. 924. 7(1-7) R. 5. 00



# পুনর্জন্ম

শ্রী উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

—ওলো, অমন দেমাক দেখিয়ে বেড়াস না। গরীবের মেয়ে একবার কালসাপের নজরে পড়লে আর রক্ষে থাকবে না। ছোবল মারবেই। যে জঙ্গলে বাস করছি আমরা!

কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে বলা সে কোন কিছুই গ্রাহ্যই করে না। ষাড় বেঁকিয়ে হেলে কুলে চলে যায়। মনে যেন জানাতে চায়, আমিও তো কালনাগিনী। আমার আবার সাপে ভয় কি। জ্ঞান হবার আগেই বাবাকে খেয়েছি, তারপর মাকে ও শেষে স্বামীকে।

আকন্দগাছি অজ পাড়ারগাঁ। শহরের সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেক দূরের। আইন শৃঙ্খলার কঠোর শাসন সেখানে তেমন পাকাপোক্ত নয়। এই ছোট গাঁয়ের জমিদার বিত্তশালী ভুজঙ্গ চৌধুরী একটি মৃতিমান শরতান। তার অসাধ্য এমন কোন চুকর্মই ছিল না। দিন-রাত কাটে তার ব্যভিচারের স্রোতে। এর হোঁচল লেগেছিল গাঁয়ের আরও অনেক অকর্মণ্য চুচরিত্র লোকের মধ্যে। এদের অত্যাচারে মধ্যবিত্ত গরীব লোকদের পারিবারিক সুখ-শান্তি প্রায় ছিল না বললেই হয়।

হরিহর ভট্টাচার্য গাঁয়ের একজন গরীব ব্রাহ্মণ। অপরের সাহায্যেই তাঁর সংসার চলে। লাভণ্য তাঁরই সহায়হীনা ঝালবিষবা ভগিনী। অসামান্য রূপবতী। সব হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল মামার কাছে। প্রকৃতি যেন নিখুঁত করে কুঁদে গড়েছিল তাকে। সকলেই তারিফ করতো তার রূপের। বয়সসীরা নাসিকা কুঞ্জন করে বলতো—বিষকণ্ঠ। এই রূপের জন্তই ও সব খোয়াল। কপালে আরও কি আছে, কে জানে!

সে এক রাতের ঘটনা। গভীর আঁধারের নিস্তরুভায় চারদিক মোন। সকলের অজ্ঞাতে আগোচরে লাভণ্যর জীবনে ঘটে গেল এক চরম বিপর্যয়।

চোখ মেলে চায় লাভণ্য। সত্য, না স্বপ্ন! বহুমূল্য খাটে ভুজঙ্গ চৌধুরীর পাশে সে শায়িত। হ'হাতে চোখ মুছে স্পষ্ট করে বুঝতে চেষ্টা করে। ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত ফুলতে থাকে

রাগে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে কেঁপে যায় শরীর। নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন সর্ব শরীর। কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে চায়। না—না, লজ্জা ও ভয়ে জ্ঞানশূন্য হলে তাকে চলবে না। কান্নার এ সময় নয়। এই নরককুণ্ড থেকে তাকে উদ্ধার পেতেই হবে। সে যে কালনাগিনী! তাকে সেটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে হবে বই কি।

অনেক দিনই কেটে যায়। বিন্মুতির অতল তলে ডুবে যায় সব স্মৃতি। কেউ খোঁজ রাখে না লাভণ্যর। বুদ্ধ হরিহর ভট্টাচার্য রোগে-শোকে ও অনাহারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অত্যাচার ও ব্যভিচারের শেষ পরিণতির হাত থেকে যেহাঁই পেল না ভুজঙ্গ চৌধুরীও। ক্রমশঃ শরীর জরা-ব্যাধিতে পঙ্গু হয়ে পড়ে। জর যেন ছাড়তেই চায় না শরীর থেকে। তারপর কাশির সঙ্গে একদিন বের হয়ে এল তাজা রক্ত। ডাক্তার পরামর্শ দেয় হাসপাতালে ভর্তি হবার। কারণ বাড়ীতে বিশেষতঃ এই অজ পাড়ারগাঁয়ে এ-রোগের ভাল চিকিৎসা একবারেই অসম্ভব।

শিক্ষা ও সংস্কারের বালাই না থাকলেও, ভুজঙ্গ চৌধুরীর এটা বুঝতে বেশী কষ্ট হয়নি যে তার দিন ফুরিয়ে আসছে। পাপের ফল ফলতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু ভুজঙ্গ চৌধুরী সহজে দমবার পাত্র নয়। জীবনে পরাজয় স্বীকার করেনি কারও কাছে কোনদিন। তাই মনে মনে বলে—বাঁচতে তাকে হবেই—যে কোন কিছুর বিনিময়ে। কিন্তু আর এ-পথ নয়। নূতন ভাবে আবার জীবন শুরু করতে হবে।

তারপর একদিন বইবার মত ধন-সম্পত্তি নিয়ে পাড়ি দিল শহরের দিকে। সঙ্গে নিল না কাউকে। সব বেইমানি বিশ্বাস নেই কাউকে। নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। সব কিছুর বিনিময়েও আজ তাকে বেঁচে উঠতে হবে। কোন মতেই অকালে সে মরবে না। পয়সার অভাব তার নেই। কিন্তু পর মুহূর্তেই ভাবে, পয়সা থাকলেই যদি লোকে বেঁচে থাকতো তাহলে জগতের বড়-

লোকেরা আর মারা যেত না। বেদনায় মুষড়ে পড়ে।

প্রথম শ্রেণীর কামরা। যাত্রী মাত্র গোটা তিনেক। রিডলভারটা হাত দিয়ে দেখে নেয় জামার তলার ঠিক আছে। এটিই তার একমাত্র বিশ্বাসী সাথী। ঠিক সাথেরই আছে। একদিনের জন্তুও কাছ ছাড়া হয়নি। গাড়ী চলেছে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে। সহসা আকাশের বৃকে জমে ওঠে কালো ঘন মেঘ। গাছপালা-ভাড়া সব কিছু ডুবে যায় কালোর বস্ত্রায়। কিছুই দেখা যায় না। কামরার আলোটা মিটমিট করে জলে। যাত্রী তিনজন একে একে নেমে যায় তাদের গন্তব্য স্থানে। ভুজঙ্গ একেবারে একা। বড় নিঃসঙ্গ মনে হয় আজ তার নিজেকে। অবসন্ন, ক্লান্ত জরাজীর্ণ শরীর। মনও বড় দুর্বল। ঘুমে এলিয়ে পড়তে চায় শরীর। কিন্তু ঘুমুলে চলবে না। আগে তাকে থাকতেই হবে। রুগ্ন শরীরটাকে টেনে খাড়া করে বসায়। চিন্তা করতে থাকে—জীবনভোর ইচ্ছামত ভোগ করলাম। কিন্তু তৃপ্তি কোথায়! কামরার ঘেন আর শেষ নেই। কত লোকের সর্বনাশ করেছি। আজ তারই প্রতিকূল শুরু হয়েছে। এসব পাপেরই পরিণাম। পরমুহূর্তে সিগারেটটা ছুঁড়ে দূরে ফেলে দেয়। গা ঝাড়া দিয়ে সারে বসে। বলে—খ্যৎ, পাপ-পুণ্য বলে কিছু আছে নাকি। এসব দুর্বল লোকের অলীক করুণা। চুলোর যাক সব। আগে সেরে উঠি, তারপর ও-সম্বন্ধে মাথা ঘামান বাবে। গাড়ী এসে থামে পরের স্টেশনে।

অন্ধকারে বিছাৎ আলকের মত এক সুন্দরী, রূপসী উঠে আসে কামরায়। মেয়েটি চোখ মেলে চায় এদিক-ওদিক। কামরার অসুস্থ ভুজঙ্গ চৌধুরী ছাড়া আর দ্বিতীয় লোক নেই। গাড়ী চলতে শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে, আর নামবারও উপায় নেই। অগত্যা জড়গড় হয়ে বসে' দূরে এক কোণে অন্ধকারে নিজেকে খানিকটা লুকিয়ে রাখে। ভুজঙ্গ চৌধুরী উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। বাস্তবিকই প্রকৃত সুন্দরী। কোন বড়লোকের মেয়েই হবে বোধহয়। গাড়ীর স্বর আলোর দূর থেকে ভাল করে দেখা যায় না তার আপাদমস্তক। রক্তলোভী বাঘের মত তার চোখ চকচক করে জলে ওঠে। ভুলে যায় তার রুগ্ন শরীরের কথা। কপালের শিরজ্বলো ফুলে ওঠে উত্তেজনায়। মেয়েটি জানলা দিয়ে মুখ বাইরে বের করে

দিয়েছিল অন্ধকারে,—হয়তো আলোর প্রত্যাশায়। কিন্তু একবার যদি সেই মুহূর্তে ভুজঙ্গ চৌধুরীর মুখের দিকে দৃষ্টি দিত, তাহলে তাকে বিপদ-শিকল টেনে গাড়ী থামাতেই হত। সাহসে কুলোতো না একলা আর ঐ কামরার বসে থাকতে।

আকাশে তখন বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে।

কামরার আগুনে হৃদয় জ্বলতে থাকলেও সাহস পায় না। আজ যে সে অসুস্থ। বাঁচবার আশায় ছুটেছে শহরের দিকে। বড়ই অসহায় সে আজ। কিছুক্ষণ ঝায় বৃষ্টির পর ক্লান্ত অসুস্থ শরীর আরও অবসন্ন হয়ে পড়ে। ভাবে আজ আর শক্তিতে নয়, ছলনায় বাজীমাত করতে হবে। সে বেশ নম্রভাবে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে—আপনি কোথায় বাবেন?

—কোলকাতার।—ওধু ছোট্ট একটু জবাব।

—ভালই হল। আমিও কলকাতাতেই থাকি। শরীর আমার খুব অসুস্থ। মালপত্রগুলোর জন্তু চোখের পাতা বুজতে পারছি না। দয়া করে আপনি যদি এগুলোর ওপর একটু দৃষ্টি রাখেন তাহলে নিশ্চিন্তে আমি একটু ঘুমতে পারি। এর মধ্যে কোন অসুবিধা হলে আমাকে জাগাতে আপনি কোন কুঠা বোধ করবেন না। আপা করি কোলকাতা পৌঁছবার আগেই আমার ঘুম ভেঙে যাবে।

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে সম্মতিই জানায়। ভুজঙ্গ চৌধুরী আশ্বস্ত হয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কিন্তু ঘুমতে পারে না। ঘুমবার ভান করে পড়ে থাকে। মেয়েটির দিকে তির্যক্ ভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করে। মেয়েটি জানলার বাইরে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। ভুজঙ্গ নিজের মনেই হাসে। পরম নির্ভরতা। মেয়েদের নাড়ীনক্ষত্র তার সব জানা। ঘুমে হুঁচোখ একবারে জুড়ে আসে। কোন রকমেই ঘেন আর সম্ভব হয় না নিজেকে খাড়া রাখা। হলেই বা অপরিচিতা, ভদ্র ঘরের মেয়ে—বিশ্বাসের অমর্যাদা কখনই করতে পারবে না। চিন্তা-সমুদ্রে হাবুডুব খেতে খেতে এক সময় অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে ভুজঙ্গ চৌধুরী। ঘুম ভাঙলো একবারে হাওড়া স্টেশনে কুলীদের চিংকারে। হুঁহাতে চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসে। প্রথমেই চোখ মেলে দেখে তার স্মৃটকেসটি উখাও। একে অসুস্থ শরীর,



তার আবার এ-চুর্খটনা—শরীর যেন অবসন্নতার ভেঙ্গে পড়ে। ভাড়াভাড়ি পকেটে হাত দিয়ে দেখে মনিব্যাগও নেই! ভাঁজ করা একটা কাগজ বার হয়ে আসে পকেট থেকে। কাগজটা বিয়ল মনে চোখের সামনে তুলে ধরে। একটা চিঠি।

ভুজঙ্গ চৌধুরী, অনেক দিন অপেক্ষার পর তোমাকে মুঠোর পেলাম। তাই এ-সুযোগের কি অপচয় করতে পারি! এরই অপেক্ষায় এতদিন আমি দিন গুনছিলাম। এই সুদীর্ঘ দিন আমি কিভাবে তোমাকে অনুসরণ করেছি তা একমাত্র আমার অন্তরীক্ষণী জানেন। আহা—নিজা মান-সম্মান কিছুই আমার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। কঠোর সাধনা আজ আমার সফল হয়েছে।

যেভাবে অনেক মেয়ে তোমার অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে নিজেদের মুক্ত করেছিল, তেমনি ভাবে তুমি নিজে মুক্ত হতে পার। সেইজন্ত তোমার রিভলভারটা আর সরালাম না। যাতে অতি সহজেই তুমি মুক্তি পেতে পার। তোমার টাকাকড়ি সব 'নারী কল্যাণ আশ্রমে' জমা দিয়ে দেব। যাতে পরলোকে তোমার আত্মার কিছুটা শান্তি ও সদগতি হয়—এই ইচ্ছা। ইতি—

লাবণ্য।

অনুস্থ রক্ত শরীর তার টলে পড়ে। একে একে গাড়ী ফাঁকা হয়ে আসে। ভুজঙ্গ আজ সত্যিই বড় অসহায় বোধ করে। তার মত কঠিন হৃদয় ব্যক্তির চোখেও জল এসে যায়। মাথায় হাত দিয়ে আনুস্থ হতে চেষ্টা করে।

সহসা লুপ্তপ্রায় চেতনা যেন ফিরে আসে ভুজঙ্গ চৌধুরীর। ক্রোধে উত্তেজনার সর্বশরীর কাঁপতে থাকে ধরধর করে। মনে মনে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে বসে—দেখে নেব হরি উচ্চারের ভাগনীকে! ভিখারীর ছেঁড়া কাঁথা! আচ্ছা, দাঁড়াও, কোন রকমে সারি আগে।

উত্তেজনায় প্রায় ছুটে বের হয়ে যায়। সম্মুখেই একটি খালি ট্যাক্সি পেয়ে তাতেই উঠে বসে। হুকুম দেয়—'নারী কল্যাণ আশ্রম'।—আপন মনেই গজরাতে থাকে—কল্যাণ করাচ্ছি।

ট্যাক্সি চলতে থাকে। উত্তেজনার মুখের শিরাগুলো সব ফুলে ফুলে ওঠে। কাশির বেগ আরম্ভ হয় প্রবলভাবে।

মুখ দিয়ে বার হয়ে আসে ঝলকে ঝলকে তাজা রক্ত। বীর-বিক্রম ভুজঙ্গ চৌধুরীর বিরাট দেহখানা অবশ হয়ে নেতিয়ে পড়ে গাড়ীর মধ্যে। 'নারী কল্যাণ আশ্রমের' সম্মুখে এসে গাড়ী থেমে যায়। পিছন দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে ড্রাইভার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। ভেবে পার না কি করবে সে। লোকটা কি শেষে মারা গেল নাকি! চুপিসারে সে ভুজঙ্গকে 'নারী কল্যাণ আশ্রমের' দাওয়ার তইয়ে দিয়ে গাড়ী নিয়ে সরে পড়ে।

আশ্রমের পরিচালিকা মিসেস ভাণ্ডারী কোন কাজের জন্ত বাইরে বাচ্ছিলেন। তিনি মৃতপ্রায় একটি লোককে ঐ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে বিস্ময়ে এগিয়ে গেলেন সেদিকে। ভাল করে পরীক্ষা করে বোঝেন লোকটি জীবিত। তবে এই অবস্থায় আর কিছুকণ থাকলে জীবনের কোন আশা থাকবে না। সমস্ত শরীর তাজা রক্তে ভরে গেছে। হুই কল বেয়ে কাল জমাট রক্ত। তিনি কোন ভাবনার অবকাশ না রেখে তৎক্ষণাৎ তাকে হাসপাতাল পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

বেহুশ অবস্থায় কেটে গেল কয়েক দিন। তারপর অল্প জ্ঞান হলে আন্তে আন্তে মলিন দৃষ্টি মেলে। বুঝতে কষ্ট হয় না যে সে হাসপাতালে।

এইভাবে আরও কিছুদিন কেটে গেল। কিন্তু তবুও সব কিছুই যেন তার কাছে ধোঁয়াটে বলে মনে হয়। একদিন ভুজঙ্গ নাস'কে বলে—একি অজ্ঞায় জ্বরদন্তি আপনাদের! নিজের বিষয় কিছু জানবার অধিকারও থাকবে না আমার।

নাস' হেসে ছোট্ট ভাবে উত্তর দেয়—যাকে জানাবার তাঁকে জানানর কোন ক্রটি হচ্ছে না।

—যাকে জানাবার তাঁকে জানান হচ্ছে মানে! তারি আশ্চর্য তো! আমার আবার আপনার লোক কে এল?

—কেন, মিসেস ভাণ্ডারী। যিনি আপনাকে এখানে ভর্তি করেছেন। বোজ এসে আপনার মাথার কাছে বসে থাকেন। তিনি বলেন—আপনি নাকি তাঁর ছেলে। বাক আপনি আর কথা বলবেন না। ডাক্তাররা জানতে পারলে আর রক্ষা থাকবে না। এখনও আপনার Complete rest-এর period.

ভুজঙ্গ চৌধুরী আর কিছু বলতে পারে না। রোগ-পাতুর মুখে ক্ষীণ ম্লান হাসি দেখা দেয়। মনে মনে বলে—

মিসেস ভাণ্ডারী,—তার মা! হার নারী, ছলনাময়ী!  
তুমি কতটুকু চেন আমাকে?

জ্ঞানে-অজ্ঞানে প্রায়ই ভুজঙ্গ চৌধুরী দেখত এক বৃদ্ধা  
নারী চিত্তাক্লিষ্ট মুখে তার মাথার কাছে বসে থাকতেন।  
কিন্তু নাসের কঠিন নিষেধাজ্ঞা অমাত্য করে মুখ খুলতে সাহস  
হয় না তার। অতীতের দুর্দান্ত দুঃসাহসী আজ শিশুর তার  
দুর্বল ও ভীত।

দীর্ঘ দিন চিকিৎসার পর শরীর ক্রমশঃ সুস্থ হতে  
লাগলো। একদিন ক্রীণ কণ্ঠে সাহসে ভর করে জিজ্ঞাসা  
করে—আপনি কে?

—আমি? কেন, তোমার মা!

বিষন্ন হাসির টেউ ভুজঙ্গর চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

—হাসছো কেন বাবা? আমি কি তোমার মা হতে  
পারি না?

—হাসছি আমার ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে! এখন  
আমি জীবনুত। বাচার আর কোন সাধই নেই আমার।  
আর কিইবা হবে এই জীর্ণ শরীরের মিথ্যা বোঝা বয়ে  
বৈঁচে থেকে।

—শরীর কি সকলের সব সময়েই একরকম যায়?  
এখন অসুস্থ হয়েছো, আবার দু-দিন বাদেই সুস্থ হয়ে ভাল  
হয়ে উঠবে। নির্ভাবনায় সুখে সংসার করবে।

—সংসার।

—অমন আশ্চর্য হচ্ছে কেন বাবা! কেন, তোমার কি  
কেউ নেই?

—না কই, কেউ তো নেই!

—আছে বাবা, আছে। সব আছে। মানুষ বৈঁচে  
থাকলেই আবার সব হয়। নিজের মত অপরকে ভাবতে  
শেখ, বাবা। তোমার যেমন আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সেই  
সঙ্গে মান-সম্মান ও মর্যাদা আছে, তেমনি অপরেরও  
তো ঐসব থাকতে পারে। আমি যদি বাবা, তোমাকে  
ছেলে বলে ভালবেসে কাছে টানি, তুমি কি দূরে সরে  
থাকতে পার? মা বলে কি ভালবেসে কাছে আসবে না?  
তাই বলে জীবনে ভুল যে হতে পারে না, এমন কথা কেউ  
জোর করে বলতে পারে না। কারণ ভুল নিয়েই তো  
আমাদের জীবন। তাই বলে নৈরাশ্রবাদী হলে চলবে না।

ভুজঙ্গ নীরব। মিসেস ভাণ্ডারী আবার বলেন—সত্যি  
করে বলতো বাবা, আজ যদি তোমার মা বৈঁচে থাকতেন,  
তিনি কি তোমাকে অমনভাবে একলা ছেড়ে দিতে  
পারতেন? ভুজঙ্গ নীরব হয়ে থাকে। শুধু দু-চোখ বেয়ে  
নেমে আসে অশ্রুর বজ্র। মিসেস ভাণ্ডারী সম্মুখে তার  
মাথার হাত বোলাতে বোলাতে সাস্থনার সুরে বলেন—ছি,  
বাবা, পুরুষ মানুষের কি এমন দুর্বল হলে চলে। কত  
সাহস তোমার। আমি লাভণ্যর কাছে সব শুনেছি।

ভুজঙ্গর চোখ সহসা চকচক করে জলে ওঠে।—লাভণ্য!  
হ্যাঁ—হ্যাঁ। হরিহর ভট্টাচার্যের ভাগিনী। কোথায় সে?  
একবার যদি তাকে কাছে পাই। তা'হলে বুঝিয়ে  
দি তাকে। তার দস্ত.....

ছি, বাবা! আবার শুধু শুধু উত্তেজিত হচ্ছে। তোমার  
নিজের জীবনের ওপরও কি মার নেই। একথা কি  
তোমার মনে থাকে না যে, তোমার জীবন এখনও নিরাপদ  
নয়।

বেদনায় মুহমান হয়ে পড়ে ভুজঙ্গ চৌধুরী। কোন কিছু  
করবার উপায় নেই তার। পরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর-  
শীল সে।

মিসেস ভাণ্ডারী আবার বলেন—ব্যথা পেলো বাবা!  
আমার নিজের ছেলেপুলে নেই। তোমরাই আমার সব।  
তাই তোমাকে বলি। লাভণ্য কেন—সমস্ত নারী জাতিকে  
তুমিও এখন থেকে আমার মত ভাবতে চেষ্টা কর।  
অতীতের গ্লানি নিঃশেষে মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেল।

—এ যুহবার নয়। তাই ভাবি এ-রকম গ্লানিময়  
জীবন নিয়ে বৈঁচে থেকে লাভ কি!—নির্জীবের মত বলে  
ভুজঙ্গ।

—ওকি, বাবা! জীবনের দাম কি কম। এখনও  
তোমার অনেক কাজ বাকী। এ হল তোমার নব জন্ম।  
নূতন ভাবে শুরু করতে হবে তোমাকে সব কিছু।

—মা-মা-মাগো! সত্যিই তুমি আমার মা। যুগ-  
সঞ্চিত কুশাশার আড়াল থেকে আমার চোখের সম্মুখে এক  
নূতন জগৎ খুলে গেল। আশীর্বাদ কর মা, ভ্যাগের ব্রজে  
যেন নিজের জীবনকে দীক্ষিত করতে পারি। নারী—সে  
কেবল ভোগের সামগ্রী নয়—সে যে মহাশক্তি স্বরূপিনী!





৪৬শ বর্ষ

শ্রাবণ, ১৩৭৩

২য় সংখ্যা

## সম্পাদকীয়

### সমাজ-শত্রুদের বিরুদ্ধে গণ-অভিযান

পশ্চিমবঙ্গের যুব সম্প্রদায় মজুতদার ও মুনাফাবাজদের হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। ভ্রাতৃ মূল্যের অতিরিক্ত দরে জিনিসপত্র ক্রয় না করে তারা ক্রেতা প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেছেন। অবশ্য আপাততঃ এ-অভিযান থুচরা ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। কিন্তু আড়কাঠির বড় বড় ব্যবসায়ীরা এখনও অভিযানের লক্ষ্য বস্তুর বাইরে।

বস্তুতঃ পক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্যস্তর এখন সাধারণ লোকের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। মজুতদার ও মুনাফাবাজদের অশুভ চক্রান্তে পণ্যদ্রব্য সমূহ অদৃশ্য পথে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। অথচ কালোবাজারে কোন কিছুই অভাব নাই। এদের শাস্তি করতে

সরকারের ব্যর্থতা জাতীয় জীবনে এক ঘোর দুর্দিনের সূচনা করেছে।

সরকার দ্রব্যমূল্য জনসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে রাখার জন্য আবেদন জানিয়েছেন এবং তাঁরা এ-কথা বার বার ঘোষণা করছেন যে, জিনিসপত্রের দাম বাড়তে দেওয়া হয়ে না। অবশ্য সরকার এ আশ্বাসও দিয়েছিলেন যে, টাকার বৈদেশিক বাট্টা হ্রাসের ফলে দেশের ভিতরের জিনিসের দাম বাড়বে না। কিন্তু সাম্প্রতিক এক অর্থনৈতিক সমীক্ষার দেখা গেছে যে, ভারতের বিভিন্ন স্থানে ডি-ড্যালুয়েশন-পরবর্তীকালে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য—বার মধ্যে আমদানীকৃত কোন উপকরণ নেই—সেগুলিরও দাম ২০ থেকে ৩০ শতাংশ বেড়ে গেছে। এর ফলে স্বভাবতঃই

সাধারণ মানুষের সংসার খরচ ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বেড়েছে। বলা বাহুল্য সরকারী আখ্যাস জনসাধারণকে কোন স্বস্তি দিতে পারছে না। আইনের কসত সরকারের আছে। কিন্তু তা' প্রয়োগ করতে গিয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে সরকারী নীতি। আর তার ফলে একদল অসাধু ব্যবসায়ী ও মজুতদার—যারা জনসাধারণের হুঃখ হৃদশাকেই নিজেদের মুনাফার প্রকৃষ্ট সুযোগ বলে গ্রহণ করে—যথেষ্ট ভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।

পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তকের পরেই রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর মজুতদার ও মুনাফাবাজদের বিরুদ্ধে যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তা' খুবই প্রশংসার্হ। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়ে সহস্রাধিক অসাধু ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়। চোরাবাজারী, মজুতদারী ও ভেজাল মেশানো ইত্যাদি নানাবিধ অপরাধে এরা অভিযুক্ত। এদের বিচারের জন্ত জেলায় জেলায় জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বসান হয়। অভিযুক্তদের লাইসেন্স ও পারমিট বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এর সুফল পাওয়া গেছে। সং ব্যবসায়ীরা 'স্বচ্ছতার জবাব্দায়' নিয়ন্ত্রণের জন্ত পাঞ্জাব সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছেন।

পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শাসন কসত হাতে নিয়েই বা করতে পারলেন, পাঞ্জাব মন্ত্রিসভা এত দিনেও তা' পারেন নি। আত্মবিশ্বাস ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারলে, সাফল্যের সম্ভাবনাও অনেকখানি সহজ হয়ে আসে। পাঞ্জাবের পর দিল্লী, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যেও অনুরূপ অভিযান শুরু হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে সমস্তার অন্ত নেই। বেকার সমস্তার তীব্রতা ও অত্যাচার বহুবিধ কারণে এ-রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো স্বভাবতঃই দুর্বল। তার উপর এভাবে বাজার দর উর্ধ্বমুখী হলে জনসাধারণের ক্ষোভ হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। জনসাধারণের আর সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ ধাপে ধাপে জিনিসের দাম বাড়ছে—এই অবস্থা বেশী দিন চলতে দিলে মানুষ মরিয়া হয়ে একদিন আগেরগিরির মতো বিক্ষোভে ফেটে পড়বে। সাধারণ মানুষের ভাতের ওপর যদি টান পড়ে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জব্য-সামগ্রীর দাম যদি ভাব্য স্তরে না

থাকে, তাহলেও জনসাধারণ শান্ত হয়ে মুখ বুজে সেটা সহ্য করে যাবে—এ আশা করা বাতুলতা মাত্র। ভারতবর্ষের হৃদশা ও জীবনহার জন্ত দায়ী তার অর্থনৈতিক ব্যর্থতা। এর পেছনে মজুতদার ও মুনাফাখোরদেরও একটি জব্বত ভূমিকা আছে।

সরকারের দুর্বল নীতির ফলে মজুতদার ও মুনাফাখোরদের সঙ্গে সরকার এঁটে উঠতে পারছেন না। পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর যে আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেছেন অত্যাচার প্রদেশে অনুরূপ কোন সক্রিয় ব্যবস্থা এখনও অবলম্বিত হচ্ছে না। হালে পানি না পেয়ে সরকার মজুতদার ও মুনাফাখোরদের সঙ্গে মোকা-বিলা করার জন্ত জনসাধারণকে আহ্বান জানিয়েছেন।

যে দায়িত্ব পালনে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের যুব সম্প্রদায় সেই দায়িত্ব পালনে স্বেচ্ছায় অগ্রণী হয়েছেন। কারেমুখী স্বার্থে আঘাত হানলে প্রতিপক্ষ থেকে বাধা আসবে—এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তার জন্তে পশ্চাৎপদ হওয়া কাপুরুষতার পরিচায়ক। যুব সম্প্রদায়ের এ-অভিযান ইতিমধ্যেই আংশিক সাফল্য লাভ করেছে। সম্পূর্ণ সাফল্য নির্ভর করছে দৃঢ়তা, ধৈর্য ও সংগঠন শক্তির উপর। এই ক্রেতা প্রতিরোধ আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে উঠুক, কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রেই এ আশা পোষণ করবেন।

ক্রেতা প্রতিরোধ আন্দোলন শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরিচালিত হলেও, এর বিরুদ্ধে সমস্ত প্রতিরোধ শুরু হয়ে গেছে। অনেক জায়গায় বাঁট, ছুরি ইত্যাদি অস্ত্র ক্রেতা প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। এই সব অসাধু ও লোভী ব্যবসায়ীদের সাহস ও স্পর্ধা কতদূর এগিয়ে গেছে, এর থেকেই সেটা বেশ বোঝা যায়।

শাসনের উপযুক্ত যথেষ্ট কসত সরকারের হাতে আছে। সরকার যদি এই সব সমাজ বিরোধী শক্তদের বিরুদ্ধে সে কসতার প্রয়োগ না করে রাজনীতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন এবং মানুষের পুঞ্জীভূত হুঃগতি যদি প্রতিকারহীন হয়, তাহলে তা শেষ পর্যন্ত কোন যুক্তি মানতে চাইবে না। বিক্ষোভের অগ্ন্যুৎপাত ঘটান পূর্বেই সরকারের এ-কথা অবহিত হওয়া উচিত।



## প্রেমের রকম-ফের



উপায় কি !

# মুহূর্তের জন্তে

## সংক্ষিপ্ত

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ব্যবস্থাদীনে আনা সংস্থা সমূহের এক বিপজ্জনক নজির সৃষ্টি হতে চলেছে। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত ব্যবসায় সমূহের দোষ-ত্রুটি দূর করে যথা সম্ভব সুপরিচালনা করাই ছিল এই সকল সরকারী সংস্থা সমূহের প্রধান কর্তব্য। কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নীতির উপর ভিত্তি করে সরকারি সংস্থা পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান। পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের বেকার যুবকদের কর্ম সংস্থানের মহৎ উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। অবশ্য জনসাধারণের জন্ত উন্নততর সুখ সুবিধা সমন্বিত পরিবহনের উদ্দেশ্যও এর মধ্যে ছিল। আশা করা গিয়েছিল সরকারী পরিচালনায় পরিবহন সমস্যার তীব্রতা কিছুটা লাঘব হবে। কিন্তু বাস্তবে সে আশা আজ হতাশায় পরিণত হয়েছে।

একথা ঠিক যে, এই সাহসার স্বাধীন বেকার বাঙালী যুবকদের কর্ম সংস্থানের যথেষ্ট সুরাহা হয়েছে, কিন্তু যাত্রী-সাধারণের সুখ সুবিধার প্রতি বোধোদ্ভূত দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। প্রশাসন ব্যবস্থার ত্রুটির জন্ত অনিয়মিত বাস-সার্ভিস অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'ব্রেক ডাউনের' মহিমায় রাস্তায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাস পাওয়া যায় না। অথচ যাত্রী-সাধারণের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সম্বন্ধে কর্তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। বিশেষতঃ, মহিলা যাত্রীরা এই পরিবহন সমস্যার সঙ্কটে যে কত অসহায় বোধ করেন, তা' একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানে।

এ-বিষয়ে যখনই আলোচনার তুফান ছোটে, তখনই কর্তারা সংখ্যা তত্ত্বের ভেলকি বাজি দেখিয়ে সমস্যাটিকে পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। মনো রেল, সাকুলার রেল ইত্যাদি বড় বড় কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে বুঝিয়ে দেন—সমস্যার আশু মীমাংসা নেই। কিন্তু তাঁরা একটুও ভেবে দেখেন না রাস্তায় যথাসম্ভব চালু বাসের সংখ্যা বাড়িয়ে ও প্রশাসন ব্যবস্থা গলদমুক্ত করলে সমস্যার অনেকখানি সুরাহা হতে পারে।

প্রতি বৎসর মোটা আকের লোকসান দিতে হচ্ছে। তার উপর যাত্রীদের দুর্দশা চরম সীমায় পৌঁছেচে। তা' হলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে, কি সার্থকতা আছে এরূপ অপদার্থ সংস্থাটিকে জীইয়ে রাখার!

\* \* \*

বাংলা, বিহার, বোম্বাই, আসাম—চতুর্দিকে আজ 'বন্ধ'-এর খেলা চলেছে। সরকারী অব্যবহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই 'বন্ধ'-এর আহ্বান দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সরকারের বক্তব্য হল, এটা বিরোধীদের প্রাক-নির্বাচনী চাল!

অভিজ্ঞতার দেখা গেছে, 'বন্ধ' আহ্বানের ফলে কিছু সংখ্যক নিরীহ লোকের প্রাণহানি আর সরকারী সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া সাধারণ সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি।

সরকার স্বীকার না করলেও একথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে সরকারী নীতি ও প্রশাসন ব্যবস্থার ত্রুটির জন্ত দেশের সমস্যার তীব্রতা অনেক বেড়ে গেছে। স্বাধীনতা পাওয়ার পর প্রায় ১৮ বছর কেটে গেছে, কিন্তু এখনও আমরা মার্কিন অমুগ্রাহ পি. এল. ৪৮০-র উপর একান্ত নির্ভরশীল। একটির পর একটি পাঁচসালী পরিকল্পনা হয়ে চলেছে, তার জন্ত শত শত কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দও হচ্ছে—কিন্তু দেশের মৌলিক সমস্যার কোন সমাধান নেই। তার উপর আবার অপদার্থ ও অযোগ্য প্রশাসন ব্যবস্থার ফলে দেশে দুর্নীতির ঘূর্ণিস্রোত বয়ে চলেছে। সেই স্রোতের টানে অসহায় জনসাধারণ ভেসে চলেছে আর খড়কুটো অবলম্বন করে আত্মরক্ষার ব্যর্থ প্রয়াস পাচ্ছে।

স্বভাবতঃই জনসাধারণের মনোভাব সরকারের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ। এই বিরূপ মনোভাবের পূর্ণ সুযোগ নিতে চান সরকার-বিরোধী গোষ্ঠীবর্গ। দেশ ও দেশের স্বার্থ আজ কারো কাছেই মুখ্য নয়—সকলেরই লক্ষ্য ক্ষমতায় আসীন হওয়া। রাজনীতির এই পঙ্কিল ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে 'বন্ধ' আন্দোলন জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে কতখানি সাহায্য করবে, তা' সত্যই হৃদয়ের রয়ে গেছে।



# বাদল ঝরে

শ্রীশশীকশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

ঝিম্ ঝিম্ —ঝিম্ ঝিম্—বাদল ঝরে,  
ঝর্ ঝর্—যেন নিঝর—বৃষ্টি পড়ে।  
আকাশের যত তারা, মুদেছে আঁখি-তারা,  
চাঁদের কিরণ-ধারা নাহিরে করে।  
বরষার বারি ঝরে, বাদল ঝরে।

আঁধারে গেছে আজ কুবন মিশি,  
চারিপাশ মেঘময়—কৃষ্ণা নিশি।  
বিটপীর শাখে শাখে, পল্লব বারি মাপে,  
জাগে সাড়া বনে—বনান্তরে।  
বরষার বারি ঝরে, বাদল ঝরে।

ভটিনী বলে—“আয় মেঘের ধারা,  
আয় পাহাড়িয়া ঢল—বাঁধন-হারা।”  
বুক তার উত্তোল, জেগে ওঠে কল্লোল,  
জাগে তৃষা আলো—তৃষার 'পরে।  
বরষার বারি ঝরে, বাদল ঝরে।

বরষার জল নামে ধরার 'পরে।  
মাটির কাতর বুক আকুল করে।  
নিবিড়তর স্মৃতি, চায়রে প্রাণের সুখা,  
মেঘের ডাকেরে সে কাতর করে।  
বরষার বারি ঝরে, বাদল ঝরে।

## সুলেখা ঐতিহ্য

দেশে ও বিদেশে সমান প্রিয়...।

## সুলেখা

ফাউন্টেন পেন-এর কালি

এই সব রঙে পাবেন :

ব্লু ব্ল্যাক • রয়াল ব্লু • ব্ল্যাক  
রেড • গ্রীন • ভায়োলেট

**সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ**  
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২







Progressive SW-32

# অলৌকিক রহস্য

# সত্য ঘটনা

## জড় জগতের পরিবেশ ও আকর্ষণময়ী আলোক মণ্ডল

### চক্রের অভিজ্ঞতা

#### সাত

কয়েক বৎসর পূর্বে আমাদের একজন বন্ধু, মিঃ পী নামে তাঁর একজন ব্যবসায়ী বন্ধুর বিচিত্র মানসিক পরিবর্তন ও ব্যবহারের কাহিনী আমাদের গোচরে এনেছিলেন।

মিঃ পী হঠাৎ কেমন যেন অন্তরকম মানুষ হয়ে উঠেন এবং তাঁর ভাবগতিকের বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তিনি হঠাৎ বদমেজাজী হয়ে উঠেন এবং অধীনস্থ কর্মচারীদের প্রতি দুর্ব্যবহার শুরু করেন—কোন কিছুতেই তাঁকে সন্তুষ্ট করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠতে থাকে।

ভক্তলোকের উপর প্রেতাচার অশুভ প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে এই আশঙ্কা করে আমরা চক্র আহ্বান করি। কয়েক সপ্তাহ পরে একটি জুড় প্রেতাচার মিসেস উইকল্যান্ডের মুখ দিয়ে আমাদের জানায় যে, সে সেই ভক্তলোকটিকে কষ্ট দিচ্ছে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্রেতাচারটি জানায় যে, সে এই কাজ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্তই করছে; তার মৃত্যুর পর তার (প্রেতাচার) বিধবা স্ত্রীর প্রতি মিঃ পী-এর আকর্ষণই এই প্রতিহিংসার কারণ।

প্রেতাচার বলে সে একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। সে কিছুকাল পূর্বে দেহত্যাগ করলেও, এ-সম্বন্ধে পুরোপুরিই অজ্ঞ ছিল। সে বলে যে, সে কিছুদিন পূর্বে গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিল, কিন্তু এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং তার ইচ্ছানুযায়ী সে সর্বত্র অবাধে চলাফেরা করতে পারে।

তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা তার সঙ্গে কেন যে কথা বলে না, এতে প্রেতাচার খুব বিস্ময় প্রকাশ করে এবং অভিযোগ করে যে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তার স্নেহ-প্ৰীতি বিশ্বৃত হয়ে, তার প্রতি উদাসীন হয়ে উঠেছে।

প্রেতাচার অভিযোগ করে যে, তার অনেক বন্ধু-বান্ধব

তার সঙ্গে বিখাসঘাতকতা করে তার স্ত্রীর প্রতি অমুরক্ত হয়ে উঠেছে এবং ফুল ও নানা উপহার তার স্ত্রীকে প্রেরণ করছে। প্রেতাচার শপথ করে বলে যে, সে তাদের উপর পুরোপুরি প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর।

প্রেতাচার স্বীকার করে যে তার চিন্তাশক্তি কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে এবং কোন বিষয়কেই স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। কিছুদিন পূর্বে তার বে গুরুতর পীড়া হয়েছিল, তার ফলেই তার চিন্তাশক্তির জড়ত্ব এবং দেহের লবুহ প্রাপ্তি ঘটেছে বলে তার ধারণা।

সে একটা বিষয়ে খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল যে, তখনই সে কোন ব্যক্তির কথা চিন্তা করত, তখনই সে সবিস্ময়ে দেখত যে, সে সেই ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেছে। এই রকম ভাবেই সম্প্রতি সে মিঃ পীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে সে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মিঃ পীকে নানা কষ্ট দিতে থাকে, সারারাত আগিরে রেখে, সকাল-সন্ধ্যা অবিরত কাজ করিয়ে ও নানা রকম ভাবে সে মিঃ পীর উপর পীড়ন করতে থাকে।

অবশেষে অনেক আলোচনা করবার পর প্রেতাচার তার মৃত্যুর বিষয় উপলব্ধি করতে পারল। তার ধারণা ছিল যে মৃত্যুই মানুষের চরম সমাপ্তি, তারপর আর কিছু নেই, কিছু থাকে না।

পরলোকে তার জন্ম বহু কল্যাণকর কাজ অপেক্ষা করছে এবং সেখানে গেলেই সে সব কিছুই উপলব্ধি করবে, এই কথা বলার প্রেতাচার দৃষ্ট চিত্তে বিদায় গ্রহণ করল।

পরদিন থেকেই মিঃ পীর আশ্চর্য রকম উন্নতি হ'ল, তাঁর ব্যবহারের মধ্যে পূর্বকার সেই স্বাভাবিক ভাব ফিরে এল এবং অফিসের সকলেই সেই পরিবর্তন বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করলেন। মিঃ পী নিজে কোনদিন জানতে পারেন নি যে, তাঁর সুস্থতা সম্পাদনের জন্ত কী প্রচেষ্টা হয়েছিল।



# ভুল

## সুদর্শন চক্রবর্তী

—একি করছিস্ তুই প্রদোষ ?

—এ আর এমন কিছু নয় সুখেন্দু, একটু শুধু ভুলে থাকার চেষ্টা ; মানে নিকৃতি পেতে চাই !—বলেই প্রদোষ পাশের বোতল থেকে সবটুকু ঢেলে এক চুমুকেই পান ক'রে নেয়। তারপর আবার ঢালতে চায়।

এবার হাতটা ধ'রে ফেলে সুখেন্দু। ফলে একটা বিকট হাসির হল্লায় কাঁপিয়ে তোলে প্রদোষ সমস্ত ঘরখানা। মুখ থেকে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে সুখেন্দু এবার তুলে আনে প্রদোষকে নিউ মার্কেটের একটা বার থেকে। মোটর ছুটিয়ে নিয়ে যায় প্রদোষকে বোটানিকেল গার্ডেনে। দুটো সিগারেট বার ক'রে একটা প্রদোষকে দিয়ে অপরটা নিজের ধরিয়ে সুখেন্দু বলে—কিসে এত শক্ পেলে তুই প্রদোষ ?

—বুঝবি না সুখেন্দু, এ তুংখের জালা।

—তা বুঝছি, নইলে যে কখনও একটা সিগারেট পর্যন্ত মুখে দিত তা, নত্তি পর্যন্ত নিত না, পান খাওয়াকেও ঘৃণা করত, সে আজ সহসা এতখানি এগিয়ে এল কি ক'রে !—বলে সুখেন্দু প্রদোষের কথায় সায় দেয়।

—আজ আর বেঁচে থাকার কোন মূল্যই নেই সুখেন্দু, এ ভারাক্রান্ত জীবনে আজ বেঁচে থাকাই একটা বিড়বনা। তারপর একটা দম দিয়ে আবার প্রদোষ বলে—ভাল একদিন সত্যিই আমিও ছিলামরে।—বলেই একরাশ ধোঁয়া ছাড়ে প্রদোষ। সেই ধোঁয়াটা কুণ্ডলী পাঁকিয়ে ধীরে ধীরে হাওয়ার সঙ্গে দোল খেয়ে খেয়ে মিলিয়ে গেল। আবার প্রদোষ শুরু করে—খেলার মেডেল, ক্লাসের ফাষ্ট বর, আবৃত্তিতে পুরস্কার সবই আমি পেয়েছি। পরসারও কোন অভাব হয়নি কখনও। ভালও বেসেছিলাম আমি রাজিকে।

—রাজিকে ?—বলে ওঠে সুখেন্দু অস্পষ্ট ভাষায়।

—হ্যাঁ, ওই জমিদারের মেয়ে রাজি, যে একটা দিনও আমার না দেখে একেবারে পাগল হ'য়ে উঠত।

—তারপর ?

—যা হ'য়ে থাকে,—কথাবার্তাও আমাদের ঠিক হ'য়ে গেল। পিকনিকের ছলে ডায়মণ্ড হারবার গিয়ে একটা গাছের তলায় ছুজনে বসলাম। গাছটা কদম গাছ না

কি গাছ ছিল, ঠিক মনে নেই। তবে রাজিই আমাদের প্রথম কথা দেয়।—বলতে থাকে প্রদোষ দূরের দিকে তাকিয়ে।

—তাতে কি হয়েছে প্রদোষ ? এ আর বিশেষ কি হয়েছে ! এমন ত কত হয়ে থাকে। এখন সে আর একজনকে বিয়ে করবে বলেছে, এইত ?

—না—বলেই প্রদোষ গম্ভীর হয়ে যায়।

—কি তবে !—বিস্ময়ে অধীর হয়ে ওঠে সুখেন্দু।

—এতদিন সে আমাদেরই বিয়ে করবে বলেছিল।

—বেশ তো, ভাল কথাই সে বলেছে।

—তুই ধাম সুখেন্দু, বি গিরিয়াস্ ! জীবনটা খেলা নয়। মাঝখানের এই তিনটি বছরের খবর কিছু জানিস কি ?

—তার মানে ?

—ওর বাবার ইচ্ছা অনুসারে মাঝখানে রবি দত্তের সঙ্গে ওর বিয়ের সবই ঠিক হ'য়ে থাকে। শুধু একটু আপত্তি ছিল—রবি দত্ত বিলেত যাচ্ছে তখন, বিলেত থেকে এলেই সে ওকে বিয়ে করবে। তারি রাশভারী লোক ওর বাবা, কিছুতেই তাকে ঠেকানো যায় না।

—হরিবল !—বলে ওঠে সুখেন্দু।

—শুধু তাই নয়, এই তিনটি বছর ধরে চলল সেই সাধনা, কিসে বিলেত ফেরত রবি দত্ত তার মার্জিত রুচি নিয়ে এসে রাজিকে উপযুক্ত স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে পারে !

—তারপর ?

—লিপিষ্টিক, পমেড, রুজ, হাইছিল, বব-ছাঁট চুল, জ্যানিটি ব্যাগ আর বুক কাটা ব্লাউজে রাজি যখন গেল তাকে দমদমের এয়ার পোর্ট থেকে আনতে, রবি দত্ত তখন দিশেহারা হ'য়ে পড়ল রাজির এ-রূপ পরিবর্তনে। সেখানে এই ধরনের নকল প্যাকেটগুলোকে দেখে দেখে সে একেবারে যেন অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল। অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল কখন দেখবে, বাংলার সেই লাজ-নম্র গ্রাম্য বধূর িঙ্ক সহ্যতা চাহনি। তাই একেবারে বিগড়ে বসল রবি দত্ত রাজির এসব কাণ্ড দেখে।

—তাই সে আবার কিরে এসেছে তোম কাছে, এইত ?

—হ্যাঁ, কিরে এসেছিল কিন্তু গ্রহণ করতে পারিনি তাকে আর।

( শেষাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদ্রষ্টব্য )

# গল্প বলা

শ্রীমুণীলকুমার ভট্টাচার্য্য

গল্প বলা, বলেছিলো উলঙ্গ সেই নিকষ কালো রঙের  
ছেলেটা,

একবারে গ্রামের প্রান্তে মাঠের কোলে  
যাদের কুঁড়েঘরটা ছিল কোনরকমে দাঁড়িয়ে  
প্রকৃতির ছয় ঋতুর খেলালীপনা থেকে মাথা বাঁচিয়ে।  
এক গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের দুপুরে—  
যামে-ভেজা গরম শরীরটা একটুকাল ঠাণ্ডা করবার আশায়  
যখন গিয়ে বসেছিলাম  
ওদের জমিতে দাঁড়ানো বিরলপত্র বাবলা গাছটার তলায়,  
সেই ছেলেটা, সেই কোনো একটি চাষীর নিকষ কালো  
রঙের উলঙ্গ ছেলেটা

আবদারের সুরে বলেছিলো আমাকে, গল্প বলা।  
জানিনা, গল্প শোনার সে-আগ্রহ ছেলেটা কোথায়  
পেয়েছিলো,  
হয়তো ওরই চাষী-দাহুর বা দিদিমার কোলের কাছটিতে  
ওরে

এ-অভ্যাগ ওর দাঁড়িয়েছিল।  
তার সে-ইচ্ছা মেটাতে পারিনি আমি  
সময়ের চাকায়-বাঁধা ক্রীতদাস হওয়ার জগুই  
উঠে পড়তে হয়েছিল তখনি কর্তব্যের আহ্বানে।  
যাবার মুহূর্তে দেখেছিলাম  
ছেলেটার চোখ দুটো হুল্হুল করছিলো,  
গল্প না শুনে পাওয়ার অভিমানেই হয়তো।  
তারপর থেকে গল্পতো অনেক লিখেছি

অনেক পাঠকের অলসক্ষণের খোঁজা যোগাতে,  
অনেক শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্ত অনেক গল্পইতো বলতে  
হয়েছে  
কত সভায়, কত আসরে, কতবার।  
কিন্তু তবুও সত্য কথাই বলবো—  
আজো তেমন করে, তেমন আগ্রহ নিয়ে গল্পার সুরে,  
ঐচ্ছল্য নিয়ে হুঁচোখের তাবায়,  
কারকে বলতে শুন্লাম না, 'গল্প বলা',  
যেমন বলেছিল একদা এক গ্রাম প্রান্তের একটি চাষীর  
উলঙ্গ, নিকষ কালো রঙের সেই ছেলেটা।  
চোখ দুটো আমার আজ যদি একটুকুণ ঝাপসাই হয়ে  
আসে, ক্ষতি কি,  
কারণ, বোগপল্লু, অশক্ত আমাকে কেউ সাধছে না একটা  
গল্প বলতে,  
ইচ্ছা থাকলেও কোনো পাঠক বলছে না গল্প লিখতে,  
জানি, এইভাবে আরো কিছুকাল থাকলে একদিন সবাই  
আমাকে হয়তো ভুলেই যাবে,  
তখন যদি এক দুর্বল অবসরে  
ঝাপসা চোখের আবরণ ভেঙ্গে হুঁফোঁটা জল নেমে  
এলে বলে :  
'তাকে সেদিন গল্প শোনাওনি,  
আজ সে তাই প্রতিশোধ নিতে এসেছে এই সাবর্জনীন  
বিস্মরণের মধ্য দিয়ে'  
তাহলে কি খুব বেশী ভুল তারা বলবে ?

( পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেষাংশ )

—তবে ?  
—সে কোথায় চলে গেছে কাল রাত্রে, তার আর  
কোন সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না।—বলেই প্রদোষ পকেট  
থেকে একখানা চিঠি বার করে সুখেন্দুর হাতে দেয়।  
তাতে লেখা আছে—শেষে তুমিও আমার ভুল বুঝলে !  
তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রদোষ আবার

ধীরে ধীরে বলে—তুই-ই বল না সুখেন্দু, এই যে আমার  
মুখের কথাটা শুনেই ফিরে গেল রাত্রি বুকের ঝড়টাকে না  
দেখে, তাতে ভুল কি সে আমাকেও বোঝেনি ?  
উত্তরে সুখেন্দুর মুখ থেকে কিছু বেরুণ না বটে, কিন্তু  
প্রদোষের চোখের দিকে তাকাতাই উদ্গত অশ্রু আর বাধা  
মানল না।



# একটি চিঠি—দুটি খুন

( গল্প )

জ. কু. বি.

ক্রিঃ, ক্রিঃ, ক্রিঃ.....

টেলিফোনের কর্কশ আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। শীতের সকাল। আড়চোখে দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকান। ছ'টা বেজে দশ। এত সকালে উঠতে ইচ্ছা করছিল না। যি বোধহয় এবই মধ্যে এসে গেছে। কলতলা থেকে বাসন মালার আওয়াজ পাচ্ছি। পাশ ফিরে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু—না, ঘুম আর আমার কপালে নেই। আবার টেলিফোন বেজে উঠল। এবার রীতিমত বিরক্ত হ'য়ে লেপ ফেলে দিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসলাম। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা নিয়ে কানে তুললাম,—হ্যালো। ওপাশ থেকে ইন্সপেক্টার সুভাষ দত্তের গলা ভেসে এল—'আমি থানা থেকে বলছি। মিঃ বিশ্বাসকে চাই'।

বললাম—আমিই বিশ্বাস। আপনার বক্তব্য বলতে পারেন।

—ও স্যার, আপনি। এইমাত্র একটা জরুরী কেসের খবর পেলাম। দয়া করে একবার যদি আসেন।

—কেসটা কি?

—খুন স্যার। দু-দুটো খুন। আমি এখনও বাইনি সেখানে। এইমাত্র জনার্দন খবর দিল। আমি ওকে 'স্পট'-এ পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনার জন্তে অপেক্ষা করছি।

—আমি এখুনি যাচ্ছি। পনেরো মিনিট। আচ্ছা রাখলাম।

মনটা বিষিয়ে উঠল। এই শীতের সকালে দুনিয়ার লোক লেপের তলার। আর আমি কোথায় কে খুন হ'ল তার তদন্ত করতে চলেছি। খেং, চাকরির নিকুচি করেছে।

কোন রকমে সকালের কাজ শেষ করে, সরকারী পোশাক গায়ে চাপিয়ে থানার উদ্দেশ্যে রওনা হল। বাড়ি থেকে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ খেয়াল হ'ল টুপির কথা। তাড়াতাড়িতে টুপি নিতে ভুলে গেছি। সুতরাং ফিরতে হ'ল। ফিরে এসে টুপি নিয়ে আবার রওনা হ'লাম।

থানার গিয়ে দেখলাম, সুভাষবাবু আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। জন চারেক কনস্টেবল নিয়ে জীপে চড়ে আমরা ঘটনাস্থলের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম—জারগাটা কোথায়?

উত্তর পেলাম—'কাছেই'। আর কোন কথা না বলে চুপ করে রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ চলার পরে জীপটা এমন এক জারগায় এসে দাঁড়াল যেটাকে ঠিক শহরের পর্যায়ে কেলা যায় না।

একটা বস্তি অঞ্চল। রাস্তাটা এত সরু যে, দুটো জীপ কোন রকমে পাশ কাটাতে পারে, তাও অতি সাবধানে। একটু বেতাল হলেই রাস্তার পাশে পচা নর্দমায় গিয়ে পড়তে হবে। রাস্তার দুধারে—ঠিক নর্দমায় গা বেঁধে—রাজ্যের ময়লা জমে একটা ছোটখাটো হিমালয় গড়ে তুলেছে। তাতে নেই এ হেন জিনিস বোধহয় পৃথিবীতে নেই। ছাই থেকে আরম্ভ করে ছেঁড়া রামায়ণের পাতা পর্যন্ত চোখে পড়ল। উৎকট গন্ধে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি পেট থেকে বেরিয়ে আসতে চায়।

নাকে রুমাল চেপে গাড়ি থেকে নেমে মিনিট তিনেক চলার পর একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ান। বাড়িটা অনেক দিনের পুরনো বলেই মনে হয়। চুন-বালির প্ল্যাষ্টার জারগায় জারগায় খসে গিয়ে ভেতরের ইট বেরিয়ে গেছে। পাঁচিলের ওপর হাত খানেক লম্বা একটা অখণ্ডের চারাও চোখে পড়ল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকজন লোক জটলা করছিল। আমাদের দেখে তারা সরে দাঁড়াল। আমরা সদলবলে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলাম। দরজা দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকে একটা ঘর চোখে পড়লো। ঘরটা লোকে ভর্তি। ঘরের দরজার জনার্দন দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখে ও সেলাম করে একটা নীলাভ খাম আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল।

অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি এটা?

জনার্দন বলল—এ ঘরের মেঝেতে পড়েছিল। আপনার বোধহয়।

খামটা হাতে নিয়ে দেখলাম, আঁধারই বাঁটে। ওপরে বড় বড় করে লেখা—‘দারোগাবাবু’। খামের মুখ আঁটা দিয়ে আটকান। খামটা পকেটে রেখে ঘরে ঢুকলাম।

আমাদের ঢুকতে দেখে ঘরের লোকেরা সব বাইরে বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে নজর পড়ল লাল ছোট্টর ওপর। দুজনই জ্বীলোক। একজনের বয়স ২৪।২৫ বছর। অপর জনের ৪০।৪৫। তরুণীটির মৃতদেহ খাটের ওপর, আর বুড়ার মৃতদেহ মেঝেতে পড়ে আছে। স্ত্রীস্বাম্যকে জিজ্ঞাসা করলাম—হুটোই কি খুন?

—কি জানি স্যার, ঠিক বুঝতে পারছি না।

দুজনকেই পরীক্ষা করলাম। নাঃ, কারও দেহে প্রাণ নেই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার দুজনের মধ্যে কারও গায়ে কোন আঘাতের চিহ্নও নেই। খাসরোপ করে বে হত্যা করা হ’লে তাও নয়। পরীক্ষা করে দেখলাম, গলায় সেরকম কোন দাগ নেই। হঠাৎ নজরে পড়ল তরুণীটির মাথার দিকে। একটা কলাইয়ের গ্লাস উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তুলে দেখলাম। কিন্তু তাতেও কিছু নেই। ঘরের মেঝের একটা সাদা কাগজের ঠোঙা চোখে পড়ল। ঠোঙাটা নিয়ে দেখলাম, তাতে কি একটা গুঁড়ো লেগে রয়েছে। চকিতে মনের কোণে একটা সন্দেহ খেলে গেল। বিষ খায়নি তো? যা হোক মৃতদেহ হুটো ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সঙ্গে ঠোঙাটাও পাঠালাম। যদি কোন কাজে লাগে।

বাইরে বেরিয়ে যে লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হ’ল, তাকে কোনদিন কোথাও দেখেছি বলে মনে হ’ল না। চোখ হুটো অলসব রকমের লাল। দাঁতগুলো আরও লাল। সেগুলোর রং যে কোনদিন সাদা ছিল দেখে তা মনেই হয় না। আমাকে দেখে হাত হুটো রূপালে ঠেকিয়ে বলল—‘নমস্কার’।

প্রতি-নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি?

পাল থেকে-কে একজন বলে উঠল—এ বাড়ির জামাই।

—জামাই? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—আজ্ঞে। এবার উত্তর দিল সেই লোকটি। কথা

মাকে এঁলে লাগল। বলল—ঘরের মধ্যে যে দুজনকে দেখলেন ঐ দুজন হ’ল আমার শাওড়ী আর জ্বী।

—ও। আমার সঙ্গে একটু আসুন। কতকগুলো কথা জানার আছে। বলে আমি এগিয়ে গেলাম।

ধানার গিঁয়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে বললাম—বসুন। চেয়ারে বসবার পর জিজ্ঞেস করলাম—কি নাম আপনার?

—আজ্ঞে, অনিমেব মিত্র।

—কি করেন?

—মাস্টারি। স্থানীয় একটা স্কুলের নায় করলেন।

—আচ্ছা, যার বয়স কম উনি তো আপনার জ্বী; তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কতদিন বিয়ে হয়েছে আপনাদের?

—এক বছর।

—কোন বাচ্চা—

—না, কিছু হয়নি।

—আচ্ছা, আপনার জ্বী এবং আপনার শাওড়ী দুজনেই খুন হ’লেন। আপনার কি কিছু মনে হয়?

—আমার কিছুই মনে হয় না স্যার।

—তবু অসুমান তো কিছু একটা করেন?

—আমার অসুমানে তো কিছুই আসছে না স্যার।

—আপনাদের বাড়িতে আর কে কে থাকেন?

—আর কেউ থাকে না স্যার। আমি, আমার জ্বী আর আমার শাওড়ী ছাড়া চতুর্থ কোন ব্যক্তি ও-বাড়িতে থাকে না।

কথাগুলো নোট করে নিয়ে তাকে বিদায় দিলাম। ওর বাড়ির পাশে থাকে এমন একজনকে ডাকল ম। বললাম—আপনি অনিমেববাবুর বাড়ির পাশে থাকেন?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—গতরাত্রে ওদের বাড়িতে কোন বগড়া খাঁটি হয়েছিল বলে আপনারা কিছু জাবেন?

—বগড়া খাঁটি তো ওদের বাড়িতে প্রায় প্রতিদিন হয়। ওটা ওদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

—মানে?



জামাই। ওনার শাশুড়ীর আর কোন ছেলে বা মেয়ে নেই। তাই অনিমেঘবাবুকে উনি ঘরজামাই করে রেখেছিলেন। কিন্তু অনিমেঘবাবুর চরিত্র মোটেই ভাল নয়। মাঝে ওনার কোন এক দুঃ সম্পর্কের ভাইবিকে নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করেছিলেন। সেই থেকেই বহু অশান্তির সৃষ্টি।

—I see. ঠিক আছে, আপনি এখন আসতে পারেন।

—লোকটিকে বিদায় দিয়ে কথাগুলো নোট করে তবে মাত্র একটা সিগারেট ধরিয়েছি। হঠাৎ অনার্দন মরন। ডাক্তার রিপোর্ট নিয়ে হাজির হ'ল। রিপোর্টটা নিয়ে দেখলাম, আমার অনুমান মিথ্যে নয়। ছোটো হত্যা এই বিষ প্রয়োগে হয়েছে। আর ঠোঙাটার “পটাসিয়াম সায়নাইড” পাওয়া গিয়েছে।

চিন্তার ঝড় উঠল মনে। বিষ প্রয়োগে হত্যার সূত্রা ঘটান হয়েছে। কিন্তু কে প্রয়োগ করল আর কেনই না করল? সারাদিন ধরে মনের আনাচে-কানাচে কেবল এই প্রশ্নটাই ঘুরে বেড়াতে লাগল। সারাদিনে কোন সমাধান খুঁজে পেলাম না। তখনও আমি জানতাম না এর সমাধান জমা হ'য়ে আছে আমার পকেটে। সেই চিঠিটাই আমার সব সমস্তার সমাধান করবে।

কালের ভিড়ে চিঠিটার কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম। বাড়ি এসে খেয়াল হ'ল। চিঠিটা নিয়ে বসলাম। খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিটা বের করলাম। নীল রঙের প্যাডের কাগজে লেখা। ‘মুক্তোর মত হাতের লেখা’—কথাটা কেবল-মাত্র উপত্যালে পড়ে আর লোকের মুখে শুনে এসেছি। আজ চোখে দেখলাম। মার্ক উপমা কবির। চিঠিটার ওপর চোখ বুজতে লাগলাম :—

দারোগাবাবু,

এ চিঠি আপনি বখন পাবেন, তখন আমি আপনার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আমাকে আপনি পাবেন না। পাবেন আমার দেহটা। বে দেহ নড়ে না, কথা বলে না। আর পাবেন আমার মেয়ের দেহ। হু-হুটো দেহ। কিন্তু হুটোই মৃত। কতকগুলো কথা জানাবার জন্তে আপনাকে এই চিঠি লেখা। আমি জানি আপনি আসবেন। তাই লিখছি।

প্রথমেই বলে রাখি, আমার মেয়েকে বিষ খাইয়ে মারা হ'য়েছে। আর মেয়েছি আমি। ইয়া, ইয়া আমি। আমিই আমার মেয়েকে বিষ খাইয়ে মেয়েছি। কিন্তু কেন? কেন মারলাম তাকে? যদি এই ‘কেন’র উত্তর পেতে চান, তবে দয়া করে চিঠিটা শেষ পর্যন্ত পড়বেন। শুধু একটা অনুরোধ, চিঠিটা পড়ে যাকে আপনি অপরাধী বলে মনে করেন—যদি পাবেন তাকে মুক্তি দেবেন।

আপনি বলতে পারেন, কতখানি দুঃখ পেলে তবে মা পারে তার মেয়ের হাতে বিষের পাত্র তুলে দিতে। কতখানি নিষ্ঠুর হ'লে তবে মা পারে তার মেয়ের খাবারের সাথে বিষ মেশাতে। পাবেন আপনি বলতে? আমি জানি, আপনি পারবেন না। কারণ সে অভিজ্ঞতা আপনার নেই। কিন্তু আমি পেরেছি। আমি পেরেছি আমার মেয়ের হাতে বিষ তুলে দিতে।

এক বছর আগে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম অনিমেঘের সঙ্গে। আমার আত্মীয়-স্বজন সবাই অমতে। কারণ প্রথমে দেখেই ছেলটাকে আমার ভাল লেগে গিয়েছিল। তাছাড়া ওর মা-বাবা কেউ ছিল না। আর



মা-বাবা না থাকার বেদনা যে কত গভীর, তা আমি জানি। ওর মত বয়সে আমারও মা-বাবা ছিল না। মাতুল হইয়াছিল এক দূর সম্পর্কের কাকার কাছে থেকে। বিয়ে দিয়ে ওকে আমার কাছে এনে রেখেছিলাম। তখনও জানতে পারিনি, ওর সুপুরুষ চেহারার আবরণে বাস করে এক কু-পুরুষ দানব। বুঝেছিলাম, ছ'মাস পরে। প্রায় রাতেই অনিমেষ বাড়ি থাকত না। সকালে যখন বাড়ি ফিরত, তখন মুখ থেকে বেরুত একটা বিস্ত্রী গন্ধ। রোজ তার টাকার দরকার হ'ত। সে টাকা যোগান দিতে হ'ত আমাকে। মাইনে বা পেত তা মাসের ছ'দিন যেতে না যেতে শেষ হ'য়ে যেত। সহ করা ছাড়া উপায় ছিল না আমার। সহ করেও যাচ্ছিলাম। কিন্তু শেষের দিকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম।

ইদানীং ওর এক দূর সম্পর্কের ভাইখিকে নিয়ে ও দারুণ বাড়িবাড়ি আরম্ভ করেছিল। আমার মেয়ে ওসব সহ করতে পারেনি। কোন মেয়েই পারে না তার চোখের সামনে নিজের স্বামীর মটামি দেখতে। আমার মেয়েও পারেনি। তাই নিয়েই অশান্তির সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন অশান্তি হ'ত। কিন্তু অবস্থা চরমে উঠল গতকাল রাতে।

কালকে ও আর বাইরে যায়নি। খাওয়ার সময়ে আমার মেয়ে ওকে ওর ভাইখি সংক্রান্ত কোন কথা বলে থাকবে বোধ হয়। তার থেকে শুরু হয় ঝগড়া ঝাটি। শেষে মারধর। আমি মা মা হ'য়ে মেয়ের নির্যাতন কতদিন দেখতে পারি? আর পারিনি বলেই সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলাম, যেমন করে পারি আজই এই অশান্তির সমাপ্তি ঘটাব। কিন্তু কোন পথই খুঁজে পেলাম না।

হঠাৎ মনে হ'ল এইতো একটা উপায় রয়েছে। এতে

আমি বা আমার মেয়ে সুখী হ'ব না। কিন্তু আমার জামাই তো হবে। তাই এই পথই বেছে নিলাম।

ভগবান বোধ হয় আমার এই পথকে সমর্থন করেছিলেন। তাই রাতে শুয়ে মেয়ে আমার কাছে এক গ্লাস জল চাইল। এ সুযোগ আমি হাতছাড়া করলাম না। মেয়ের অসাক্ষাতে সেই জলে মিশিয়ে দিলাম 'পটাসিয়াম সাইনাইড'। বিখাপ করুন দারোগাবাবু, বিষ মেশানোর সময় একটুও হাত কাঁপেনি আমার। তারপর মেয়ের দেহে বিষক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও খেলাম। তারপর কি হ'ল সেত' আপনি চোখেই দেখতে পাচ্ছেন।

এই হ'ল আমার এবং আমার মেয়ের মৃত্যুর ইতিহাস।

তাৎক্ষণিক—

সরমা রায়

আমার চোখের সামনে থেকে একটা কালো পর্দা সরে গেল। সব কিছু দিনের আলোর মত পরিষ্কার হ'য়ে ফুটে উঠল।

তারপর কেটে গেছে ছ'টা বছর। সেখান থেকে বদলী হয়ে আমি চলে এসেছি এক অজ পাড়ারগারে। কিন্তু সেই ঘটনাটা আমি আজও ভুলতে পারিনি। আর পারিনি সরমা দেবীর জীবনের শেষ প্রাণটিকে। বার বার মনে হ'য়েছে প্রাণটা, 'আপনি বলতে পারেন, কতখানি দুঃখ পেলে, তবে মা পারে তার মেয়ের হাতে বিষের পাত্র তুলে দিতে। কতখানি নিষ্ঠুর হ'লে, তবে মা পারে তার মেয়ের খাবারের সাথে বিষ মেশাতে'। আজ পর্যন্ত নিজের মনের কাছেও এ প্রশ্নের কোন সন্তুস্ত দিতে পারিনি। কোনদিন পারব বলেও মনে হয় না।

**Kirit** ADVERTISING AGENCY

REPRESENTATIVE OF  
FAMOUS NEWS PAPERS & MAGAZINES

72, HINDUSTHAN PARK - CALCUTTA-29



# প্রেম

( গল্প )

## শ্রীমুশোক্তন দত্ত

ম্যাল থেকে উঠবো উঠবো ভাবছি। এরই নাম ম্যাল! স্কাট-ব্রিচেস আর শাড়ি পরা একপাল নানা জাতের রং-বেরঙের মেয়ে আর প্যান্ট-কোট-টাই পরা একদল ছেলে নাচছে-হাসছে-ড্রিক করছে। আশ্চর্য! বারা দার্জিলিং বেড়াতে আসে, এই ম্যাল তাদের কাছে একটা বিশেষ আকর্ষণ। বাংলার প্রফেসার সুকুমার ভট্টাচার্য এই ম্যালের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছিলেন সেদিন। গাইড বুক মোটা মোটা হরফে লেখা আছে—'visit to the Mal.' আমার মনে হ'ল দার্জিলিং বেড়াতে এসে ম্যাল দেখার অর্থ হ'ল সময় নষ্ট করা। মনটাকে আবিষ্কার করে তোলা।

আমি গরীবের ছেলে। ভাবিনি কোনদিন দার্জিলিং দেখতে পাবো। বাবা কাজ করতেন একটা অফিসে। আর করতেন সামান্য। কোনমতে চলতো আমাদের সংসার। কিন্তু তিনি মারা গেলেন হঠাৎ। তখন আমার বয়স নয় কি দশ বছর। কোনমতে দিন চালিয়ে লেখাপড়া শিখেছি। বিলাসের মুখ দেখতে পাইনি জীবনে। মা বলতেন, আরাম-বিলাস বড়লোকদের জন্তে, গরীবের ওতে অধিকার নেই। M. A. পড়ার সময় পর্যন্ত একখানা সার্ট আর একখানা কাপড় পরেছি। নিদারুণ দারিদ্র্যের ভেতর দিয়ে আমার জীবনের অনেকগুলো দিন কেটেছে।

কিন্তু এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পরিখানে টেরি-লিনের সার্ট, ট্রাউজার। হাতে সর্বাধুনিক ডিজাইনের স্কোয়ার ডায়ালের ঘড়ি। মুখে দামী সিগারেট। দারিদ্র্যের ওপর আজন্মের আক্রোশের চরম প্রতিশোধ নিচ্ছি যেন। মাকেও যথাসাধ্য স্মৃতি করার চেষ্টা করেছি। তবে পারিনি তাঁর একটা কথা রাখতে। মা আমাকে বার বার অনুরোধ করেছিলেন বিয়ে করবার জন্তে। কিন্তু আমি আমার প্রতিজ্ঞায় অনড়। বিয়ে আমি জীবনে করব না। বিয়েতে একটা রোমান্স আছে জানি। কিন্তু তা নিতান্তই রোমান্স! কয়েকটি দিনের সামগ্রী। তারপর জীবনটা হ'য়ে উঠবে

অসহ, সংসারটাকে মনে হবে জেলখানা। কি প্রয়োজন স্মৃতি জীবনটাকে অস্মৃতি ক'রে তোলা?

একরাশ কাচের গেলাস ভাঙার শব্দ কর্ণপটেই আঘাত হানলো। কি ঘটলো জানবার জন্তে আশেপাশে তাকালাম। পাশের টেবিলে চোখ পড়লো এক সময়। না, সত্যি কোন কাচের গেলাস ভাঙেনি। পাঁচ-ছ'টা তরুণী বিয়ারের গেলাস হাতে হাসছিল খিলখিল ক'রে। বুঝলাম এই লালময়ী ললনাদের সরব হাতকেই আমি কাচের গেলাস ভাঙার শব্দ ব'লে ভুল করেছি। ওখান থেকে চলে আসার জন্তে উঠে দাঁড়লাম। ঠোটে একটা সিগারেট জ্বলে দেশলাইয়ে কাঠি চুকছি, এমন সময়ে পেছন থেকে কে বেন সুরেলা গলায় ডাকলো—'অর্ণবদা'।

নামটা আমার, তবু মনে করলাম, এখানে আর কে আমার ডাকবে? হয়তো আমি ভুল শুনেছি। কাউন্টারে বিল চুকিয়ে গেটের কাছে গেছি। আবার সেই মিষ্টি ডাক 'অর্ণবদা'।

পেছন ফিরে তাকাতেই দেখলাম শিফনের শাড়ি পরা একটা ছিপছিপে তরুী ছোট ছোট পদক্ষেপে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। মেয়েটা আর একটু কাছে আসতে চিনতে পারলাম, উর্মিলা হাজরা।

ইউনিভারসিটি লাইফের ক্লাগমেট শাস্ত্রভূক্ত রাজার বোন। শাস্ত্রভূক্ত এখন জার্মানিতে। M. A. পাস করার পর ও জার্মানিতে গেছে Economics নিয়ে রিসার্চ করতে। ওদের বাড়িতে আমি প্রায়ই যেতাম। গরীবের ছেলে ব'লে ওর চোখে ঘৃণার চিহ্ন কোনদিন দেখিনি। তাছাড়া ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল সমুদ্রের মতো গভীর। ওর বাবা মা'ও খুব স্নেহ করতেন আমায়। শাস্ত্রভূক্ত জার্মানিতে যাওয়ার পর আর ওদের বাড়ি বাইনি নানা সঙ্কোচে। উর্মিলার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিলো, তবে বনিষ্ঠতা হয়নি। আমি যে কলেজের লেকচারার ও সেই কলেজেরই ছাত্রী।

এমনকি আমার subject-টাও ওর আছে। কলেজে ও আমাকে সব সময় এড়িয়ে চলতে চাইত। প্রয়োজন না হ'লে কোন কথা বলত না। হয়তো ওর দাদার বন্ধু বলেই। উর্মিলা এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। কোতুক মাথা চোখে প্রশ্ন করল—অর্ণবদা আপনি এখানে?—ওর চোখ-মুখ হতে ঝরে পড়লো এক ঝলক বিষয়।

—কেন, দার্জিলিং আসতে আমার মানা আছে নাকি?

—অনেকটা সেই রকমই! আমি তো জানতাম অজানার ওপর কোন আকর্ষণই আপনার নেই। আপনাকে হাত-ছানি দেয় যতো রাজ্যের বই।

—বড় একঘেয়ে লাগছিলো, তাই চ'লে এলাম। বন্দী জীবনে একটু বৈচিত্র্যের প্রয়োজনেই।

—বাক তবু ভালো। আপনারও একঘেয়ে লাগে, বৈচিত্র্যের প্রয়োজন হয়।

—কেন উর্মিলা, তুমি কি মনে করো আমি গ্রহ-কীট?

—তাইতো জানতাম। দাদার কাছেও তো সেই রকম শুনেছি।—হেসে হেসে বলে ও।

—না, তোমার সঙ্গে কথায় পেরে উঠবো না। কোথায় উঠেছ তাই বলা?

—‘মাউন্ট এভারেস্ট’ হোটেলে। আপনি কোনটাত্তে?

—‘হিমালয়ান গ্লোরি’তে। তোমার বাবা মা’ও সঙ্গে আছেন নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ। তাঁরা তো আপনার কথা প্রায়ই বলেন। আপনি তো অনেকদিন যাননি আমাদের বাড়ি। মা বলেন, আপনি আমাদের ভুলেই গেছেন।

—না, না, ভুলবো কেন?

ঘাসের গালিচা বিছানো রাস্তা দিয়ে ছুঁজনে হাঁটছিলাম পাশাপাশি। ওর চলাফেরা কথাবার্তার ভঙ্গিটা নৃত্য-চপল। ভেবে পাচ্ছিলাম না উর্মিলা আজ নিজেকে এতটা অনাবৃত করলো কেন ক’রে? কই আগে তো কোনদিন ওকে এতটা মুখর হ’তে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। তবে? ও আজ কেন এতটা উচ্ছল? হয়তো আমারই ভুল। অপরিচিত ভায়সায় একজন পরিচিতের সন্ধান মিলেছে ব’লেই হয়তো ও আজ মনের ঘোমটা খুলে ফেলেছে। যে কোন কারণেই হোক, ওকে আজ আমার ভারি ভালো

কথা বলতে বলতে হোটেলের কাছে পৌঁছে গেলাম আমরা। বললাম—চলি উর্মিলা, কাল আবার দেখা হবে।

—এত ভাড়াভাড়ি হোটেল তুকে কি করবেন? চলুন না আমাদের হোটেল। বাবা মা’য়ের সঙ্গে দেখা ক’রে আসবেন। তাঁরা কিন্তু আপনাকে দেখে খুব খুশী হবেন।

—আজ নয়। কাল সকালে যাবো।

—ঠিকতো? অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বললো ও।

—হ্যাঁ, ঠিক।

—আমি না হয় ডেকে নিয়ে যাব। ঠিক ন’টার।

—তাই এসো।

উর্মিলা চলে গেল ওদের হোটেল। হিমালয়ান গ্লোরি আর মাউন্ট এভারেস্ট ঠিক পাশাপাশি। যেন দু’টি স্বর্গ ভাই। হোটেলের স্টাটে তুকে কেমন যেন একা একা মনে হ’তে লাগলো। অনেকক্ষণ পায়চারি করলাম। সিগারেটের ধোঁয়ায় মিং করবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। একি হ’ল আমার? জীবনে তো এ-রকম মানসিক দুর্বলতা কোনদিন দেখা দেয়নি। আশ্চর্য! চাকর রাতের খাবার দিয়ে গেল। খেয়ে নিলাম। তারপর অবশ দেহটাকে লুটিয়ে দিলাম শয্যায়। চোখ বুজে এলো ঘুম।

\* \* \*

ঘুম ভাঙলো অনেক বেলায়। তাও খাবার চাকরের ডাকাডাকিতে। টেবিলের ওপর বেড-টীর কাপটা নানিয়ে রেখে ও চ’লে যাচ্ছিল। ওকে ডেকে বাথরুমে গরম জল দিতে বললাম। ও চ’লে গেল। হঠাৎ চোখ পড়লো হাত-ঘড়িটার ওপর। আটটা! অনেক দেরি হ’য়ে গেছে। একটু বাদেই তো উর্মিলা আসবে। চায়ের কাপটা কয়েক চুমুকে শেষ ক’রে ছুটলাম বাথরুমে। বাথ টবে গরম জল ছিলো। ভাড়াভাড়ি চান ক’রে নিলাম।

জামা-প্যান্ট পরে আরনার সামনে দাঁড়িয়ে চলে চিফনি চালাচ্ছি। উর্মিলা এসে ঘরে ঢুকল। ওকে বলতে ব’লে চটপট তৈরী হ’য়ে নিলাম। বেরুলাম ওর সঙ্গে।

পথ চলতে চলতে ও বলছিলো—বাবা-মা এখনও ব্রেকফাস্ট করেন নি। আপনার জন্তে অপেক্ষা করছেন। আপনি দার্জিলিং এসেছেন শুনে ওঁরা তো খুব খুশী।



নয়। মৃন্ময়বাবু আর যিগা দেবী অপেক্ষা করছিলেন আমার জন্য। আমি বসলাম উঁদের মুখোমুখি। উর্মিলা বসলো আমার পাশে। ব্রেকফাস্ট করলাম উঁদের সঙ্গে। ডিনারও খেতে হ'ল উঁদের সঙ্গে। সকো বেলায় ক্লাস্ত হ'য়ে ফিরে এলাম হোটেল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এক সময়।

পরের দিন সকালটা বিছানায় গড়িয়ে গড়িয়ে কেটে গেল। বিকেল বেলায় উর্মিলার সঙ্গে গল্প করলাম। 'Price Theory' বুঝতে এসেছিলো ও। বুঝিয়ে দিলাম।

এইভাবে বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল। উর্মিলার সঙ্গে সখ্যতা এসে দাঁড়ালো অন্তরঙ্গতার। ছাত্রী আর অধ্যাপকের অদৃশ্য ব্যবধানটা ঘুচে গেছে নিজেকেদের অভ্যস্তে। 'সত্যি প্রেম পদার্থটা খুব ছোয়াচে। অনেকটা হামের মতো। প্রেম প্রমত্তা পদ্মা নদীর মতো সর্বগ্রাসী। প্রেমের জোয়ারে আভিজাত্য, কুল-মান—সব ভেসে যায়। কিন্তু আমাদের সমাজের নিয়ম অন্তরঙ্গ। শ্রদ্ধা-ভক্তি, স্নেহ-প্ৰীতি নিয়ে মাতামাতি করে। আপত্তি নেই, কিন্তু প্রেম! অসম্পূর্ণ। অশ্লীল। শুচি-শুভ্র-সুন্দর বস্তুটাই আমাদের কাছে লজ্জার বিষয়।

আমি যে কথা বলতে সাহস পাইনি, লজ্জা পেয়েছি, ও সে-কথা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছে। ও একদিন বলল—আমার ভালবাসে। প্রেমের মনোভাব সখ্যকে ভিত্তির হগো ব'লেছেন, "The first symptom of love in a young man is timidity; in a girl it is boldness."

কলকাতা খুলতে আর দিন কয়েক মাত্র থাকি। তারপরই আবার যোগ দিতে হবে ছকে বাঁধা একঘেয়ে জীবনে। আরাম কেদারায় দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে সিগারেট টানছিলাম। উর্মিলা এসে হাজির। আবদারের ভঙ্গীতে বলল—চলো একটু খেড়িয়ে আসি।

—কোথায় বাবে উর্মি? সারা দার্জিলিংটাই তো চ'বে ফেলেছি এ ক'দিনের মধ্যে।

—চলো না, একটু নির্জনে গিয়ে বসি। আবদারের ছুর গুনলাম ওর ঘরে।

—তার কি আর কোন দরকার আছে উর্মি?

—তবুও চলো। আমার হাত ধ'রে টেনে তুললো ও।

অগত্যা বেরুতে হ'ল। পা ঘেঁষে ঘেঁষে হাঁটছিলাম ছ'জনে। বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে এসে এক জায়গায় দেখতে পেলাম, পাইন আর বার্চ গাছের মেলা। মাঝে মাঝে নানা ধরনের বুনো ফুলের ঝোপ। এক কথায় অপূর্ব সুন্দর জায়গাটা। যেন কোন নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা ছবি। উর্মিলা বললো, আর হাঁটতে পারছি না। এলো এখানে বসি।

ঘন হয়ে বসলাম ওর পাশে। একটা সিগারেট ধরলাম। কচি সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো উর্মিলা। ভাল ক'রে তাকালাম ওর দিকে। ও যেন অনশ্রু! ওর ফরসা দেহটা যেন পাথর কুঁড়ে তৈরী। সুডোল চিবুকে লাবণ্যের আভাস। চোখ হ'টো কি নিবিড় কালো, গভীরতা যেন অন্তলম্পর্কী। ঠোঁটের কিনারে ছুরির ফলার মতো স্বচ্ছ হাসিটুকু নিভাস্ত একঘেয়ে হ'য়ে গেছে ব'লেই মোনালিসার রহস্যময় হাসির সঙ্গে তুলনা করছি না। নির্নিমেবে চেয়ে রইলাম ওর দিকে। লাজে আবীর-রাঙা হ'য়ে উঠলো ওর কমলীর মুখটা।

—অমন ক'রে দেখছ কি? জড়ানো স্বরে বললো উর্মি।

—তোমাকে। সহজ ছোট্ট উত্তর দিলাম।

—প্রথম দেখছ নাকি?—চাপা কৌতুক ক'রে বললো ও।

—না, দেখছি ওখেলোর সঙ্গে কেমন মানাবে ডেস্-ডিমনাকে।

—তুমি বুঝি ওখেলো? বলো তো এ-রকম বৈক্য-বিনয় শিখলে কোথা থেকে?

—বেশ বাবা, বেশ।

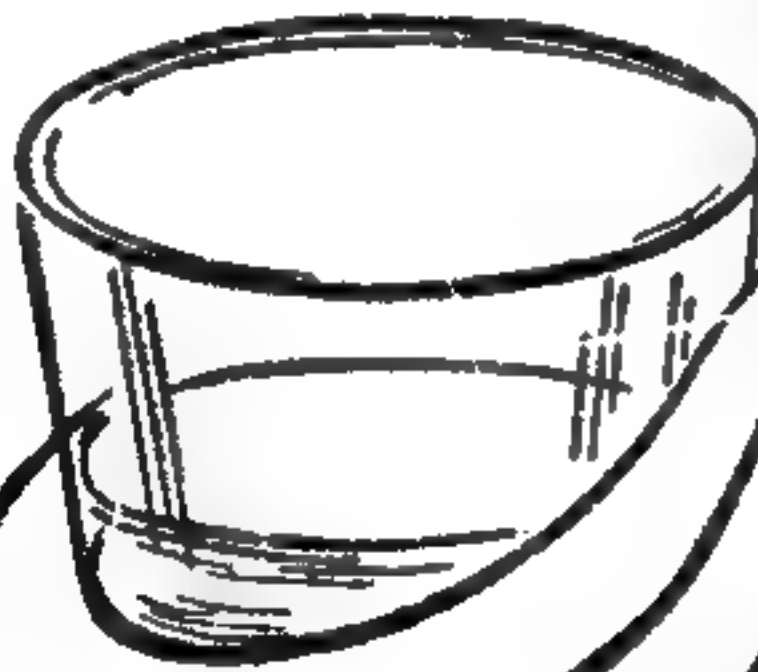
—ভাল হবে না বলছি।—কপট রাগে ঠোট ওলটালো উর্মিলা।

ওর হ'চোখে এক অদ্ভুত আবেদন। উর্মিলার মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিলাম। নরম কপোলে ঐঁকে দিলাম প্রেমের জয়টিকা।

আহারের পর  
দিনে দু'বার..

দ্রব প্রাণুতে  
প্রাণ্য নাড়ের  
শ্রেষ্ঠ উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান



মহাদ্রাক্ষারিষ্ট  
(৬ বৎসরের পুরাতন)

মৃতসঞ্জিবনী

সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কের ডাঃ নরেশ চন্দ্র  
যোষ, এম-বি, বি-এস, আরুর্কেট-  
আচার্য, ৩৬, গো হা ল পা ডা  
রোড, কলিকাতা-৩৭



অধ্যাপক ডাঃ বোগেশ চন্দ্র যোষ, এম-এ,  
আরুর্কেটশাস্ত্রী, এক, সি, এস, (লণ্ডন),  
এম, সি, এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর  
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ডুতপূর্ব অধ্যাপক।

০ দু' চামচ মৃতসঞ্জিবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-  
দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার  
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-  
দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি,  
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ করতে অত্যধিক  
ফলপ্রসূ। মৃতসঞ্জিবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও  
বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে  
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে  
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলক  
স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।



# চলার পাথ

( গল্প )

এস. দত্ত

পর পর দু'বার ভাইশেল বাজিয়ে রাতের মোহময় নিশ্চরতাকে খান খান করে দিয়ে থেমে গেল দশটা দশের হিমেলগঞ্জ লোকাল। ভিড় ছিল না প্ল্যাটফর্মে। বেশী রাতের ট্রেন বলেই হয়ত। কিরকিরে হাওয়ার দোলায় দূরের কোন বাগান থেকে ভেসে আসছিল নাগকেশরের সুরভি। আকাশটা তারায় তারায় ছাওয়া। তারার রোশনাইয়ের মাঝে গুরু পক্ষের এক টুকরো চাঁদ অকুপণভাবে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে নিজের আভিজাত্য অক্ষুণ্ন রাখবার প্রচেষ্টায় মগ্ন। ষ্টেশন ঘরে কেরোসিনের একটা বাতি জ্বলছিল মিটমিট করে। জমাট অন্ধকারকে লঘু করার বৃথা চেষ্টা। হিমেলগঞ্জ ফরেস্টের তরুণ অফিসার পরেশ চ্যাটার্জী গাড়ী থেকে নেমে সাতপাঁচ ভাবলো অনেকক্ষণ ধরে। এতো রাতে কোয়াটারে যাওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। উচিতও হবে না। তাই ছোট ওয়েটিং রুমটার দিকে মন্থর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল পরেশ।

খোলাই ছিল ওয়েটিং রুমটা। কেরোসিন বাতির বাদামী শিখাটা কৈপে কৈপে উঠছিলো। একটা জীর্ণ লম্বা বেঞ্চে আশ্রয় নেয় পরেশ। বডু মোংরা। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তবু আজকের রাতটার মত থাকতে হবে এখানে। উন্মুক্ত বাতাসের পথে দৃষ্টিকে অন্ধকার দিগন্তে প্রসারিত করে দেয় সে। কতকগুলো তালগাছের মাথা দেখা যাচ্ছিল আবছা চাঁদের আলোয়। উদার আকাশের নীচে অজস্র জোনাকির আলোর হরিলুট। সত্যিই বড় ভাল লাগছিল তাকিয়ে থাকতে। নিঃসঙ্গতার প্রেমে পড়ে যায় সে। বেশ কিছু সময় কেটে যায় বাইরের দিকে চেয়ে।

—ঝরামৌ যাওয়ার ট্রেনটা ক'টার বলতে পারেন?—

প্রশ্ন করলেন এক ভদ্রমহিলা।

মিহি গলার চিঁচিঁ শব্দে মোহজাল ছিন্ন হ'ল পরেশের। ঝরামৌ! নামটা শুনেই চমকে উঠে সে। কোডুহলী চাউনি মেলে ধরে পরেশ ভদ্রমহিলার মুখের উপর।

ভদ্রমহিলার বয়স ত্রিশের বেশী হবে না। গোলগাল চেহারা। গালের কাছে অপ্রয়োজনীয় মেদ মুখশ্রীটাকে অনেকটা হরণ করে নিয়েছে। একটা দু-তিন বছরের ছেলে ভদ্রমহিলার সঙ্গে আছে। পরেশের মনে হ'ল এ মুখটার সঙ্গে সে যেন অনেকদিন থেকে পরিচিত। তবু সম্পূর্ণ ভাবে মনে পড়লো না কখন কিভাবে ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছিল। হঠাৎ নজর পড়ল ভদ্রমহিলার লেদার ব্যাগটার ওপর। চমকে উঠল ও। তড়িতাহত হ'ল যেন। আকস্মিক উদ্গাদনায় কৈপে কৈপে উঠল ওর সর্বাঙ্গ। 'সুকঠা যায়'—মানে সুকঠা মুখো-পাখায়, পরেশের 'কঠা', হিমেলগঞ্জে কঠা?—হ্যাঁ, কঠাই তো। ওইতো কপালের ওপর কাটা দাগটা। চাঁদের ওপর যেমন কলক। কথা হারিয়ে এবার পাথর হয়ে যায় পরেশ।

ভদ্রমহিলা আবার জিজ্ঞাসা করলেন,—ঝরামৌ যাবার লাষ্ট ট্রেনটার আর কতো দেরি?

মনের আবেগকে নির্মম ভাবে রুদ্ধ করে পরেশ। ডান হাতের রিষ্টে বাঁধা স্কারার ডায়ালের ঘড়িটার দিকে তাকায় একবার। কয়েক সেকেন্ড কেটে যায়। তারপর উত্তর দেয় ও—এখনো মিনিট তিনেক বাকী আছে ঝরামৌ যাবার ট্রেন আসতে।

আর কোন কথা বলেন না ভদ্রমহিলা। এমনকি একটা ধন্যবাদও পর্যন্ত দেয় না। যেন প্রয়োজন নেই। ছেলের হাত ধরে ওয়েটিং রুম থেকে বেরিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ান তিনি। সঞ্চিত বেদনাকে লঘু করবার জন্ত একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ছাড়ে পরেশ।

অনেকদিন পরে কঠার দেখা পেয়ে ওর মনের প্রাচীন ক্ষতটা দগদগ করে ওঠে। প্রচণ্ড ঘৃণার সারা শরীরটা রিরি করে উঠেছিলো ওর। তার মনের শক্তি চুরি করে নিয়েছিলো কঠা। পরেশের স্মৃতির নীড়টাকে

ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ঝড়ো হাওয়ার উড়িয়ে দিতে ও বিন্দুমাত্র বিধা করেনি। ওকে পরেশ ঘৃণা না করে পারবে কেন? মানুষ যখন অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবিধান করতে পারে না, তখন সে অন্যায়কারীকে ঘৃণা করে। ঘৃণা করে তবেই সে পায় শান্তি।

ঝরামোগামী ট্রেন এসে থাকে। যাত্রীদের ওঠানামা শেষ হয়। আবার ছেড়ে দেয় গাড়ী। চলন্ত গাড়ীটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে পরেশ। হিমেল হাওয়ার কানাকানি, বাতাসের চেউ-এ ভেসে আসা ফুলের মিষ্টি গন্ধ আর গগনতলে জোনাকির আলোর হরিলুট—সব কিছুর মধ্যে এক অপূর্ব জ্ঞান খুঁজে পায় সে। তার নিজের হারিয়ে যাওয়া অতীতকেই ফিরে পায় যেন। তার চোখের সামনে চকচক করে ওঠে ছ'বছর আগের দিনগুলো। যেন ছাই ঢাকা আগুন! হাওয়ায় ছাই উড়ে যেতেই আগুনের দীপ্তি বেরিয়ে পড়েছে আবার। আঁধারের ঘোমটার আড়ালে চলন্ত গাড়ীটা মিলিয়ে গেল। চোখ ফিরিয়ে নিলো পরেশ।

অভিনয়! অভিনয় ছাড়া আর কি? সত্যি দীর্ঘ ছ' বছর ধরে নিখুঁত প্রেমের অভিনয় করেছে কণ্ঠ। ও মিনেমায় নামলে নিঃসন্দেহে একজন নামকরা পেশাদার অভিনেত্রী হতে পারতো। অভিনয়? না না, অভিনয় কেন বলছে পরেশ? এর নাম প্রতারণা! পরেশের সঙ্গে প্রতারণা করেছে কণ্ঠ। পরেশ একটি ইডিয়ট। কাচকে মনে করেছে হীরা, চকচকে তামাকে মনে করেছে গিনি-সোনা, পরিহালকে মনে করেছে প্রেম, গরলকে মনে হয়েছে অমৃত।

ঝরামো কলেজে B. Com. পড়তো পরেশ। ওর চেহারাটা তখন বেশ সুন্দর ছিলো। যাকে বলে অনিন্দ্য-সুন্দর কাস্তি। দেহের প্রতিটি অংশে মাখানো ছিল জুলিয়েটদের পাগল করে তোলার তীব্র ক্ষমতা। পরেশ জানতো অনেক মেয়েই ওকে চায়। ওর ফণিকের সান্নিধ্যে নিজেকে ধন্য মনে করে। জমিদার বাড়ীর মেয়ে সুকণ্ঠা ওর জন্তে বিশেষ লালসিতা। তবু পরেশ কারুর কাছে বিলিয়ে দেয়নি নিজেকে। নিজের গ্যামার নিয়ে নিজেকে আনন্দে থাকত সে। মাঝে মাঝে গর্বও হয়েছে নিজের রূপের জন্ত।

কলেজে কি একটা বিচিত্রানুষ্ঠান হচ্ছিল সেদিন। অনুষ্ঠান শেষ হ'ল রাত দশটার। গেট দিয়ে বেরুচ্ছিল ও। পেছন থেকে ডাকলো সুকণ্ঠা। সসংকোচে বলেছিলো— কিছু মনে করবেন না, অনেক রাত হয়ে গিয়েছে, একা বাড়ী যেতে পারছি না। তাই আপনাকে ডাকলাম। আপনি তো গৈপুর্ন হোস্টেলে থাকেন। আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়েই তো যাবেন। আমাকে একটু পৌছে দেবেন?

পরেশ নির্নিমেষে তাকিয়েছিল সুকণ্ঠার দিকে। সুকণ্ঠা সুন্দরী। গোলাপী ঠোঁটে আর সুডোল চিবুকে লাগণোর স্পষ্ট আভাস। চোখ দুটো যেন অবিকল কাজল-লতা। একটা ছাপা শাড়ি ওর তুষার-ধবল দেছে। লজ্জা পায় সুকণ্ঠা। মাথা নীচু করে।

ভরমুজ-লাল দুটি ঠোঁট নেড়ে বলে—আপত্তি আছে নাকি?

অস্তরের লোভাতুর আত্মার আকস্মিক আত্মপ্রকাশে লজ্জা পায় পরেশ। অত্যন্ত লজ্জা পায়। নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলে—আপত্তি থাকবে কেন? চলুন।

এই পরিচয় হ'ল ওদের প্রণয়ের সূত্রপাত। প্রেমে পড়ল ওরা। মাঝে মাঝে পরেশের কোলে মুখ লুকিয়ে অমুযোগ করত কণ্ঠ। কঁদতো। গুঁফ মুখে বলতো— আমি যে আর পারছি না 'রেশ! যৌবন নিয়ে মেয়েদের যে কি জ্বালা, প্রতি মুহূর্তে সতর্ক হয়ে থাকার বেদনা যে কি তা' তুমি বুঝতে পার না? আমার বিয়ে কর। না-না, আর এক মুহূর্ত আমি কুমারী হয়ে থাকতে চাই না।

পরেশ কথা দিয়েছিলো। কিন্তু ভয় ছিল। জমিদার বংশের আদরের ছলানীকে তার মত ছেলের ঘরনী-রূপে কি মানাবে? সংসারের অকুল সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল সে। তবু কথা দিয়েছিলো। কে জানত সবই মিথ্যা হয়ে যাবে, জীবনটা ফাঁকা হয়ে যাবে!

নদীতে কোয়ারের পর আসে ভাঁটা। প্রেমের জগতেও অনেকটা তাই। প্রচণ্ড উন্মাদনার পর আসে ক্রান্তি। আসবেই। আসতেই হবে। ওদের ক্ষেত্রেও মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি সে কথা। হবার নয় বলে হয়নি হয়তো। কণ্ঠার প্রেমে ভাঁটা এসেছিলো। পরেশ টের পায়নি এই সত্যটা। কি করেই বা জানবে? মেয়েরা কেবল



প্রেম করার জন্তে, বোঝার জন্তে নয়। যে নারী চরিত্র স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার কাছে রহস্যময়, পরেশ কি করে বুঝবে সেই নারী চরিত্রটাকে? তবে বুঝতে পেরেছিল একদিন। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে তখন।

সব কিছুই জানতে পারল একদিন। লাল কাণ্ডিতে লেখা সুকঠার বিয়ের চিঠি হাতে এসে পড়ল যেদিন। চিঠিটা বজ্রপাতের মত এসে পড়ল ওর অগ্রসৌখনীর্ষে। মেয়ে জাতটাকে চিনতে পারেনি সে। বুঝতে পারেনি একাধিক পুরুষের সঙ্গে লাভ করার জন্তে মেয়েরা উন্মুখ হয়ে থাকবেই। নারীরা লোভী। শিশুর মতো লোভী। বুঝতে পারল পরেশ মরীচিকার প্রেমে পড়ে সে জীবন হারাতে বসেছিলো। আরো বুঝলো, বিলাস-সন্নিবীরা

গৃহস্থালির বাইরেই মানানসই। তাদের গৃহস্থালি করার প্রচেষ্টা নিভাস্তই হাস্যকর এবং বার্থ। কিন্তু বুঝতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

তারপর বিগত চার বছরের মধ্যে আর দেখা হয়নি সুকঠার সাথে একবারও। অনেকদিন বাদে হঠাৎ দেখা হ'ল এঞ্জিনিয়ার চঞ্চল রায়ের স্ত্রী সুকঠা রায়ের সঙ্গে। পরেশ চিনলো। সুকঠা চিনলো না। চিনলেও হয়ত না চেনার অভিনয় করলো। চার বছর আগেকার সেই মোহময় দিনগুলোকে, এরই মধ্যে ভুলে গেল সুকঠা। এতো সহজে ভুলে গেল। ভুলতে পারলো? একটুও কষ্ট হল না? আশ্চর্য! অবশ্য জীবনের চলার পথে হামেশাই তো এ-রকম ঘটছে।

## সচিত্র শিশির

মাসিক পত্রিকা আষাঢ়, ১৩৭৩ হইতে ৪৩শ বর্ষ, আরম্ভ হইয়াছে। সডাক বার্ষিক মূল্য ৪/- সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য ২৪০। পূজা সংখ্যা বর্ধিতাকারে প্রকাশিত হয় কিন্তু গ্রাহক-দের বর্ধিত মূল্য দিতে হয় না। আষাঢ় হইতে গ্রাহক হইতে পারেন। গ্রাহক-মূল্য মনি-অর্ডারে পাঠানই শ্রেয়, কারণ, ভি-পিতে লইতে হইলে ৬০ পয়সা অতিরিক্ত খরচ পড়ে। নমুনা-সংখ্যা পাইতে হইলে ৩০ পয়সা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইবেন।

শিশিরে গল্প রচনাদি যে কেহ পাঠাইতে পারেন, ছাপাইবার যোগ্য হইলে ছাপা হয়। অনেক সময়ে মনোনীত রচনাও স্থানান্তরের জন্ত বিলম্ব ছাপা হয়। শিশিরের জন্ত প্রেরিত রচনাগুলির নকল রাখিয়া পাঠাইবেন।

শিশির কার্যালয়

২২১১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।

# বেরী মলম



দাদ, হাজা, খোস,  
পাঁচড়া, চুলকানি,  
ফোড়া, ঘামাচি,  
পোকার কামড়,  
ও একজিম্বার  
অব্যর্থ মলম।

কাপড়ে দাগ লাগেনা,  
বেদনা নাশক ও সিঞ্চকর

ফোন-৩৪-৫১০১

প্রোল এজেন্ট মাধব এণ্ড কোং জোড়াসাঁকো, কাল-৭

# মনীষা

( গল্প )

নিতাই মৃধা

—আর ধৈর্য রাখতে পারছি না মনীষা,—তোমাকে-  
আমাকে নিয়ে হয়তো অনেক হাসাহাসি অনেক কানাকানি  
চলছে—তা' চলুক। সেজন্তে আমি এতটুকুও বিচলিত  
নই। এই তীব্র খরস্রোতা নদীর চেষ্টে যেমন আছড়ে পড়ছে  
তার বেলাভূমিতে, আমার এ উন্মত্ত হৃদয় তেমনি উবেলিত  
হয়ে উঠেছে, কিন্তু কিনারা পাচ্ছে না। অকূলে কূল কি  
দেবে না মনীষা? আমি তোমাকে না পেলে যে পাগল  
হয়ে যাব।

—হা-হা-হা! পাগল হয়ে যাবে! বাঃ, বড়ো চমৎকার  
কথা তো! তোমার কথাটা শুনে খুব হাসি পাচ্ছে  
ডাক্তার।

—তুমি হাসছ মনীষা? তুমি আমাকে বিক্রপ করছ,  
তুমি আমার ভালবাসাকে উপেক্ষা করতে চাইছ? হয়তো  
আমি ভুল করেছি তোমার মতো একজন সামান্ত নার্সকে.....

—Yes, Yes, Doctor, ঐ কথাটিই তোমাকে আমি  
বোঝাতে চাইছিলাম,—আমার মত একজন সামান্ত নার্সকে  
ভালবেসে তুমি খুব ভুল-ই করছ? আমার মতো একজন  
নার্সের সঙ্গে তোমাদের মতো ভদ্রবেশী যুবকেরা কিছুক্ষণ  
প্রেম করতে পারে। কিন্তু বিয়ে?—হি-হি-হি, বিবেকে  
বাধবে যে তাদের।

—একি বলছ মনীষা? তুমি এভাবে আমাকে বিক্রপ  
করতে পারলে? আমি ত তোমাকে আমার জীবন সঙ্গিনী  
হিসেবে গ্রহণ করতে কোনদিন কুণ্ঠিত হইনি, তবে কেন  
বৃথা আমাকে আঘাত দিচ্ছ?

—প্রীজ ডাক্তার! এতখানি উদারতা এ অভাগীর প্রতি  
নাই বা দেখালে! তোমার মতো নামকরা ডাক্তারের পত্নী  
কি এই সামান্ত নার্সকে মানায়? আমাকে বিয়ে করে তুমি  
কিছুই পাবে না। পাবে শুধু কাঁটার জালা। তার চেয়ে  
দেখ কোন ধনী তার ছললীর জন্ত বাড়ী-গাড়ী আর ভরি  
ভরি স্বর্ণ যৌতুক নিয়ে অপেক্ষা করছে। এ-যুগে গরীবের

মেয়ে হয়ে জন্মান বড়ো একটা অভিশাপ—তাই না ডাক্তার?

—তুমি অস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গীতে আমাকে বিচার করতে  
চাইলে খুব ভুল করবে মনীষা। আমি অর্থ-সম্পদ কিছুই  
চাই না।—চাই শুধু একজন উপযুক্ত জীবন সঙ্গিনী। জান  
মনীষা, আমি চিরদিন স্তম্ভরকে বেশী ভালবাসি। তাই  
স্তম্ভরের উপযুক্ত মূল্য দিতে কখনও ভুল করিনি। আমি  
চাই তোমার ঐ মনোহারিনী রূপের মাঝে, তোমার যৌবন-  
ভারাবনতা হৃদয়-সমুদ্রের মাঝে নিজেকে বিলীন করে দিতে।  
—বলো মনীষা, আমার এই তৃষ্ণার্ত হৃদয়কে তুমি শান্ত  
করবে কিনা?

—প্রীজ, হাত ছাড়ো ডাক্তার! আমার প্রতি এতখানি  
হর্বলতা তোমার সাজে না। ফুলের জন্ত কণ্টক সহ্য করা  
বার ততক্ষণ—যতক্ষণ তাতে মধু থাকে।

—তুমি একি বলছ মনীষা! তোমার হৃদয় বলে কি  
কিছুই নেই? তোমার কি কাউকে ভালবাসতে ইচ্ছা  
হয় না? তোমার মন মাতানো রূপ কি শুধু মানুষকে  
মাতাল করবার জন্ত—মানুষকে ভালবাসবার জন্ত নয়?

—হা-হা-হা! ডা-ল-বা-সা—শুনতে খুব ভাল লাগে।  
ইংরাজীতে আরো ভালো লাগে—'Love' ( লাভ )। সত্যিই,  
জগতে সবাই লাভের আশায় ঘোরে, লোকমান কেউ-ই  
করতে চায় না। যখন কোন লাভের আশা থাকে না—  
তখন বাসী গোলাপের মতো ফেলে, ছ'পায়ে মাড়িয়ে চলে  
যায়। ডাক্তার, অনুগ্রহ করে আমাকে মুক্তি দাও। জীবনে  
যে কটা দিন বাঁচি স্বার্থপর মানুষের একটু সেবা করে যাই।

—মানুষ সম্বন্ধে তোমার এত নীচ ধারণা কেন মনীষা?

—পশুদের সাথে মানুষের তফাত এমন কিছুই নেই  
ডাক্তার! পশুদের চিন্তা শক্তি নেই—আমাদের আছে,  
এইতো! মানুষ বেশী শিক্ষার অধিকারী হয়ে পশু-প্রেম  
আর মনুষ্য-প্রেমকে প্রায় সমপর্যায়ে এনে ফেলেছে। পশুরা  
মেলামেশা করে যেমন জৈবিক প্রয়োজনে—ইঞ্জিরের



তাড়নায়, অধিকাংশ পুরুষেরা কি ঠিক ভেমনি করে না?

—এভাবে বলতে তোমার বিবেকে কি আদৌ বাধা নেই মনীষা? তুমি কি পুরুষকে এতই হেয় মনে করো? তোমার কি এতই গর্ব—এতই দান্তিকতা? যাকে স্ত্রীরা দেবতা জ্ঞানে পূজা করে—তা'কে তুমি এতখানি নীচে নামিয়ে দিতে চাও?

—Please doctor, excuse me. আমি হৃদয়ের মর্মবেদনায় সত্যিই বিবেকে হারিয়ে ফেলেছি।—আজ্ঞা ডাক্তার, তুমি বলো তো—যারা অর্থের বিনিময়ে, যৌতুকের মানদণ্ড দিয়ে নির্বাচন করতে চায় তা'দের জীবন সঙ্গিনীকে—তা'র মধ্যে প্রকৃত প্রেমের চিহ্ন, ভালবাসার মূল্য কতখানি থাকতে পারে? কস্তার পিতামাতাকে চাহিদা-সুধারী অর্থ দিতে চোখের জল ফেলতে হয়। অপর দিকে সৌভাগ্যবানেরা সেই অর্থের বিনিময়ে কস্তাকে গ্রহণ করে। এ যেন ক্রেতা আর বিক্রেতার সম্বন্ধ। বড়ো চমৎকার এই জগৎ—তাই না ডাক্তার?

—আমি বুঝতে পেরেছি মনীষা, তোমার জীবনের বেদনা কোথায়। কিন্তু মনীষা, মুষ্টিমেয় শ্রেণীকে কেন্দ্র করে জগতের সকলকে বিচার করা চলে না। তুমি কি বলতে চাও—আমি তোমাকে জীবন সঙ্গিনী হিসাবে পেতে চাই অর্থ আর স্বর্ণ যৌতুকের আশায়? তোমাদের মেয়ে জাতটা কিন্তু বড়ো Sentimental—এমন কি আঘাত তোমার জীবনে এসেছে, যে জন্তে তুমি এমন হুঃখ-শোকে ভেঙে পড়েছ। আমি কোন স্বার্থের লোভে তোমাকে জীবন সঙ্গিনী হিসাবে পেতে চাইছি না। তোমাকে বিয়ে করলে অল্প সমাজের চোখে হয়তো অনেকখানি ছোট হয়ে যাব। কিন্তু মনীষা, আমি জানি স্বামী-স্ত্রীর চেয়ে মধুরতর সম্পর্ক আর কিছুতেই নেই। একি মনীষা, তুমি কাঁদছ।

—তুমি আমাকে ক্ষমা করো ডাক্তার। তুমি আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছ, এর চেয়ে বড়ো সৌভাগ্যের বিষয় আমার আর কিছুই নেই। কিন্তু এ কলঙ্কিনীকে ভালবেসে তোমার জীবনকে কলঙ্কিত করতে চেয়ো না ডাক্তার।

—মিছে কেন চোখের জল ফেলছ মনীষা! সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন তো মানুষের জীবনে আছেই। তুমি

এমন কি হুঃখ—যার জন্তে তুমি এমন ভাবে ভেঙে পড়েছ!

—তোমার কাছে ধরা যখন দিয়েছি, তখন আজ আর আমি কিছুই লুকাব না ডাক্তার। জানি, তখন আর এতখানি ভালবাসতে পারবে না। দূরে সরিয়ে নেবে নিজেকে—আমি তাই-ই চাই। শোন তা'হলে—

বাবা ছুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা গেলেন। টাকার শ্রদ্ধা করেও তাঁকে বাঁচানো গেলো না। আমি সেবারে হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা পাস করি। বাবার মৃত্যুর পর শোকে-দুঃখে মা নিরুপায় হ'য়ে পড়লেন আমাকে নিয়ে। আমাকে বিয়ে দিয়ে মা একটু নিশ্চিন্ত হ'তে চাইলেন। তাই মামারা আমার জন্তে পাত্র খুঁজতে লাগলেন। সৌভাগ্যবানেরা আসে, রূপে ভোলে বটে কিন্তু ভোলে না অর্থে! কারণ অবশ্য বুঝতে পারছি,—চাহিদা-মত মূল্য দিয়ে তাদের কিনবার শক্তি তখন আমাদের ছিল না। তাদের উপযুক্ত 'পণ' চাই। ওঃ, ভুল করলাম 'সত্য' সমাজে বুঝি আর 'পণ' কথাটি চলে না। বাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমাকে পাত্রস্থ করা আর সম্ভব হ'ল না। বাড়ী থেকে মাইল কয়েক দূরেই ছিল কলেজ। অগত্যা সেই মীর্জাপুর কলেজে ভর্তি হ'লাম। কলেজ-জীবন শুরু হ'লো। যেখানে পড়াশুনার অন্তরালেও চলে প্রেমোভিনয়।

প্রভাত রায় পড়তো ঐ কলেজে। পার্ড ইয়ারে পড়তো সে। ইক্‌নমিক্‌সে অনার্স ছিল। শুনেছিলাম মণ্ড বড়লোকের ছেলে সে। ট্যান্সি করে আসতো কলেজে। সে আমার রূপে মুগ্ধ হয়েছিলো। কিন্তু বামন হয়ে টাঁদ ধরবার ইচ্ছা আমার কোনদিন-ই ছিলো না। সে একদিন পণের মাঝে আমাকে ডেকে বলল—মনীষা, অনেকদিন থেকে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছি, কিন্তু ভরসা পাচ্ছি না। ভালবাসা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আমিও তোমাকে সেইভাবে ভালবেসে ফেলেছি। জানি না কোন অপরাধ করেছি কিনা, হয়তো আমি তোমার অযোগ্য।

সে এসেছিলো আমার বাড়ীতে। মা'কে খুলে বলেছিলো সব কথা। মা সরল মানুষ, ভুলে গিয়েছিলো প্রভাতের কথা।

মা সব কিছু শুনে বলেছিলো—বাবা, এতো আমার

খুব জাগ্রতের কথা। তুমি যদি গ্রহণ করো আমার মণিকে, তার চেয়ে সুখের বিষয় আমার আর কিছুই নেই বাবা।

এইভাবে ভুলে গিয়েছিলাম প্রভাতের স্বার্থপর ভালবাসায়। জগতকে চিনবার ক্ষমতা তখন আমার ছিল না। প্রথম জীবনে স্বপ্ন দেখেছিলাম—কপোত-কপোতী যেমন নীড় বাঁধে, সেই রকম নীড় বাঁধবার। এইভাবে চলেছিলো বেশ কিছুদিন আমাদের আবাধ মেলামেলা। মা কোনদিন বাধা দেন নি আমাদের এ ভালবাসায়।

তারপর প্রভাত অনাস' পাল করলো। নিজেকে তখন আরো ধন্য মনে হ'লো। প্রভাত একদিন এসে বললো—কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো, আমি বাবা-মা'কে রাজী করে তোমাকে আমার জীবন-সঙ্গিনী করব।

তারপর চলে গেল প্রভাত। পত্রের পর পত্র দিয়েও যখন কোন উত্তর পাওয়া যায় না, তখন খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমাদের সমাজের একটা বিশেষ গুণ আছে,—কোন উপকার কারুর করতে না পারলেও, নিন্দা বা কুৎসা রটাতো অন্য দেশ অপেক্ষা এরা অনেক উন্নত।

যাই হোক হঠাৎ একদিন প্রভাতের চিঠি পেলাম।

লিখেছে—মনীষা, তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো। তোমাকে আমার জীবন-সঙ্গিনী করতে পারলাম না। বাবা-মা'কে অনেক বুঝালাম কিন্তু তারা রাজী হ'লো না।

তারপর শেষ কথাটি লিখেছে—গরীবের ঘরের সাথে নাকি ওদের কোন সম্বন্ধ চলে না। তাই ওর বাবা নাকি কলকাতার সমস্ত বড়লোকের মেয়েব সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছে।

এইভাবে প্রভাত সেদিন আমার জীবন থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছে। পারের তলা থেকে সমস্ত মাটি সরে গিয়েছিলো সেদিন। আর কোথাও দাঁড়াবার স্থান পাইনি।

—কি ডাক্তার নীরব কেন? এবার পারবে, পারবে আমার গ্রহণ করতে?

—না মনীষা, আমাকে তুমি প্রভাতের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখ না। যে ভুল সে করেছে—আমাকে তুমি তার বন্ধু হিনাবে সুযোগ দাও সে ভুলের সংশোধন করতে।

মানিভগা জীবনের অন্ধকার ঢেকে দিয়ে মনীষার জীবনে উদিত হ'লো প্রভাতের নতুন সূর্যালোক। সে আলোকে মনীষা দেখতে পেল প্রকৃত প্রেম—তার স্থান বহু উর্ধ্বে।

## মেঘের মাদল বাজে

শ্রীমতী শান্তি বসু

মেঘের মাদল বাজে

আজি গুরুগুরু,

আনন্দে মাথা দোলার

অবাধ্য ঐ তরু।

কাশের গুচ্ছগুলি

ঘন স্নিবিড়,

ছেয়ে গেছে আজিকে যে

নদীর ডুই তীর।

বনভূমি মেজেছে আহা

কদম কেশরে,

সোঁদা গন্ধ উঠেছে যে

মাটি সিক্ত করে।

নৃত্যরত কেকাদল

আজি হরষিত

নব ধারার ধরাখানি

হল শুচিস্নাত।

মেঘের মাদল বাজে

গুরুগুরু আকাশে

কেয়ার সুরভি এল

বাতাসেতে ভেসে।



# পার্ক সুপরিচিতা

কুকাকাস

অনেকদিন পরে পার্কে বেড়াতে চলেছি। কোন্ পার্কে জানি না। তবে চলেছি। অনেক কষ্টে এড়িয়ে ছিলাম। কেন জানি না পার্কের পূর্ণতা আমার মনের শূন্যতা বাড়িয়ে দেয়। মনে হয় বড় একা। মনটা বড় ভারী হয়ে উঠে। ঘাসের উপর কিছু সময় বসে উঠে আসতে হয়। মনে হয় ভীষণ ভাবুক হয়ে পড়েছি। কিন্তু জানি না কিসের ভাবনা। পথে এসে সব কিছু ভুলে যাই। হয়ে উঠি আগের সেই কর্মব্যস্ত স্বাভাবিক মানুষ—এই আমি। তবু বয়স সময় কম নয়। কী না-পাওয়ার বেদনার মন গুমরে মরে।

ফাস্টনের সন্ধ্যা। এলোমেলো হাওয়ার মনটা আন-মনা। ইডেন গার্ডেনের দিকেই চলেছি। অগোছাল ইডেনের বসন্তের কিছুটা পরিপাটি—যেন মেজে ঘষে যৌবনটা জোর করে ধরে রাখতে চেয়েছে। আকাশে চাঁদ ছিল। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না। সমস্ত ইডেন জুড়ে আলো-আঁধারের খেলা। এখানে-সেখানে, আড়ালে সামনে নানান গুঞ্জন—তবে মুহূর্তেই। অনেক ঘুরেও ঠিক মত বসার সুযোগ হল না। নিজেকে বড় বেসামান মনে হচ্ছিল। রিক্স মনে এখানে যেন প্রবেশ নিষেধ। তবুও পা ছুটো নিচের দিকেই টানে—এখানেই বিশ্রাম চায়। ভাল করে চারদিকে তাকিয়ে দেখি—না কোনও বেঞ্চ খালি নেই। ইঁা দূরে গাছতলার বোধহয় একটা খালি আছে মনে হচ্ছে। গাছের ছায়া এসে পড়েছে বেঞ্চটার উপর। দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় না। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই অন্ধুর আগে পৌঁছুবার আশায়। কাছে গিয়েই অপ্রস্তুত। খালি নেই, একজন ভদ্রমহিলা বসে আছেন। সন্দের পুরুষটি বোধহয় বসিয়ে রেখে কিছু কিনতে গিয়েছে। ফেরার জন্তু পা বাড়িয়েছি, এমন সময় ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর কানে এলো—আপনি কি বসবেন? তাহলে আমি উঠছি।

বাস্তবাবে বলে ফেললাম—না না উঠবেন কেন? আমি ভেবেছিলাম—

মেয়েটি বোধহয় আমাকে দুর্বল ভেবে হাসল।

—এত সংকোচের কী আছে? আমার আপত্তি নেই, আপনি বসতে পারেন।

আমিও আর আপত্তি তুললাম না। কিছু বাধান রেখে বসে পড়লাম। মনে হচ্ছিল ছুঃসাহসিক কিছু একটা করে ফেলেছি। অবিখ্যাত কিছু একটা ঘটতে চলেছে বা কেবলমাত্র গুলের আসরে স্থান পাবে। থাক ওসব চিন্তা। সন্দের ভদ্রলোকটি কী ভাববেন? শেষে আবার হাতাহাতি না হয়।

মেয়েটি আবার কথা বলল—বেড়াতে এসেছেন?

সংক্ষেপে বললাম—হ্যাঁ।

মেয়েটি বলল—আমিও।

—মানে! আপনি একা!

—আপনি কী ভেবেছেন, সঙ্গে কেউ আছে! থাকলে তো কাছেই থাকত।

আমি বেশ অবাক হয়েই মেয়েটির দিকে তাকলাম। এককণ পরে হুশিয়ার থেকে মুক্তি পেলাম। মেয়েটির গান্ধীর্ষের আড়ালে মুহূর্তে হাসির আভাস। বেশভূষা বেশ অভিজাত। চোখে-মুখে যৌবন-স্বলভ স্বাভাবিক চকিল্য। কলকাতার মেয়ে তাই বোধহয় একটু সংকোচের অভাব। দেখে বেশ শিক্ষিত মার্জিত মনে হচ্ছে। মনে 'হল' আজ বেড়াতে আসা সার্থক হোল। এত কাছে বসে গল্প করা ....এ যে স্বপ্নেও ভাবা যায় না। নামটা জিজ্ঞাস করলে তো হয়। হয়তো সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। শেষকালে সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যাবে।

মেয়েটি বলল—অপরিচিত আপনার সাথে কথা বলছি বলে অবাক হয়ে অনেক কিছু ভাবছেন, তাই না?

—না না, সে সব তো কিছু ভাবিনি।

—অনেকক্ষণ একা বসে থেকে এত বিরক্ত লাগছিল। আপনাকে কাছে পেয়ে সেইজন্য সোজাশুজি আলাপ শুরু করলাম। অনেকে এ নিরে অনেক কিছু কুৎসিত সন্দেহ করে বসে। এরা নিজেরা সহজ হতে পারে না, অন্তরেও

হতে দেয় না। আপনিই বলুন একা চুপচাপ এখানে কতক্ষণ বসে থাকতে ভাল লাগে?

—এক মুহূর্ত নয়। সেইজন্তু তো বেশী সময় বসি না।

আচ্ছা আপনার নামটা?

—সুপরিচিতা রায়,—আপনার?

—সুব্রত চট্টোপাধ্যায়।

হুজনেই হেসে উঠি। আবার যেন নতুন করে গল্প শুরু হয়। কত হাসি, কত কথা, মনে হচ্ছিল, সত্যি যেন কত কালের সুপরিচিতা।

সুপরিচিতা বলল—রোজই আসেন?

—নাঃ, অনেকদিন পরে এসাম।

—কেন আসেন না? সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বুঝি?

—না সংসার নেই। এখানে আসলে বড় একা মনে হয়, কিছু ভাল লাগে না।

সুপরিচিতা মাথা নেড়ে বলল—ঠিক বলেছেন। অবসর সময়ে একটু কথা বলার লোক না থাকলে বড় একা মনে হয়। সেইজন্তুই তো নিতান্তই লজ্জাহীনার মত আপনার সাথে আলাপ শুরু করলাম।

এরপর কিছুক্ষণ হুজনেই চুপচাপ। সুপরিচিতা আবার বলল—গুনছেন, কী এত ভাবছেন?

কি সব ভাবছিলাম। মনে হোল অনেক ঘনিষ্ঠ ভাবে বসে আছি। ওর শাড়ীর আঁচল কখন হুজনের মাথের বেকের ব্যবধান ঢেকে ফেলেছে।—বললাম, ভাবছি, আমরা হুজন হুজনের কাছে সহজ হতে পেরেছি। বাস্তবে খুব কমই দেখা যায়।

—সহজ সম্পর্ক তো আজকাল কেউ মেনে নিতে চায় না তাই। তাই শুধু মিথ্যে সন্দেহ আর ব্যবধান। আমরা হুজনে মেনে নিতে পেরেছি বলে হুজন হুজনের কাছে সহজ হতে পেরেছি। সেখানে কোনও খারাপ ইঙ্গিত আসেনি। রাত হয়ে গেল—এবার উঠতে হবে সুব্রতবাবু।

—কোন দিকে যাবেন?

—আমি ঠিক চলে যেতে পারবো; আচ্ছা, নমস্কার।

—বেঞ্চ ছেড়ে উঠে পড়ে সুপরিচিতা।

—তাহলে চলি কেমন? আবার দেখা হবে, নমস্কার। হেসে প্রতি নমস্কার জানালাম।

সুপরিচিতা চলে গেলো। দূরে গাছের ছায়ার কোথায়

যেন হারিয়ে গেল। পেছন ফিরেই হুজন লোকের সঙ্গে মুখোমুখি। কুৎসিত ইঙ্গিত করে হেসে চলে গেল তারা। ভাবলাম, সুপরিচিতা ঠিকই বলেছে—জীবন বড় জটিল হয়ে পড়েছে। এখানে সহজ সরল মধুর সম্পর্কটা কেউ মেনে নিতে পারে না—এমনকি হয়তো কেউ ভাবতেও পারে না।

সংসার পরে করলাম। গেটের কাছে আসতেই সেই অন্ধ ভিক্ষুকটা পুরনো সুরে একটা পরস চাইল। পকেটে হাত দিয়েই, অবাক! মনিব্যাগ নেই! অথচ অল্প আগেও তো ছিল। হাসতে হল। সুপরিচিতার সঙ্গে যখন ঘনিষ্ঠ ভাবে বসেছিলাম তখন একবার মনে হয়েছিল যে, পাঞ্জাবির বা পকেটটার টান পড়ল। কিন্তু তখন তো সুপরিচিতা সন্দেহের অবকাশ রাখেনি।

সকল সৌন্দর্য ও আদর্শ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো। হাত-বড়িতে দেখলাম রাত ৯টা। ইডেনের উত্তান শান্ত। নিজেকে ভীষণ বোকা মনে হল। আজ সন্ধ্যায় বা কিছু ঘটেছে সবই অস্বাভাবিক। তাকেই স্বাভাবিক ভেবে মেতে-ছিলাম। নিজের উপর ঘৃণা জন্মাল। মনটা আরও বিগুণ ব্যথার ভরে উঠল। তবু সান্ত্বনা—মনিব্যাগটা প্রায় শূণ্য ছিল। কিন্তু সু-পরিচিতার এখন সান্ত্বনা কোথায়?

শান্ত ইডেনের দিকে তাকিয়েছিলাম। আপন মনে প্রেম করেছিলাম সুপরিচিতা, তুমি সু-পরিচিতা, না অপরিচিতা।

—

কালিদাস রায়, কবিশেখর সম্পাদিত

## কৃতিবাসী রামায়ণ

হুজ্জ শব্দের পাদটীকা সম্বলিত সচিত্র সংস্করণ। ভাল কাগজে ছাপা। মূল্য ১০ টাকা মাত্র।

শিশির পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা-৬।





৪৬শ বর্ষ

ভাদ্র, ১৩৭৩

৩য় সংখ্যা

সম্পাদকীয়

এ উচ্ছ্বলতার শেষ কোথায় !

আমাদের জাতীয় জীবনে সর্বনাশা-উচ্ছ্বলতার চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। সর্বত্র দেখা যাচ্ছে শৃঙ্খলাবদ্ধতার অভাব ও চরম অসহিষ্ণুতা। জনসাধারণের পুঞ্জীভূত অভাব অসন্তোষ এতদিন যেটা বাক-দেহ ভূপের ভায় চাপা ছিল, এখন সেই বিক্ষোভের আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়েছে।

লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এটা প্রাক-নির্বাচনী কাল। তাই সরকারের বক্তব্য হল, বিরোধী পক্ষ চেষ্টা করছে যেন তেন প্রকারে সরকারকে জনসাধারণের চক্ষে হয় প্রতিপন্ন করা। তাই একের পর এক আন্দোলন, বন্ধ, আত্মহান ইত্যাদির দ্বারা গণ-জীবন বিপর্যস্ত করে দেওয়াই বিরোধীদের উদ্দেশ্য। কিন্তু সমস্তার একটু গভীরে প্রবেশ করলেই বেশ বোঝা যায় যে, সরকারী নিষ্ক্রিয়তা ও অপদার্থতার পূর্ণ

সরকার এক বিপজ্জনক নজীর সৃষ্টি করে চলেছেন যে, রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রকাশের আগে পর্যন্ত কোন সমস্তার প্রতি সরকারী দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। সাধারণ আবেদন-নিবেদন যখন ব্যর্থ হয়, স্বভাবতঃই জনসাধারণকে তখন রাস্তায় নেমে আসতে বাধ্য হতে হয়। এবং সবচেয়ে বিশ্বয়ের বিষয় যে, সমস্তার সমাধান বা দাবি পূরণের ব্যবস্থা তখন আপনা থেকেই হয়ে যায়। সেই বিপজ্জনক নজীর অনুসরণ করে কারখানার কুলি থেকে শুরু করে কেরানী কুল, শিক্ষক, অধ্যাপক ইত্যাদি প্রত্যেকে বিক্ষোভ প্রকাশ করে দাবি আদায়ের সহজ উপায় বেছে নিয়েছেন।

সেই 'ঘেরা ডালো' নীতির সর্বত্র অবাধ প্রয়োগ চলেছে। চরম দাওয়াই এখন যথেষ্ট ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে এর কুফল এখনই দেখা দিয়েছে। কলকাতায়

পরিণত হয়েছে। পালাক্রমে এক এক দল সেখানে পাড়ি জমাচ্ছেন, দাবি আদায় করে তারা আবার অন্য দলকে জায়গা করে দিয়ে যাচ্ছেন। এ-ছাড়া নাকি দাবি আদায়ের আর অন্য কোন উপায় নেই! এ-অসহনীয় অবস্থা সরকারের পক্ষে মোটেই গৌরবের বিষয় নয়।

শিক্ষকেরা এই নীতি অনুসরণ করে দাবি আদায়ের জন্য এখন রাজপথে নেমে এসেছেন। প্রাথমিক শিক্ষকেরা চলে গেছেন। এখন পালা চলেছে মাধ্যমিক শিক্ষকদের। অবশ্যই সব মাধ্যমিক স্কুল বন্ধ। ছাত্ররা ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে, বছরের শুরুতেই নানা হাদামা ও বন্ধু আহ্বানের ফলে বেশ দীর্ঘদিন স্কুলগুলি বন্ধ ছিল। এখন আবার দ্বিতীয় ধাক্কার স্কুলগুলি বন্ধ হল। এর ফলে লেখাপড়া সব পণ্ড হতে বসেছে।

শিক্ষকদের দাবি জাতীয় দাবি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আপামর জনসাধারণের প্রত্যেকেরই এ-দাবি নীতিগত ভাবে সমর্থন জানাবেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আজকের এই ছাত্র-উচ্ছ্বাসভার যুগে শিক্ষকেরা এ কোন্ বিপজ্জনক উপায় অবলম্বন করেছেন! আর সরকার সেই শিক্ষকদের দাবির কি বিবেচনা করছেন?

পিতা-মাতা ও শিক্ষক, এঁরাই হলেন ছাত্রদের আদর্শ স্থানীয়। এঁরা যদি আদর্শ-চ্যুত হন, তাহলে ছাত্রদের সম্মুখে আর কি আদর্শের লক্ষ্য থাকবে? শিক্ষক-অধ্যাপক আজ সবাইকেই ন্যূনতম বাঁচার দাবি আদায় করতে বাস্তব নেমে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে বাধ্য হতে হয়েছে। এর ফলে তাঁদের যতটা মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে তার চেয়েও বেশী মর্যাদা হানি হয়েছে আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের। আজকের সর্বত্র যে সমাজ-শৃঙ্খলার বন্ধন শিথিল হয়ে গেছে, তার মূল কারণ এখানেই নিহিত রয়েছে।

ছাত্রেরা জাতির ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যৎ গঠনের মহান কাজে যারা ব্যাপৃত আছেন, তাঁদেরও একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। কিন্তু সেই দায়িত্ব আজ অবহেলিত। তার অবশ্রুভাবী ফলস্বরূপ জাতীয় জীবনে দেখা দিয়েছে গণ-উচ্ছ্বাসভা। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানেই আজ ছাত্রদের উচ্ছ্বাসভা একটা সমস্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় 'কামি' ও 'কাঙ্গি'র ছাত্ররা এবং কম্যুনিষ্ট চীনে 'রেড গার্ড'-এর ছাত্ররা তাদের নিজদেশের দেশে একটা সজ্জাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে চলেছে। আমাদের দেশে সেই ছুঁইটনার দিন বোধহয় এগিয়ে এসেছে।

## কড়ি

কুমারী রেখারানী দাশ

(১)

অতি আশা সর্বনাশা, সুখভোগ মেকি!  
জীবনের যত দুঃখ শোক,  
সঙ্কানের খুলে দেয় চোখ,  
লোভের অন্তর ভরা, অতি বড়ো ফাঁকি ॥

(২)

আপনারে বড়ো ভেবে  
সবাকারে করি অবহেলা,  
ব্যথা পেয়ে কাঁদে ভগবান।

মূলধন বেড়ে ক্ষুদে,

প্রত্যাহের সাথে ফিরে, আনে  
নিত্য নব শেল, অপমান ॥

(৩)

সত্য মিথ্যা উভয়েই ধর্ম বিপরীত,  
আলো-অন্ধকার সম হিত ও গহিত।  
সত্য প্রত্যাহের দ্বারে পরম আশ্রয়,  
মিথ্যার ছর্ব্বহ বোকা বাড়ায় বিপদ ॥



## রঙ্গ চিত্র



মনোভাব মোটেই পালটায় নিঃ

# মুহূর্তের জগৎ

## সংক্ষিপ্ত

যে দেশে অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা কম, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও প্রমোদ পরিবেশের মাধ্যম হিসাবে সে-সব দেশে বেতার এবং ছায়াচিত্রের প্রভাব নিঃসন্দেহে খুব বেশী। এ-দুটি মাধ্যমের বিষয়-সূচী ও তা প্রচারের ধারা তাই সর্বতোভাবে নিখুঁত এবং সবদু রচিত হওয়া দরকার।

হিন্দী ছায়াচিত্র সম্পর্কে এ-কথা না বলে উপায় নেই যে, আমাদের দেশে এই শক্তিশালী মাধ্যমটি অনেক সময়ই ঐ প্রয়োজনীয় কথা স্বরণে রেখে ব্যবহার করা হয় না। এ-কথা কেউ বলবেন না যে, ছবি শুধু মূল শিক্ষা ও হিতোপদেশ দেবার জগ্গেই তৈরি হবে; কিন্তু প্রেম, গ্রোভভেদার ও ফটিনটি নিয়ে যে ছবি তৈরি হয়, তা আয়ত্বিক বৈকল্যের স্তরকে স্পর্শ করলে তা আর আর্ট থাকে না। এ-কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, হিন্দী ফিল্ম দেশের তরুণ-তরুণীদের কুরুচি শেখাচ্ছে; আর তারা উচ্ছৃঙ্খল, বেয়াড়া ও বাউণ্ডুল হবার প্রেরণা পাচ্ছে এ থেকে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে হিন্দী ছবির অসুন্নত রুচি ও তরুণ সমাজে তার প্রভাব সঙ্ক্ষে এক বে-সরকারী প্রস্তাব উত্থাপন করে শ্রীযতীন চক্রবর্তী এই সব ছবির প্রদর্শন বন্ধ করার দাবি তুলেন। শ্রম-মন্ত্রী শ্রীনাহার সহ অনেকেই এ-বক্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। প্রস্তাবটি শেষ পর্বত প্রত্যাখ্যত হলেও শ্রম-মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে, বাংলার সমস্ত প্রেক্ষাগৃহেই বাতে আবশ্যিকভাবে অশ্লীল ছবির সঙ্গে বাংলা ছবি নিয়মিত দেখানো হয় এবং বাংলা দেশেই বাতে রুচি সম্পন্ন হিন্দী ছবি দেখানো হয়, সে বিষয়ে সরকার দৃষ্টি দেবেন।

ফিল্ম ছনিয়ার কর্তৃত্বের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর তুলে। এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের, তবে রাজ্য সরকারসমূহ তাঁদের বক্তব্য যথাযথভাবে পেশ করতে পারেন।

প্রত্যেক ছায়াচিত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের পূর্বে সেন্সার বোর্ডের অনুমতি-প্রাপ্ত হতে হয়। কিন্তু আধুনিক হিন্দী ছবির এতদূর রুচি বিগর্হিত রূপ দেখে স্বতঃই এই

প্রশ্ন মনে জাগে যে সেন্সার বোর্ডের কর্তাদের বিচারের মান কোথায় এসে পৌঁছেছে?

\* \* \*

সমস্ত আমাদের হাজারো রকমের আছে ঠিকই, কিন্তু তা' সমাধানের জগ্গ আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গী হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা' মোটেই নেই। সেইজগ্গই জনসাধারণের মধ্যে এত বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে। উপর তলার কর্তাদের অনুসৃত নীতি ও তাদের কর্তব্যপরায়ণতা সাধারণ মানুষের মনে হতাশার সঞ্চার করেছে। এই কারণেই বছরের পর বছর পার হয়ে যায়, কিন্তু সমস্তার রূপ প্রায় একই থেকে যায়।

লোকসভার ডাঃ রামমোহন লোহিয়া সরকারের বিরুদ্ধে চাল অদৃষ্ট হওয়াব এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনেছেন। এর সঙ্গে ৪টি মন্ত্রী দণ্ডের জড়িত এবং একজন মন্ত্রী বড়বস্ত্র চাপা দেন এরূপ অভিযোগ আরও হতবুদ্ধিকর। ১৯৬২ সালে ভারত সরকার প্রায়ই দেখতেন যে, ব্রাহ্মের বন্দরে বোঝাই করা চাল ভারতীয় বন্দরে নামানো হলে তা ওজন কম হয়ে যায়। প্রকাশ, জাহাজ কোম্পানী এই ব্যাপারে মোটা খেপারতের হাত থেকে বেহাই পাওয়ার জগ্গ তাঁদের বিভিন্ন জাহাজের ক্যাপ্টেনদের নির্দেশ দেন যে, তাঁরা যেন তাঁদের জাহাজের পাটাতনের তলায় অনেকগুলি খালি চটের বস্ত্র রেখে দেন। এই সব পলের উপরে যেন বর্মী চটের বস্ত্রের মতো ছাপ বা মার্ক মারা থাকে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার ও শিপিং লাইনস্-এর মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বস্ত্রের সঠিক সংখ্যা ডেলিভারী দেওয়া কোম্পানীর দায়িত্ব, বস্ত্রের মালের পরিমাণ তাঁদের জানার দরকার নেই। ক্যাপ্টেনদের নিকট এই জাতীয় লেখা চিঠির একখানি ভারত সরকারের হাতে এসে পৌঁছায়।

ডাঃ লোহিয়া এই ধরনের কোন পত্র সরকারের ফাইলে আছে কিনা এবং কোন মন্ত্রী এই সব অপরাধী পোষণ করছেন কিনা, তা সরকারকে খুঁজে বার করার অনুরোধ জানান। ডাঃ লোহিয়া যে রহস্যময় নেপথ্য কাহিনী প্রকাশ করেছেন, তার কিছু অংশও যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের খাণ্ড সঙ্কট বুঝাবে কে?



# মোনালিসা

কৃষ্ণদাস মণ্ডল

একক তানের মধুর মূর্ছনার জেগেছিল একটি হাসি।  
ঠিক যেন মোনালিসার দীপ্ত  
চোখের চাহনিতে বেঁধেছিল  
একটি প্রাণের ফাঁসি।

অলক ওজ্জ্বল কঙ্কনখানি মেলেছিল ললাটভূমি।  
শুভ্র চেলির বাধা মানে না  
উচ্ছল যৌবনের রাশি,  
ক্ষুরিত অধরের মৌন হাসি।

চিকন সোনার, শরৎ হাসির শাস্তির নীড়ে  
সংযতহীন অকারণ হাসির  
উদ্দামতায় জেগেছিল  
একটি প্রেম ধীরে।

বলেছিলেন, হাসো তো মোনালিসা,  
শিশিরে সিক্ত তুণের মত,  
জ্যোৎস্না পরিপ্লুতা রাত্রির মত  
যেখানে পাই না দিশা।

দীঘল চোখের অমল মাগা একটুখানি চাওয়া  
ভ্রান্তিতে তরা এ জীবন শুধু  
তোমারেই দিয়েছি  
ওগো সন্ধ্যা শিশিরে হাওয়া।

ছুটি উচ্ছল যৌবনের বিকশিত বাঁধন হারা উম্মি।  
মনের গোপনে আনে কামনার বহি,  
নিবৃত্তির শীতল বারিধারা—  
যেন ছদ্মবেশী বর্মি।

সুলেখা  
ঐতিহ্য

দেশে ও বিদেশে সমান প্রিয়...।

**সুলেখা**

ফাউন্টেন পেন-এর কালি

এই সব রঙে পাবেন :

ব্লু ব্ল্যাক • রয়াল ব্লু • ব্ল্যাক  
রেড • গ্রীন • ভায়োলেট

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ

সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২



# অলৌকিক রহস্য

# সত্য ঘটনা

জড় জগতের পরিবেশ ও আকর্ষণময়ী আলোক মণ্ডল

চক্রের অভিজ্ঞতা

আট

মিস আর: এফ. নামে একটি রমণী মাঝে মাঝে ভয়ানক উত্তেজিত হ'য়ে উঠতেন এবং ঘর থেকে পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে যেতেন। তাঁকে আমাদের পরীক্ষাগারে আনা হয় এবং পরীক্ষাগারে প্রবেশ করবার পর তাঁর উন্মত্ততার এবং উত্তেজনার ভাব অনেকটা শান্ত হয়।

একজন মিডিয়ামকে ধরে রইলেন, কারণ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মিডিয়াম ছুটে পালাবার উপক্রম করছিলেন। সংঘত হবার পর মিডিয়াম জুঁকভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ডাক্তার: আপনি বলবেন না?

প্রেতাঙ্গা: না।

ডাক্তার: কোথায় যেতে চাইছেন?

প্রেতাঙ্গা: ঘরে।

ডাক্তার: ঘর। কোথায় আপনার ঘর?

প্রেতাঙ্গা: সেই ত খুঁজছি, তাইত—(মুক্তিলাভের জন্ত প্রচেষ্টা)।

ডাক্তার: কোথায় আপনি যাবেন বলুন, আপনার কোন ঘর নেই।

প্রেতাঙ্গা: আমি এখানে থাকতে চাই না। আমি যাবই—

ডাক্তার: কতদিন হ'ল আপনি মারা গেছেন?

প্রেতাঙ্গা: আমি মারা যাই নি—আমি চলে যাচ্ছি। ওই ভয়ানক জিনিসগুলো আমাকে দেওয়া আমি মোটেই পছন্দ করি না, গা আলা ক'রে, (কুগিলীকে প্রদত্ত ইলেকট্রিক চিকিৎসা)। হ' হ'বার আমি পালাবার চেষ্টা করেও পারি নি—আমাকে ধরে আনা হয়েছে।

ডাক্তার: আপনি স্ত্রীলোকটির চুলগুলো কাটিয়ে

ফেললেন কেন?

প্রেতাঙ্গা: আমি অপরের চুল কাটাই নি ত। এটা আমার নিজের দেহ। আমার ইচ্ছে হ'লে আমি আমার চুল কাটব না, বলতে চান? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুমিয়ে উঠে দেখি যে ইয়া বড় বড় চুল মাথায় গজিয়ে উঠেছে—অনেককণ ঘুমিয়ে ছিলাম তাই বোধহয় মেয়েমানুষের মত লম্বা চুল মাথায় গজিয়ে উঠেছিল। আমি ত আর মেয়েমানুষ নই যে অত বড় চুল মাথায় রাখব। অত বড় বড় চুল নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে নাপিতের দোকানে যেতে আমার লজ্জা করল, তাই নিজেই চুলগুলো কেটে ফেললাম।

ডাক্তার: জানেন, আপনি আপনার নিজের চুল কাটেন নি—ওগুলো যে মহিলাটির উপর আপনি ভর করেছিলেন তাঁর চুল।

প্রেতাঙ্গা: ওগুলো আমার মাথার চুল। আমাকে এভাবে এখানে ধরে রাখার মানে কি? আমি ত আপনাদের কাণ্ড কিছু করি নি।

ডাক্তার: আপনি একজন মহিলাকে বহু যন্ত্রণা দিয়েছেন। আচ্ছা, আপনি বলছেন যে আপনি পুরুষমানুষ; কিন্তু আপনার পরিধানে নারীর বেশ কেন বলতে পারেন?

প্রেতাঙ্গা: পুরুষের পরিচ্ছদ আমি পেলাম না, তাই—

ডাক্তার: এই ব্যাপারেই আপনার ধারণা করা উচিত নয় কি যে, আপনার মধ্যে কিছু একটা ঘটেছে।

প্রেতাঙ্গা: বলতে পারি?

ডাক্তার: ইয়া স্বচ্ছন্দে। তবে শান্ত হয়ে বলতে হবে।

প্রেতাঙ্গা: আমি এখানে থাকতে চাই না। আমি বাড়ী যাচ্ছি—

ডাক্তার: আপনি যদি স্থির হয়ে বলেন এবং আমার কথা শোনেন, তা'হলে সব আপনাকে বুঝিয়ে দেব। ইয়া,



আপনি মৃত, বুঝলেন—

প্রেতায়া : না আমি মৃত নই। ছেড়ে দিন আমাকে, এখনই আপনাকে দেখিয়ে দেব আমি কি—

ডাক্তার : আমি ত আপনাকে ধরে নেই, আমি আমার স্ত্রীকে ধরে আছি। আপনার অবস্থা বড় বিচিত্র। আপনি দেহত্যাগ করেছেন, কিন্তু সেই অবস্থাটাকেই আপনি উপলব্ধি করতে পারছেন না।

প্রেতায়া : আমার হাত ছেড়ে দিন।

ডাক্তার : আমি আমার স্ত্রীর হাত ধরে আছি, আপনার নয়।

প্রেতায়া : আপনার স্ত্রীর হাত! কি পাগলের মত বকছেন। আমি আপনার স্ত্রী নই। পুরুষ পুরুষকে বিয়ে করে বলে আপনি মনে করেন নাকি? এ-রকম কথা ত আমি কখনো শুনি নি।

ডাক্তার : যা বলছি তা' সত্যি কথা। আপনি একজন অজ্ঞ প্রেতায়া, নিজের অবস্থা সধকে আপনার কোন ধারণা নেই।

প্রেতায়া : ছেড়ে দিন আমাকে, যেতে দিন।

ডাক্তার : মৃত্যুর পর মানুষের কি হয় সে সধকে কোন দিন কিছু চিন্তা করেছেন কি?

প্রেতায়া : আমি ত মারা যাইনি। আমি শুধু ঘুমিয়েছিলাম।

ডাক্তার : হ্যাঁ, ওইটাই 'মৃত্যুর ঘুমঘোর' (That was the sleep of death)।

প্রেতায়া : যদি আমি মারা যেতাম, তা'হলে ত আমি শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত কবরেই থাকতাম।

ডাক্তার : ওটা আপনার ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাস। আপনি জীবন-রহস্য উপলব্ধি করতে পারেন নি।

প্রেতায়া : আমি শিখেছিলাম যে মৃত্যুর পর ভগবানে বিশ্বাস থাকলে আমি স্বর্গে যাব।

ডাক্তার : তা'হলে মৃত্যুর পর আপনি স্বর্গে গেলেন না কেন? যাই হোক, শুনুন, আপনার জড়-দেহের সমাপ্তি ঘটেছে—জড়-জগতের দিক থেকে আপনি মৃত। আপনি এখানে রয়েছেন, কিন্তু আমরা কেউ আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না—আমি আমার স্ত্রীর দেহকেই শুধু দেখতে পাচ্ছি।

প্রেতায়া : আমি আপনার স্ত্রীকে কখনও দেখি নি, তাকে আমি চিনি না, জানি না।

ডাক্তার : আপনি 'মিডিয়ামের' কথা কখনও শুনেছেন কি?

প্রেতায়া : হ্যাঁ, শুনেছি বটে। কিন্তু ওতে আমার বিশ্বাস নেই।

ডাক্তার : আপনি একজন মিডিয়ামের মধ্য দিয়ে কথা বলছেন, বুঝলেন।

প্রেতায়া : মিথ্যে কথা, ডাঃ মিথ্যে কথা।

ডাক্তার : মিথ্যে নয়, সত্যি। দেখতে পাচ্ছেন না আপনার দেহে নারীর পরিচ্ছদ। আপনার বোঝা উচিত যে, নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যাপার এর মধ্যে আছে। আপনি বোধহয় জানেন না যে, আপনি ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলসে রয়েছেন?

প্রেতায়া : না, জানি না। আমি কিছুদিন ধরে খালি ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ডাক্তার : আপনার হাত দু'টি দেখুন ত। ওগুলো কি আপনার নিজের বলে মনে হয়? আপনি একজন স্ত্রীলোককে আশ্রয় ক'রে তাকে কষ্ট দিচ্ছিলেন, বুঝলেন?

প্রেতায়া : আমার কি হয়েছে? আমার মনে হচ্ছে আমার চারপাশে বেশ ভিড় জমে রয়েছে।

ডাক্তার : দেখুন, আমার মনে হয় আপনি বেশ বিরাটকার ছিলেন। সেইজন্য ক্ষুদ্র একটি দেহের উপর আশ্রয় গ্রহণ ক'রে, আপনার খুব ভার বোধ হচ্ছে। আচ্ছা আপনি খোলা মনে সব বিষয়টি ভেবে দেখবার চেষ্টা করছেন না কেন? মনে হচ্ছে বহুদিন হ'ল আপনি দেহত্যাগ করেছেন। আচ্ছা এটা কোন সাল বলতে পারেন?

প্রেতায়া : আমি বহুক্ষণ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম, সেইজন্য বলতে পারব না।

ডাক্তার : আচ্ছা আপনার বর্তমান অবস্থা আপনাকে নানা বিষয় জানবার জন্য আগ্রহান্বিত করছে না? আপনাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, খালি আপনার কথা শুনে পাচ্ছি, বুঝলেন।

প্রেতায়া : যাকে দেখতে পাচ্ছেন না, তার সঙ্গে কথা বলবার কি মানে হয়?

ডাক্তার : এই মহিলাটি একজন মিডিয়াম। এর মধ্য দিয়েই আপনি কথা বলছেন।

প্রেতাঙ্গী : আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি না।

ডাক্তার : আপনি একটি ধারণাশক্তিহীন অজ্ঞ প্রেতাঙ্গী। যে স্ত্রীলোকটিকে আপনি ইতিপূর্বে ভর করেছিলেন, তাঁর দেহাত্ম প্রেতাঙ্গী-আশ্রয়ের অন্তর্কূল। আপনার প্রভাবেই সেই স্ত্রীলোকটি নানা পাগলামি করেছে। এসব কাজগুলোকে আপনার কি মনে হয়?

প্রেতাঙ্গী : আমি বলতে চাই না যে ওগুলো ভাল কাজ। তবে আমি ত কোন স্ত্রীলোককে জানি না—

ডাক্তার : আপনিই সেই স্ত্রীলোকটিকে তার চুল কাটতে এবং ছুটে পালাতে বাধ্য করেছিলেন।

প্রেতাঙ্গী : কেন কাটব না বলুন? ঘুম ভেঙেই দেখলাম যে মাথায় বড় বড় চুল গজিয়ে উঠেছে, সেইজন্মেই ওগুলো কেটে ফেললাম।

ডাক্তার : কিন্তু ওগুলো সেই মহিলার কেশরাশি।

প্রেতাঙ্গী : কিন্তু ওগুলো যে বড় বড় হয়ে উঠেছিল।

ডাক্তার : সে ত আপনার দেখবার কথা নয়, সেটা তাঁর নিজের ব্যাপার। ধরুন, কেউ যদি আপনার নিজের চুলগুলো কেটে দেয়, তবে আপনার কেমন লাগবে? আচ্ছা, আপনার কি নিজেকে একটু স্বার্থপর বলে মনে হয় না?

প্রেতাঙ্গী : জানি না। আপনি যে বললেন আমি মরে গেছি, কিন্তু যদি মরেই গেছি, তা'হলে আমি স্বর্গে বা নরকে কোথাও গেলাম না কেন?

ডাক্তার : স্বর্গ বা নরক বলে কোন কিছু নেই।

প্রেতাঙ্গী : জীৱন বা শরতান কই কাকেও ত দেখলাম না। তবে আপনি বলবেন যে আমি মরে গেছি।

ডাক্তার : আপনি ত মরে যান নি।

প্রেতাঙ্গী : একটু আগেই ত আপনি তাই বললেন।

ডাক্তার : জড়-জগতের কাছে আপনি মৃত, ( You are dead to the world ) কারণ, আপনি আপনার জড়-দেহটাকেই শুধু হারিয়েছেন।

প্রেতাঙ্গী : অতশত জানি না। আপনিই ত বললেন যে আমি নাকি মারা গেছি।

ডাক্তার : দেখুন, যদি সব ব্যাপারটা ধৈর্য সহকারে

উপলব্ধি করতে চেষ্টা না করেন, তা'হলে আমরা আপনাকে 'ইলেকট্রিক শক' দিতে বাধ্য হব।

প্রেতাঙ্গী : দেখুন এসব আমি পছন্দ করি না, আমার সর্বাঙ্গ জ্বালা করে। এসব দিয়ে আপনার কি লাভ? আমি যদি ওখানে ( স্ত্রীলোকটির সহিত ) থাকি তাতে আপনার কি ক্ষতিবৃদ্ধি? কেন আমাকে তাড়াতে চাইছেন বলুন ত? স্ত্রীলোকটির দেহ থেকে আমাকে মুক্ত করবার আপনার কোন অধিকার নেই ( You have no right to get me a way from her )।

ডাক্তার : আপনি ওই স্ত্রীলোকটির উপর ভর ক'রে তাকে কষ্ট দেওয়া সমস্ত কাজ বলে মনে করেন?

প্রেতাঙ্গী : কিন্তু মানুষের থাকবার একটা স্থান, একটা অবলম্বন চাইত।

ডাক্তার : যদি আপনার মা'র উপর কোন স্বার্থপর, ছুটে আসার আবির্ভাব হয় এবং তার প্রভাবে আ'নার মা যদি উন্মাদিনীর মত ব্যবহার করেন, তা'হলে কি আপনি সেটাকে ভাল কাজ বলে সমর্থন করবেন?

প্রেতাঙ্গী : আমি পাগল নই, ওই স্ত্রীলোকটিকেও পাগল করি নি।

ডাক্তার : নিজের চুল টেঁচেপুঁচে কেটে ফেলে, ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে যাওয়া পাগলামি নয়?

প্রেতাঙ্গী : আপনি যদি পুরুষ হতেন তাহলে মাথায় বড় বড় চুল গজালে আপনার কেমন লাগত?

ডাক্তার : ওই দেহটি এবং কেশরাশি আপনার নষ্ট, ওটা হচ্ছে ওই মহিলাটির। আপনাকে এখন ওই মহিলাটির দেহ থেকে তাড়ান হয়েছে, এখন আপনার মতি পরিবর্তন হওয়া উচিত। শুধুন, আমার স্ত্রী একজন মিডিয়াম। তিনি মৃত ও অজ্ঞ প্রেতাঙ্গীদের আত্ম-উপলব্ধির জন্ম তাঁর দেহের উপর তাদের আশ্রয় গ্রহণ করান—যেমন এখন আপনি করেছেন। আপনার এই সুবিধাটুকু গ্রহণ ক'রে আত্ম-উপলব্ধি চেষ্টা করা উচিত। প্রেতলোকের অনেক উন্নত আত্মিকেরা এখানে রয়েছেন, আপনি আগ্রহান্বিত হলেই তাঁরা আপনাকে পরলোকে নিয়ে যাবেন। আপনার এখন সব বিষয়টা উপলব্ধি করবার জন্ম সচেষ্ট হওয়া উচিত।

প্রেতাঙ্গী : আমাকে কি করতে হবে?



ডাক্তার : পরলোক ( Spirit-world ) অতিব সমৃদ্ধে অবহিত হোন এবং সেখানে উপনীত হবার চেষ্টা করুন।

প্রেতাশ্বা : পরলোক! মানে স্বর্গ এই কথা বলছেন ত? ( You mean 'Heaven' )

ডাক্তার : মানুষের মনের মধ্যেই স্বর্গ-রাজ্য।

প্রেতাশ্বা : প্রভু খ্রীস্ট আপনার পাপের জন্তই প্রাণদান করেছিলেন, একথা কি আপনি বিশ্বাস করেন না? ( Don't you believe that Christ died for your Sins? )

ডাক্তার : এই বিশ্বাসের মধ্যে একটা কিছু অভাব আছে বলে আপনার মনে হয় না? প্রভু খ্রীস্ট আমাদের জীবনকে উপলব্ধি করবার উপদেশ দিয়ে গেছেন—কারও পাপের জন্ত তিনি প্রাণদান করেন নি ( He did not die for the Sins of any one )। যারা একথা অন্ধভাষা বিশ্বাস করে, তারা প্রভু খ্রীস্টের শিক্ষার মর্মগ্রহণ করতে পারে নি। এ-রকম ধারণা ঈশ্বরোপলব্ধির পক্ষে কৃতিকর।

যাই হোক, বন্ধু এখন আপনি আমার জীকে ত্যাগ করুন। সেই মহিলাটিকেও আপনাকে ত্যাগ করতে হবে। যদি না করেন, তা'হলে আপনাকে অন্ধকারে রেখে দিতে আমরা বাধ্য হব।

প্রেতাশ্বা : ঈশ্বর তাঁর অতিপ্রায় অনুযায়ী আমার প্রতি ব্যবহার করবেন, এইটাই কি সম্ভব নয়? আমি ঈশ্বরোপলব্ধি, সেখানে প্রভুর অর্থ সাহায্য করতাম এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম। তারা বলত ( সম্ভবতঃ ধর্মবাক্যেরা ) যে অর্থ সাহায্য না করলে, আমি মৃত্যুর পর স্বর্গে যেতে পারব না, নরকেই পড়ে মরব।

ডাক্তার : প্রভু খ্রীস্ট কি বলেছেন? তিনি বলেছেন, 'God is spirit and they that worship him, must worship him in spirit and truth'. স্বর্গ, স্বর্গ বলে চীৎকার করছেন, আসলে স্বর্গটা কি? স্বর্গ হচ্ছে আপনার উন্নত মনের উচ্চ অনুভূতির অবস্থা।

প্রেতাশ্বা : কেন স্বর্গ কি একটা মনোরম স্থান নয়? কেন বাইবেলে লেখা আছে যে, স্বর্গের সকল পথই সোনা দিয়ে মোড়া।

ডাক্তার : জীবনের বৃহৎ সত্যের অনেক প্রতীকময়

আখ্যান বাইবেলে আছে।

প্রেতাশ্বা : একটু আগে আপনি বলেছেন যে প্রভু খ্রীস্ট আমাদের পাপের জন্ত প্রাণদান করেন নি। তা'হলে আপনি কি বিশ্বাস করেন?

ডাক্তার : জড়-জগতের আমরা সবাই জড়-দেহধারী অমর আত্মা। পরিপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে যখন আমরা জড়-দেহ ত্যাগ করি, তখন আমাদের আর অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে হয় না—আমাদের আত্ম-দৃষ্টি উন্মুক্ত হয়, উন্নত আত্মিকদের সাহায্যে তখন আমরা পরলোকে প্রবেশ করি। আপনারও এমন করেকজন বন্ধু এখানে নিশ্চয়ই আছেন। আচ্ছা, আপনার কোন পরিবর্তন হয়েছে, এটা আপনি এখনও কি উপলব্ধি করতে পারছেন না?

প্রেতাশ্বা : আগেকার চেয়ে এখন আমি অনেক বেশী কথা বলতে পারছি। আপনি বললেন না যে আমি আপনার জীবন মধ্য দিয়ে কথা কইছি, কিন্তু এটা কি ক'রে সম্ভব? আপনার জীবন মধ্য দিয়ে আমি কি ক'রে কথা বলতে পারি?

ডাক্তার : আমার জীবী একজন মিডিয়াম—তাঁর মধ্য দিয়ে প্রেতাশ্বারা কথা বলতে পারে। উন্নত ও বিচক্ষণ আত্মিকেরা আপনার সাহায্যের জন্তই আপনাকে এখানে এনেছেন ও আমার জীবী উপর ভর করিয়েছেন।

প্রেতাশ্বা : আমার এবার বেশ চমৎকার লাগছে, সব কিছুই কেমন বেন ভাল লাগছে।

ডাক্তার : পরলোকের মাধুর্যমণ্ডিত অবস্থার উপলব্ধি হ'লে, আরও আনন্দ অনুভব করবেন। আপনার নামটি কি, এবার বলুন।

প্রেতাশ্বা : এডওয়ার্ড।

ডাক্তার : এডওয়ার্ড কি?

প্রেতাশ্বা : জানি না।

ডাক্তার : কোথায় আপনি বাস করতেন? আপনি এখন ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলসে তা'জামেন কি? এটা কোন সাল বলতে পারেন?

প্রেতাশ্বা : বলতে পারছি না।

ডাক্তার : কেন বলতে পারছেন না?

প্রেতাশ্বা : আমার স্মরণ-শক্তি নেই। আমি চিন্তা করতে পারছি না।

ডাক্তার : এর কারণ কি জানেন ? এর কারণ হচ্ছে যে আপনি বহুদিন অন্ধকারে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং তারপর ওই মহিলাটির দেহালোক ( Aura ) দেখে তাতে জড়িয়ে থেকে মহিলাটির উপর আশ্রয় করেছেন ।

প্রেভাতা : আমি সুন্দর, শান্তিময় একটি আশ্রয় চেয়েছিলাম ।

ডাক্তার : যে কাজ আপনি করেছেন সেটা কি ভাল কাজ ?

প্রেভাতা : অন্ধকারে ঘুরতে ঘুরতে যদি আপনি আলো দেখতে পান, তা'হলে কি সেখানে আপনার থাকতে ইচ্ছা করে না ?

ডাক্তার : ওই আলো কিন্তু প্রকৃত আলো নয় । প্রকৃত আলো হচ্ছে জ্ঞানের আলো—পরলোক সম্বন্ধে জ্ঞানের আলোই আপনার প্রয়োজন, বুঝলেন ।

প্রেভাতা : তা'হলে কি আপনি বলেন যে আমি পুনরায় চার্চে গিয়ে বাইবেল পাঠ এবং ভজনা শুরু করব ।

ডাক্তার : বাইবেল রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে কোনদিন কিছু জানবার চেষ্টা করেছেন কি ?

প্রেভাতা : 'বাইবেল' ঈশ্বরের প্রেরণায় লিখিত পুস্তক ( It was God's inspired book ) ।

ডাক্তার : ঈশ্বর বাইবেল রচনা করেন মি, মানুষই বাইবেল রচনা করেছে ( God did not write the Bible, the book is man-made ) ।

প্রেভাতা : বাইবেলের রচয়িতা কে ?

ডাক্তার : কাল্পনিক স্বর্গ ও নরকের আতঙ্কের মধ্যে মানুষকে বন্দী ক'রে রাখবার জন্য বাইবেল যুগে যুগে বিভিন্ন সূত্রে গ্রথিত ক'রে রচিত হয়েছে—বাইবেল ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, রূপক এবং সত্য ও বৈপরীত্যের ( Of contradictions and truths ) চরনিকা ।

কিন্তু মানুষ বিশ্বাস করে যে বাইবেলের প্রতিটি কথা ঈশ্বরের নিজের মুখের কথা এবং সেই কারণেই অন্তর্নিহিত অর্থ অপেক্ষা শব্দার্থের উপর আস্থা স্থাপন করবার প্রবৃত্তি মানুষের খুবই প্রবল—এর ফলেই প্রকৃত সত্য-উপলব্ধি হয় না ।

ধর্ম মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান, সাময়িক উদ্ভবমুখীতার মধ্যে, সত্যোপলব্ধির মধ্যেই ধর্মার্থের সার্থকতা ।

প্রভু যীশুর উপদেশের মধ্যে সেই বৃহৎ-সত্যের বাণীই নিহিত, কিন্তু চার্চে প্রভু যীশুর উপদেশের মধ্যে রূপক-গুলিকেই ঐতিহাসিক ও বাস্তব বলে শিক্ষা দেওয়া হয় ও তার ফলেই উপদেশের আধ্যাত্মিক মর্মবাণী অপেক্ষা, অন্ধ-বিশ্বাস ও ধারণাই লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করে ।

প্রেভাতা : ঈশ্বর ছ' দিনে এই পৃথিবী তৈরী ক'রে সাত দিনের দিন বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন, একথা কি আপনি বিশ্বাস করেন না ?

ডাক্তার : না, ওটা হচ্ছে রূপক-কাহিনী । সাত দিন হচ্ছে প্রকৃতির সাতটি গুণের প্রতীক । ঈশ্বর স্বয়ং স্রষ্টা ও সৃষ্টি দুইই—( God is at once the creator and creation ), ঈশ্বর যদি বিশ্রাম গ্রহণ করেন, তা'হলে ত তাঁর সৃষ্টিই ত্তক হয়ে যাবে । জীবনকে প্রকৃত সত্যের আলোর আমাদের চেনা ও জানা দরকার—কোন বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নয় ।

বাই হোক, অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে, আপনি আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবেন না । দেখুন ত আপনার পরিচিত কেউ এসেছেন কিনা ?

প্রেভাতা : আমার মা'কে দেখছি । আমার মা বহু-কাল আগে মারা গেছেন, এখন আমি নিতান্তই ছেলে-মানুষ ।

ডাক্তার : উনি আপনাকে সাহায্য করবেন—ওঁর কথা শুনুন ।

প্রেভাতা : মা, তুমি আমাকে নিয়ে যাবে ? সত্যিই নিয়ে যাবে ? তাই ভাল মা, আমার নিয়ে চল—আমি বড় ক্লান্ত, বড় শ্রান্ত ।

ডাক্তার : উনি নিশ্চয়ই আপনাকে নিয়ে যাবেন, কিন্তু আপনাকে আপনার সব তথাকথিত অন্ধধারণা ও বিশ্বাস-গুলোকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হবে, বুঝলেন ।

প্রেভাতা : ( উঠে পড়ে ) আমাকে যেতে দিন ( Let me go ) ।

ডাক্তার : আপনি আপনার মা'র সঙ্গে যাচ্ছেন এই চিন্তা করতে হবে । এই দেহ আমার জীব, এই দেহকে আপনি মিরে যেতে পারেন না । আপনি ভাবতে থাকুন যে মার সঙ্গে চলে যাচ্ছেন, তা'হলেই মা'র সঙ্গে যেতে পারবেন ।



প্রেতাঙ্গী : আমি বড় শ্রান্ত, বড় অবসন্ন। আমি মা'র সঙ্গে চলে যেতে চাই। ওই যে মা আবার আসছেন, একটু আগে উনি এখান থেকে কিছুক্ষণের জন্য চলে গিয়েছিলেন।

ডাক্তার : যান মা'র সঙ্গে চলে যান। ঈশ্বর আপনাকে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়েছেন, সেই বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণায় আপনি বিবেচক ও চিন্তাশীল হবেন—মা ও অপরের প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণ করবেন, বুঝলেন।

প্রেতাঙ্গী : মা বলছেন যে আপনার কাছে প্রথমে খুব রুঢ় ব্যবহার করবার জন্য আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। সেই স্ত্রীলোকটিকে বহুগা দেবার জন্য, মা আমাকে তাঁর কাছেও ক্ষমা চাইতে বলছেন।

ডাক্তার : আচ্ছা কোথা থেকে আপনি এগেছেন, তা' আপনার স্মরণে আছে কি ?

প্রেতাঙ্গী : ঠিক মনে করতে পারছি না।

ডাক্তার : এটা কোন সাল ব'লে আপনার মনে হয় ?

প্রেতাঙ্গী : ষোড়শ ১৯০১ সাল।

ডাক্তার : উনিশ বছর আগে ওই সাল ছিল। আচ্ছা এখন প্রেসিডেন্ট কে ?

প্রেতাঙ্গী : ম্যাকিনলি (McKinley)।

ডাক্তার : তিনি ১৯০১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর গুলি-বিদ্ধ হ'ন এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর মারা যান। এখন ১৯২০ সাল।

প্রেতাঙ্গী : তা'হলে এতদিন ধরে আমি কি কর-ছিলাম ? ঘুমাছিলাম নাকি ? ১৯০১ সালের শীতকালে আমার খুব অসুখ হয়—তারপর কিছু আর আমার মনে পড়ছে না। ষষ্ঠমাসের কাছাকাছি সময়ে আমার খুব ঠাণ্ডা লেগে ডায়ানক অসুখ হয়, এটা আমার বেশ মনে আছে।

ডাক্তার : আপনার অসুখের সময় আপনি কোথায় ছিলেন ?

প্রেতাঙ্গী : আমি বসে কাজ করছিলাম। আমি লুয়ারিং নগরে বাস করতাম। আমার মনে আছে মাথায় কিসের বেন ঘা পড়েছিল—বাস আর কিছু মনে নেই। আমার মা বলছেন যে আমার নাম ষ্টারলিং।

ডাক্তার : লুয়ারিং-এ আসবার আগে কোথায় ছিলেন, আপনার মাকে জিজ্ঞাসা করুন না।

প্রেতাঙ্গী : মা বলছেন যে, আমি 'আইওয়া' (Iowa)-

তে জন্মগ্রহণ করি। যখন আমি আঁত পাই, তখন আমি উত্তর উইসকনসিনের বনে কাজ করছিলাম—আমি 'Iowa'-তেই প্রায় থাকতাম।

ডাক্তার : বন্ধু, জীবনের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করবার চেষ্টা করুন, জনসেবার কার্যে আত্মনির্মাণ করুন—ধ্বংসের কাজে নয়। আপনি যে স্ত্রীলোকটিকে কষ্ট দিচ্ছিলেন, তিনি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেন নি।

প্রেতাঙ্গী : আমি একাই তাকে কষ্ট দিই নি। আমার মত আরও ছ'জন ছুঁই প্রকৃতির ব্যক্তি ছিল।

ডাক্তার : জীবন-চেতনা লাভ ক'রে স্ত্রীলোকটি যাতে অপর ছ'জন ছুঁই আত্মিকের কবল থেকে মুক্ত হতে পারেন, সে চেষ্টা নিশ্চয়ই করবেন, বুঝলেন।

প্রেতাঙ্গী : চেষ্টা করব। ধন্যবাদ। বিদায়।



# অমর মুহূর্ত

( গল্প )

সুকুমার রায়

বসিরহাট রেলস্টেশনে গাড়ীটা থামতে ভাত্তে উঠে পড়ল প্রদীপ ওরফে পানু। প্রদীপ নাম হলেও পানু বলে ডাকে সকলে। কোণের দিকে খালি একটা সিট পেয়ে বসে পড়ল। সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক। দামী টেরিলিনের জামাটা ভিজ়ে উঠেছে ঘামে—সু্যটের কুঞ্চিত স্তর ভেদ ক'রে স্থানে স্থানে ভেসে উঠেছে ঘামের বিন্দু। রামধনু রঙের রঙীন চশমাটা খুলে সেন্টেড ক্রমাল দিয়ে মুখটা মুছবার সময় কমপার্টমেন্টটা ভাল করে দেখে নিল সে। ও ছাড়া আরও চারজন এই কমপার্টমেন্টে—এক বৃদ্ধ ভক্তলোক, তার স্ত্রী, তার ছোট্ট শিশুপুত্র কেবলমাত্র হাঁটতে শিখেছে আর তবী কাপ্তি, স্ত্রী সুরূপা ষোড়শী কত্তা।

রঙীন চশমাটা পরে নিয়ে বাইরের দিকে তাকাল পানু। যৌবন আকর্ষণ করে রূপকে—রূপ প্রকাশ পায় যৌবনে। আর এই ছোট্টাই হল প্রেমের ধারক—আর এরই অগ্নিঝরা বোম্বাঙ্ক প্রভাব একই যৌবনের ছোট্ট পৃথক সত্তাকে এক করে মিলনের স্বর্গীয় সুধার।

সবাই বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। দৃষ্টি ছিল তাদের পরিবর্তনশীল সৌন্দর্য সন্তোগের দিকে—মন ওদের উপভোগের দিকে। ভেতরের দিকে তাকাল পানু—কিন্তু শিউরে উঠল ভেতরের দৃশ্য দেখে। বাচ্চা ছেলেটা দয়াকর একটা হাতল ধরে ঝুলে পড়েছে বাইরে—একি! হাত ফসকে গেলেই পড়ে যাবে ছেলেটি আর সঙ্গে সঙ্গে নির্ঘাত মৃত্যু। পানু চিৎকার করে ছুটে গেল ছেলেটির দিকে—'একি আপনাদের কোন লক্ষ্য নেই, ছেলেটি প'ড়ে পেল যে।'

সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে সমস্বরে আর্ত চিৎকার করে উঠল বাবা-মা, 'বাঁচাও বাবা বাঁচাও'।

ছুটে গিয়ে পানু বেইমাত্র ধরেছে তখনি ছেলেটি হাত ফসকে পড়ে যাচ্ছিল, অতি কষ্টে পানু ধরে ফেলল ছেলেটিকে।

ছেলেটিকে ধরে পানু উঠে দাঁড়াল, আর সঙ্গে সঙ্গে ওর

থাকলে যে কি হত বাবা,—তোমার শত শত বৎসর পরমায়ু হোক'।

—আপনারা খোকাকে বাঁচানো দেখছেন, এদিকে বেচারী ভয়ে কাঁদতেও পারছে না—পানু খোকাকে ওর মায়ের দিকে ধরে বলে।

মা ছেলেকে বুকে চেপে ধরেন।—আমার সোনা, আমার মানিক, উনি যদি না থাকতেন, তবে কি তোমাকে পেতাম। চোখ জলে ভরে এল তাঁর।

বাবা বললেন—বোস বাবা বোস, তুমি যা উপকার করলে তা কি বলব তোমাকে। তুমি বললাম—কিছু মনে করো না বাবা, তুমি ও আমার সন্তানের মত।

তা ঠিক; তা ছাড়া আপনি বৃদ্ধ, আমি যুবক—বয়সে কি বিরতি পার্থক্য।

একি! মেয়েটি পানুর একেবারে কাছে কখন এসে দাঁড়িয়েছে পানু জানতেই পারেনি—মেয়েটির কথার ও ফিরে তাকাল।—একি আপনার হাত কেটে রক্ত বেরুচ্ছে যে,—পানুকে দেখবার সুযোগ না দিয়ে ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল। সর্বনাশ, রক্তে যে ভেসে যাচ্ছে।

—দেখছিল কি, ক্রমাগত দিয়ে হাতটা বেঁধে দে'না—বাবা বললেন চঞ্চল ভাবে।

পানু হাসতে হাসতে বলে—এর জন্তে আপনারা ব্যস্ত হবেন না, এত সামান্য কেটে গিয়েছে।

—ধায়ুন আপনি—মেয়েটি ধমক দিয়ে বলে—কতোটা কেটে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে আর বলে কিনা ব্যস্ত হবেন না!

—বাঃ বাবা, ভাল—পানু মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে হাসে।

—আবার হাসি আসছে, একটু ব্যথা নেই গায়ে—আঃ হাতটা লম্বা করুন বেঁধে দি—পানুর হাত ধরে টান দিল মেয়েটি।

—হ্যাঁ, আপনার দামী ক্রমাগত রক্ত কাপিয়ে নষ্ট



—যে মহৎ কাজ করতে গিয়ে আপনার হাত কেটে গিয়েছে তার প্রতিদানে এই সামান্য রুমালটাকে ব্যবহার করতে নিষেধ করবেন না। আর আপনার মহৎ কাজের মহত্বকে আর এই অমূল্য মুহূর্তকে চিরদিন প্রত্যক্ষ ভাবে মনে রাখতে আপনার পবিত্র রক্তে রুমালটা রাঙিয়ে নিচ্ছি। জানেন এই রক্তপাতের বিনিময়ে একটা বৃহৎ পরিবারকে রক্তপাতের হাত থেকে বাঁচালেন আপনি। আমাদের বংশের একমাত্র ছেলে ঐটি। ও যদি মারা যেত তবে এই পরিবারকে কেউ বাঁচাতে পারত না। নিজের রুমাল দিয়ে পানুর হাতটা বাঁধতে বাঁধতে মেয়েটি বলল।

পানু পানের দিকে তাকাল। দেখল, মেয়েটির বাবা উঠে অত্নদিকে চলে গেছেন।

—বাবা আসছেন—বলেই মেয়েটা অত্নদিকে চলে গেল।

মালতিপুর ষ্টেশনে গাড়ী থামল। পানু উঠে দাঁড়াল।

—আমি এবার নামব।

—না-না—বাবা ছুটে আসলেন।—তা হয় না, আমাদের বাড়ীতে তোমাকে যেতে হবে।

—কিন্তু—পানু মেয়েটির দিকে তাকাল। কেমন যেন ওর হলহল আঁখি আর অধর প্রান্তে বিদায়ী সূর্যের রক্তিমাতা। চলে যাওয়ার মত দৃঢ় মনোবৃত্তি ওর নষ্ট হয়ে গেল। তবুও পানু বলল একটু থেমে—কিন্তু ওদের যে ষ্টেশনে আসবার কথা ছিল।

—না পোলে চলে যাবে—মেয়েটি নিষ্পৃহ হয়ে বলল।

—কিন্তু—মাথা চুলকে পানু বলে—না, ও ভাল দেখাবে না, ভদ্রতা-বিরুদ্ধ হয়ে যাবে।

—বেশ বুঝলাম। তবে একজনের অনুরোধ উপেক্ষা করে চলে যাওয়া কি ভদ্রতা-বিরুদ্ধ নয়! মেয়েটি ট্রেনের মেঝেতে পা ঘষতে খুঁতে বলে।

—তাত বটে, কিন্তু এ যে উত্তর সংকট। একদিকে ভদ্রতা রক্ষা করতে গেলে অত্নদিকে ভদ্রতা নষ্ট হয়।

—এক্ষেত্রে যদি আপনার আত্মীয়দের ভদ্রতা না রেখে আমাদের ভদ্রতাটা রাখেন তবে কি আপনার খুব অনুবিধা হবে। আর যদি আমি না যেতে দি। আপনি এত বড় উপকার করলেন তার প্রতিদান এবং আমাদের কর্তব্য খাতিরে এখানে আপনাকে নামতে দেব না।—দৃঢ়কণ্ঠে মেয়েটি বলে পানুর মুখের দিকে তাকাল উত্তরের প্রতীক্ষায়।

পানু নীরবে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে।

মামার বাড়ীতে পানুর আর যাওয়া হল না। ওদের সঙ্গে যেতে হল ওকে। পথে যেতে যেতে বৃদ্ধ বললেন—এতক্ষণ ত নানা কথা হল, কিন্তু তোমার পরিচয় কিছু ত পেলাম না বাবা—

—আমার পরিচয়—আড়চোখে পানু মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটি পানুর উত্তর শুনবার জন্তে আগ্রহী হয়ে ওর দিকে তাকিয়েছিল। অমর-কৃষ্ণ চারি চোখে তৃষ্ণার ছায়া পড়ে—মৃদু হাসিতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় ওরা। অত্ন দিকে মুখ ফিরিয়ে পানু বলে—আমার নাম প্রদীপকুমার সিংহ রায়, কিন্তু বন্ধুরা পানু বলে ডাকে। জাতিতে আমরা ব্রাহ্মণ। ওর এই কথার সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মা-মেয়ে চোখে চোখে তাকালেন। পানু ওদের এই পরিবর্তনে কিছু মনে না করে বলে—বাড়ী আমার মেরুদণ্ডী গ্রামে বসিরহাটের উত্তর দিকে।

বৃদ্ধ বললেন—ঐদিকে বাইনি বটে তবে ঐ গ্রামের নাম শুনেছি। ভীষ্মপুত্র রণসাইয়ের বাড়ী ত ওখানে। বড় ভাল লোক উনি।

বৃদ্ধের বাড়ী চাঁপাপুকুর। চাঁপাপুকুর ষ্টেশন থেকে বেশী দূরে নয়। একটু পরে ওরা পৌঁছে গেল বাড়ীতে। পাকা দোতলা বাড়ী। উঠানের পাশে ছোটো ধানের গোলা। তার পাশ দিয়ে সরু রাস্তা অন্ধরের দিকে চলে গেছে। বৃদ্ধ বললেন মেয়েকে উদ্দেশ্য করে—আমরা ভেতরের দিকে বাচ্ছি, তুই বাবুকে বসতে দে। দেখিস কোন অনুবিধা না। বেন—বলে মা-বাবা চলে গেলেন।

—আনুন—বলে মেয়েটি ভেতরের দিকে পা বাড়াল।

পানু ওকে অনুসরণ করে বলে—বাঃ সুন্দর বাড়ী ত। আমি একটু আরাম-প্রিয়। একটু সুখ পেলে এমন বসাব বেসে ওঠার কার সাধ্য।

—সে সৌভাগ্য কি আমাদের হবে। ভাল করে যদি জানেন, তবে যেটুকু বলাবেন তার জন্তে আপনি অনুতপ্ত হবেন।

—তার মানে?

—আমরা মূল্যমান।

—হঁ মূল্যমান।

—হ্যাঁ, দাঁড়ালেন কেমন?

ওহো শব্দ করে হেসে উঠল। মুসলমান সেজ্ঞ কি হয়েছে!

—প্রদীপবাবু।

—বলুন।

—আমরা মুসলমান জেনেও আমাদের বাড়ীতে থেকে আমাদের হাতে খেলে আপনার জাত যাবে না।

—জাতটা হাতের খেলা নয় ম্যাডাম, আর মাটির পাত্রও নয় যে ইচ্ছামত ব্যবহার আর নষ্ট করা যায়। যে জাত এত তাড়াতাড়ি আর সহজে যায় সেটা কবির ভাষায় জাতের নামে বজ্জাতি। আমরা শিক্ষিত, অথচ শিক্ষা যদি এই উদারতাটুকু না দেখায় তবে আমরা শিক্ষিত কিসে! এই জাত বিচার দেশের ঐক্যের পথে বড় বাধা, বুঝলেন!

—প্রদীপবাবু, সত্যি আপনি জাত মানেন না দেখছি।

—না।

—বেশ আমি দেখবো। আপনি বসুন ড্রেসগুলো ছাড়ুন—কাপড় গামছা তেল রইল। পাশের টিউবওয়েল থেকে স্নান করে ঠাণ্ডা হোন। এখন গরম মাথায় অনেক কিছু বলছেন। তখন বুঝতে পারবেন জাত ছাড়া বাংলা দেশের লোকগুলো বাঁচতে পারে না। আমি আসি প্রদীপবাবু।

—আসি মানে—

—বাঃ ড্রেসগুলো ছাড়তে হবে না।

—ও, তাই বলুন—তেল বিহীন প্রদীপ অচল, বুঝলেন? তাড়াতাড়ি আসবেন।

—আবার ভেজাল তেলেও কিন্তু প্রদীপ অচল।

কিছুক্ষণ পরে—

পান্ন স্নান করে এসে মাথা আঁচড়াচ্ছিল। এমন সময় মেয়েটি এসে ঢুকল।

—প্রদীপ জলছে ত।

—এইবার জলতে শুরু করল।

—ভাল। আসুন আপনার জলখাবার প্রস্তুত।

—সময়টা কত—একটু থেমে পান্ন বলে, আচ্ছা চলুন পেটে এখন আগুন জলছে।

মেয়েটি পান্নর কাছ থেকে একটু দূরে বসেছে। হ্যারি-কেনের আলো পড়ে অপূর্ব স্নানর দেখাচ্ছিল মেয়েটিকে। মেয়েদের এ রূপ ইতিপূর্বে পান্ন দেখেনি।

পান্ন খেতে খেতে বলে—আপনার পরিচয় কিন্তু এখনও পাইনি, বিশেষ করে আপনার নাম।

—ও, আমার নাম—ফতিমা।

—না আপনার ও রূপের সঙ্গে ফতিমা নাম খাটে না। আপনি যদি মমতাজ হতেন, তবে আমার সাজাহান হতে বিধা ছিল না।

—না প্রদীপবাবু, আপনার সাজাহান হওয়ার দরকার নেই; আমি বরং আলো হই।

—অর্থাৎ—

—আপনি প্রদীপ—আমি তার আলো।

—তা মন্দ হয় না মমতাজ দেবী।

—মমতাজের সঙ্গে দেবী খাটে না বিবি খাটে। আমি আলো হলে আপনার আর ও ভুল হবে না।

—দেখুন, আপনার ইচ্ছা। তবে এত খাবার এনেছেন, আমি কত খেতে পারব না মমতাজ দেবী।

—আবার সেই ভুল করলেন। তার চেয়ে আলো দেবী বলুন—তাতে আমার কথাটা থাকবে আর আপনিও ভুলের হাত থেকে রক্ষা পাবেন। তাছাড়া আপনার মমতাজ নাম বজায় করতে গেলে দুটোকেই পরিবর্তন করতে হবে, সেটাও বিদ্রী।

—তাই হোক। সাজাহান হলে রাজাও হতে পারব না আর স্মৃতিসৌধ ত গড়তেই পারব না—সে একটা আরও বিদ্রী ব্যাপার হয়ে যাবে।

খাওয়া শেষে এঁটো পরিষ্কার করতে করতে ফতিমা বলে—আপনার খাটের পাশে আলমারিতে অনেক বই আছে, শুয়ে শুয়ে পড়ুন এবার।

—মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে—ও ভাল লাগবে না। আর তা' ছাড়া নীরস বস্তু থেকে রস বার করতে গেলে সময় লাগবে আর তাতে মানসিক অবস্থাও স্থিতিশীল হওয়া চাই।

—মনটা বড় চঞ্চল নাকি?

—হ্যাঁ, মমতাজের রূপ আর আলোর তাপ মনকে পাগল করেছে।

—আলোকে প্রদীপ বুকে ধরলে অমন মনে করে। কিন্তু যতক্ষণ আলো প্রদীপে না থাকে প্রদীপটা শূণ্য বোধ করে। আবার আলো প্রদীপ বুকে ধরলেও বেশিক্ষণ রাখতে পারে



না—কারণ আলোর ত একটা ভেজ আছে।

পাত্রগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল কতিমা।

একটু বাদে রেডিওটা নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল—শুনুন এটা। আলো যাওয়ার ক্ষেত্রে পা বাড়ালে, পান্নু ডাকল—শুনুন।

—বলুন, কিন্তু আমার পূর্বের কথা সমালোচনা করে কিছু বলবেন না যেন।

—তা বলব না, তবে Don't mind, একটা কথা বলছি। আমি নেশাখোর মানুষ, Smoke করি। কিন্তু পকেট বে গড়ের মাঠ—এখন উপায়।

—ওজেশ সম্মানিত অতিথিকে ভাবতে হবে না, খাটের ওপরে দেখুন—

—Good luck, আপনাকে কি বলে যে ধন্তবাদ দেব আলো দেবী—বলতে বলতে খাটের কাছে এসে দাঁড়াল পান্নু।—এক Number Ten,—আবার হু প্যাকেট। আচ্ছা, কি করে জানলেন যে আমি Number Ten খাই।

—ষ্টেশনে আপনাকে এই সিগারেট খেতে দেখেছি। জানেন প্রদীপবাবু, ষ্টেশনে এত লোকের ভিড়ের মধ্যে আমার দৃষ্টিটা ছুঁয়ে ছিল আপনাকে সর্বকণ। বাক্গে চলি এখন, আপনি সিগ্রেট খান আর রেডিও শুনুন।

—বেশ—না বুঝলাম সব, কিন্তু হু প্যাকেট কেন?

—তুই নিয়ে ত জগতের সব কিছু। সিগ্রেট আর এক প্যাকেট দি কি করে—উত্তরের অপেক্ষা না করে আলো চলে গেল।

সিগারেটের ধোঁয়ার রিং তৈরী করতে করতে আলোর রূপটাকে মনের তরঙ্গায়িত পর্দায় তুলে ধরবার চেষ্টা করে পান্নু। পরিষ্কার টুকটুক, তরঙ্গী কাস্তি মসৃণ পেলব মুখ-মণ্ডলে বাম গণ্ডের তিলটি যেন নির্মল মেঘযুক্ত আকাশের প্রাক্তন তলে সৌন্দর্যের ইন্ধনবাহী চন্দ্রিমা। হাঁটার তালে তালে যখন দেহটা দোলে, তখন মনে হয় যৌবনের মারা কাননে ছন্দের প্রবাহ তুলে নাচছে রঙ বাহারী দোলন চাপা।

দীর্ঘ পথশ্রান্তে কখন ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। আলোর ডাকে ওর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

—প্রদীপবাবু, প্রদীপবাবু—পান্নুর মাথায় মূহু নাড়া দিয়ে বলে—এত সুন্দর গান হচ্ছে আর এর মধ্যে গম

আসে—আশ্চর্য।

ঘুম ভেঙ্গে গেল পান্নুর, তবুও চুপ করে পড়ে রইল। কেমন যেন আবেশ লাগছে রূপসীর করম্পর্শে,—ভাল লাগছিল প্রদীপবাবু ডাকটুকু।

—কই উঠুন, কি সুন্দর গান হচ্ছে এর মধ্যেও ঘুম এলো আপনার?

—ঘুম পাড়ানী গান গেয়ে ত আমাকে আপনি ঘুম পাড়িয়ে গেছেন, তবে আর ঘুমের জন্তে কেন অপবাদ দিচ্ছেন!

—ঘুম পাড়ানী গানে অবশ হয়ে গেলে চলবে কেন? কান পেতে গান শুনে পান্নু বলে—তাইত বেশ সুন্দর গান ত!

—কথাটা কিন্তু আরও সুন্দর।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ, শুনবার চেষ্টা করুন।

—'মিলন তোমার আমার হবে এ বসন্তে'—বাঃ খুব সুন্দর ত!

—তুমুই কি সুন্দর, সত্যি নয়?

—হয়ত সত্যি, কিন্তু এখন ত গ্রীষ্মকাল; আর ওবে 'বসন্ত কাল'।

—ভুল বললেন, প্রদীপবাবু—প্রতিবাদ করে বলে আলো।—মিলনের ক্ষেত্রে যে বসন্ত তা প্রাকৃতিক বসন্তের ভিন্ন রূপ। আচ্ছা, উঠুন আপনার খাবার এগে গেছে।

—এর মধ্যে?

—এর মধ্যে আর কোথায়, রাত কটা বাজে দেখেছেন?

—ছোট কাঁটাটা দশটার ঘরে বটে, কিন্তু আমার মনের বড় কাঁটাটা বারোটার ঘরে এসে নিরন্তর খচখচ করছে।

—রোগের প্রাথমিক সূচনা কিনা তাই অমম মনে হচ্ছে—উঠুন! যুবক ছেলেরা এত অলস কেন—এ কিন্তু ভাল নয় মোটেই।

—তা বটে, কিন্তু এগুলো ত আপনাদের জন্তেই—উঠে বসল পান্নু।

—চলুন না—

—চলুন—

আমি এলেন, ভাজল তোমার ঘুম,

আমি এলেন, ভাজল তোমার ঘুম,

আমায় তুমি ফুলে ফুলে

ফুটিয়ে তুলে

জলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে ।

খাওয়া শেষ করে পান্থ ঘরে একটা চেয়ারে বসে সিগারেট টানছিল। আলো ওর শোওয়ার জন্তে বিছানা তৈরী করে দিল।

একগাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পান্থ প্রশ্ন করে—  
আপনার বাবাকে আর দেখলাম না ?

—অতিথি সেবা আমি করে থাকি—এ ভার বাবা আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন,—বিশেষ করে আজকের অতিথিটির ভার।

—কেন, কেন ?

মূহ হাসল মেয়েটি। অনেক কথা বললার, এবার আপনি যুগ্মোন, আমি আসি, বলে আলো চলে গেল।

বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল পান্থ। কিন্তু চোখে যুগ্ম কোথায় ? ঘোবনের পতন ছুঁয়েছিল ওর মনের প্রান্তে, আর তখনই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল রোমাঞ্চকর প্রেমের মত্তির কল্পনা। কল্পনার রাজ্যে ও প্রেমের স্বপ্ন দেখত আর কেমন যেন মোহ জন্মাত। বহু কাল প্রেম আজ ধরা দিয়েছে কিন্তু সার্থকতা আর নতুনের আলো নিরে নয়। প্রেম—এ যে বিজাতীয় প্রেম। চিন্তার এলোমেলো স্বাক্ষর যুগ্ম আসছে না।

রাত অনেক হয়েছে—অন্ধকার রাত্রি। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। অন্ধকার আর নিতুন্মতার মধ্যে পৃথিবী যেন বিলীন হয়ে গেছে।

হঠাৎ দরজায় শব্দ হল। পান্থ বিছানার ওপর শুয়ে থাকিয়ে রইল ওদিকে। আন্তে আন্তে দরজাটা খুলে গেল। ধীরে ধীরে কে একজন এসে দাঁড়াল পান্থর বিছানার

কাছে—কে ?

—আমি।

—আলো, তুমি।

—হ্যাঁ—একেবারে প্রদীপের খাটের কাছে মশারী স্পর্শ করে আলো বলে—আমার যুগ্ম আসছে না প্রদীপবাবু। আপনি আমাকে এমন করে চঞ্চল করে দিলেন কেন বলুন তা !

—তুমি কি আমাকে কম করেছ আলো—আমারও ত যুগ্ম আসেনি।

—তবে বলুন কাল আপনি চলে যাবেন না।

—তা হয় না আলো।

—কেন হবে না ?

—না, তা হয় না।

—তবে এখনই চলো না।

—কি বলছ তুমি ?

—ঠিকই বলছি। আমার মনে রক্ত ধরিয়েছ তুমি। মনে হচ্ছে এ প্রেম আজকের নয়, বহু দিনের। তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না প্রদীপ। তুমি চলে গেলে আর আসবে না। আজ চলো না প্রদীপ, চলো কোথাও আমরা চলে যাই।

—না, তা হয় না। তোমাকে ভালবাসি, কিন্তু বিয়ে!—না, তা আমি পারব না।

—কেন, কেন পারবে না ? কেন মুসলমান বলে আমি ভালবাসতে পারি না ? প্রেমে জাত নেই, ধর্ম নেই, সম্পর্ক নেই। প্রেম, প্রেম!—প্রদীপ বল, কথা দাও।

পান্থর বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ল আলো। প্রদীপের বুকে মাথা রেখে কান্নার ভেঙ্গে পড়ল আলো—প্রদীপের বুক বেয়ে জলের দ্বারা গড়িয়ে পড়ল বিছানার ওপর।

**Kirit** ADVERTISING AGENCY  
REPRESENTATIVE OF  
FAMOUS NEWS PAPERS & MAGAZINES



# অশ্রয়

( গল্প )

শ্রী নিরঞ্জন সেন

দয়্যারাম জবাব দিল রায় কর্তাকে—ওর চাষে আর খাটবে না দয়্যারাম। ঠেলাটা বুঝুক এইবার—এখন চাষ চলেছে পুরানমে—জমিতে জল লেগেছে, তাছাড়া অনেকের চাষ হয়েও গেছে। এখন লোকও পাবে না রায়কর্তা—যদিও পায় তবে অনেক টাকা খরচ করতে হবে, আর খরচকে বড় ভয় পায় রায়কর্তা।

—কি এমন কথা বললাম যার জন্তে তুই জবাব দিলি দয়্যারাম—নরম সুরে বলে রায়কর্তা।

—সামান্য কথা—রেগে ওঠে দয়্যারাম। এইটা সামান্য কথা—আমার মা নাকি অধর বাউরীর ঘর করেনি!

অধর বাউরী দয়্যারামের বাপ।

একবার আড়চোখে তাকায় দয়্যারাম রায়কর্তার দিকে। মিষ্টি কথায় কম পয়সায় কার্জ করিয়ে নিতে রায়কর্তার জুড়ি নেই। মিষ্টি কথায় সব ভুলিয়ে দেয়। তবে একটা পণ্ড প্রবৃত্তি ঘুমিয়ে থাকে ওর মনে, স্বেযোগ পেলেই জাগে—নেশা করে। নিকষ কালো অন্ধকারের মত ওর গায়ে রঙ।

দয়্যারামের ঘরে ও যায়—বেলাকুঁড়ির দয়্যারাম—এখন ঘন বনের। নয়নমণি দয়্যারামের বউ—বিয়ে করা বউ। ঘন বনের নয়নমণি। বেলাকুঁড়ির কাছ দিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে—পাথর ছড়ানো দেহটা নিয়ে সপিল গতিতে। বেলাকুঁড়ির কাছে ঘন বন।

ঘন এখন মোটেই নেই—আর ঘনর প্রশ্নই উঠে না। আগে হয়তো ঘন বন ছিল—এখন তাও নেই। গ্রামের মধ্যে কয়েকটা গাছের জটলা। সবুজ সবুজ ভাব। পাখীদের মিষ্টি কাকলি পরিবেশকে করে তোলে স্বপ্নময়।

ঐ দূরে পড়ে আছে অমূর্বর অনেকটা জায়গা—প্রাণ নেই মাটির—চাষের উপযোগী নয়—তাই ওর দিকে চেয়ে চাষীরা স্বপ্ন দেখে না—জলে ওঠে না ওদের সামনে আশার আলো!

এখানের ঘরের অবস্থা সকলের ভাল বললেই হয়, তবুও মেয়ে-পুরুষে কাজ করে—বসে খায় না।

\* \* \* \*

নয়নমণি ঘন বনের।

ঘন বনে ঘন সবুজ বন না থাকলেও নয়নমণির রূপ আছে—ঘর আলো করা রূপ।

খালে জল নিতে এসেছে নয়নমণি। গোপীনাথপুরের তাঁতের রঙিন শাড়ীটা জড়িয়ে যৌবন-ভরা দেহতে। নিস্তরঙ্গ খালের জলের ওপর মাটির কলসী রাখে—ঢেউ ওঠে আবার মিলিয়ে যায়—আবার ওঠে।

খালের পাড়ের বটগাছের তলায় বসে বাঁশী বাজাচ্ছে সাধু। বাঁশীর সুর ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে—কেমন মিষ্টি অথচ মন উদাস করা সুর। মনটা যেন কেমন হয়ে যায় নয়নমণির—কুমারী মন। কি যেন পেতে চায় নয়নমণি।

এমন সময় খালের পশ্চিম পাড়ের রাস্তাটা ধরে এসে ঘাটের বকুল গাছটার তলায় দাঁড়াল দয়্যারাম। নিটোল স্বাস্থ্যবান দয়্যারাম। তাড়াতাড়ি কলসী ভরে উঠে আসে নয়নমণি।

কিসের এক ডাক শুনতে পায় নয়নমণি।—গজারামের ঘর কুথা—নয়নমণির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে দয়্যারাম। অদ্ভুত এক শিহরন অনুভব করে নয়নমণি।

—এস আমার সনে—কি মিষ্টি ডাক! আগে নয়নমণি চলে, পিছে দয়্যারাম।

যেতে যেতে দয়্যারাম হঠাৎ দাঁড়িয়ে ম্লান দৃষ্টি মেলে ধরে নয়নমণির ওপর। দাঁড়িয়ে পড়ে নয়নমণিও। গোপীনাথপুরের তাঁতের শাড়ীর ভেতর সজোপনে লুকিয়ে আছে যৌবন—এ-পক্ষের আমন্ত্রণ।

শান্তিময় একটি ছোট ঘরের স্বপ্ন দেখে দয়্যারাম। কত তৃপ্তি লুকিয়ে আছে ওর মধ্যে—ওকে কাছে পেতে চায় দয়্যারাম। নিবিড় করে! নয়নমণির কপালের ওপর লুকিয়ে

পড়েছে কয়েক গাছি চুল। মুহূর্তে আসে দোলা দিয়ে যায় ধীরে ধীরে।

তাকিয়ে আছে দয়ারাম মুগ্ধ দৃষ্টিতে। নয়নমণিও দাঁড়িয়ে থাকে কলসী কাঁখে নিয়ে—অনাগত বসন্ত দিনের আগত সম্ভাবণ নয়নমণির চোখের দৃষ্টিতে। শেষে ছ'জনেই চলতে শুরু করে।

পায়ে চলা পথটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই নয়ন-মণিদেব ঘর—ঘরের অবস্থা ভালই।

গঙ্গারাম এগিয়ে আসে দয়ারামকে দেখে।

—আরে রাম যে—এস, এস।

দয়ারাম আগে আসেনি গঙ্গারামের ঘরে, আজই প্রথম এলো। গঙ্গারাম অধরের সাজাত ছিল। অপর রানীগঞ্জের কাগজের কলে কাজ করতো। ওখানে কলেরা হয়ে অধর মারা যায়। অধরের ঘরের অবস্থা খুব খারাপ—দিন চলতো না।

অধরের বউ বাপের বাড়ীতে থাকতো। মাঝে মাঝে আসতো—থাকতো ছ' একদিন অধরের কাছে, তারপরে চলে যেত। তাই বেলাকুঁড়ির লোকেরা বলে অধরের বউ ঘর করে না, পালিয়ে যায়। ওর কেউ মনের মানুষ আছে। সত্যিই কোন একটা লছনা (উদ্দেশ্য) করে পালাত। অধরের বউ মাঝে মাঝে যেত গঙ্গারামের ঘরে। অনেক কিছু দিত গঙ্গারাম—সাহায্য করতো। তাই নিয়ে বেলাকুঁড়ির লোকেরা কথা বলত। ওদের একঘরে করে রেখেছিল—দয়ারামও একঘরে হয়ে আছে। দয়ারাম মায়ের আর কোন খবর জানে না বাপ মারা যাওয়ার পর থেকে। অবশ্য ইচ্ছা করেই খবর নেয়নি—মা বেন কেমন।

এখন আর বেলাকুঁড়িতে টিকতে পারে না দয়ারাম। ঘরের সব জিনিস পাড়ার বাউরীরা নিয়েছে জোর করেই। সাতপাঁচ কারণে গঙ্গারামের কাছে এসেছে দয়ারাম।

সব শুনে গঙ্গারাম বলে—ভর কি! আমি আছি। আর তুমি এখানেই থাকবে। আমার তো বেটা নেই—তুমি বেটার মতন থাকবে। আছে কেবল ঐ মেয়ে নয়ন-মণি—অঙ্গুলি তুলে সঙ্কেত করে গঙ্গারাম দাঁড়িয়ে থাকা নয়নমণিকে। ওর নাম মণি, আমি ডাকি নয়নমণি বলে।

দেহে যৌবনের অপূর্ব শ্রী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নয়নমণি—পূর্ণতার স্বাক্ষর। স্বপ্ন দেখে দয়ারাম—নিটোল কামনা মাখা স্বপ্ন।

হাত-মুখ ধুতে এক ঘটি জল এগিয়ে দেয় নয়নমণি দয়ারামের দিকে।

এখানেই থাকবে দয়ারাম—আশ্রয় মিলল। বলিষ্ঠ আশ্রয়। বেরিয়ে যায় গঙ্গারাম।

এক গ্লাস জল এগিয়ে ধরে নয়নমণি—হাত বাড়িয়ে নেয় দয়ারাম। হাতে হাত লাগে। নিটোল নারী হাতের মিষ্টি অনুভূতি জাগানো স্পর্শ। নয়নমণির হাতের কাচের চুড়ির শব্দ ওঠে—মিষ্টি সুরেলা কামনা-জাগা শব্দ।

—মণি! ছোট অথচ মিষ্টি করে ডাকে দয়ারাম।

—উ! হাসে নয়নমণি—মিষ্টি মন ভোলানো হাসি।

—তুমি আর যেও না—অনুরোধ করে পড়ে নয়নমণির কণ্ঠ থেকে। ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে সে।

উঠানে কি একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে—যৌবন-ভরা সবুজ দেহ নিয়ে। ফুল ফুটে আছে তাতে অজস্র।

—এস, থাকবে—সহজ ভাবে ডাকে নয়নমণি।

—চল। নয়নমণির হাত ধরে দয়ারাম। প্রতিবাদ করে না ও। আত্ম সমর্পণের পূর্ণ সঙ্কেত নয়নমণির দৃষ্টিতে।

বড় অসহায় আর সরল দয়ারাম—সমতা জাগে মনে—নয়নমণির কুমারী মনে।

পরের দিন নিজের সব জিনিসপত্র নিয়ে বেলাকুঁড়ি থেকে চলে আসে দয়ারাম। জিনিস বলতে এমন কিছু নেই, সব তো পাড়ার বাউরীরা নিয়েছে। আবার বলে দিয়েছে—

কালিদাস রায়, কবিশেখর সম্পাদিত

## কুণ্ডিবাসী রামায়ণ

হুগুহ শব্দের পাদটীকা সম্বলিত সচিত্র সংস্করণ। ভাল কাগজে ছাপা। মূল্য ১০ টাকা মাত্র।

শিশির পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা-৬।

দয়ারাম তাকায় নয়নমণির দিকে—অনুত! মারা



তুই যদি এখানে থাকিস তাকে কেটে দেব—তোর মা জাগানো স্পর্শ! কি যেন পেতে চায় মণি আপ  
পালিয়েছে—আমাদেরও সমাজ আছে। করে।

এখন দয়ারামের আশ্রয় স্থায়ী—আর নয়নমণি এর এ-এক প্রেরণাময় আশ্রয়। মণির যৌবনের ত  
বাঁচার উৎস। নতুন জীবন শুরু হল দয়ারামের। সান্নিধ্যে জেগে ওঠে দয়ারামের তৃষ্ণা—তারপরেই ওরা ঘা

হাতে নয়নমণিকে ডেকে বলে দয়ারাম—চল, মণি— আসে।  
চাঁদের আলোয় একটু বসি।

—চল।

নয়নমণির কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকে দয়ারাম।

মণি এর কপালে হাত রাখে—মাদকতার ভরা নেশা সেই থেকে দয়ারামের আশ্রয় হয় স্থায়ী।

সুপ্তি মগ্ন ঘন বন।

দিন আসে—যায়—আসে মাস।

ফাল্গুনের চার তারিখে ওদের বিয়ে হয়ে যায়। আ

## সচিত্র শিশির

মাসিক পত্রিকা আষাঢ়, ১৩৭৩ হইতে  
৪৬শ বর্ষ, আরম্ভ হইয়াছে। সডাক বার্ষিক  
মূল্য ৪/- সডাক বাৎসরিক মূল্য ২৫/-। পূজা  
সংখ্যা বধিতাকারে প্রকাশিত হয় কিন্তু গ্রাহক-  
দের বধিত মূল্য দিতে হয় না। আষাঢ় হইতে  
গ্রাহক হইতে পারেন। গ্রাহক-মূল্য মনি-  
অর্ডারে পাঠানই শ্রেয়, কারণ, ভি-পিতে  
লইতে হইলে ৬০ পরস; অতিরিক্ত খরচ পড়ে।  
নমুনা-সংখ্যা পাইতে হইলে ৩০ পরস।  
মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইবেন।

শিশিরে গল্প রচনা দি যে কেহ পাঠাইতে  
পারেন, ছাপাইবার যোগ্য হইলে ছাপা হয়।  
অনেক সময়ে মনোনিবেশিত রচনাও স্থানভাবের  
জন্ত বিলম্বে ছাপা হয়। শিশিরের জন্ত প্রেরিত  
রচনাগুলির নকল রাখিয়া পাঠাইবেন।

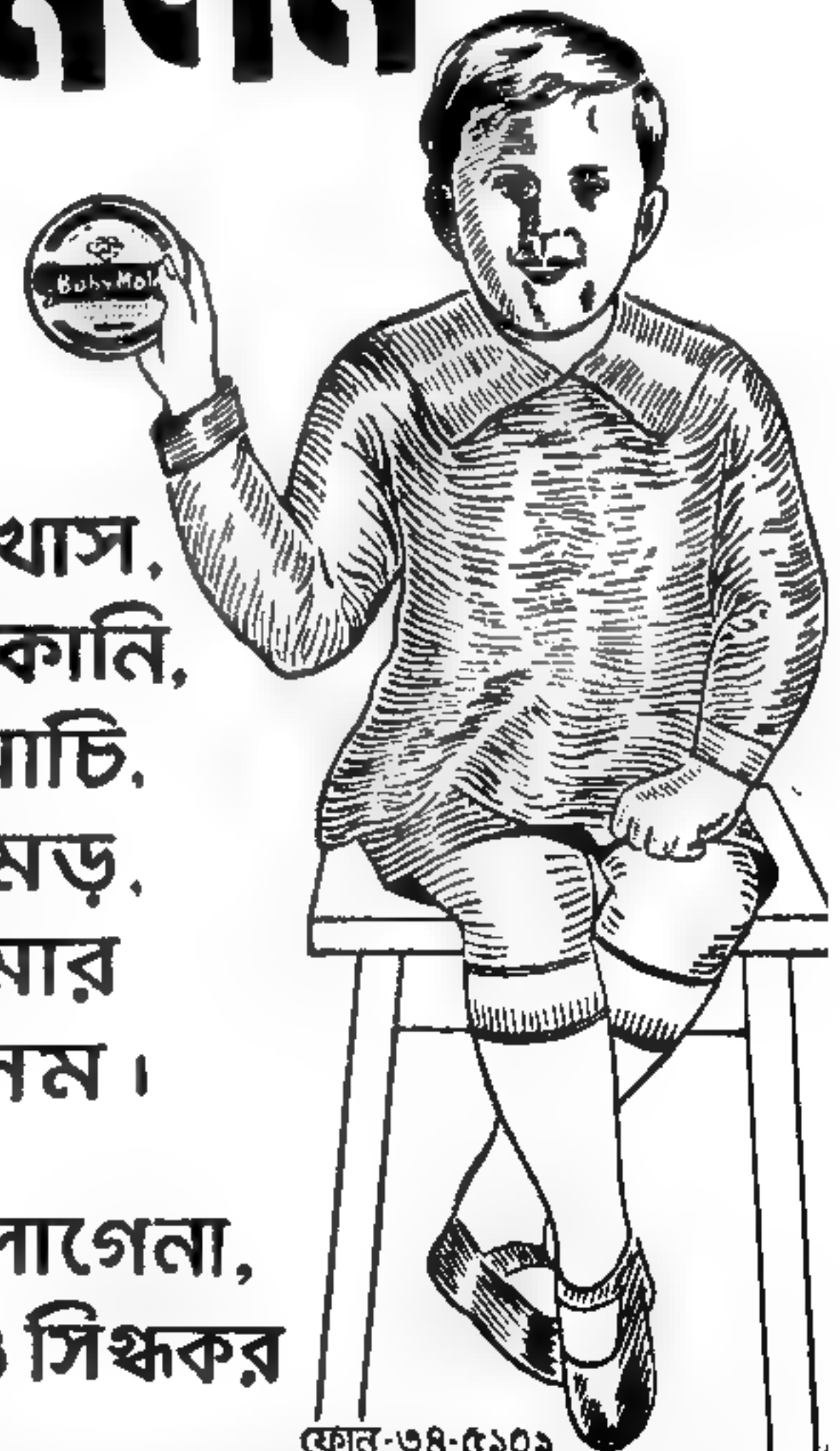
শিশির কার্যালয়

২২/১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।

# বেবী মলম

দাদ, হাজা, খোস,  
পাঁচড়া, চুলকানি,  
ফোড়া, ঘামাচি,  
পোকার কামড়,  
ও একজিমার  
অব্যর্থ মলম।

কাপড়ে দাগ লাগেনা,  
বেদনা নাশক ও সিঞ্চকর



ফোন-৩৪-৫১০১

গোল এজেন্ট

মাধব এণ্ড কোং জোড়াসাঁকো, কলি-৭

আহারের পর  
দিনে দু'বার..

# দ্রব খাতুতে খাঁস লিভার খোঁস উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

০ দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনী সঙ্গে চার চামচ মহা-  
জাঙ্কারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার  
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-  
জাঙ্কারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি,  
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক  
ফলপ্রসূ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও  
বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে  
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে  
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ  
স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।



আধনা ও মৃতসঞ্জীবনী • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র  
ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আরুর্সেদ-  
আচার্য, ৩৬, গো মা ল পা ডা  
রোড, কলিকাতা-৩৭



অধ্যাপক ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,  
আরুর্সেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস, (লন্ডন),  
এম, সি, এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর  
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।



# দু'টি জীবন

( গল্প )

সুদান্ত

কালো মেঘ ছেয়ে ফেলেছিল সারা আকাশটাকে। তার উপর আবার পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যার নিস্তর চুখন। চারিদিকে একটা জমাট আঁধার। এলোমেলো বিছানাটার ওপর অনেক কষ্টে উঠে বসলো সন্তোষ। আলোটা জ্বালা হয়নি। উঠে গিয়ে মোমবাতিটা জ্বালাবার ক্ষমতাটাও ও যেন হারিয়ে ফেলেছে এই ক'দিনের অরে। কী ভীষণ ভোগাটাই না জুগলো! পার্বতী না থাকলে ও হয়তো মরেই যেত। সে'টাই বোধহয় ভাল ছিল। জীবনে যার শান্তি নেই, দুঃখের দিনে দু'ফোঁটা সমবেদনার জলও যার ফেলার নেই, কি মূল্য তার বেঁচে থাকার? বেঁচে থাকা মানেই স্মৃতির বিশাল বোঝাটা আজীবন ব'য়ে চলা। একলা থাকা। অন্ততঃ তার কাছে তো তাই। পার্বতী ওকে বাঁচিয়ে তুললো। পাশের বাড়িতে থাকে পার্বতী। একা থাকে। এটা ওর বাপের বাড়ি। ওর বাবা হৃদয়নারায়ণ ছিলেন এই মোশলী গাঁয়ের শেষ জমিদার। বছর তিনেক জমিদারী ভোগ করেছিলেন তিনি। মা'কে হারিয়েছিল পার্বতী অল্প বয়সেই। জীব মৃত্যুর পর হৃদয়নারায়ণ আর বিয়ে করেন নি। কোন প্রয়োজন ছিল না বলেই। টাকা থাকলে যৌবনটাকে ভোগ করার জন্ত বিয়ে করার প্রয়োজন হয় না। তাই তিনি আর সাত পাকের বন্ধনে নিজেকে বাঁধতে চান নি।

পার্বতী তাই ক্ষুঁতিবাজ বাবার সান্নিধ্য পেত না বেশীক্ষণ। বাবার কাছে নিজেও যেত না ইচ্ছে ক'রে। হৃদয়নারায়ণকে ওর কেমন যেন কঠিন মনে হ'ত। মনে হ'ত তিনি বুঝি পাষণ। বাবার চরিত্রটাকে পার্বতীর বুঝবার বয়স তখনো হয়নি। কতই বা ওর বয়স তখন। যার কি তের হবে। তবু ও ভয় করতো বাবাকে। এড়িয়ে চলতে চাইত।

গোটা দিনটা ঘরের মধ্যেই কাটতো ওর। বিকেল বেলায় একা একা পায়চারি করত বাগানে। কখনো উদাস

চোখে চেয়ে থাকত আকাশ-মাটির কোলাকুলির দিকে। ওর কিশোরী মনটা কল্পনার পাখা মেলে উড়ে যেত এক অজানা স্বপ্নরাজ্যে। অনেক কিছু ভাবতো ও। মাঝে মাঝে মায়ের জন্ত মন খারাপ করতো। ছুটে আসতো মায়ের ঘরে। খুঁজে পেত না মাকে। বিছানার ওপর ফ্রক পরা কচি মেহটাকে লুটিয়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত অনেকক্ষণ। তারপর ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়তো একসময়। ওকে কেউ সাহায্য দিতে আসতো না। কোলে তুলে নিয়ে চোখের জল মুছিয়ে কেউ আদর ক'রে তুটো মিষ্টি কথা শুনাত না।

এমনি কবেই পার্বতী কাটিয়ে দিয়েছিল বেশ কয়েকটা বছর। বোধহয় সারাটা জীবনই কাটিয়ে দিত ও। কিন্তু এবার এলো জীবনের গতি পরিবর্তনের পালা। সবে যৌবনে পা দিয়েছে ও। কিছুদিন থেকে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরতে শুরু করেছে। একদিন বাবা এসে বললেন—“বিকেল বেলায় ভোকে আজ দেখতে আসবে পার, ঠিক হয়ে থাকবি।”

বাবার কথাটা পার্বতী ঠিক বুঝতে পারে নি। দেখতে আসবে! কে? কেন? বুড়ী ঝি বাপারটা পরিহার ক'রে দিল।—“হ্যাঁলো দিদি, তুই কি কিছুই জানিস্ না? মহাপুরের বাবুদের বড় ছেলে প্রবীরশঙ্করের সঙ্গে তোব বিয়ের কথা যে পাকা হ'য়ে গেছে রে। অমন সোনার চাঁদ ছেলে সাতখানা গাঁ খুঁজলে আর একটি মিলবে না। অনেক পাস দিয়েছে। দেখতেও রাজপুতুর। অমন ভাতার পাওয়া ভাগ্যের কথা”—রহস্য ক'রে বললো সে।

বিকেল থেকেই সাজাতে বসলো ঝি। ময়ূরকণ্ঠী রঙে একটা শাড়ি পরলো পার্বতী। মায়ের সমস্ত গয়নাগুলো এক এক ক'রে ওর গায়ে উঠলো। সাঁখের প্রদীপ জ্বালা সজে সজেই বাবা নাচঘরে নিয়ে গেলেন পার্বতীকে।

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ছেলে প্রবীর। তাই সে নিজের

পাত্রী পছন্দ করে বিয়ে করবে। মেয়ে দেখতে আসতেও কোন বিধা করেনি। ঘরের ভেতর বসেছিল ও। পার্বতীকে সাথে ক'রে হৃদয়নারায়ণ দাঁড়ালেন ওর সামনে। বাবার ইঙ্গিতে প্রবীরের পা ছুঁয়ে আসতো ভাবে ছোট্ট একটা প্রণাম করলো পার্বতী। ওর দিকে নির্নিমেয়ে তাকিয়ে রইলো প্রবীর। যেন একটা ক্ষুধার্ত পশু প্রতি পলকে ওর সুকোমল দেহটাকে পিষে ফেলতে চাইছে। বড় অসহায় বোধ করল পার্বতী। সঙ্কুচিত হ'ল। পুরুষের চোখে কামনার আগুন জালিয়ে মেয়েরা পার আনন্দ। এটা একটা সহজাত নারী-ধর্ম। কিন্তু পার্বতী যে আর পাঁচটা মেয়ের মত নয়। তাই লজ্জা পেল। রাঙা হবার মত লাল হয়ে উঠলো। মূহুর্ত পদক্ষেপে অবজ্ঞার ভঙ্গিতে নাচঘর থেকে বেরিয়ে এলো সে।

তবু প্রবীর ওকে পছন্দ করলো। ওর বিয়ের কথা পাকা হ'য়ে গেল। নহবতখানার সানাইয়ে কৈশে কৈশে বেজে উঠলো বেহাগের তান। আলোর মালা পরলো ছ'মহলা বাড়িটা। লাল বেনারসী পরে প্রবীরের গলায় মালা পরালো ও। একটুও উত্তেজনা ছিল না ওর। শুভ-দৃষ্টির সময়ে প্রবীরের মুখের দিকে মাত্র একবার তাকিয়েছিল ও। নিয়ম রক্ষার তাগিদেই—কোতূহলের বশে নয়। এ বিয়েটাকে ও মনে মনে মেনে নিতে পারে নি। প্রবীরের ওপর ওর মনে প্রথম থেকেই কেমন একটা বিরূপতার ভাব সঞ্চার হয়েছিল। মনে হয়েছিলো প্রবীর ওকে বিয়ে করছে না, বিয়ে করছে ওর দেহটাকে।

ওর ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল কালক্রমে। প্রবীর শিক্ষিত, কিন্তু মার্জিত নয়। চরিত্রের কোন বালাই ওর নেই। ওর মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই, আছে লোভ। তাই প্রবীরকে সহ্য করতে পারতো না ও। তারপর একদিন জানতে পারলো ও, ওকে মাতৃস্বের অধিকার দেবার কামত প্রবীরের নেই। সেদিন আর সহ্য করতে পারেনি পার্বতী। বলেছিল—“কোন অধিকারে তুমি আমার জীবনটাকে মাটি ক'রে দিলে?” কোন উত্তর না দিয়ে কেবল ক্রুর হাসি হেসেছিল প্রবীর।

পার্বতী ফিরে এলো হৃদয়নারায়ণের কাছে। ও মনে করেছিলো প্রবীর একদিন নিজের ভুল বুঝতে পারবে। আবার ফিরে আসবে ওর কাছে। কিন্তু প্রবীর আসেনি।

বহরের পর বছর কেটে গেল। তবু প্রবীরের মনে পড়ে নি পার্বতীকে। পার্বতীও ফিরে যায় নি। যে নারীত্বের চরম অবমাননা করেছে, তার কাছে ফিরে যাবে ও হৃদয়ের ডালি সাজিয়ে? কিছুতেই না। হৃদয়নারায়ণও মহাকালের টেনি-গ্রাম পেয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন একদিন। বাবার বেলায় পার্বতীকে দিয়ে গেলেন অসহ্য নিঃসঙ্গতা, আর কিছু পার্থিব সম্পত্তি। সেই থেকেই পার্বতী একা, একেবারে একা।

পার্বতী নিজেই একদিন কোন এক ছব'ল যুহুর্তে ওর জীবনের করুণকাহিনীটা প্রকাশ ক'রে ফেলেছিল সন্তোষের কাছে।

—আলোটা জালেন নি কেন?

চিন্তার অশান্ত সাগর থেকে রূঢ় বাস্তবের বালুতে ফিরে এলো সন্তোষ। একটু লজ্জিত হ'ল। নিরাসক্ত ভাবে উত্তর দিল—এমনি।

আলোটা জ্বলে দিল পার্বতী। অসংযত আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে সামনে দাঁড়ালো সন্তোষের।

—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

জাড়াজাড়ি ঘরের কোণে রাখা টুলটা টেনে আনবার চেষ্টা করলো ও। বাধা দিলো পার্বতী।

—থাক, ওটা আমি নিজেই আনতে পারবো।

টুলটা টেনে আনলো পার্বতী। বসলো ওর সামনে। পিঠের ওপর ছড়ানো ঘন কালো চুলগুলো নিরে আপন মনে খেলা করলো কিছুক্ষণ। বোধহয় পরিবেশের উপযুক্ত ভাষা খুঁজতে লাগলো।

সন্তোষ রেহাই দিল ওকে, নিজেই শুরু করলো—আপনাকে ক'দিন খুব কষ্ট দিলাম, না?

—জা একটু দিলেন বই কি। শুভ্রা থাকলে আমাকে এত কষ্ট করতে হ'ত না।—মূহু কোতুকে অন্ন একটু মুচকি হাসল ও।

—শুভ্রা!

পার্বতী শুভ্রাকে জানলো কি ক'রে? শুভ্রার চিঠি-গুলো তো ও পুড়িয়ে ফেলেছে। রোজনামচার খাতাটাও বাস্তবের মধ্যে আছে। সন্তোষ নিজে ভুল ক'রেও ওর কাছে শুভ্রার কথা বলেনি। এমনকি ওর নামটাও উচ্চারণ করেনি। তবে?



—আকাশ থেকে পড়লেন মনে হচ্ছে? ওই নামের কোন মেয়েকে আপনি চেনেন না নাকি? মৃদু ব্যঙ্গ-মিশ্রিত কথাগুলো।

—চিনি।

—তবে?

—ভাবছি আপনি জানলেন কি করে?

চুপ করে রইলো পাবতী। কি যেন ভাবলো অনেকক্ষণ। তারপর বলল—আপনাকে কোনদিন কোন অমুরোধ করিনি। আজ একটা অমুরোধ করবো। রাখবেন?

—রাখার হ'লে নিশ্চয়ই রাখবো।

—না, আপনাকে রাখতেই হ'বে।

—আদেশ করছে পাবতী। আশ্চর্য! সন্তোষ দফাদারকে আদেশ করার অধিকার ও পেল কোথা থেকে? সন্তোষ ওকে আদেশ করার অধিকার তো কোনদিন দেয় নি। তবে? রোগশয্যায় সন্তোষের অক্লান্ত সেবা করে ও এই অধিকার অর্জন করেছে, অন্ততঃ ওর ধারণা তাই।

—অমুরোধটা আগে শুনি।

—শুভ্রা কে? বলুন চুপ করে রইলেন কেন?

—সত্যিই কি শুভ্রার কথা আপনার জানা চাই-ই?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—অসুখের সময় আপনি বিকারের ঘোরে বার বার শুভ্রার কথা বলেছিলেন। তাই আমার জানা চাই শুভ্রা কে? কোথায় থাকে সে?

—আপনি যখন শুনে চাইছেন, তখন নিশ্চয়ই আমি বলব সব কথা।—ধেমে যায় সন্তোষ, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে।

—কি হ'ল থামলেন কেন?

—হ্যাঁ বলছি। সবটা সাদা করেই বলছি। ছেলেবেলা থেকেই আমি ঠাকুরমার কাছে মাহুষ। বাবা-মা সবাইকেই হারিয়েছি খুব ছোটবেলায়। নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই শৈশব হ'তে কৈশোরে, কৈশোর হ'তে যৌবনের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছি। গাঁয়ের হাই স্কুলের প্রয়োজন মিটিয়ে একটা ছোট শহর ঝাউডাঙ্গায় গিয়েছিলাম কলেজের পাঠ নিতে। ভর্তি হয়েছিলাম ওখানকার বেসরকারী কলেজে। কলেজের হোস্টেল ছিল না। তাই

কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা বাড়ি ভাড়া ক'রে একটা মেস্ ক'রে থাকতাম। বাড়িটা ছিল গার্লস স্কুলের কাছে। আমার বন্ধুবা তাই নিয়ে মাতামাতি করতো। কিন্তু আমি তা নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। মেয়েদের দেখলেই আমি নার্ভাস হ'য়ে পড়ি, হার্টের প্যালপিটেশন্স শুরু হয়। অন্ততঃ তখন তাই হ'ত। এটা হয়তো যৌবন ধর্মের বিরোধী। তবু আমার হ'ত। তাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম।

আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত শুভ্রা। ওর বাবা অলকেশ মুখার্জী কোন একটা অফিসে কাজ করতেন। শুভ্রাকে প্রায়ই দেখতাম ছাদে দাঁড়িয়ে থাকতে। কোনদিন ওকে দেখে কোন রকমের উত্তেজনা বোধ করিনি আমি। আমার এক বন্ধু ওকে পড়াতো। ওর কাছে শুভ্রার গুণগান শুনতাম প্রায়ই। খারাপ লাগতো না।

শুভ্রার সঙ্গে কোনদিন কথা বলার ইচ্ছে আমার জাগেনি। তবে আমি বলতে বাধ্য যে, শুভ্রাকে আমার ভাল লেগেছিল। প্রশ্ন উঠতে পারে, ওকে দেখতে কেমন? বার জন্ত আমি কঠোর সংযম হারিয়ে ফেলেছিলাম। না। ওকে দেখতে এমন কিছু রোমাণ্টিক নয়। অতি সাধারণ বাঙালী ঘরের একটা সহজ লভ্যা মেয়ে। দোহারা চেহারা, আঁটসাঁট গড়ন। গায়ের রঙ ততো ফরসা নয়। শ্রাম বর্ণ। চোখ ছোটো বৈচিত্র্যহীন। পটলচেরা বা টানা টানা দীঘল নয়। তবে ওকে আমার ভাল লেগেছিল। কারণ অবশ্যই আছে। ওর লাজুক লাজুক চাহনি আকর্ষণ করেছিল আমায়। ভাল লাগা একদিন ভালবাসায় পরিণত হল। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষায় পূর্বরাগ। ওর সঙ্গে পরিচয় হল আমার। আমরা একবার মেসে সরস্বতী পূজার ব্যবস্থা ক'রেছিলাম। পূজার দিন পুরুত না আসায় ওর বাবাকে ডেকে এনেছিল বাবুরাম। ও ওদের বাড়িতে পড়াতো। শুভ্রা বাবার সঙ্গে এসেছিল পূজার আয়োজন করতে। বোধহয় বাবুরাম ডেকে এনেছিল। সেই স্মৃতিই ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। পরিচয় থেকে প্রেম।

ওর সঙ্গে পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ হয়েছে, ওকে হারাবার ভয় যখন নেই, আমি তখন B. Com. পাস করলাম। M. Com. পড়বার জন্ত গেলাম কলকাতায়। মাঝে মাঝে শুভ্রার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম ঝাউডাঙ্গায়। এইভাবেই 5th year কাটিয়ে দিলাম। 6th year-এরও অনেকটা

কেটে গিয়েছিল। পরীক্ষার অস্ত্র তৈরী হচ্ছি। হঠাৎ একদিন বাবুরামের চিঠি পেলাম। ওলা পালিয়ে গেছে একটা ছেলের সঙ্গে।

বিধাস করতে পারলাম না। ছুটলাম খাউডাকার। জানলাম ব্যাপারটা মিছে নয়। বড় আঘাত পেলাম। M. Com. পরীক্ষা দিতে পারলাম না। পড়াশুনা ছেড়ে দিলাম। তারপর এই মৌশলী স্কুলে একটা চাকরি জুটে গেল। চলে এলাম। বেদনার হাত থেকে একটু মুক্তি পাবার আশায় বেছে নিলাম এই অখ্যাত পল্লীটাকে। ইতিমধ্যে ঠাকুরমাও মারা গেলেন। তাই এখানেই থেকে গেলাম। হয়তো বাকী জীবনটা এখানেই কাটবে দেব।

কাহিনী শেষ ক'রে পার্বতীর মুখের দিকে চাইলো সন্তোষ। আনমনা পার্বতী তখন বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টির ঝাপটা এসে পার্বতীকে ভিজিয়ে দিলো। তবু ওর খেয়াল নেই। সন্তোষ ক্লান্ত

পায়ে কোনমতে এগিয়ে এলো ওর কাছে। দাঁড়ালো ওর পেছনে। আলতো ক'রে একটা হাত রাখলো পার্বতীর কাঁধে। চমকে উঠলো ও। ফিরে তাকালো। সন্তোষকে দেখে বললো—আপনি উঠে এসেছেন।

—তুমি ভিজ়ে গেলে যে।

—কিন্তু তোমার যে অস্থখ। বৃষ্টিতে ভিজলে অস্থখ বাড়বে না?

—কতি কি, তুমি তো আছো।

—আমাকে তুমি সহ্য করতে পারবে না। আমাকে কেউ সহ্যে পারেনি।

—আমি পারবো।

—বীর পুরুষ! তাই প্রেমে ব্যর্থ হয়ে জীবনটাকে নষ্ট করছিলে!

—নইলে তোমার পেতাম না যে।

—হুই।

অপূর্ব আবেশ সন্তোষকে আলিঙ্গন করে পার্বতী।

## গান

### শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ

ওরে, ভাবে মাতোয়ারা হরি বল,  
মেরুদণ্ড সোজা করে  
একবার তোরা দাঁড়া ওরে  
একবার সবে বদন ভরে  
বল বল ওরে হরি বল।

ওরে হরি বিনে গতি নেই—  
অগতির গতি সদা সেই  
ভুলে থেকে দেখি তাহারেই  
সরি গেল হায় রসাতল  
ওরে, আকুল হইয়ে হরি বল।

অপরাধ ভাবে মাথা হেঁট করে  
লাঞ্জে অবনত ঘরে কিবা পরে  
কতকাল আর রবি সবে ওরে  
সত্যের পথে ফিরে চল,  
ওরে মন প্রাণ খুলে হরি বল।

সেই পথ পানে, যেথা নিশিদিনে  
সবে গৌরবে চলে পথ চিনে  
মাথা উঁচু করে চলে দিন কিনে  
সেই পথে তোরা ফিরে চল,  
ওরে ভাবে মাতোয়ারা হরি বল।





শারদীয়া সংখ্যা

আশ্বিন

১৩৭৩

শ্রীমন্ত সঙ্গার

—:~::~~:—

‘কমলে কামিনী’ মা যার—  
সে শ্রীমন্তের কথাই কহি।  
সকল পথই জয় পথ তার  
মা যে তার আনন্দময়ী।

ভীম তরঙ্গ, গর্জে সাগর,  
ডুবলো ‘চাঁদর’ আর মধুকর।  
ডোবা তরী উঠলো তাহার  
অমৃতের যে বাতী বহি।

হার মানি’ সিংহলের রাজা—  
জয়মালা তার দিল গলে  
রাজেন কমল-কামিনী মা  
শ্রীমন্তের যে হৃদকমলে।

কণ্ঠে পরি’ ‘রত্নমালা’  
এবার তাহার ফেরার পালা  
সপ্ত ডিঙা সাজাইয়া  
ফিরলো ঘরে সে কালজয়ী।

শ্রীকৃষ্ণদত্ত মল্লিক



## স্মৃতিরূপা

ডক্টর রমা চৌধুরী

বা দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তুতৈ নমস্তুতৈ নমস্তুতৈ নমো নমঃ ॥

(শ্রীশ্রীচণ্ডী ৫।৬৪)

“যে দেবী সর্বভূতে স্মৃতিরূপে বিরাজিতা। তাঁকেই প্রণাম, তাঁকেই প্রণাম, তাঁকেই প্রণাম, অনিন্দিতা।”

শ্রীশ্রীমাতুলীনার মহাগ্রন্থ শ্রীশ্রীচণ্ডীর অন্ত্যস্ত বহু স্মৃতিমণিক্যর অতুল্যম এটি—কি অভিনব, কি কোতুলজনক কি অত্যাশ্চর্য! কারণ স্মৃতি, একটি সামান্য—সাধারণ মনো-বৃত্তিই মাত্র। যোগ-দর্শনের পঞ্চ চিত্ত-বৃত্তির মধ্যে এটিও একটি:—প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতি। সেজন্য যে যোগ “চিত্তবৃত্তি-নিরোধ” সেই যোগে স্মৃতিরূপ চিত্তবৃত্তির স্থান যে একেবারেই নেই, তা বলাই বাহুল্য। সেক্ষেত্রে পরমমঙ্গলময়ী বিশ্বজননী এরূপ “স্মৃতিরূপা” হবেন কিরূপে? তিনি বরং প্রত্যক্ষরূপা হতে পারেন—যেহেতু তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করাই হল আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রত্যক্ষের ছায় স্মৃতি সাক্ষাৎ জ্ঞানের কারণ নয়; স্মৃতি পরোক্ষ জ্ঞানই মাত্র। যেহেতু বস্তুর উপস্থিতিতে যে জ্ঞানলাভ হয়, তা “প্রত্যক্ষ”-জ্ঞান। কিন্তু বস্তুর অনুপস্থিতিতে তার বিষয় জ্ঞানলাভ হল “স্মৃতি”র সাহায্যে পূর্বদৃষ্ট বস্তুর সঙ্ক্ষে জ্ঞানলাভ করা। সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, প্রত্যক্ষ অপেক্ষা স্মৃতি বহুলাংশে নূন এবং অল্প নির্ভরযোগ্য। অতএব, প্রসন্ন হতে পারে যে এরূপ একটি অপকৃষ্ট, অপ্রশস্ত, অবিধাসযোগ্য—এমন কি, ব্যবহারিক

দিক থেকেও ঠিক তাই—প্রমাণের সঙ্গে তুলনীয় হলেন কেন প্রকৃষ্টতম, প্রশস্ততম, বিধাস্ততম জগজ্জননী।

তার উত্তর হল এই যে, স্বয়ং জগজ্জননী পৃথিবীর দিক থেকেই “স্মৃতি”-রূপা; যথেষ্ট গোববের সঙ্গেই তা। “স্মৃতি” কি? সাধারণ দিক থেকে বা উপরে বলা হয়েছে, স্মৃতি হল একটি অসন্নিহিত, অদৃষ্ট বিষয় সঙ্ক্ষে চিন্তামূলক জ্ঞান। সেদিক থেকে দেখতে গেলেও, এক অর্থে “স্মৃতি” “প্রত্যক্ষ” অপেক্ষা বিস্তৃততর, প্রয়োজনীয়তর, কঠিনতর প্রমাণ। কারণ প্রত্যক্ষ দ্বারা কেবলমাত্র সেই সকল বস্তুর জ্ঞানই সম্ভবপর যা আমাদের সন্মুখে বর্তমান; এবং সেজন্য দূরের বস্তু, অতীত ও ভবিষ্যতের বস্তু প্রভৃতির জ্ঞান এর দ্বারা সম্ভবপর নয় বলে, এর সীমা সঙ্কীর্ণ। উপরন্তু, বস্তুটি আমাদেরই সন্মুখে বিদ্যমান আছে বলে, তার সঙ্ক্ষে জ্ঞানও বহুলাংশে সহজতর। অপর পক্ষে, স্মৃতির দ্বারা যা’ আমাদের সন্মুখে বিদ্যমান নেই, যা দূরের বস্তু, অতীত ও ভবিষ্যতের বস্তু, সে সঙ্ক্ষেও জ্ঞানলাভ করা যায়। এই কারণে, স্মৃতির সীমা বিস্তৃততর; এবং কেবল বর্তমান নিয়েই আমাদের চলে না বলে, এ-হ’ল আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়তরও নিশ্চয়ই। পুনরায়, যা’ সন্মুখেই রয়েছে তার সঙ্ক্ষে ইচ্ছিয়জ্ঞ জ্ঞানের অপেক্ষা, যা’ আমাদের সন্মুখে নেই তা’ সঙ্ক্ষে চিন্তাপ্রসূত জ্ঞান নিশ্চয়ই কঠিনতর। এই অর্থে, স্মৃতিকে প্রত্যক্ষ থেকেও উচ্চতর বলা চলে।

অবশ্য অন্য অর্থে, প্রত্যক্ষই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, যেহেতু



সকল জ্ঞানের শেষই দর্শনে। এই “দর্শন” অবশ্য সাধারণ ইন্দ্রিয়জ দর্শন নয়—এই দর্শন মানসিক প্রত্যক্ষ, এই দর্শন আত্মিক উপলব্ধি। এই ভাবে, পার্থিব দিক থেকে মানসিক প্রত্যক্ষ, এবং পারমার্থিক দিক থেকে আত্মিক উপলব্ধিই হল “স্মৃতি”র মূল উদ্দেশ্য।

এই কারণেই, “স্মৃতির” অপর নাম হল “নিদিধ্যাসন” বা “ধ্যান”। একরূপ ধ্যানের অতি সুন্দর সংজ্ঞাদান করে’ বিশিষ্টাবৈতবাদী ষাচার্য রামানুজ বলছেন—

“তৈলধারাবদবচ্ছিন্না স্মৃতি সন্তান-রূপা ধ্রুবা স্মৃতিঃ।”

(শ্রীভাষ্য ১।১।১)

অর্থাৎ, ধ্যান হল একটি বিশেষ বস্তুর বিষয়ে অনবরত, স্থির স্মৃতি বা চিন্তা। যেমন তৈলধারা অনবরত হয়ে চলেছে ধারাবাহিক ভাবে কোনো ‘ফাঁক’ না রেখে, তেমনি সেই একটি বিষয় অবলম্বনে আমাদের চিন্তাধারাও অনবরত হয়ে চলেছে ধারাবাহিক ভাবে কোনো ‘ফাঁক’ না রেখে। তারই ফলে, পরিশেষে, সেই বস্তুটির সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, বা আত্মিক উপলব্ধি হচ্ছে। অতএব, “স্মৃতি”র শেষ “দর্শনে”। সেজতাই, অতি সুন্দর ভাবে রামানুজ বলছেন—

“এবং রূপা ধ্রুবাস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে, উপাসনা-পর্যায়-ত্বাভুক্তিশব্দকম্।”

“স। চ স্মৃতিদর্শন-সমানাকারা।”

অর্থাৎ, একরূপ ধ্রুবা স্মৃতিই হল “ভক্তি”; এবং “ভক্তি” ও “উপাসনা” এক ও অভিন্ন।

“একরূপ স্মৃতিই হল দর্শন-তুল্যা।”

বস্তুতঃ, “শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন”-রূপ প্রখ্যাত সাধন ত্রয়ালীকেই আভাস পাই আমরা একত্রে। একত্রে ব্রহ্মোপলব্ধি হবে কি করে আমাদের? তার জন্ত, প্রথমে প্রয়োজন “শ্রবণ”—অথবা গুরুবাক্য ও শাস্ত্রোপদেশ থেকে সেই তত্ত্ববিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানলাভ। তারপরে প্রয়োজন “মনন”—অথবা, সাময়িকভাবে গৃহীত সেই তত্ত্ব-বিষয়ে নিজস্ব যুক্তি-বিচারমূলক চিন্তা। সর্বশেষে প্রয়োজন “নিদিধ্যাসন”—অথবা যুক্তি-বিচার দ্বারা গৃহীত সেই তত্ত্ব-বিষয়ে নিরন্তর চিন্তা বা ধ্যান। এরই ফলে, শ্রবণ ও মননের স্তরে পরোক্ষভাবে জ্ঞাত সেই তত্ত্বটির অবশেষে অপরোক্ষ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ বা “দর্শন” উপলব্ধি হয়।—এই ত হল ব্রহ্মোপলব্ধি, এই ত হল মুক্তি।

এরূপে, “স্মৃতিরূপা” জগজ্জননী ধ্যানরূপা, ভক্তিরূপা, উপাসনারূপা, উপলব্ধিরূপা, মুক্তিরূপা। আমাদের জীবনের বা শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, আমাদের জীবনের বা বরিষ্ঠ সাধনা, আমাদের জীবনের বা গরিষ্ঠ সিদ্ধি—তিনি ত তাই। একরূপে, তাঁকে আমরা পাচ্ছি নিরন্তর আমাদের শোভন স্মৃতিতে, আমাদের গভীর চিন্তায়, আমাদের নিগূঢ় ধ্যানে, আমাদের মোহন ভক্তিতে, আমাদের নির্মল উপাসনায়, আমাদের স্নিগ্ধ উপলব্ধিতে, আমাদের মধুর মুক্তিতে। কি পরম সৌভাগ্য আমাদের; এবং শ্রীশ্রীচণ্ডী এই সৌভাগ্যের বার্তাই বহন করে এনেছে আমাদের নিকট।

## ॥ তবু সূর্য অস্ত যায় ॥

নচিকেতা তরঙ্গাজ

তবু সূর্য অস্ত যায়। দিন মাস বর্ষ ঘুরে আসে।

আমার আকাশে

সব রোদ-রূপ-রঙ, হাসি-গান কিছু নেই আর—

অবসর আগর সন্ধ্যার

প্রতীক্ষায় বসে আছি। সেদিনের সব পথ

হারিয়েছি নির্মম ধূলার,—

তীক্ষ্ণ ঝড়ে। নীল চোখে তবু যশ অজ্ঞান বুলায়,

নরম নিটোল এক হীরে-কাঁপা উজ্জল ভোরের

মুগ্ধ ছবি ফেলে আমা দূর ওপারের—

রুদ্ধের অন্তরালে জাগে—

কত অমুরাগে!

# স্টাটিক পাত্র

( গল্প )

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীরঞ্জন রায় বি, এস-সি প্রশংসনীয় মনোযোগ সহকারে শেঠ বুলচাঁদ লোহিয়ার আদেশ প্রণিধান করলে। শেঠজি শেষে স্পষ্ট করে নির্দেশের সারাংশ বুঝিয়ে দিলে—বুঝলেন বাবু, মেজর সাহেব চাহিবেন কণ্ট্রাক্টের মোট টাকার উপর শতকরা দশ টাকা। কিন্তু শেষে পাঁচ টাকার রাজি হবে। সাফা সাহেবের সঙ্গে বন্দোবস্ত করবেন। কোনো বাবুর মারফত এসব করবেন না। সবাই লোভী। দেশে ধর্ম নেই। কলিকাল। ১৯৪৪ সাল।

রঞ্জন নীরবে শুনলে। বুলচাঁদ একটু দম নিয়ে আবার বলে—মোট কথা চনচনিয়ারা যেন এ কাজটা না পায়, ওরা ফেরেবী।

রঞ্জন বলে—মেজর যদি সহি করবার আগে কিছু অগ্রিম চায়?

লোহিয়ার বিচার-বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। সে বলে—সম্ভব। মোট ঠিকা নব্বই হাজারের, দশ টাকা শাঁকরা হোলে তি ওর পাওনা সেটা হবে ন'হাজার। তা' আপনি ছ' হাজার টাকা নগদ দেবেন।

নীরবে শুনলে রঞ্জন। শেষে যখন লোহিয়া বলে—বাবু আট নব্বই বুইক নিয়ে যান আর ভালো ইংরাজি পোষাক পরবেন। এ কাজটা সারা হ'লে আপনি আর একটা বিলাতী স্টুট করাবেন। বুঝলেন?

যুবক হাসলে। গরজ বড় বালাই। বস্ত্রদানের মূল অভিসন্ধি কর্মচারীর মারফত নিজের কারবারের সম্ভ্রান্ততা প্রমাণ। বুলচাঁদ তার হাসির অর্থ বুঝলো। বলে—এটা সাফ কথা বাবু। আজকাল কি গুণের আদর আছে না ধর্মের, এটা বারফটাইয়ের দিন, কাপড়ের যুগ।

রঞ্জন রায় বিষন্ন হ'ল। সত্যই সে ছায়ার যুগের লোক। কায়ার কথা কেহ ভাবে না, ছায়া নিয়ে বিচার—

বিজ্ঞাবুদ্ধি, সংস্কৃতি বা চরিত্র, পার্থ্য-পুস্তকের প্রবন্ধের কবজ। ছায়াচিত্রের যুগ—তাই অলিতে গলিতে সিনেমা। প্রাচীন মন্দির জীর্ণ।

গাড়িতে তার হস্তবোধ ফিরে এলো। আক্ষেপে কি বল? পরিশ্রম সে গ্রাহ্য করতো না। বাঙ্গালী তরুণের আর্থিক জগতে উন্নতির অন্তরায়, শ্রম-বিমুখতা। সংসার কর্মক্ষেত্র। পরিশ্রমই জীবন। তার বিজ্ঞা বা বুদ্ধির মূল্য সেই সনাতন নিয়মে নির্ণয় হয়, যে পদ্ধতিতে চাল, ডাল, কমলালেবু বা ধানকচুর দাম ঠিক হয় বাজারে। চাহিদা যার অধিক দাম তার বেশী। গ্রাজুয়েটের চাহিদা অপেক্ষা ঘুঘু-দেনেওয়ালার কদর অধিক। সে যেটুকুও রোজগার করে, ঐ গুণে।

বারাকপুরের পথে আট-সিলিঙার বুইকের গতির সঙ্গে তার মনের গতি পরিবর্তিত হ'ল। যা অনিবার্য এবং স্পষ্ট তার জন্ত পরিতাপে রক্তের উত্তাপ বাড়ে। উদ্যায় বিকোভ বাড়ে, শান্তির সে অন্তরায়। আট-নব্বই বুইক-গাড়ির কথা স্মরণ ক'রে তার হাসি এলো। সে যখন ব্যবসায়ীর জগতের রীতিনীতি সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ এমন দিনে সে গাড়ি চেয়েছিল বুলচাঁদের কাছে, জননীকে কালীঘাটে নিয়ে যাবার জন্ত। শেঠ বুলচাঁদ তেলের দোহাই দিয়ে তার দীন অহরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিল। সে তার কর্মচারী। তৈলদান কলে' বরষার প্রোতেরমত তৈল-প্রবাহ বহে ব্যবসায়ী বাজারে। কলেজে পাওয়া বিজ্ঞা পটে আঁকা ছবির মত, জীবনের আসল শিক-যজ্ঞ কর্মক্ষেত্রে।

মেজর হজগজের কথা স্পষ্ট। সে রঞ্জনকে বুঝিয়ে দিলে যে তাদের প্রতিযোগী চনচনিয়া কোম্পানী শতকরা পনেরো টাকা কমিশন দিতে চায়, সাহেব চায় বিশ। তারা ছ'মণ্টার সময় নিয়ে গেছে। প্রথমে যে আসবে, সাহেব



তার টেঙার নেবে। স্পষ্ট কথার কষ্ট নাই।

শ্রীযুক্ত বাবের আট সিলিঙের বুইক ছুটলো স্থানীয় উকীলের বাড়ি। সে টেলিফোনে সকল সমাচার শ্রীযুক্ত বুলটাদ লোহিয়াকে নিবেদন করলে।

তারের উপর দিয়ে বিজলীর সাহায্যে তার মোটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—বাবু ধর্মের দিকে তাকাও। তোমাকে আমি নিশ্চয় পরে বখশিস দেব। দশ পারসেন্ট বহৎ।

ক্রোধে ও ক্ষোভে নিলোভ বাবের হাত কাঁপছিল। সে স্পষ্ট স্পষ্ট শব্দে বলে—শেঠজি, আমি নয়, মেজর সাহেব চার—ঠিকার মোট টাকার উপর শতকরা কুড়ি টাকা। আচ্ছা আমি তাকে সইবাদ দিচ্ছি, আপনি ও সর্ভে রাজি মন। আচ্ছা।

—বাবু—রনজোন বাবু। হাঁ, লাইন রাখুন দেখি—

রজন কুড়ি সেকেণ্ড নীরবে কাণে চোঙা লাগিয়ে অপেক্ষা করলে। তার পর।—

—হ্যালো। হ্যাঁ। রনজোন বাবু। দেখেন গোসা হবেন না। ব্যবসা আপনকার ব্যালেন—

রজন বলতে যাচ্ছিল—শরতানের, তা বুঝে চক্ষু বুজে আছি পেটের দায়ে। কিন্তু সামলে বলে—সময় কম। চনচনিয়া—

—হ্যালো। বাবু ধর্মের দিকে তাকাইয়ে যেটি ভালো খাটে করুন। হ্যালো, এ ব্যবসা আপনার। আপনি আমার ধরম ছেলে—হ্যালো—

বিরক্ত হয়ে এবার রজন বলে—বিচার করতে গেলে চনচনিয়া—

চনচনিয়ার নামে বুলটাদের শিরে চনচন কোরে বাজে প্রলয়ের ঘণ্টা। সে বলে—আচ্ছা বাবু—না হয় একটা নোকলানের কাজ হ'ক। সাহেবটা যে হারামি।

( ২ )

ইডন উত্তানের প্রকাণ্ড কেয়াগাছের আড়ালে রজন বলে—মীনা, আমি এবার একটা নতুন বিত্তে শিখব—চুরি বিত্তে।

মীনা বুঝেছিল তার বন্ধুর মন কিসের একটা ভারে যেন অবসন্ন। সে নিজেও সারাদিন পরিশ্রম করেছিল। তার মন চাইছিল, খেলা, সুখের অভিনয়, মনের তার-নামানো প্রসঙ্গ।

সে বলে—ও বিত্তে তো তোমার সাধা বিত্তে। ডিরেক্টর জেনারেল অফ্ সাপ্তিক অফিসের টেনোগ্রাফার মিস্ মীনা সেন ভুক্তভোগী।

হঠাৎ সারা পৃথিবীটা যেন অপার্থিব রশ্মিকরণে রঙীন হ'ল। কি অপূর্ব রক্তিম রাগমাত উত্তানের ক্ষীণদেহ সরোবরে সুধা-স্রোত।

সে তার পাশে সুখমা দেখলে—সকল সৌন্দর্য একত্র করে বিধি গড়েছেন কুমারী মীনা সেনকে। কিন্তু তুচ্ছ রজন রায়, নির্ধন, নিগুণ, অসুন্দর, এত বড় কথাটা বিশ্বাস করে সে কিরূপে? আর সুন্দরীর কোন বস্তুই বা অপহরণ করেছে সে? যে বস্তু সে ভাবছে হয়তো অপহৃত পদার্থ তা হ'তে ভিন্ন।

সে সাহসী। বা থাকে কপালে—স্পষ্ট প্রতীতি অনাদি জ্ঞানের মত। সে বলে—তোমার কি চুরি করেছে মীনা।

যুবক তার সুখের দিকে তাকাবার মত ছঃসাহস আশ্রয় করতে পারলে না। তার দৃষ্টি নিবন্ধ হ'ল—যুবতীর ড্যানিটি ব্যাগে আঁকা নোকার পালের উপর।

মীনা হাসলে। বলে—বোকামীর ডান কোর না। অপহৃত পদার্থের নাম করলে না। বুকের উপর হাত রাখলে, অপাজে হাসলে।

কৃতজ্ঞতার রজনের নিজের চিত্ত হ'ল ভরপুর। দারুণ প্রজ্ঞা জন্মালে নিজের উপর—যত চুরি বিত্ত। সত্যই তো সনাতন প্রবচন—মারি তো হাতী, লুটি তো ডাঙার। সে তিনবার জিজ্ঞাসা করলে—মীনা, সত্য? মীনা তিনবার বলে—ভগ্ন, জানো না?

সন্ধ্যাকে মধু-সন্ধ্যা করতে মীনা কৃতসংকল্প। বেচারী রজন—বহুদিনের বন্ধু,—চিরদিন নিকষ হেমের মত থাটি, বিকচ কমলের মত প্রসন্ন। মীনার সে সহপাঠী—উভয়ে একত্র কিছুদিন ল কলেজে পড়েছিল, দুজনের কেউই পাশ করেনি।

মীনা বলে—তুমি অত প্রলাপ বকুচ কেন রজন। দণ্ড-বিধি আইনের পঁচানব্বই ধারা মনে আছে?

—আঃ! এমন সন্ধ্যাটা আইনের কথা বলে নষ্ট ক'রনা মীনা। ছিঃ!

সুন্দরী হাসলে। বলে—ছেলেদের অপেক্ষা মেয়েদের স্মরণ-শক্তি ভালো।

যে শ্রেণীর মধ্যে শ্রীমতী মীনা রায় বিরাজিত, তারা বড় নয় তো বুলচাঁদের জাত, পুরুষ মানুষ বড়? সে সাগ্রহে বললে—এক বার নয় সহস্র বার। ও ছাই-ভস্ম আইনের কথা আমি কেন, উকীল বন্ধুরাই ভুলে গেছে এখন স্মরণ কর কবিতা—

মীনা বললে—তা স্মরণ করলে হবে কেন চোর? তোমাকে অপরাধী করেছি। চোর অপবাদ দিয়েছি। তবে আইনের অঙ্গ-বিজ্ঞার ফল শোনাই। পঁচানব্বই ধারা—

—চুরায় যাক পঁচানব্বই ধারা। আমি যদি চোর হই—  
সেকন্দর, অশোক প্রভৃতির মত বিধ-চোর। কারণ বা' চুরি করেছি তা যে আমার রঙীন ছনিয়া—মীনা।

আবার যুবতী হাসলে। তার প্রাণ চাইছিল, আরো শুনতে, আরো শুনতে, তার প্রণাম, তার রক্তভাবের মুক্ত উচ্ছ্বাসের সজীব কল-গান।

সে বললে—তোমার দণ্ড মকুব হবে পঁচানব্বই ধারায়। তাতে বলে, অপরাধী দণ্ডনীয় হয় না, অপরাধ যদি হয় তুচ্ছ। যেমন নগণ্য জিনিষের চুরি যথা মীনার ক্ষুদ্র হৃদয়—

এবার সে লাফিয়ে উঠলো। বললে—ছলনাময়ী, তুচ্ছ তোমার প্রাণ? তাহ'লে গোলকণ্ডার হীরার খনির কি মূল্য, চাঁদের কি দাম—

সে হেসে পরিহাস ক'রে তাকে চুপ করালে। তার সহায়তা করলে তিনটে মার্কিনী গোরা। মুখের ভাষা না বুঝলেও মুক অভিনয়ের ভাব বোঝার মত তারা বে-মানুষ বুঝে ফেলে ব্যাপারটা। তাদের নির্নিমেষ পলক এবং মহত্ত্বের হাসি প্রেমিকের উৎস-মুখে পাথর চাপা দিলে। মার্কিন দেশকে প্রশান্ত এবং অতলান্তিক মহাসাগর ভাগা-ভাগি করে উদরস্থ করুক এই রকম শুভ প্রার্থনা ক'রে মিঃ রঞ্জন রায় শুক হ'ল। আঃ মোলো! গারে পঃ গণ-তান্ত্রিক মার্কিনীর চেয়ে দূরে থাকা দান্তিক সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ ভালো।

আমল ব্যাপার, আজ কয়েকদিন রঞ্জন রায়ের চিত্ত ছিল অপ্রসন্ন। সে আইন ভাঙছিল, হুণীতি পোষণ করছিল পরের হিতে। অথচ সেই পরে সন্দেহ করছিল, সে নিজে চোর, উৎকোচের দালালী লাভ করে। সে একবার ভাবতো বুলচাঁদের ভুলের শাস্তির জন্য কমিশনের কমিশন

আজ আবার কথা প্রসঙ্গে সে বলে—মীনা, পৃথিবী পাণে ফেঁপে উঠেছে। চারিদিকে অনাচার—

—অনাচার? নোংরা, পচা, পুতি-গন্ধ, আমি নরকে বাস করি—চারিদিকে লোভী মানুষ কেবল পরসার ধান্দায় ঘুরছে।

রমণী-রত্ন, ভাবলে রায়। ঐ কথাই তার হৃদয়ের অন্ততলকে আলোড়িত করছিল। সে বললে—যুব-খোর লোক দেশ ছেয়ে ফেলেছে।

রমণী রত্ন বললে—যুব-খোরের একটা গুণ আছে, সে ভদ্র, মুখ-মিষ্টি লোক। ভাণ করে বন্ধুত্বের। ভণ্ডামী করে কিছু আদায় করে। কিন্তু আমার আপিসের লোক একস্ট্রাসানার। বুকে পিস্তল দেখিয়ে, সরকারী চাকরীর উদ্ধত ভাব বোল আনা বজায় রেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে পরসাদ আদায় করে। এ শোষণ দস্যুতার কনিষ্ঠ সহোদর।

তার বিশ্লেষণ শক্তির অজস্র প্রশংসা ক'রে রঞ্জন তাকে নিজের হৃৎকের কথা শোনালে।

যুবতীর মুখ গম্ভীর হ'ল, দরদ ফুটে উঠলো বাক্যে ও চক্ষে। সে বললে—মাণ কর রঞ্জন, যখন—না কিছু না।

কিন্তু থাকীটুকু শোনবার জন্য ব্যাকুল হ'ল রঞ্জন।

কাজেই বুদ্ধিমতীকে বলতে হ'ল—এমন কাজ করে লাভ কি ভাই?

রঞ্জন বললে—এ কাজে ঢুকেছিলাম একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। কোনো কাজ না শিখে ব্যবসা হয় না। ব্যবসা শেখবার জন্য—

—কী ব্যবসা? যুব নেওয়া? ছ' আনা মাল দিয়ে বোল আনার রসিদ নেওয়া? এলসেসিগ্যান বায়না ক'রে থ্যাকশিয়ালী সরবরাহ করা?

রঞ্জন অপ্রস্তুত হ'ল। বললে—সত্য কথা বলি, দেবি শোনো, পেটের দারে। আমার অন্ন নিষ্পাপ। পাপের ধন যায় ধনী লোহিয়ার মোটা উদরে।

এবার তারা হাসলে। উভয়ে একমত হ'ল—দারিদ্র্য-দোষো গুণরাশিনালী।

শ্রীমতী বললে—আমার প্রতি ভগবানের এই দয়া যে মাত্র নরকে রেখেছেন। নিজের হাতেও আমাকে পাপ



ডুবো রবির স্নান রশ্মিতে রঞ্জন দেখলে উজ্জল চাঁপার  
কলির মত আঙুল আর তার শ্রীমুখে পরিহাস-স্নান হাসি।

( ৩ )

রঞ্জন ভাবে, ক্ষুদ্র হৃদয়ে হায়, ধরেনা ধরেনা তার।  
মনটা যেন বহির্জগতের প্রতিফলক। বর্মা সীমান্তের  
যুদ্ধক্ষেত্রের মত তার চিত্তে ছোটো বিরোধী ভাব সদাই  
সংগ্রামরত। মনের পটভূমি উজ্জল—ভাবীকালের সংসার  
—যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীমতী মীনা রায় বি, এ।

এই পটভূমির নাট্যিকার প্রোজ্ঞল চিত্র ছিল তার  
মানসিক সংগ্রামের প্রধান কারণ। সে ব্যবসারীর প্রতিনিধি,  
ছ'শো একটাকা বেতন। কাজের মধ্যে জুয়াচুরি, ঘুষের  
দালালী। দিনের পর দিন তার প্রভুর ভাণ্ডার পূর্ণ হচ্ছে,  
তারই কর্মে। এ ঐশ্বর্যের ভোগী সে স্বয়ং হ'তে পারতো  
যেকের ভাণ্ডার ভর্তি না ক'রে। এই চিন্তার অব্যবহিত  
পরেই তার বিবেক তাকে কষাবাত করত। বজ্র-শাসনে  
তার অন্তরাগ্নি রঞ্জনকে কর্তব্য-পথ দেখিয়ে দিত।

গঙ্গার ধারে বসে সে ভাবতো, উদয়ের মুখে জাহ্নবীকেও  
কাদামাটি কাঁকরের সঙ্গ করতে হয়। এই খরস্রোতের  
নিচের ভূমি কর্দমময়। সত্যই জগত শ্রদ্ধা করে বাহিরের  
চাকচিক্য। জীর্ণবাস ভিখারীর অন্তরে কি আছে স্পষ্ট  
জানলে, অনেকের পদধূলি গ্রহণ করা উচিত। কাঞ্চন-  
কৌলিগুই সামাজিক উচ্চভূমি। কিন্তু মানুষের চরিত্র, তার  
ধর্ম, তার বিবেক—বুদ্ধিই তার নিজের সম্পদ, আত্মসম্মানের  
কারণ। এই বিচারে সে মুখ পেতো যখন লোভে তাকে  
প্রণোদিত করত—উৎকোচের ভাগ গ্রহণ করতে, লোভীর  
অধর্মের লাভের অংশ হ'তে তাকে বঞ্চিত করতে।

আবার ভাবতো এ আত্মসাৎ হবে গঙ্গোত্রী পথের  
কাদার মত। এই অর্থে ব্যবসা বাণিজ্য লাভবান হ'লে  
সে প্রামাণ্যে গুদ্র হবে। তার কোষে অর্থ থাকলে বহু  
গুণী নির্ধন সহায়তা লাভ করবে। কিন্তু তার বিবেক ছিল  
গুদ্র। তার রসবোধ ছিল যথেষ্ট। সে হেসে বলতো—  
মাটির শয়তান সরে পড়। এ দোকানে নয়।

একদিন রঞ্জন অন্তরালে দাঁড়িয়ে শুনে তার মনিব  
শেঠ বুলচাঁদ লোহিয়া এবং তার অন্তরঙ্গ শেঠ ঝক্করমল  
খস্খসিয়ার কথোপকথন।

ঝক্করমল বলে—বুলচাঁদজি, তুমি বাজার মাটি করছ।  
তোমার কমিশনের হার বড় বেশী।

বুলচাঁদ বলে—ভেইয়া, অধর্মের যুগ। তবুও দিয়ে  
নিরে মুষ্টিভোর পাকে। যা দেন পরমাত্মা।

ঝক্করমল বলে—হাঁ। তবে আরও থাকতো। তোমার  
বাঙ্গালী খেয়ে নেয়।

শিহরে উঠলো গোপন-শ্রোতা।

বুলচাঁদ বলে—ছনিয়াদারী। তবে ওর চেহারাটা  
ভালো, মুখের আংরেজি বুলি মিষ্টি। দেশী বিলাতী সব  
সাহেব ওকে পেয়ার করে।

নিজের খুল উদরে হাত বুলিয়ে ঝক্করমল খস্খসিয়া  
বলে—হাঁ। ওরা চোরতো হয়ই।

এবার বুলচাঁদ বলে খাঁটি কথা অন্তরঙ্গকে—কি জানি  
ভাই অর্থ বরাতে। ঠিক ভাগ্যে ভাগ্যে না মিললে দৌলত  
আসে না। এটা স্বীকার করতে হবে যে, রণজোন বাবুর  
তকদির আমার নসীবের সঙ্গে মেলে। আমাদের তারায়  
তারায় মিল আছে।

শ্রীযুক্ত রঞ্জন সেন, বি, এস্-সি বুঝলে তার অবস্থা।  
সে কালিকালের চোর, তার চেহারা ভালো, তার ইংরাজি  
মিষ্ট এবং বুলচাঁদের তারা তার ভাগ্য-তারার অন্তর্ভুক্ত। সে  
ইংরাজিতে বলে—বুল, যাঁড় না হলে পরমা হয় না।

সেইদিন সে একটা কাজে নগদ দু'হাজার টাকা নিজের  
জুড়ে রাখলে। ব্যবসায় পাঁচ হাজার টাকা লাভ করলে।  
প্রথম রাত্রি অনিদ্রায় কাটালো। তার মন বলে—এ  
আত্মসাৎ নয়, শাস্তি; মানহানিকর উক্তি নয় শাস্তি, মিথ্যা  
অপবাদেয় ক্ষতি-পূরণ। ভরসা ক'রে মীনাকে জিজ্ঞাসা  
করতে পারলে না, বুলচাঁদের এ শাস্তি কোন্ আইনের কোন্  
ধারা অনুসারে।

তারপর বিবেক তাকে শাসন করে না। গুদ্র-বুদ্ধি  
ধিকার দেয় না। বরং লাভ কম হলে তার বুদ্ধি তাকে দোষ  
দেয়, অববিবেচক, অলস বলে। স্বর্ঘ পূর্বের মত ওঠে ও  
অস্ত যায়, কিন্তু প্রতিদিন দেখে রঞ্জন রায়ে উত্তরোত্তর  
শ্রীবৃদ্ধি। সে বোঝে সকাম ও নিকাম কর্মের পার্থক্য।  
তার সকাম কার্য সাধনায় বুলচাঁদেরও লাভের মাত্রা বৃদ্ধি  
হচ্ছিল। তাকে নিঃসন্দেহ করবার জন্ত রঞ্জনবাবুর ভাষা  
সপ্রদ্ব হ'য়েছিল। আর অতি লাভের লোভে বুলচাঁদজি রঞ্জন-

বাবুকে কালাবাজারের ভালো সার্জের পোষাক তৈরি করে দিলে।

১৯৪৪ সালের শেষ দিনে মিঃ রঞ্জন রায়ের তহবিলে ছিল নগদ টাকা প্রায় একলক্ষ।

### ( ৪ )

নববর্ষে সে মীনাকে নিয়ে গেল চিড়িয়াখানায়। যুদ্ধের দিনে বছরের প্রথম দিন তেমন সুখের ছিল না—অভাব, অভিযোগ, নিরাশা, দুঃশাসন কুহেলিমাথা। তবু জন্তুনিবাস আজ এদের মিলনভূমি সুতরাং পবিত্র। ছুটি প্রগল্ভী প্রাণও চাইছিল ক্ষুধা, অবাধ আনন্দ। হাসি, পরিহাস, কাজের ও নিরর্থক কথায় কোথা দিয়ে দিন কেটে গেল, কেউ বুঝলো না। একবার দার্শনিক মীনা বলে—বন্ধু, এটা লক্ষ্য করেছ যে, এই জানোয়ারের মেলায় আজ আমরা অমরাপুরীর সুখ উপলব্ধি করছি।

রঞ্জন বলে—অমরাপুরী ভূগোলের মানচিত্রে নেই। স্বর্গ মনোবিজ্ঞানের রচনা পুরী। না—না স্বর্গ মাত্র একটা প্রতিফলিত ছবি, যার আসল রূপ তুমি।

এবার যুবতী হাসলে। সে বলে—যার বসতি নরকে—ডিরেক্টর জেনারেল অফ্‌ স্যানিট্রিজের দপ্তরখানায়।

রঞ্জন গম্ভীর হ'ল। তার নিজের দপ্তর এখন আর নরক নয়, মাত্র ছুনিয়া, সে কথা সে মুখ ফুটে বলতে পারলে না।

মীনা বলে—জাল-ফুয়াচুরির সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করে আমার সহকর্মীদের আবার দেখছি একটা নতুন সখ গজিয়ে উঠেছে।

যুবক নিজের চিন্তায় মসৃণ ছিল। সে অন্তমনে বলে—কী?

মীনা হেসে বলে—ছোট বড় সবাই ভাবে দরিদ্র কেরাণী মীনা এবং তার মত অল্প শ্রমিক মেয়েগুলো তাদের প্রেমের জন্তু অফিসে রাখা হয়েছে। সবাই ইঙ্গিত করে প্রেমের।

রঞ্জন তাদের গালি দিল।

মীনা খুব হাসলে। বলে—পাগলা, জেলাস্ ছোকরা, ওদের কর্তব্য প্রেম করতে আসা, আমাদের কর্তব্য প্রত্যাখ্যান করা, চাবুক খাওয়া কুকুরের মত পালান, আবার

রঞ্জন বলে—আমি কাজ ছেড়ে দেব মীনা। তুমিও ছেড়ে দাও। আমরা দুজনে এবার বাসা বাঁধি।

তারপর সুর করে বলে—যৌবন সাগরে পড়িলে যে ভাঁটা, পুনঃ না আসিবে জল।

মীনা বলে—সেই বহুগুণনাশী দোষটা? কবিতায় কি পেটে ভরবে? আমার বিধবা মা আছেন, অনাথা পিসিমা আছেন, শিকারী ভাই আছে তোমারও—

বাধা দিয়ে রঞ্জন বলে—কারবার করব মীনা। অনাহারে মরব না।

মীনা বলে—মূলধন?

—তা আমার সংগ্রহ হ'য়েছে। কারখানা খুলব। আমাদের কারবার ভালোই চলবে।

মীনা সুখী হ'ল। বেচারী এক অর্থবান ভাগীদার পেয়েছে। ভালো।

সে বিজ্ঞাসা করলে—তোমার ভাগীদার কে? তোমরা কারা?

রঞ্জন সগর্ব্বে বলে—বে সুখহুঃখের সারা জীবনের ভাগীদার। ফার্ম হবে—সেন রায়—না না রায়-রায় কোম্পানী—মীনা রায়—আর রঞ্জন রায়।

বিস্মিত মীনা আবার বলে—কিন্তু মূলধন?

—তবে বলি শোন মীনা, আমি প্রায় লাখ টাকা জমিয়েছি।

—কেনন করে?

সে সব কথা বলে। মীনার হৃদপিণ্ড মোচড়াচ্ছিল দানবে। রক্তধারা বন্ধ করবার জন্তু সে কাঠ-হাসি হাসছিল। সকল কথা শুনে সে একটি ছোট শব্দ উচ্চারণ করলে—ছিঃ!

যুবকের চমক ভাঙলো। সে বলে—সব ঠিক হবে মীনা। বড় বড় অট্টালিকার ভিত্তি থাকে জল-কাদা-মাটি। সে অনেক বোঝালে।

অবোধ বালিকা। সে বলে—দোষ দেবার ক্ষমতা নেই। ভালো মন্দ বিচারের শক্তির গর্ব করি না বন্ধু। তবে বুঝেছি আজ হ'তে তোমার-আমার জীবনের চলার পথ ভিন্ন-মুখ।



# অসাধ্য সাধন !

( গল্প )

শিবরাম চক্রবর্তী

'মেয়েদের মন, সহস্র বর্ষেরই সখা সাধনার ধন !' কচকে উদ্দেশ্য করে দেবযানীর মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন কবি।

কিন্তু লক্ষ বছরের সাধনাতেও তার রহস্যের একটুও কি টের পাওয়া যায় ?

পরিণামে শুধুই কচকচি !

বাইরে অন্ধকার বেশ জমে এসেছে, এমনি সময়ে কল্পনা এল লাভণ্যর ঘর। প্রথম যে চেয়ার পেল তাতেই সে নিজেকে এলিয়ে দিল।

'উনি গেছেন এক বাল্য বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। যশিড়িতে। এখনো যখন ফিরলেন না তখন বুঝতে হবে সেখানেই মজে রয়েছেন। রাজিতে ফিরবেন কিনা কে জানে।' লাভণ্য একটু থামে, 'কাল সন্ধ্যাে আমাদের তাহলে আর ত্রিকুট বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে না কহু !'

কল্পনা চূপ করে থাকে।

'থাক, তুই খুব দৃষ্টিতেই কাটিয়েছিস বিকেলটা। কি বলিস ? কোথায় গেছলি বেড়াতে ? গণেশবাবু কই ? তাঁকে দেখেছিনে ?'

অশ্রুর উচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে পড়ে কল্পনা ; কোনো জবাব দেয় না।

'র'্যা ? কোনো ম্যাকসিডেন্ট ঘটেছে না কি তাঁর ?' লাভণ্যর স্বরে উদ্বেগ। কল্পনার দিকে সে এগিয়ে আসে।

'তাঁর ? না তাঁর আবার কী ম্যাকসিডেন্ট হবে ?' কহুর বিজ্ঞক কণ্ঠে যেন কৈফিয়তের দাবী।

'ভালো, তাহলে তোরই কিছু হয়েছে যেন মনে হচ্ছে।'

'বা হয়েছে তাকে ম্যাকসিডেন্ট বলা যায় কিনা জানিনে। তবে তোমাকে জানানো দরকার। সেজদি, গণেশবাবু বিয়ের কথা পেড়েছেন। এ-একটু আগেই।'

( পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেবাংশ )

রঞ্জন চীৎকার ক'রে বলে—সব মিথ্যা ? প্রেম যে অনন্ত, মীনা, আমি পাপী, তাই আমার ত্যাগ করবে ?

মীনা সংযত হয়েছিল। সে বলে—পাপ-পুণ্য উপলব্ধি। তুমি যাকে ভালো ভাবো, সে কাজ তোমার কাছে পাপ নয়।

ভাষাশাস্ত্রের অবকাশ ছিল না। সে বলে—মীনা, তুমি-আমি শাখত সত্য। এক। আমার হাত-পা ভাঙলে, কুষ্ঠ হ'লে আমার ত্যাগ করতে পার, এ কথা তো কোনো দিন ভাবিনি মীনা। আমার কমা কর।

মীনা বলে—কুষ্ঠ বা রোগ দেহের। সে করুণা জাগায়, কিন্তু ব্যক্তিত্বই ভালবাসার জিনিষ। তোমার ব্যক্তিত্বকে ভালবেসেছিলাম। সে আজ নেই, সে পরলোকে।

—তা হ'লে পরলোকে গেলে প্রেম যায় ?

—মোটাই না। যাকে ভালবেসেছিলাম, তাকে বুকে ক'রে রাখব। সরল, সজ্জাত, ধার্মিক, নির্লোভ একটা সত্তা। তার স্মৃতিকে ফেলব না। তুমি পদ ও সম্পদ-লোভী মহিলা খোঁজ, নতুন জীবনের সহচরী হবার জন্ত।

রঞ্জন বলে—আমি টাকা জাহ্নবীর জলে ফেলব।

মীনা বলে—তাতেও প্রেম ফিরবে না। প্রেম কাঁচের বাসন। ভাঙলে জোড়া লাগে না। আমাদের বাসন ভেঙেছে মিঃ রায়।

এ গল্পে বর্ণিত ব্যাপার অবশ্য কাল্পনিক। ঘটনা ১৯৪৪ সালের। গল্পে বর্ণিত নর-নারী এবং দপ্তরের বাবু বা সাহেব সব কাল্পনিক।

লেখক

শেষের কথাগুলো কল্পনা একটু কঠোর স্বরেই উচ্চারণ করে। গুরুতর বিষয়ের উপযোগী গুরুত্ব দেবার জন্তই বোধ করি।

‘তাই ভালো!’ স্থিতির নিখাস ফ্যালে লাবণ্য। লোভনীয় যোগাযোগ ঘটলে পটীয়সী ঘটকী যেমন পুলকিত হয়ে ওঠে, তেমন কিছু আত্মাদের আতিশয্য দেখা যায় না তার চেহারায়। বিষে জিনিষটা লোভনীয়ই বটে, তা নিজেরই কি আর নিজের বোনেরই কি! যতক্ষণ তা অবাকের মধ্যে রসায়িত হয়, ততক্ষণ তার চমৎকারিত্ব নিয়ে সন্দেহের অবকাশই নেই, কিন্তু বখনই বাস্তবে রূপ নিতে লাগে তখনই তার নানাদিক থেকে নানান জিজ্ঞাসার চিহ্ন খাড়া করে—নানাবিধ বাস্তবিক প্রশ্ন উঁকি খুঁকি মারতে থাকে।

সত্যি কথা বলতে কি, কল্পনার পাত্র হিসেবে গণেশবাবুকে সে কল্পনাই করতে পারে না। গণেশবাবুর সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানশোনা এতই কম, এবং সূচাক্রমে অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, গণেশের দিকে মনের টানটা কম আরও। এটা অবশ্য সে আবিষ্কার করল এই মুহূর্তেই, এবং করে নিজেকে পীড়িত বোধ করল। এমন চমৎকার স্মার্ট মেয়ে ওই কনু আর তার সঙ্গে কিনা ওই অজ-উজবুক! এক-আধদিনের জন্ত নয়, সারা জীবনব্যাপী! একথা ভাবতেই পারা যায় না। এমনই ওই লোকটা যে, ওর বিনম্র ব্যবহারেই যেন গা জালা করে, সোজা-থর আতিশয্যে মাথা ধরে যায়, শিভালার বাড়াবাড়ি দেখে এইসা এক চড়কসিয়ে দেবার জিহাংগা জাগে যে—কনুর অতঃপরবর্তী ফটোতে উনিই হবেন কিনা পাশের মূর্তিমান? ভাবতেও বিচ্ছিন্ন। ওই ভোঁতা তলোয়ারের সঙ্গে অজীবন খাপ খাইয়ে চলতে হবে আমাদের কনুকে....ধারণা করতেই লাবণ্যর মাথা ঘুরতে থাকে। ভাঙা গলায় ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে: ‘তুই কি রাজি হয়েছিস?’

‘আমি?’ কল্পনা জবাব দেয়, ‘না।’

‘তাই ভালো।’ লাবণ্যর অন্তর্গত দীর্ঘনিখাস আরামের মধ্যে মুক্তিলাভ করে।

কিন্তু ক্রমশই তার চিন্তা ঘনীভূত হয়ে ওঠে। এই প্রত্যাখ্যানটা কি সমীচীন হোলো? কনুর দিক থেকেই? বিয়ে তো ওকে করতেই হবে। আর পাত্ররূপে গণেশবাবু

এমনই বা কি মন্দ? চেহারাটা তো খারাপ নয়। খুঁটিয়ে দেখলে স্ত্রীই বলতে হবে। আর পরসাকড়িও আছে বেশ। উভয়ের মধ্যে যাতে দাম্পত্য যোগাযোগ ঘটে যায় এ বিষয়ে বেশ সজাগ ভাবেই দু’জনকে সুযোগের প্রশ্ন সে দিয়ে এসেছে এতোদিন। এই তথ্য ক্রমশই তার মনে উদ্ভিত হতে থাকে। তাছাড়া, গণেশবাবুকে গায়ে পড়া হয়ে নিমন্ত্রণ করে এতদূরে টেনে আনার আর মানেই বা কী থাকতে পারে?

‘কী বেকরব, কিছুই ভেবে পাচ্ছি নে সেজদি।’ কনু আন্তে আন্তে মাথা তোলেন, ‘তুমি আমাকে পরামর্শ দাও।’

‘দেব বই কি, কনু। কিন্তু আমার পরামর্শ কোনো কাজের হবে কিনা বুঝতে পারছি না। ভাবতে শুরু করলে এমন সব উন্টোপাণ্টো আমি ভাবতে থাকি, এমন সব আজগুবি ভাবনা আমার মাথায় আসে যে আমি নিজেই কিছু ঠাণ্ডা করে উঠতে পারি না।’

সেজদির সাক্ষ্যকায়োক্তিকে আমলই দেয় না কনু। সমস্ত ব্যাপারটার চেহারা সে সুস্পষ্ট দেখতে চায় নিজের সামনে। আগাগোড়া ঘটনাটা সে পুজাখুপুজা প্রকাশ করে চলে। ঘরের বাইরে অন্ধকার তখন ঘোরালো, ঘরের ভেতরে তার আবছায়া। এক কোণে একটা মিটমিটে আলো জ্বলছে, বহুশ্রমের অন্তরালের মতো। সাহসী হয়ে ওঠে কল্পনা। অভাবিতপূর্ব এবং অভাবনীয় এই আকস্মিক ঘটনাটার—কিন্মা হৃদয়টার—সম্পূর্ণ মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় সে।

‘এমন গুরুগম্ভীর ভাবে শুরু হোলো, বলব কি সেজদি, একেবারে ঘাবড়েই গেছলাম। গণেশবাবুর মুখ থেকে এ হেন প্রস্তাব, আমি ভাবতেই পারিনি। কিন্তু আমি সতর্ক ছিলাম, মাথা ঠিক বেখেছিলাম, বুঝলে সেজদি? ‘হ্যাঁ’ বলিনি। কিছুতেই বলিনি ওই জন্তে যে, ও বলা খুব সোজা, বলে ফেললেই হোলো। আর বললেই গেল চুকে। কি বলে সেজাদ, ঠিক করিনি কি?’

সেজদির দিক থেকে কোনো সাড়া আসে না।

‘গণেশবাবুকে আমি বলেছি—জানি না। জানিই না তো। তা ছাড়া, আমার তো ভেবে দেখতে হবে। বিয়ে হেন ব্যাপার—একটা ভাবনার বিষয় নয় কি, সেজদি? কিন্তু গণেশবাবুর কেমন অন্তর আবদার। বলেন, ভাববার



আবার কী আ'ছ? ভাবনার নাকি যথেষ্ট সময় আমি পেয়েছি। ওঁর ভাবখানা ঠিক বোঝা যায় না। মানেটা যেন, বিয়ে—এ, আর এমন কি! কী আর সাংঘাতিক? সামান্যই একটা কাণ্ড যেন, করে ফেললেই হোলো!'

'তাই যদি ভাব হয়ে থাকে তো তেমন দোষ ওঁর দেয়া যায় না। তুমি ওঁকে এতদিন উৎসাহ দিয়ে এসেছ এ কথাও তো মিথ্যে নয়। এ অভিযোগও উনি করতে পারতেন অনায়াসে।' লাবণ্য এবার চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়।

'আমি উৎসাহ দিয়েছি? তাঁকে?' কল্পনা অবাক হয়ে যায়, 'ঘ্যাতো! বড়ো বেহায়াপনার দোষ তুমি দাও আমায়?'

'উৎসাহ দেয়া আর বেহায়াপনা, এক নয়। পুরুষ মানুষদের উৎসাহিত করতেই হয়, তা না হলে কি কোন দিনই এক পা-ও এগুবার সাহস হবে? এমনিতেই ওরা এতো ভীত। ভয় খাওয়াই ওঁদের স্বভাব!'

'গণেশবাবু ভীত একথা ভাবাই যায় না। ওঁর ব্যাপার দেখে মনে হোলো এরকম একটা প্রস্তাব করতে হয় তাই করা। স্রেফ ফরম্যালিটি। তাছাড়া কিছু না। আসলে এ ব্যাপারে আমার যেন কিছু বলবার নেই। আমি সাব দেব, দিতে বাধ্য, এটাই যেন স্বতঃসিদ্ধ।' কল্পনা ক্রমশঃ গরম হয়, 'কেন বাপু, উনি কী করেছেন আমার জন্তে? ভাবখানা যেন আমার মাথা কিনে রেখেছেন। এক এক সময়ে এমন রাগ হয় যে মনে করি—'

যা মনে করে কল্পনা তা উল্টাই রাখে।

'বাস্তবিক। এই পুরুষ মানুষগুলো এমন গোঁয়ার-গোবিন্দ কে জানতো আগে? মনে করে যেন ওঁদের পুরুষদের মতো, মেয়েরাও নিজের মতামত সর্বদা তৈরী করে রেখেচে। আর যদি তৈরী করাও থাকে, ওঁদের মুখের কথা ধরা মাত্র প্রকাশ করে ফেলতে বাধ্য অমনি। যেন ভারি গরজ মেয়েদের!'

'সত্যিই!' কল্পনার উচ্ছ্বাসে লাবণ্য বাধা দেয়, 'মেয়েদের ধরণই ওই। বিশেষ করে, তোমার মতো মেয়েরা যারা সব কলেজ থেকে বেরিয়েছে। প্রেম করতে গিয়ে পরিণামে বিয়ত করতে হবে এ তারা ভাবতেই পারে না। তারা চায়

চিরদিন—সেই রোমান্সের চূড়ান্ত পরিণতির দিকে মুখ ফেরাতে চায় না কিছুতেই। মেয়েদের অবশিষ্ট এজন্মে দোষ দেয়া যায় না, যদিও একচোখো লোকেরা মেয়েদেরই দোষ দিয়ে থাকে।'

কল্পনা মনোযোগ দিয়ে দ্বিধার লেকচার শোনে : 'ঠিক বলেছ সেজদি। আমিও তো তাই বলছিলাম। এই কারণেই, বিয়ের মতো হেস্তনেস্ত ব্যাপারের আগে ভালো করে ভাববার যথেষ্ট সময় নেয়া দরকার, নয় কি? মেয়েকে নিজের মন জানতে হবে, নয় কি? কী বলো তুমি? তুমি নিজেও কি সময় নাও নি সেজদি?'

'হ্যাঁ নিরেছিলাম, নিরেছিলাম বই কি।' লাবণ্য বলে, 'হু-মিনিট কেবল। বেনারস ইঞ্জিনিয়ারিং-এ উনি ভর্তি হয়েছিলেন, সেটানে যাবার পথে আমাদের বাড়ী এলেন। ট্রেন ফেল করার খুব বেশি সময় ছিল না। হাতবড়ির দিকে তাকিয়েই প্রগল্ভা করলেন। আমি বললাম—না।' তারপরই কিন্তু তাঁকে ডেকে ফিরিয়ে নিজের ভুল শুধরে নিলাম। তক্ষুনি তক্ষুনি।'

কল্পনা কিছু বলে না,—চোখ বড়ো করে চেয়ে থাকে।

'আমার চেয়ে বেশি ভাববার সময় তুই পেয়েছিল।' লাবণ্য অনুযোগ করে, 'আরও কত সময় তুই চান?'

'আমি বলেছি, মধুপুর থেকে যাবার আগে জবাব দেব।'

'কেন, কী বলবি, এখনো ঠিক করতে পারিস নি তুই?'

'জানি না' কল্পনা জবাব দেয়, 'কী বলব তাই তো আমি ভাবছি।'

লাবণ্য কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। 'বেশ, তাহলে আগাগোড়া সমস্তটাই ভেবে দেখা যাক। আমরা দুজনেই ভাবি আয়।'

কল্পনা ঘাড় নাড়ে। তার ঈর্ষহৃৎতা তখন জুড়িয়ে এসেছে।

'প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাতেই ওর ওপর তোমার মন পড়েছিল। গোড়া থেকেই ওকে তোমার ভাল লেগেছিল—কেমন কি না?' লাবণ্যর জেরা সূরু হয়।

'হ্যাঁ,' কল্পনা ক্ষীণস্বরে জানায় : 'তবে ঠিক কি ধরনের ভালো লাগা তোমাকে আমি বলতে পারব না, সেজদি। দেখতে মন্দ নয়, আদব-কায়দা ভালো; চমৎকার ষ্টাইল,

নিভে আসে।

‘থামলি কেন?’ লাবণ্য উসকে দেয় ওকে : তারপর বেশ কিছুদিন ঘনিষ্ঠভাবে মেশার পর—?’

‘বাঃ সে তো একটু আগেই তোমাকে বললুম না? সেই কথাই তো বলছি সেজদি।’

‘ওঃ! আজকের এই বিয়ের প্রস্তাব! তা—তা—এই প্রস্তাবের পরে তোর মনের অবস্থাটা এখন কেমন?’

‘এখন তো আমি মাথা ঘামাচ্ছি তাই নিয়ে।’ কন্ননা উত্তর দেয় : ‘গণেশবাবুকে আমি ভালবাসি কিনা, ভালবাসতে পারব কিনা, উক্ত ভ্রূলোক ভালবাসবার উপযুক্ত কিনা, গণেশ নামের কাউকে ভালবাসা আধুনিক কালে সম্ভব কিনা, সম্ভব কিনা, এই সবই তো ভাবছি। আমার সব চেয়ে আশ্চর্য লাগছে মানুষটার অদ্ভুত ধরন। ছেলেরা প্রেমে পড়লে ওই রকমই হয় বুঝি। ইতিমধ্যেই ওঁর ধারণা হয়ে গেছে যে আমি যেন ওঁরই জিনিস।’

লাবণ্য ভাবে, কি বলবে ভেবে পায় না। কিছুক্ষণ যায়, সে জিজ্ঞাসা করে, তুই ওর জিনিস, ওর এই ধারণাটাই কি ওকে না পছন্দ করার কারণ?’

‘তাও বলতে পারি না। কিরকম অদ্ভুত ধারণা ভাবো তো সেজদি। এরকম ধারণা হয় কেন?’ কন্ননা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

‘এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলাম।’—লাবণ্যর হৃৎ চোখ উজ্জল হয়ে ওঠে, ‘আমার মনে হয় তুই—’

‘কি—?’

‘তুই গণেশবাবুকে—’

ঠিক সেই মারাত্মক মুহূর্তে লাবণ্যর ‘উনি’ এসে আবির্ভূত হন। কন্ননাও তৎক্ষণাৎ পাশের ঘরে পল্লবিনী লতার মতো লড়িয়ে যায়। নিঃশব্দে, বিনা বাক্যব্যয়ে।

‘ওগো গুনছো?’ লাবণ্যর কর্ণস্বর স্বীতিমত ভাবাত্মক, ‘কী হয়েছে জানো কিছু?’

বলার ধরনে মনে হয়, যেন সব দোষ সমস্ত অজানতার জড় অকস্মাৎ আগত এই ব্যক্তিটিই একমাত্র দায়ী।

‘না, জানি না তো। কিন্তু জেনে নেবো। তুমি নিজের যখন সশরীরে বর্তমান আছ’, উনি জানান : ‘তখন জানতে কতক্ষণ?’

‘না’, ঠাট্টার কথা নয়। তোমাকে নিয়ে কি করব বলত। সব কথাই তুমি হেসে উড়িয়ে দাও। কবে একটু বুঝদার হবে? সত্যি, ভারি বেয়াড়া ব্যাপার। বুঝেচ, গণেশবাবু—ই্যা, গণেশবাবু—’

উনি উদ্গীৰ্ণ হবার চেষ্টা করেন, ই্যা, বুঝছি।’

‘গণেশবাবু কনুর কাছে বিয়ের কথা পেড়েছেন আজ।’

এবার সত্যিই উনি চমকে যান, ‘ই্যা, বলো কি।’ তারপর নিজেকে সামলে নেন : ‘তা, তা, তাতে আর হয়েছে কি?’

‘কী হয়েছে! অবাক করলে তুমি। নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যাবে না, বুদ্ধিগুদ্ধি আর হবে না তোমার কোনো কালে। ঐ হৌংকা গণেশবাবুর সঙ্গে কিনা আমাদের কনুর—তুমি বলো কি গো? মাথা খারাপ হোলো নাকি তোমার?’

‘তা বটে। ওটা একটু হৌংকাই বটে।’ পক্ষীর লাটফিকেটে উনি একবাক্যে সার দেন। ‘কিন্তু আমার ধারণা ছিল ছোকরাকে তুমি পছন্দই করতে।’

‘পছন্দ কোনদিনই করিনি।’ লাবণ্যর দিক থেকে প্রবল প্রতিবাদ আসে। ‘তবে আমি ভেবেছিলুম গণেশবাবুর সঙ্গে যদি সম্বন্ধটা বেধে যায় তাহলে এমন মন্দ কি?’

‘তা বাধছে না কেন?’ ওঁর চোখ কপালে ওঠে : ‘কনু—কনুরও কি ওকে অপছন্দ?’

‘কনু এখনও কিছু ঠিক করতে পারেনি।’

‘তাহলে তো মুন্সিল।’ ওঁর মাথা ঘামতে থাকে। ‘ভারি মুন্সিল তো! পছন্দ কিনা ঠিক করে উঠতে না পারলে কি করে তবে বিয়ে হবে? বিয়ের পরে ওসব খুঁটিনাটি না হলেও চলে যায়, কিন্তু বিয়ের আগে? উহু, পছন্দ চাই-ই।’

‘হুঁ।’ লাবণ্য তার গভীর গ্রীবা আন্দোলিত করে জানান : ‘নিশ্চয়।’

‘কনু কী জবাব দিয়েছে গনুকে?’

‘বলেছে, মধুপুর ছাড়বার আগে জানাবে।’

‘সে তো হুঁ হুঁয়ার খাচ্চা! কনুর পছন্দের প্রত্যাশায় কি বেচারাকে এতদিন ধরে খাবি খাওয়ানো ঠিক হবে? এত সময় হাতে পেলে ভেবে চিন্তে আত্মহত্যা করে ফেলতেও পারে, হার্টফেল করাও সম্ভব।’



‘আমি তার কি করছি?’

‘ভারি হাজারি তো! আচ্ছা, আমি কল্পের সঙ্গে কথা কই। দেখি পছন্দ করানো যায় কিনা!’

‘তাহলেই তুমি গোল বাধাবে। এমন কাজও কোরো না।’

‘কেন? আমি কি কথা কইতে জানি না?’

‘দেখো, খুব সাবধান কিন্তু! কল্প কি রকম সেন্সিটিভ মেয়ে, জানো তো?’

‘জানি জানি! আমাকে আর তোমায় অতো করে বলতে হবে না।’

হঠাৎ কিছু বেমত্কা বলে বোসো না বেন। খুব আস্তে আস্তে কথাটা শুরু করো। বুঝলে? মেয়েদের মন হচ্ছে কাঁচের বাসনের মতো। ভারি ঠুনকো, কপার ঘাসে বাজানোও যায়, ভাঙাও যায় তেমনি আবার।’

‘সাহিত্য শুরু করলে যে।’

‘আমাদের মনের কি জানবে তোমরা? আমরাই জানিনে। সত্যি, বোকার মতো যা তা বলে’ বোসো না বেন। ছিপি খুলে একটু বুজি না হয় খরচই করলে। জীবনে একটা দিন হাঁদা না হলেও তেমন বিশেষ ক্ষতি হবে না তোমার।’

‘ভেব না, ভেব না। খুব কোশলে আমি কথাটা পাড়ব। হঠাৎ কিছু বলব না, সোজাসুজিও বলব না। ফল করে বেঁজাস কিছু নয়। খুব ঘুরিয়ে, ফিরিয়ে, কায়দা করে ইনডিপেন্ডেন্ট কথাটা পাড়তে হবে তো? এখনই আমি যাচ্ছি ওর কাছে।’

কিন্তু ওঁকে আর জয়যাত্রায় বেরতে হয় না। কল্প নিজেই বাতি হাতে কি খুঁজতে ঘরের মধ্যে আসে। ওর মুখের চেহারা দেখেই বোঝা যায় একটু আগেই ও কৈদেছে। লাবণ্যর চোখে তা ধরা পড়ে। লাবণ্য ওর দিকে হাত নেড়ে ইঙ্গিত জানায়, যার অর্থ হচ্ছে, এখন নয়, এখনই নয়, এখন শু-কথা নয়। কিন্তু সে ইশারা উনি গ্রাহ্যই করেন না। ওঁর সমস্ত মুখ তখন ভয়ানক খুসীতে ভরে উঠেছে। বাল্মীকির প্রথম বাক্যের মতো ওঁর মর্মভেদী বাণী বহির্গত হয়ে গেছে—‘এই যে কল্প! হৌৎকা গণেশ কি বলছিল আজ তোমায়?’

লাবণ্য সোফায় এলিয়ে পড়ে। কে বেন তাকে গুলি করেছে। ছ’হাতে সে মুখ ঢাকে।

কল্প বেন ওঁর কথা শুনেই পায় না। মুখ ফিরিয়ে একবার তাকায় ওঁর দিকে, কিন্তু সে মুখে ভাবের ছায়ামাত্র নেই। চোখে বেন সে দেখছেই না। তার দৃষ্টি বেন ভগ্নিপতিকে ভেদ করে ছ-হাজার মাইল দূরে প্রসারিত। যেমন স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো সে এসেছিল, তেমনি চলে গেল আবার।

‘আচ্ছা মেয়ে বাবা!’ অনেকক্ষণ পরে ওঁর বাক্যসৃষ্টি হয়, ‘বেশ একখানা লেডি ম্যাকমেথিস্ টাইল ঝেড়ে গেল। এমন নিশির ডাকে পাওয়ার আর্টিষ্টিক অভিনয় থিয়েটারের বাইরে দেখার সৌভাগ্য আমার কমই হয়েছে। তুমি যদি এমন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কায়দা করে কথা না কইতে বলতে, পুরুষ মানুষের মতো সোজাসুজি কথা পাড়তে দিতে আমায়—’

‘দোহাই তোমার পায়ে পড়ি! আর কথা কইতে হবে না তোমাকে।’

‘কইবই না তো! আধখানা কথা পেটে, আধখানা মুখে....অমন করে কথা বলতে কেবল মেয়েরাই পারে। আমরা পুরুষ মানুষ—সোজা কথা সোজাসুজি বলে ফেলতেই ভালবাসি।’

উনিগজগর করে গজরাতে থাকেন।

দিদির ঘর থেকে বেরিয়েই গণেশের সঙ্গে মুখোমুখি হোলো কল্পনার। গণেশ এগিয়ে আসে। ‘কল্প!’ নরম গলায় ডাক দেয়।

‘একটি কথাও না এখন।’ কল্পর কণ্ঠস্বর পৃথিবীর মতোই, উত্তর-দক্ষিণে চাপা।

গণেশ আঙুল দেখায়, ‘ও! তোমার দিদি আর উনি ঐ ঘরে বুঝি? বুঝেছি। কিন্তু সব ঠিক তো আমাদের?’

‘সেজদিকে বলেছি আমি।’

‘র’্যা?’ গণেশ বিচলিত হয়। ‘সমস্ত? বলো কি? আজ রাতে এখান থেকে পালিয়ে কলকাতায় গিয়ে আমাদের বিয়ের কথাও?’

‘সেসব প্রাণ কি আউট করি? পাগল!’ কল্পা জবাব দেয়।

# কুকুর-বেড়াল

[ একাঙ্কিকা ]

নাট্যকার মনমথ রায়

[ বিখ্যাত এ্যাডভোকেট গম্ভীরানন্দ মিত্রের চেম্বার। শ্রীযুক্ত মিত্র একটি ফাইল পাঠরত। চেম্বারের পরদা সরাইয়া একটি মহিলা দেখা দিলেন। ]

মহিলা ॥ আসতে পারি ?

[ মিত্র আসিতে ইঙ্গিত করিলে অতি আধুনিক একটি তরুণী উদ্ভাস্ত ভাবে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন ]

তরুণী ॥ আমি বড় বিপন্ন শ্রীযুক্ত মিত্র। স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। আমি জানি, এ বিষয়ে আপনার চেয়ে বড় উকিল আর নেই বললেই হয়, কিন্তু তাতেই হয়েছে বিপদ। আমার স্বামীকেও দেখলাম, আপনার এই চেম্বারের দিকে আসছেন। কিন্তু আমি এসেছি আগে। আশা করি আপনি আমাকেই সাহায্য করবেন। আমি আপনাকে আপনার পুরো ফি একশ' টাকাই দেব।

[ চেম্বারের দরজায় স্বামীর কণ্ঠ ও শোনা গেল ]

স্বামী ॥ আসতে পারি স্যার ?

[ শ্রীযুক্ত মিত্র এই অনুমতি বাহাতে না দেন তাহার জন্ত জী হাত নাড়িয়া ব্যাকুল মিনতি জানাইলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত মিত্র তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। ]

স্বামী ॥ আসবো স্যার ?

[ অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই তিনি ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। মিত্র অঙ্গুলী নির্দেশে তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। স্বামীটি জীর দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া চেয়ারে বেশ গাঁট হইয়া বসিলেন ]

জী ॥ (স্বামীকে) তুমি ভেবেছ কি ? তুমি এখানেও আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে নাকি ?

স্বামী ॥ আমি জানি, শ্রীযুক্ত মিত্র বিবাহ বিচ্ছেদের

সবচেয়ে বড় উকিল। তুমি যে গুঁর কাছে এসে আমার নামে কতকগুলো মিথ্যা কথা লাগিয়ে গুঁর মন গলিয়ে দেবে—আমার বিরুদ্ধে গুঁর মন বিষিয়ে দেবে—এ আমি হতে দেব না।

জী ॥ (মিত্রকে) আমি আগে এসেছি। আমি আপনাকে পুরো ফী দেব। আশা করি আপনি আমার কথাই গুনবেন শ্রীযুক্ত মিত্র।

মিত্র ॥ (মৃদু হাস্য।)

স্বামী ॥ (মিত্রকে) আমিও আপনাকে আপনার পুরো ফী একশ' টাকাই দেব, আমার কথাও আপনাকে গুনতে হবে স্যার।

মিত্র ॥ (এবারও মৃদু হাস্য।)

জী ॥ লোকটি কেমন জুলুমবাজ, আশা করি আপনি এতেই বুঝে গেছেন শ্রীযুক্ত মিত্র। দরকার হলে লোকটি খুনও করতে পারে, এও আপনাকে বলে রাখছি স্যার।

স্বামী ॥ বিনা দরকারেই তুমি আমাকে প্রায় খুন করেছো। কি বলবো স্যার,—কি বলবো স্যার, একটা জলন্ত চিমটা দিয়ে আমাকে পুড়িয়েছে।

জী ॥ তুমি একটা জলন্ত সিগারেট আমার হাতের উপর ঠেসে ধরেছিলে! তাই না আমি নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে ঐ জলন্ত চিমটা দিয়ে তোমাকে ঠেঙিয়ে আত্মরক্ষা করেছি। নইলে কি কেউ সাধ করে স্বামীর গায়ে হাত তোলে!

স্বামী ॥ স্যার আপনিই বুঝে দেখুন, কেউ কি সাধ করে জীর গায়ে হাত তোলে? আদরের জীর গায়ে? যখন দেখলাম, না, আর উপায় নেই, তখনি না আমি—

জী ॥ উপায় ছিল না—একথা ধর্মতঃ বলতে পারো



তুমি? ঐ বাঘাটা—কুকুৰটা তোমাৰ না পুহলে কি  
কিছুতেই চলতো না?

স্বামী ॥ আমি তোমাকে বিয়ের আগেই বলেছি,  
বিয়ের পরেও বলেছি, দেখ, আমি সব সইতে পারি, কিন্তু  
বেড়ালের 'ম'্যাও ম'্যাও' ডাক সইতে পারিনে। তবু কিনা  
তুমি সেই বেড়ালই পুহলে গণ্ডায় গণ্ডায়?

স্ত্রী ॥ লোকে হাতি পোষে, বানর পোষে, আর আমি  
স্ত্রী বলে আমার কি এটুকুও স্বাধীনতা নেই যে আমি একটা  
বেড়াল পুষবো? বেড়াল পুষেছি বেশ করেছি।

স্বামী ॥ ঐ বেড়াল তাড়াতে আমিও বাবা কুকুৰ  
পুষেছি—বেশ করেছি।

স্ত্রী ॥ বেশ করেছে? বেশ, আমিও তাই তোমাকে  
চাবির রিং ছুঁড়ে মেরে অন্ডায় করিনি।

স্বামী ॥ আর তাই আমিও তোমার গায়ে এক বালতি  
গরম জল ঢেলে দিয়ে কোন অন্ডায় করিনি।

স্ত্রী ॥ (মিত্রকে) আপনি শুনেছেন স্যার?

মিত্র ॥ (মাথা নাড়িয়া জানাইলেন 'হ্যাঁ')।

স্বামী ॥ আশা করি আপনি আমার কথাগুলোও  
শুনেছেন।

মিত্র ॥ (মাথা নাড়িয়া জানাইলেন 'হ্যাঁ')।

স্ত্রী ॥ এই লোকটির এই সব অত্যাচারে আমাকে  
হাসপাতালে থাকতে হয়েছে তিন মাস।

স্বামী ॥ হ্যাঁ, নিজের খরচে নয়, আমার খরচে। আর  
তোমারও ঐ সব অত্যাচারে আমাকেও হাসপাতালে  
থাকতে হয়েছে পুরো তিন মাস। তার খরচ তুমি দাওনি—  
সে খরচ বইতে হয়েছে আমাকে।

স্ত্রী ॥ এই তিনটি মাস হাসপাতালে পড়ে থাকায়  
আমার যে কী নিদারুণ ক্ষতি হয়েছে তা' তুমি জানো?

স্বামী ॥ তোমার আবার কি নিদারুণ ক্ষতি হয়েছে?  
নিদারুণ ক্ষতি হয়েছে আমার। হাসপাতাল থেকে বাড়ি  
গিয়ে দেখি আমার বাবা নেই। তার বকলসটাই শুধু  
পড়ে আছে। বেচারি আমার শোকে তিলে তিলে কাঠ  
হয়ে মারা গেছে।

স্ত্রী ॥ আর আমার? আমার ক্ষতি হয়নি? হাস-  
পাতাল থেকে বাড়ি ফিরে দেখি আমার খাড়িটা গেছে  
পালিয়ে, বাচ্চাগুলো সঙ্গে নিয়ে। (ক্রন্দন)

স্বামী ॥ আর আমার বাবাটা? তার লাশটা পর্যন্ত  
আমি দেখতে পেলাম না। (ফুঁপাইয়া ক্রন্দন)

স্ত্রী ॥ (ধরা গলায়) একি! পুরুষ মানুষ হয়ে তুমি  
ভেউভেউ করে কাঁদছো? স্যার কি মনে করছেন বল  
তো? না না, শোনো, তুমি কেঁদো না! আমি সব সইতে  
পারি—তোমার কান্না সইতে পারিনে। তুমি কাঁদলে  
আমার কান্না পায়। তুমি কেঁদো না। বেশ, বেড়াল  
আর আমি পুষবো না; পুষবো না।

স্বামী ॥ তুমি বেড়াল না পুহলে, আমারো কুকুৰ  
পোষার কোনো মানে হয় না। বেড়াল যদি না থাকে  
কুকুৰও থাকবে না।

স্ত্রী ॥ তবে তো ঝগড়া-ঝাঁটির আর কোনো কারণই থাকে  
না। (মিত্রকে) আপনি কি বলেন স্যার?

মিত্র ॥ (মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন)

স্বামী ॥ তবে তো বিবাহ বিচ্ছেদের কথাই উঠছে  
না। কি বলেন স্যার?

মিত্র ॥ (মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন)

স্ত্রী ॥ তাহ'লে আমরা আর এখানে কেন! কি  
বল গো?

স্বামী ॥ তা তো বটেই। চলো—বাড়ি চলো।

স্ত্রী ॥ (হাসিমুখে) তাহলে এখন থেকে আমাদের  
কুকুৰ-হীন জীবন—

স্বামী ॥ এবং বেড়াল-হীন জীবন, কেমন তাই  
তো?

স্ত্রী ॥ নিশ্চয়! নিশ্চয়! এখন শুধু তুমি আর  
আমি।

স্বামী ॥ হ্যাঁ, আমি আর তুমি। কুকুৰ বেড়াল  
ভুলে গিয়ে—

স্ত্রী ॥ একমন একপ্রাণ হয়ে—(অনুরাগ ভরে স্বামীর  
হাত ধরিতে গেলেন)

স্বামী ॥ আঃ! দেখছো না, স্যার—

স্ত্রী ॥ ওঃ! (সংযতহইয়া) অচ্ছা স্যার, তাহলে  
আমরা আসি।

মিত্র ॥ (সম্মিত মুখে সম্মতি জানাইলেন।)

স্বামী ॥ চললাম স্যার।

(শোষণ পদবর্তী পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য)

# রবীন্দ্রনাথের - আধ্যাত্মিকতা ,

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ

আত্মিক-চেতনায় কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ঋষিদৃষ্টিতে দেখেছেন পরমসত্যের বিস্ময়কর রূপ—সৌন্দর্য ও আনন্দের উপলব্ধিতে স্পন্দিত। রবীন্দ্রনাথ এই অনন্তের রূপকেই উদ্গীত করেছেন উপলব্ধির বিচিত্র প্রকাশে—মুগ্ধকে অতিক্রম করে চিন্ময়ের আনন্দ রূপে। তাই প্রাণের যোগে উষোধিত হয়ে উঠে দেখেন বিশ্বস্পন্দনে অণু-পরমাণু কম্পমান, চেতনার তালে তালে সঞ্চারিত এক রস-ধারা অনন্তের দিকে প্রবাহিত, অনন্তের আনন্দে জেগে আছে চরাচর—দুঃখের উর্ধ্বে এই আনন্দের নিবিড়তায় ধ্বনিত নিত্যসঙ্গীতে চিরন্তন। সেখানে সীমার মধ্যে অসীমের সুর। কবি দেখেছেন, নিত্য লীলার অনন্তের প্রকাশকে—তাই বলেন, “আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।”

বিচিত্রের দূতরূপে কবি বলেছেন নিজেকে—এই বিচিত্রের দূত। এই বিশ্বসংসারে দেখেছেন, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে চলছে এই সীমা-অসীমের পালাগান। সীমার মধ্যে বিচিত্রকে দেখেছেন—অসীমের আনন্দে খুঁজে পেয়েছেন মুক্তি-রসের আনন্দ।

এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে আত্মকথায় বলেছেন—

“প্রকৃতি তাহার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধি-মন তাহার স্নেহ-প্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি অবিদ্যাস করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে, তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই। নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণ-পাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে। প্রেম ও প্রেমের বিষয়কে অতিক্রম করিয়াও ব্যাপ্ত হয়; যে জিনিষটাকে সন্ধান করিতেছি, দীপালোক কেবলমাত্র সেই জিনিষটাকে প্রকাশ করে তাহা নহে, সমস্ত বস্তুকে আলোকিত করে। জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদের টানিতেছেন—আর কাহারও টানিবার ক্ষমতা নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যে সেই অরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুক্ত, সেই মোহেই আমার মুক্তি-রসের আনন্দ।”

কবির মহাজীবনের পরিচয় ফুটে উঠে সৃষ্টির ক্ষেত্রে—কবির জীবন দ্রষ্টা ও স্রষ্টার জীবন। চিন্তার তরঙ্গে তরঙ্গে

( পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেষাংশ )

[ মিত্র সম্মিত মুখে সম্মতি জানাইলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নমস্কার করিয়া যাইতেছেন। এমন সময় শ্রীযুক্ত মিত্র টেবিলে সজোরে মুঠাঘাত করিয়া হুংকার দিয়া হাত পাতিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চমকাইয়া উঠিলেন। ]

স্ত্রী ॥ ও! তাই তো! ফী। ১০০ টাকা। ( পাস খুলিয়া টেবিলের উপর ১০০ টাকা রাখিলেন )।

স্বামী ॥ বটেই তো! ( মানি ব্যাগ হইতে ফী'র টাকা শ্রীযুক্ত মিত্রের সামনে রাখিলেন )

উভয়ে ॥ ( স্বামী ও স্ত্রীর মুখ বাঙলা পাঁচ-এর আকার ধারণ করিল ) আচ্ছা চলি!

মিত্র ॥ [ নোটগুলি গুনিতে লাগিলেন ]।

॥ ধর্মজিকা ॥



কবি-হৃদয় জগৎ-রহস্যকে তাই উদ্ঘাটন করে। দেখে, বিশ্ব-জগতের হৃদয় স্পন্দিত হয়ে নিত্যকালের রস-উৎস অবিরাম উৎসারিত হয়ে চলেছে—কাল থেকে কালে, যুগ থেকে যুগে বিচিত্র রূপে সেখানে আনন্দ বেদনার গান। ব্রহ্মদর্শী কবির মত ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন অনন্তকে। মুক্তিদাতার জগৎ সংসার-বৈরাগ্য এবং ইহ-বিমুক্ততার প্রয়োজন কবি কখনো অনুভব করেননি—দ্রষ্টার দৃষ্টিতে দেখেছেন অন্তরের প্রকাশকে। মুক্তি ও বন্ধনের সমন্বয়ের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের মুক্তি-ভাবনাবোধের প্রকাশ নানাভাবে বিকশিত। ইন্দ্রিয়ের সীমার অতীন্দ্রিয় অনুভূতির আশ্বাদন, সীমার মধ্যে অসীমের রাগিণী শ্রবণ, রূপের মধ্যে অপরূপকে দর্শন, কবির আধ্যাত্ম-চিন্তাকে বিকশিত করেছে সহস্রদল পদ্মের মত। এখানে কবির অনুভূতি আধ্যাত্মিক চেতনার একটি নতুন ভাবস্বর্গ বিরচিত করেছে। ভাবলে বিশ্বয় লাগে যে, সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দময় বিধেয়ক্যামুভূতির আলোকে বন্ধনের মধ্যেই মুক্তির আলোক বিকীরণ দেখেছে কবির আধ্যাত্ম-মানস। এখানে কবি বৈরাগ্যবাদী উদাসীনতার সঙ্গে সংসারকে ত্যাগ করার চেষ্টা করেন—বস্তুর বন্ধনের মধ্যেই অপরিণামের আনন্দকেই সন্ধান করে। আমরা শুনতে পাই—

“যেনাজং পুরুষং বেদং সত্যং

প্রোবাচ হাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিজ্ঞান্ ॥”

—বেদান্তের সেই চরম ও পরম কথা। সেই সত্যরূপী অমর পুরুষের, সেই সত্যাত্ম সত্যং ব্রহ্মতত্ত্বের বাণী।

দার্শনিকতার দিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চিন্তার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সংসারকে স্বীকার করেই মুক্তি—সাধনার দর্শন। কবির কথাতেই দেখতে পাই, বিশ্বজীবনের সঙ্গে সংযুক্তির পথে আত্মার আনন্দ বিহারের কথা। কবি বলছেন—

“আজ বুঝিয়াছি সে সকল লেখা উপলক্ষ্য মাত্র, তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন রচনাকারী আছেন। তাঁহার সম্মুখে সেই ভাব তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান। শুধু কবিতা লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন তাহা নহে।...আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি আমার জীবনকে

যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে, তিনি বারে বারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন। তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা বিচ্ছেদের দ্বারা বিশ্বের সহিত বিরোধের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন। তাই যে কবি, যিনি সমস্ত ভালো-মন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল-প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাহাকেই আমার কাব্যে “জীবন দেবতা” নাম দিয়াছি।”

‘জীবন দেবতা’র লীলাসঙ্গীতেই বিশ্বজীবন ও বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্মুখীন রহস্য উদ্ঘাটন করে কবিমানস ব্রহ্মপত্নীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে—এই ব্রহ্মপত্নী রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চিন্তার চরম প্রকাশ। কবি সীমার মধ্যে অসীমকে দেখেছেন বলেই রস সাধনার সিদ্ধি লাভ করে’ আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করেছেন, বিশ্বের অনিত্যের মধ্যে সত্যের চিহ্নন নিত্যরূপ দেখেছেন, কবি চিরবন্ধন-মুক্ত প্রাণের আলোকে অখণ্ড সত্যের সমগ্র রূপকে প্রত্যক্ষ করেই বলেছেন—

জীব, জগৎ ও জগতের লীলার সংসারে লীলার আনন্দ। মর্ত্যে অমর্ত্যের আলো খরে পড়ে বলেই সীমা অনন্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে রচনা করে ব্রহ্মভাবহ্যতিতে সচ্চিদানন্দের আনন্দরূপ।

কবি তাই দেখেন—

“কুসুম আপন গন্ধে সমস্ত সংসার

সম্পূর্ণ করিয়া তব সম্পূর্ণতা নয় ;

তোমারি পূজার তার শেষ পরিচয়।

সংসার বঞ্চিত করি’ তব পূজা নহে।”

সংসারকে বঞ্চিত করে নয়, সংসারকে স্বীকৃতি দিয়েই বিশ্বদেবের পূজা। বিশ্ব-সত্যের পরশে স্তব্ধের আনন্দ তরঙ্গিত হয়—হৃৎকের উর্ধ্ব মৃত্যুর উর্ধ্ব মানবাত্মার ভূমানন্দের মহাসঙ্গীত ধ্বনিত হয়ে বিশ্বসত্যের ভাগবতসত্যের পরমানন্দকে সমুদ্ঘাটিত করে, প্রকাশিত করে। সংসার লীলাতেই কবি মুক্তির আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন বলেই কবির দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়ে—

“এই বিশ্বসত্যের পরশ,

জলে স্থলে তলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরশ

তুলি লব অন্তরে অন্তরে,

সর্ব দাহ রক্তশ্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে কণ্ঠস্বরে,

জাগরণে দেখানে তুম্ভায়,

বিরাম সমুদ্রতটে জীবনের পরম সন্ধ্যায় ।”

বৈষ্ণব কবির দৃষ্টিতে ভগবানের চিদ্রসঘন যে মূর্তি  
প্রসুতিত হয়ে উঠেছে বিতাপতির কাব্যে তা বাস্তব—

“জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু

নয়ন না তিরপিত ভেল ।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু

তবু হিয়া জুড়ন না গেল ॥

প্রেমধর্মের এই অপূর্ব রস বৈষ্ণব কবিবৃন্দের পদাবলীতে  
অলৌকিক প্রেমের রহস্যকে উদ্ঘাটিত করেছে । রবীন্দ্রনাথের  
আধ্যাত্মিকতাও প্রেমধর্মের ছাতিতে ভাস্বর । তিনি বলেন—  
“সংসার বঞ্চিত করি’ তব পূজা নহে ।”

“বিশ্ব যদি চণ্ডে যার কাদিতে কাদিতে,  
আমি একা বাস’ রব মুক্তি আরাধিতে ?  
জন্মেছি যে মর্ত্যালোকে ঘৃণা করি তা’রে  
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবানে ।”

অন্তরে প্রেমধর্মের নিখার ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে  
বলেই রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা প্রেমসুন্দর । কবি বিশ্ব  
ও প্রকৃতিকে জীবনে বারংবার নব নব রূপে দেখেছেন,

অন্তরের আনন্দ-বেদনার সংসারকে স্বীকার করেছেন ।  
রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার মর্মবাণী প্রেমের মাহাত্ম্য—  
মিলনের আনন্দ ও বিরহের অশ্রুতে । কবির জ্ঞান-ধ্যান,  
তপস্যা-ত্যাগ, অমুরাগ-বৈরাগ্য-পন্থীর সংসার দুঃখের মূলে,  
পরে নয় ।

এ যেন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডকে  
বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্যকে খুঁজে পাওয়া । অব্যক্ত  
ব্যক্ত এখানে—নিত্যলীলার সঙ্গীতে সঙ্গীতে গভীরতম  
ও নিবিড়তম ভাবে কবি জীবনদেবতার বন্দনা করেছেন—  
‘আপন মনের মাধুরী মিশায়’ দেখেছেন অরূপকে সংসারের  
তীর্থভূমিতে রূপময় গুণময় আনন্দময়রূপে । সংসারের বন্ধন  
মধুর হয়ে উঠেছে পরশাতীতের পরশে । কবি তাই  
বলেন—

“মর্তবাসীদের তুমি যা দিয়েছ ও ভু  
মর্তের সকল আশা মিটাইয়া তবু  
রিক্ত তাহা নাহি হয় । তার সবশেষ  
আপনি খুঁজিয়া ফেরে তোমারি উদ্দেশ ।”

চরম সত্য, চরম সৌন্দর্য, চরম মঙ্গল অন্তরানুভূতিতে  
রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার এই সত্যই ভুলে ধরেছে  
অনিবর্তনীয় আনন্দের নিত্যআনন্দের রসানুভূতি ।—

## সূর্য কি আমায় চেনে ?

উমাদেবী

সূর্য কি আমায় চেনে ? আমি সন্ধ্যাতারা,  
পশ্চিমের বিগলিত-স্বর্ণালোকছায়ে  
সূর্যকে দেখেছি আমি স্তিমিত সন্ধ্যায়—  
ধীরে ধীরে মিলেছে সে রাত্রির তিমিরে ।  
রাত্রির তিমিরে দিক থেকে দিগন্তরে  
অনেক খুঁজেছি তাকে তন্মাহারা হয়ে—  
বিতাপ করেছি কত—“হীন অন্ধকার,  
সূর্য-সঙ্গে যা এনেছে সূচির বিচ্ছেদ ।”

—হে সূর্য, হৃহর্ত শুধু ফিরে চেয়ে দেখো—  
আমি শুভ্র শুকতারা উজ্জল আকাশে—  
যাই—যাই—ডুবে যাই—আলোক-প্রবাহে—  
আলোক-প্রবাহে ডুবে যাই সর্বহারী ।  
বন্ধু ফেরো—ফিরে চাও একটি নিমেষ—  
—কে জানে, আলোকও আনে সূচির বিচ্ছেদ ।



# অলৌকিক রহস্য

# সত্য ঘটনা

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

## প্রত্যক্ষদর্শীর কথা

অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং প্রেততত্ত্ব নিয়ে যারা অন্বেষণ করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে বলেন, তুন্তে পায়নি, এমন কোনো ব্যক্তিকে যদি চক্রবৈঠকে মিডিয়াম করা হয়, তাহলে তার তন্ত্রাবস্থায় সে যে-কথা বলে, সে-সব কথা তার নিজের মনের বা নিজের থেকে বলা কথা নয়...তার উপর তখন কোনো মৃতের আত্মার ভর হয় এবং সেই আত্মার দ্বারা সম্পূর্ণ আবিষ্ট হয়ে মিডিয়াম তখন কথা বলে, প্রশ্নের জবাব দেয়।

এ-সম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শী এ-ব্যাপারে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় যে-বিবৃতি লিখেছেন, তার মর্ম সঙ্কলন করে দিচ্ছি।

তিনি লিখেছেন—১৯০৩ সাল থেকে তিনি এ-বিষয়ে অন্বেষণ করছেন এবং এর মূল তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্ত তিনি বহু পরীক্ষা করেছেন।

তাঁর প্রথম পরীক্ষা হয় কলিকাতা দর্জিপাড়ার কবিরাজ অন্নদাচরণ সেন মহাশয়ের গৃহে। কবিরাজ মহাশয়ের একটি ছাত্র...তাঁর বয়স তখন আঠারো বছর। তিনি কবিরাজ মহাশয়ের গৃহে থেকে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করছিলেন। বালকটি শুদ্ধাচারী এবং সত্যপরায়ণ...বিনয়ী এবং বুদ্ধিমান। কবিরাজ মহাশয়ের গৃহে সাইকিক চক্রবৈঠক বসতো হুগুয়া দুদিন নিয়মিত ভাবে এবং সে-বৈঠকে বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি, উকিল, ডাক্তার এবং পদস্থ সরকারী কর্মচারীরা উপস্থিত থাকতেন। লেখক লিখেছেন— দু'চার বার এ-ছেলেটিকে আমি মিডিয়াম হতে দেখেছি। বৈঠকের পরে যখন তিনি সচেতন ভাবে নিজের পড়াশুনা বা কাজকর্ম করতেন, তখন তাঁকে এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন—Trance হলে তিনি কি করেন, কি

বলেন, সে সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন না...তবে তাঁর মনে হয়, তিনি যেন 'তিনি' নন...গার কেউ। সচেতন অবস্থাতেও মাঝে মাঝে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি হয়, তাঁর মধ্যে যেন তিনি ছাড়া আর একজন আছেন...He felt himself conscious of two consciousnesses...অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে যেমন তাঁর নিজস্বতা আছে, তেমনি সেই সঙ্গেই তিনি উপলব্ধি করেন, যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর একটা সত্তাও তাঁর আছে...He has a feeling that there is another self separate and distinct from the first.

কবিরাজ মহাশয় বলতেন—ঘরে সাতজন, দশজন, তিনজন অর্থাৎ যত লোক থাকুক...বৈঠক হলে এই ছেলেটিই হন তন্ত্রাবিষ্ট অর্থাৎ তাঁর উপরে হয় স্পিরিটের ভর। মিডিয়াম হিসাবে এঁর যোগ্যতা আর সকলের চেয়ে বেশী।

লেখক লিখেছেন—এর আবেশ হবামাত্র লক্ষ্য করেছি, He was completely metamorphosed. তাঁর মন যেন হয়েছে আর একজনের মন...তাঁর নিজের মন থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন...দেহের ভঙ্গী যায় বদলিয়ে এবং কণ্ঠের স্বর তখন হয় অগ্নরকম। দে-স্বর শুনলে তাঁর কণ্ঠস্বর বলে মনে হয় না। তাছাড়া দেখেছি, নাড়ীর গতি হয় ধীর মন্দ...গায়ের তাপ এক ডিগ্রী কমে যায়...দেহ যেন হয় একটা কাষ্ঠখণ্ডের মতো নিশ্চল, নিম্পন্দ।

এ-আবেশ পরিপূর্ণ হবার আগে পর্যন্ত তাঁর অনুভূতি, থাকে সজাগ অর্থাৎ হাতে পিন ফোটালে তিনি ব্যথা পান। আবেশ পরিপূর্ণ হলে তখন গায়ে পিন ফোটালেও কোনো সাড়া থাকে না। তিনি থাকেন জড় পদার্থের মতো নির্বিকার। জ্ঞান হবার পনেরো মিনিট পরে দেখেছি,

মিডিয়ামের দৃষ্টি পূর্ণ বিস্ফারিত। জ্ঞান হবামাত্র ডান হাতের আঙুল দিয়ে ডান নাক চেপে ধরলো—বুড়ো আঙুলে পৈতা জড়ালো—ধীরে ধীরে প্রশ্বাস ছাড়লো। প্রায় পনেরো মিনিট ধরে এই অনুষ্ঠান—তারপর দেখি, নাড়ীর স্পন্দন হলো স্বাভাবিক। বরজ্জ্বল সকলেই এ-সব লক্ষ্য করলেন। একজন আরো একটি জিনিষ লক্ষ্য করেছিলেন—ইসারায় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন—তখন দেখি, যে-তক্তাপোষে তিনি বসেছিলেন—সেই তক্তাপোষ থেকে তিনি প্রায় আধ ইঞ্চি উচুতে অবস্থিত—অর্থাৎ দেহ তক্তাপোষ স্পর্শ করে নেই।

তারপর আর একদিন দেখলুম, আবেশকালে তাঁর দেহ অচেতনের মতো তক্তাপোষে লম্বালম্বিভাবে শায়িত—মাথার উপরে দেখি, দুটো গোলা ভাসছে—নীলাভ আলোর ছটা সে-দুটি গোলায়—গোলা দুটির সঙ্গে অতি মিহি কুয়াশা রেখাসূত্র দিয়ে মিডিয়ামের দেহের যোগ রয়েছে।

আমাদের তরফ থেকে প্রশ্ন হলো—তুমি কে?

মিডিয়ামের কণ্ঠে স্পষ্ট জবাব ফুটলো—যত মূর্থ অবিখ্যাসীর দল! তোমরা জানো না, আমার কতখানি ক্ষতি করেছে তোমরা।

—কিন্তু আমরা তো আপনাকে ডাকিনি।

—আমার আসার জন্ত তোমরাই দায়ী।

—তোমার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলবে না?

—বলতে পারি—কিন্তু তোমরা অবিখ্যাসী—তা বিশ্বাস করবে না।

—আপনি জীবিত আছেন? না, পরলোক-গত?

—একদিন আমি জীবিতদের সঙ্গে জীবলোকে ছিলাম।

—এই মিডিয়ামের দেহে আবিষ্ট হবার পূর্বে আপনি কোথায় ছিলেন?

—এখান থেকে কাছে একটা বেলগাছ আছে—সেই বেলগাছে।

—আপনি কে?

—আমি কে, তা জেনে লাভ নেই। যদি তোমরা স্পিরিটের দ্বারা হিতসাধন চাও, তাহলেই স্পিরিটদের ডেকো। স্পিরিটের পরিচয় জেনে কোনো লাভ হবে না। তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে—জিজ্ঞাসা করতে পারো।

অবস্থার সঙ্গে হবে আমার সংযোগ-স্থাপন—তাতে আমি ব্যথা পাবো।

—এখানে আপনি কত কাল আছেন?

—বহু কাল।

—কিন্তু কে আপনি?

এ-প্রশ্নে মিডিয়াম যেন ক্ষেপে উঠলো—তার শরীরে এমন শক্তি সঞ্চারিত হলো যে স্পষ্ট তা লক্ষ্য করলুম। তীব্র চীৎকার করে উঠলো সে—তারপর যাতনায় গাঁড়ানি। বহু কাকুতি-মিনতি জানিয়ে তাকে শান্ত করলুম—তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ—সে একেবারে স্থির।

এই সময়টার দেখি, সে জপ করছে যেন—নিখাস বন্ধ করে যেন প্রাণায়াম করছে! মিডিয়াম প্রাণায়াম করে—এই আমি প্রথম দেখলুম। তখনো আমরা সকলে দেখছি, মিডিয়ামের মাথার উপর দুটো আলোর গোলা। সে-দুটি গোলা মিডিয়াম নিলে দু-হাতে—তখন গোলার রঙ ধোঁয়াটে নীল—তারপর গোলা দুটি মুখে পুরলো।

এক্ষেত্রে তার কাছ থেকে দুটি তথ্য পেলুম—(১) মৃত ব্যক্তির আত্মার ভর হয়েছে; (২) সে-আত্মার আবির্ভাব (বিনা আহ্বানে) সকলের হিত সাধনার্থে।

তারপর আমরা মিনতিভরে অনুরোধ নিবেদন করলুম—দয়া করে আপনার পরিচয় দিন।

জবাব: আমার পরিচয়—আমি স্পিরিট—আমি আত্মা। এ-ব্যাপার নিয়ে কোতুক করো না—নিষ্ঠাভরে অনুশীলন করো—ভক্তিপূত চিন্তে। তোমাদের চারিদিক ঘিরে কত-না রহস্ত রয়েছে—ভক্তিভরে অনুশীলন করলে সে-সব রহস্ত জানতে পারবে।

এরপর মিডিয়ামের অবস্থা হলো এমন—যেন সে Collapse করবে। ডাক্তার ছিলেন আমাদের সঙ্গে—তিনি তার নাড়ী পরীক্ষা করে বললেন—আর নয়—একে মুক্তি দিন।

আমি তখন স্তম্ভিতপ্রায়—মিডিয়ামের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে যে যে আছি—চোরে থাকতে থাকতে দেখি, তার দেহ থেকে ছায়ার মতো কি যেন বিনির্গত হলো—বিনির্গত হয়ে সে-ছায়া আকার ধারণ করলো ধীরে ধীরে—বেশ জোয়ান



ভীত দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ। সে-দৃষ্টি আমি জীবনে  
ভুলবো না!

আমি যেন মস্তম্পৃষ্ট....নিজেকে প্রকৃতিস্থ করবার প্রয়াস  
পেলুম....মুখে কথা ফোটে না—যেন Auto-hypnotised!  
আমার চোখের সামনে কুয়াশা-জাল বিস্তারিত হলো....  
মিডিয়ামের দিকে আমি চেয়ে আছি একাগ্র দৃষ্টিতে। হঠাৎ  
কানে শুনলুম মিডিয়ামের কণ্ঠে বাণী...এ-কণ্ঠ গম্ভীর....  
মিডিয়ামের কণ্ঠ নয়। বাণী শুনলুম—দেহে মনে শুদ্ধাচারী  
হও....আমি ব্রাহ্মণ, আমাকে একটা ঝুলি দাও। তামাসা  
দেখতে এসেছো....ঝুলি দিয়ে জাখো, কি তখন দেখবে।

এ-কথায় চেতনা হলো। কিন্তু কোথায় পাবো ঝুলি?

একজনের উড়ানি নিয়ে উড়ানির চার কোণ বেঁধে উড়ানিকে  
ঝুলির মতো করে বেঁধে দিলুম মিডিয়ামের হাতে। সেটা  
মিডিয়াম হাতে নিতেই দেখি, যবে আলোর লহর....নানা  
বিচিত্র শব্দ হতে লাগলো....আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত  
যেন বিদ্যুতের প্রবাহ বইছে। তার পর দেখি, ঝুড়ি থেকে  
বেরুলো অনেক ঔষধ....আয়ুর্বেদীয় ঔষধ।

মিডিয়াম বললে—ঔষধ রাখো....বহু রোগীর রোগ  
সারবে এ-ঔষধে।

ঔষধ সত্য....রাখা হলো এবং এইখানেই সে-রাত্রির  
বৈঠক শেষ।

## আশীর্বাদ

শ্রীতারাপদ দাশ

জীবনের কূলে কূলে  
যতো দুঃখ-অশ্রু-অপমান,  
তারি অন্তরালে দিলে  
মহত্তর স্মরণীয় দান।  
যত দেখি ভাবি মনে,  
তত স্পষ্ট হয় মোর চোখে,  
বিপুল সাধনা সেই  
জন্মে জন্মে লেখা হবে বুকে ॥  
কুড়িয়ে যদিও কিছু  
রাখি নাই অনিত্য সঞ্চয়,  
দ্রুত চলার বেগে  
আপনারে করেছি তো ক্ষয়।

অতীত ও ভবিষ্যতে  
দিই নাই স্থান কোল পেতে,  
চূপে চূপে বর্তমানে  
বসিয়াছে নিশীথে প্রভতে ॥  
সংশয়-বিষেব-ভীতি,  
জীবনের যত শোক-তাপ,  
কলুষ-কামনা জাত  
একান্ত-ই সে আমার পাপ।  
অশান্তি-বিজ্ঞপ্তি হিংসা,  
পদে পদে নির্লজ্জ অত্যাচার,  
আঘাতে সংঘাতে কতো  
অপমানে মরেছি লজ্জায়।

অকল্পিত বন্ধে তবু বুঝি নাই দীনতার স্বাদ,  
এ যে তব কতো দয়া, এই তব পূর্ণ আশীর্বাদ ॥

# নো ভোকসি

কুমারেশ ঘোষ

আজ বাঙ্গালীর চারিদিকে ‘নো ভোকসি’ বোর্ড  
ঝুলিতেছে। অবশ্য আগেও ঝুলিত—তবে এমন চারিদিকে  
নয়।

তাছাড়া আগে চাকরির চেষ্ঠায় বাঙ্গালী তরুণরাই জুতা  
ছিঁড়িত, এখন তরুণীরাও স্যাণ্ডাল ছিঁড়িতে শুরু করিয়াছে :  
চাকরি চাই, কিন্তু চাকরি নাই।

কিন্তু সত্যই কি চাকরি নাই? আছে। বহু চাকরি  
আছে এবং স্বাধীন ভারতে আরো চাকরির পদ সৃষ্টি  
হইতেছে। কিন্তু চাকরি দিবে কে? সরকার ছাড়া আজ  
চাকরি দিবার মালিক হইল—সাহেব, মাড়োয়ারী, গুজরাট  
প্রভৃতি—অবাঙ্গালী। সাহেব বাঙ্গালীকে হাড়ে হাড়ে চিনে,  
মাড়োয়ারী-গুজরাটরা জাত ভাইকে ডাকিয়া আনে, কারণ  
ইহারা সকলেই জানে—বাঙ্গালীকে চাকরির চেয়ারে  
বসাইলে—দুদিন পরেই হয়তো তাহাদেরই গদী ছাড়িতে  
হইবে—শুরু হইবে ইনক্লাব জিন্দাবাদ! মাদ্রাজী-বিহারী  
‘ইনক্লাব’ করে না, কাজে কামাই করে না, কথায় কথায়  
তর্ক করে না, কাজ দিলে ফাঁকি দেয় না—তাই তাহারা  
চটপট চাকরিও পায় এবং সে চাকরি বজায় রাখিতেও  
জানে। কারণ মালিক নিজের সাহায্যের জন্তই লোক চায়,  
তাহাকে খুঁচাইবার জন্ত বা তাহার কাজ কাঁচাইবার জন্ত  
মাহিনা দিবে কেন?

তাই আজ অবাঙ্গালী ব্যবসাদার বাংলার টাকা দুই  
হাতে লুঠিলেও বাঙ্গালীকে চাকরি দিয়া তাহার হাতে এক-  
পয়সাও তুলিয়া দেয় না। অথচ আমরা বাঙ্গালী কিন্তু উদার!  
আমরা মাদ্রাজী শাড়ী পরিয়া আঁচল উড়াইয়া বেড়াই,  
পাঞ্জাবীর দোকানে রুটি-মাংস সাঁটিয়া ঢেঁকুর তুলি,  
মাদ্রাজীকে বাড়ি ভাড়া দিয়া নিশ্চিন্ত হই, হিন্দুস্থানীর  
মশলাদার পান চিবাইয়া ঠোট রাঙাই, উড়িয়ার ভেলেভাজা  
আনাইয়া আড্ডা জমাই;—তাছাড়া আমাদের কাপড় কাচে

হিন্দুস্থানী ধোপা, গেট পাহারা দেয় নেপালী দারোয়ান,  
রাগা করে উড়িয়া বামুন, মোটর চালায় বিহারী ড্রাইভার,  
জুতা পরায় চীনা—আরো কত বলিব! তালি-মেরামতী,  
জলের কল মেরামতী, বাড়িতে রং-য়ের কাজ, কাঠের  
কাজ, রাজমিস্ত্রির কাজ, জুতো সেলাই (অবশ্য চণ্ডী পাঠটি  
বোধহয় এখনও বাঙ্গালী পণ্ডিত মশায়দের আয়ত্বেই  
আছে) —ইত্যাদি সব কাজেই অবাঙ্গালীরই আবির্ভাব—  
বাঙ্গালী সেখানে অনুপস্থিত।

কিন্তু কই, কোন মাদ্রাজী তো বাংলা মিলের বা তাঁতের  
কাপড় পরে না! কোন মাড়োয়ারী তো বাঙ্গালীর  
দোকানে কিছু কিনিতে আসে না! কোন পাঞ্জাবী বা  
হিন্দুস্থানী তো বাঙ্গালীর রেটুরেন্টে বা খাবারের দোকানে  
টোকে না। এই বাংলা দেশেই তাহারা বাঙ্গালীকে বয়কট  
করিয়াছে, কিন্তু বিখ্যাত মালিক বাঙ্গালী গদগদ হইয়া দুই হাত  
বাড়াইয়া তাহাদের বুক জড়াইয়া রাখিতে চায়। ‘প্রেম’  
অতি উত্তম জিনিস, তবে পেট ভরা না থাকিলে উহা কিছু  
ঠিক ভমে না।

অথচ এই অতি বড় সত্য কথা, আমাদের খেরালে  
নাই। বাংলার ‘সবেধন নীলমণি’ শহর কলিকাতার পথে-  
ঘাটে পয়সা ছড়ানো আছে। বাংলার বাহির হইতে লোক  
আসিয়া তাহা দুই হাতে কুড়াইতেছে—আর আমরা শুধু  
ভিক্ষা করিতেছি কিংবা ভাবের ঘোরে চোখ বুজিয়া ‘কলা-  
চর্চা’ করিতে ব্যস্ত। তাই ‘কলা’-ই আমাদের ভাগ্য  
জুটতেছে! তা’ও পাকা জোটা ভার—কাঁচাই মিলিতেছে!

আসল কথা, চাকরি গাছের ফল নয় যে, কেহ পাড়িয়া  
আমাদের হাতে তুলিয়া দিবে। তাই চাকরি জোটে ভালো,  
নতুবা এত রকমের কাজ পড়িয়া থাকিতে অকেজো হইয়া  
বসিয়া থাকিবার তো কোন কারণ নাই। ভিক্ষা করার

(শোষণ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)



## কালজেশ্বরী দেবী

কালজেশ্বরী দেবীর আবির্ভাব ও প্রভাব কতকালের তাহা বলা কঠিন। বাঙ্গলা দেশে তান্ত্রিক উপাসনা প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই দেবীর ইতিহাসও চলিয়া আসিতেছে। এই ইতিহাস জনশ্রুতিমূলক ইতিহাস। কালজেশ্বরী দেবী কালঞ্জ নামক গ্রামে বিরাজিতা। কতকালের এই দেবী এখানে অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন সে ইতিহাস বলা কঠিন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, সাধকশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ কালঞ্জ গ্রামে দেবী আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যে স্থানে দেবীর ভগ্নমন্দির পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বেও দেখা যাইত, ঐ স্থান পূর্বে ছিল এক মহাশ্মশান। ঐ মহাশ্মশানে মহাপুরুষ সাধক ব্রহ্মানন্দ শ্মশানবাসিনী দেবীর আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং উক্ত স্থান সিদ্ধপীঠ বলিয়া অভিহিত হইতেছে। এইখানে যেমন হইত নরবলি তেমনি এইখানেই ব্রহ্মানন্দ শব সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন।

আমাদের দেশে তান্ত্রিক সাধকদের জীবনী এবং তাঁহাদের ক্রিয়া-কর্ম সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা হয় নাই। জনশ্রুতি

এই যে, তন্ত্রসার রচয়িতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের পূর্বে মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি পর্যালোচনা করিলে ইহা বুঝিতে পারা যায়।

সাধক ব্রহ্মানন্দের নাম অনেকের মুখেই শোনা যায়। কাহারও কাহারও মতে—ব্রহ্মানন্দ রাজসাহী জেলার অন্তর্গত শ্রামনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। ব্রহ্মানন্দ ইহার সাধন নাম।

তন্ত্রশাস্ত্রে দেখা যায় যে, শক্তিমন্ত্রের উপাসকগণের মধ্যে আচার-ভেদ আছে। পঞ্চাচারী, কুলাচারী, দিব্যাচারী প্রভৃতি। সম্প্রদায় ভেদে সাধকগণের সাধনা-ভেদ দেখা যায়। কৌয়ল গণ তন্ত্রোক্ত পঞ্চতন্ত্রের দ্বারা ইষ্টদেবতার আরাধনা করেন। তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণের পর এই সম্প্রদায়ের পূর্ণাভিষেক হইবার বিধি আছে। পূর্ণাভিষেক সমাপ্তে সম্প্রদায়ের আনন্দ শব্দান্ত কোন একটি নাম পূর্ণাভিষেককারী গুরু কর্তৃক রক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ত্রিপুরানন্দ, উমানন্দ প্রভৃতি। ব্রহ্মানন্দ ত্রিপুরানন্দের শিষ্য ছিলেন। ব্রহ্মানন্দও এই পূর্ণাভিষিক্ত মহাপুরুষের অভিষেক কালে গুরু-প্রদত্ত নাম।

### ( পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেষাংশ )

অপেক্ষা জুতা পালিশ করা চের সম্মানের। এবং অস্ত্রের চাকচিক্য না ভুলিয়া নিজের ঘরের টুকুতেই তৃপ্ত হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

তবে হ্যাঁ, আমার মুখের ভাত অস্ত্রে অস্ত্রে আসিয়া খাইতে থাকিবে—তাহা কেন সহ্য করিব? আমার দেশের চাকরি অস্ত্রে আসিয়া ছিনাইয়া লইবে আর আমরা ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিব নাকি? এ অস্ত্র বাড়িয়াই চলিয়াছে—আর চলিতে দেওয়া যায় না। আজ আমাদের

অস্ত্রের জন্তই অস্ত্রকে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

তাই আজ আমাদের অমুনয় নয়, দাবি : ঘরের চাকরি ঘরের ছেলেকে দাও।—অবশ্য সেই সঙ্গে আর একটি 'কথা'ও দিতে হইবে : চাকরি করিতে গিয়া আর খেলা করিতে বসিব না।

কারণ, আমাদেরই এক বাঙালী সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, 'চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য সাধিত হয় না।'—সে কথা আর আমরা ভুলিব না।

ব্রহ্মানন্দ শক্তিমজ্জের উপাসক ছিলেন। তাঁহার বিরচিত “ভারবহু” ও ‘শাক্তানন্দতরঙ্গিনী’ নামে দুইখানি বই এখনও বিদ্যমান আছে এবং ইহা হইতে তাঁহার সাধন প্রণালী সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা যায়।

ব্রহ্মানন্দগিরি যখন কালজ্যেষ্ঠরী সিদ্ধ পীঠে সাধনা করেন, তখন সেই সিদ্ধপীঠের তত্ত্বশাস্ত্রানুসারে “জাতা লক্ষ বলিবত্র হোমো বা কোটিসংখ্যকঃ। মহাবিশ্বাজপঃ কোটি সিদ্ধপীঠ প্রকীৰ্ত্তিতঃ।” সাধকগণের কোনও সিদ্ধপীঠ ব্যতীত জপোপাসনা হয় না। মহাপীঠের জায় সিদ্ধপীঠেও উপাসনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা যায়। ব্রহ্মানন্দ প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র কালজ্য গ্রামে জগন্মাতার উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া মাতৃ-দর্শনে কৃতার্থ হইয়া ব্রহ্মানন্দ নাম সার্থক করিয়াছিলেন। যে স্থানে দক্ষ্য ডাকাতির ভয়ে সাধারণ লোক সচরাচর অগ্রসর হয় না, সেই স্থানে সাধকপ্রবর ব্রহ্মানন্দ পুরস্চরণাদি দ্বারা

উপাস্যদেবভাবে ভাবিত চিত্ত হইয়া সিদ্ধির অভিলাষে উপাসনায় বসিয়াছিলেন। সংসারী মানুষ যেখানে অপবিত্র ঘৃণিত ও অগম্য মনে করে, সাধক ব্রহ্মানন্দ তাহাকে পরম পবিত্র, পরম রম্য ও পরম পূজনীয় সাধক-গম্য মনে করিয়া সেই স্থানে স্থান-বাসিনীর আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জগজ্জননীও তাঁহার সেই পবিত্র আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া সাধকের হৃদয়-স্থানে নিয়ত অবস্থান করিয়া সাধককে অনিষাদি সিদ্ধির অধিকারী করিয়াছিলেন। তাই মহাত্মা পরমহংসদেব গাহিয়াছিলেন :

“স্থান ভালবাসিস বলে,  
স্থান করেছি মাগো  
ধাকবি বলে নিরবধি।

নরবলি ও শব সাধনার জন্ত বিখ্যাত কালজ্যেষ্ঠরী দেবীর মহামুখানে ব্রহ্মানন্দের সাধনা-সিদ্ধ হইয়াছিল।

## আমি বাজাইব বাঁশী

বন্দে আলী মিয়া

মেঘ-টাকা দিন—বসে আছি একা  
কোনো কাজ নাহি হাতে,  
ঝাঁকে ঝাঁকে প গোখীউড় যায় হেরি  
আকাশের আঙিনাতে।  
তুমি আসিয়াছ মোর ঘরে যদি  
আজ তবে থাকো প্রিয়া—  
সাতনরী হার গোঁধিয়া ফুলেতে  
দেবো গলে পরাইয়া।  
তোমার নয়নে তুলি মোর আঁখি  
সাধ যায় আজ চেয়ে শুধু থাকি  
একটি গোপন কথা গো তোমার  
কহিব অনেক রাতে,  
মিনতি তোমারে শোনো প্রিয়তমা  
থাকো আজ মোর সাথে।

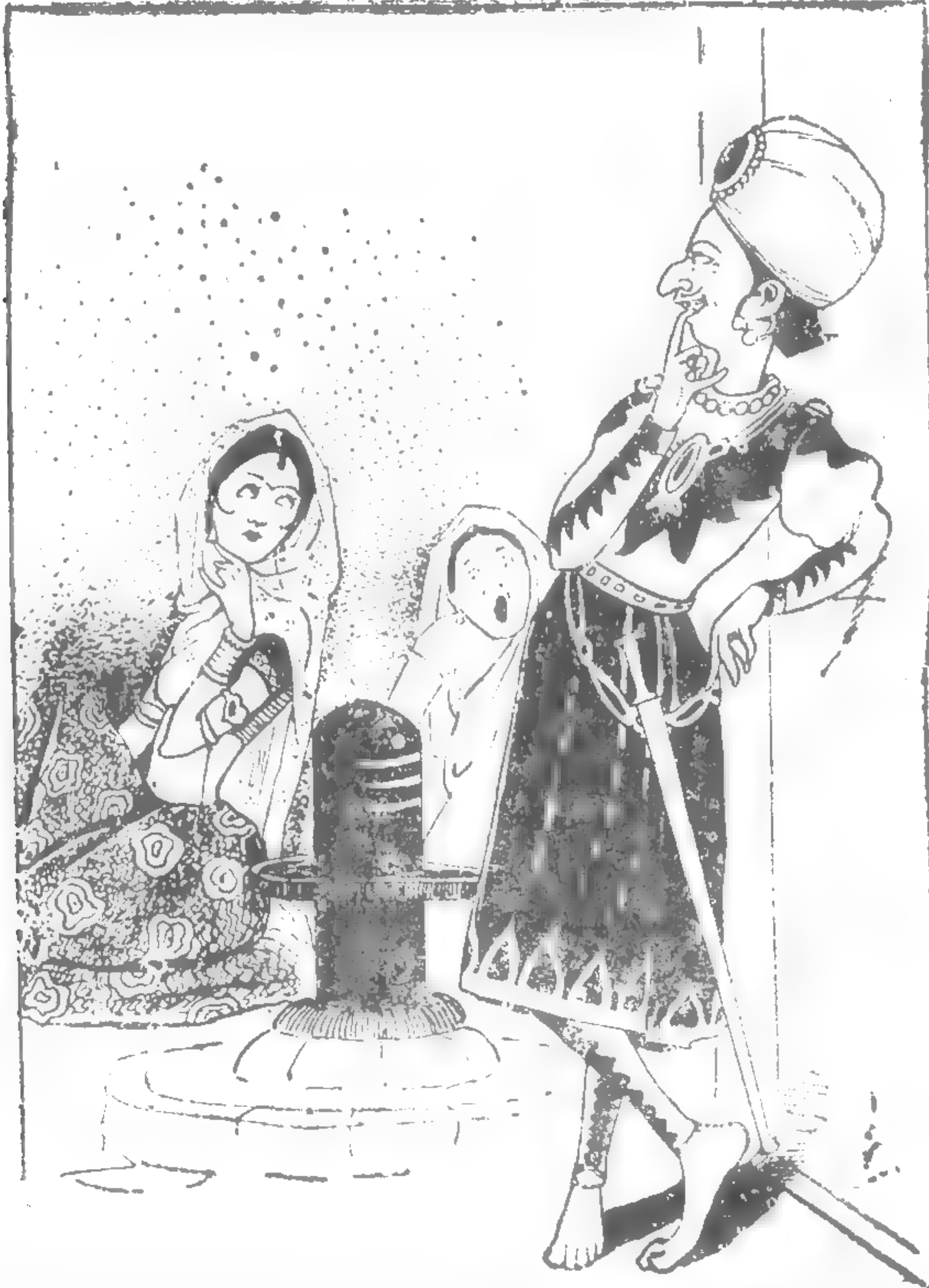
চেয়ে দেখে দূরে কাশফুল দল  
বাতাসেতে দোল খায়  
আজ সারা নিশি শিউলি ঝরিছে  
আমাদের আঙিনায়।  
এমন দিনেতে আসিয়াছ তুমি  
নাহি দেব যেতে আজ  
তোমার মনের পরশ লেগেছে  
মোর অন্তর মাঝ।  
তুমি আর আমি শুধু দুইজন  
মোদের ভুবনে রচিব স্বপন  
আজ সারা নিশি ঘুমাবো না কভু  
বসে রবো পাশাপাশি,  
তুমি গান গেয়ো স্বপনের গান  
আমি বাজাইব বাঁশী।



## থিয়েটারে বঙ্কিম

নাট্য-মহাট বঙ্কিমচন্দ্রের আদর সর্বত্র। কিন্তু থিয়েটারে বঙ্কিমবাবুর যে আদর তাতে সমানক বন্দা যেতে পারে। পঞ্চাশ বছর আগেও এর যেমন সমাদর ছিল—আজও তেমন-ই আছে। এ-কখনও 'থ্যাক ডেট' হতে পারে না।

জগৎসিংহ, তিলোত্তমা ও বিমলা



'কর্পেদলিনী' বই-এ বঙ্কিমবাবু যুবরাজ মানসিংহের বীরত্ববাজক প্রতিমূর্তির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু থিয়েটারে সেই জগৎসিংহের পুত্রের—রান্না ঘরের ধোঁয়ায় কাঁচা ককির ছিপের যে অবস্থা হয়,—পঞ্জিকার ধূমে তাঁর বাফেবিশালতাও সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে গেছে—কিন্তু তাতে কি আসে যায়?

## জগৎসিংহ, আরোহণ ও ওসমান



বন্দী আমার প্রাণেশ্বর !

‘হর্গেশমলিনী’ বই-এর একটি পরিচ্ছেদ—মুক্তকণ্ঠ। বহুসংখ্যক পঞ্চাশ পাতার যে দৃষ্ট দেখাতে চেয়েছেন, এক মুহূর্তে থিয়েটারে তার সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়ে, ঝরে পড়ল।



## চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনী



বুড়ো চন্দ্রশেখর কিশোরী শৈবলিনীকে বিয়ে করে যে অস্ত্রার করে ফেলেছিল, তাই দেখাতে বঙ্কিমবাবুকে 'চন্দ্রশেখর' এইখানি লিখতে হয়েছিলেন। "চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর সুস্থিতি-সুস্থির মুখমণ্ডলের প্রসঙ্গ করিয়া দেখিয়া" কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন। চন্দ্রশেখর বলছেন—“এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত। শাস্ত্রোত্তীর্ণনে রাজ্য-রাজ্য-পাতিভার কুটারে এ আনন্দাম কেন?”

এত বুড়ো, এমন বিয়ে ভাঙ্গা না হ'লে কি চন্দ্রশেখর এত আপনোষ করত।

## নির্মলকুমারী ও মণিকলাল



বিব্রটাক্ষের টেলে ঘোড়া বার করতে পারা একটা মস্ত বাহাদুরী কান্ন। কিন্তু সেই অবশুর্থে চড়া ঘোড়াই সোজা কান্ন নয়। সে অবশুর্থে আরোহণ করলে জীবহত্যা-জনিত পাশে লিপ্ত হতে হয় এবং নিশ্চয়ই হাড়গোড় ভেঙ্গে কেলবার সম্ভাবনা প্রচুর।



## চঞ্চলকুমারী ও রাণা রাজসিংহ



—“আপনি আমার পরিত্যাগ করিলে আমি রাজ সম্মুখে ডুবিয়া মরিব”—বলে চঞ্চলকুমারী মরাল-গমনে চক্রে বেগে উত্তর হ'লে; রাজসিংহ পথের পাট সব ভুলে গিয়ে ইঁ।!—ভূবে মরবে কি বাবা? শেষে কি হাতে দড়ি পড়বে?

## নির্মলকুমারী ও আলমগীর



নির্মলকুমারী যখন বাদশাহের “মুখে সাত পরজার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইবে” ব’লে ভয় দেখান, তখন “বাদশাহ বাকশূন্য। তিনি পৃথিবীপতি বলিয়া খ্যাত, পৃথিবীময় যাহার গৌরব ঘোষিত; তিনি সমস্ত ভারতবর্ষের জাদ, তিনি এই অনাথা নিঃসহায় অবলার নিকট অপমানিত, পরাস্ত হইয়াছিলেন।” অপরদিক্ত ও পরাস্ত ভাবটা প্রকাশিত হয়েছে কি? বাদশাহের কিত কোমর আর সোজা হ’ল না, বাপ—সাত পরজার। উঃ।



## হীরা ও দেবেন্দ্র



সুনির্জনে অফার (offer) করবার এমন সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। থাক আর নাই থাক—সাধবার সৌভাগ্য পেয়েছে! সেই যথেষ্ট! ফুল ফোটে, সে কি তোলাকা রাখে—কে তার গন্ধ নিল না নিল! বঙ্কিমবাবু লিখেছেন—“সেই বছরসুন্দরী শোভিত রমণীমণ্ডলেও, কুন্দনন্দিনী ব্যতীত তাহা হইতে (অর্থাৎ দেবেন্দ্র [হরিদাসী] হইতে) সমধিক স্নপবতী কেহই নহে।”—দর্শক যদি বলে, ভেজাল চালাচ্ছ বাবা!—উত্তর হলো যেতে পারে, এ যে যুগ-ধর্ম!



# তবু প্রণিপাত

ত্ৰিন্বেন্দুকুমার বসু

অগ্নি দুর্গে, তব পাশে মিছে বর মাগি ।  
তোমার উদ্ভব হ'ল ত্রিদিবের নিরাপত্তা-লাগি' ।

কবে কোন্ বিস্তৃত অতীতে  
আশামুগ্ধ চিতে  
স্বজেন্দ্ৰ দেবতার মিলিয়া তোমারে —

বধিবারে  
হুবাধৰ্ম মহিব-অসুরে ।  
ক্রন্দন উঠিয়াছিল স্বর্গরাজ্য জুড়ে ।  
সেদিন ধরিলে তুমি দশ হস্তে দশ গ্রহরণ,  
কেশরীয়ে করিলে বাহন,  
রণচণ্ডী-রূপে  
আহ্বানিয়া অমরা-লোলুপে,  
বহু শ্রমে  
বহু পরাক্রমে  
করেছিলে অরাতি-নিধন ।  
ভারপর ফুটাইল তব প্রয়োজন ।  
অকস্মাৎ তুমি মিলাইলে  
কোনো চিহ্ন না রাখিয়া নগর মিথিলে ।

মধ্যযুগে কিসের আশ্বাসে  
তোমারে বসালো কোন্ কবি-ঋষি মহেশ্বরের পাশে,  
উমারূপে বরণ করিল ।  
তোমার বিচিত্র মূর্তি শিল্পীরা গড়িল ।  
দশ হস্তে দশাযুধ দানি,  
অসুরের সাধে দিল চারি পুত্র-হৃহিতারে আনি' ।  
রাজা সুরথের কাল হ'তে  
প্রতিটি শরতে  
বাঙালার নগর-পল্লীতে  
দেবী-রূপে, কতলা-রূপে আস পূজা নিতে ।

পুষ্পপত্রে-অঙ্কুর-চন্দনে,  
প্রস্ফাবিত উলসিত প্রাণের স্পন্দনে  
বাঙালী তোমারে পূজে,  
মাতঃ দশভূজে !

লক্ষ কোটি পশু-রক্ত রাঙায়েছে তব পূজা বেদী ;  
উঠিয়াছে নভো ভেদী  
শজা-ঘণ্টা-ঢাকা-বংশীনাদ ;  
স্তবে মন্ত্রে নৃত্যে গীতে ভুলেছে বিষাদ  
অগণিত শিশু-নর-নারী ।  
কত আঁখিবারি  
ঢালিয়াছে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকারী  
ত্রিদিবস-যামি  
করিয়াছে তব ধ্যান, পুত নাম গান ।  
শত দুঃখ, ব্যথা, অভিমান  
জানায়েছে তোরে  
কোটি কোটি ভক্ত তিতি' নয়নের লোরে ।

এতকাল এত আরাধনা,  
তবুও কি বাঙালীর ফলিল সাধনা ?  
পুরিল কি কোনো মনস্কাম,  
শুভ পরিণাম  
আসিল কি জাতির জীবনে ?  
অসুর-পীড়নে  
জর্জর, জীবন্ত ভক্তের সমাজ ।  
সুরলোক আজ  
নিরুবেগে সুখে নিদ্রা যায় ।  
অসত্য প্রবল হ'ল দেবতা-কুণার  
( শেষাংশ ১৬১ পৃষ্ঠার ত্রুটিব্য )



# সম্পত্তি সমর্পণ

[ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমর গল্পার্য্য অবলম্বনে ]

শ্রীমুনীলকুমার ভট্টাচার্য্য

## চরিত্রলিপি

যজ্ঞনাথ কুণ্ড	....	অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ।	শ্রামাকান্ত	} .... গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগণ ।
বৃন্দাবন	....	ঐ পুত্র ।	হরমোহন	
গোকুল	....	ঐ পৌত্র ।	মনমথ	
( পরে নিতাই )			কবিরাজ, বাউল [ নেপথ্যেও চলবে ], ভিগারী, পথিক, হুজুর গ্রামবাসী, গ্রাম্যবালকগণ ।	

## প্রথম দৃশ্য

[ যজ্ঞনাথ কুণ্ডের বাড়ীর ভিতরের ঘর । অতি সাধা-  
রণ, অনাড়ম্বর ভাবে সাজানো । একটি তক্তাপোশের ওপর  
যজ্ঞনাথ বসে আছে, নিবিষ্ট মনে একটি কাগজে কি লেখা  
আছে পাঠরত । বেশবাসে কৃপণতার প্রকাশ । ]

যজ্ঞনাথ । ( পাঠান্তে ) মহাশক্তি রসায়ন, যত সব ফন্দি-  
বাজি । টাকা লুটে নেবার ফিকির, দেখাচ্ছি মজা ।  
( কাগজটা মুড়ে মুঠোর ভিতর পুরে, বাড়ীর ভিতর দিকে  
উদ্দেশ্য করে ) বৃন্দাবন, বপি ওহে ধনীর পুত্র বৃন্দাবন, ঘরে  
আছে না এই দিন-দুপুরেই নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে—

( বৃন্দাবনের প্রবেশ । বেশভূষায় বেশ আধুনিকতা,  
অবশ্য এদেশে ইংরাজের নতুন আগমনের সময়কার দিনে  
যতটা আধুনিকতা সম্ভব ছিলো, তেমন । )

বৃন্দাবন । কি, বাড়ীতে একটা মরমর রোগী, আর তুমি  
বে-আক্কেলের মত গলার পর্দা চড়িয়েই যাচ্ছে, একটু  
বিবেচনাও কি নেই ?

যজ্ঞনাথ । থামো, আমাকে আর শিক্ষা দিতে  
এসো না । বলি ভেবেছো কি, আমাকে কি স্বয়ং বকরাজ

কুণ্ডের ঠাওরেছো যে এই সব রাজারাজড়ার ঘরের মত লম্বা-  
চওড়া ওয়ুপের ফর্দ বানিয়েছো, এত টাকা দেবে কে ?

বৃন্দাবন । কবিরাজ মশায় বললেন যে, ব্যাধিটা বড়ই  
গুরুতর, এ যাত্রা রক্ষা পেতে হলে ভালো ভাবে চিকিৎসা  
আর পথাদি করতেই হবে ।

যজ্ঞনাথ । তবে আর কি, এ বুদ্ধকে পথে বসাও । বলি,  
কবিরাজের কি আর অগ্র ওষুধ জানা নেই, যা দামেও এমন  
আকাশকে ছোঁয় না অথচ কাজেও আশ্চর্য ফল দেয় ? বেশী  
দামের না হলে বুঝি বেশী কাজেরও হয় না ? বলিহারি  
তোমাদের আধুনিকতা আর ফ্যাশান্ মার্কা ওষুধ-পত্রের  
বহর । এ ফর্দ পত্রপাঠ ফেরত পাঠাও । এত দাম দিতে  
আমি অক্ষম মোদ্দা কথাটি এই জানিয়ে দিলাম ।

বৃন্দাবন । কিন্তু যে রোগের যে ওষুধ—

যজ্ঞনাথ । থামো । কটা রোগ তুমি দেখেছ শুনি,  
কটা রোগে ভুগেছ ? এ-বাড়ীতে তোমার মা, দিদিমা কিছু  
কম রোগে ভোগেন নি, তাঁরা কত পাত্র পাত্র এমন দামী  
ওষুধ খেয়েছেন, একবার শুনি । এ-বাড়ীর সনাতন প্রথা  
ছিল, রোগ হোক, আর যাই হোক, কবিরাজের বা বৈষ্ণবের  
প্রবেশ একেবারে নিষেধ । আমি তো তবু আজকাল এ

নিয়ম ভেঙেছি, তাই বলে এমন ভাবে শত্রুতা করা আমার সঙ্গে কিছুতেই চলবে না। (কাগজটা বৃন্দাবনের হাতে জোর করে গুঁজে দিয়ে) এই নিয়ে যাও তোমার মহাপণ্ডিত কবিরাজের এক-কাঁড়ি টাকা শ্রদ্ধ করার ফর্দ।

বৃন্দাবন। (যজ্ঞনাথের পায়ে পড়ে) বাবা, শোনো, দয়া করো, এ ওষুধ না হলে তোমার একমাত্র ছেলের বউ অকালে প্রাণ হারাবে।

যজ্ঞনাথ। ওসব আমি কিছু গুনতে চাই না। (কবিরাজকে এমন সময় আসতে দেখে) এই যে কবিরাজ মশাই, আপনি কি জ্যোতিষ মানুষকে খুন করার ফর্দ করেছেন নাকি?

[ কবিরাজের প্রবেশ ]

কবিরাজ। আজ্ঞে? আপনার কথা সম্যক উপলব্ধি হচ্ছে না।

যজ্ঞনাথ। রোগ হলো কি না হলো অমনি চড়চড় করে এতবড়ো একখানা ফর্দ তো বানিয়ে দিলেন, একবারও কি ভেবেছেন যে কি সর্বনাশ করতে চলেছেন এই গরীব গৃহস্থের? কত টাকার হিসাব দিয়েছেন তা জানেন? দিনের বেলায় ডাকাতি করবেন,—ভাবছেন, কেউ টেরটি পাবে না, না?

কবিরাজ। আজ্ঞে, কি বলেন যে। ডাকাতি করা আমার পেশা নয়। তবে পীড়ার গুরুত্ব অনুসারে এই ঔষধ অপরিহার্য জানেই।

যজ্ঞনাথ। অপরিহার্য!

কবিরাজ। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার পুত্রধুর পীড়া এক্ষণে বিশেষ চিকিৎসার উদ্রেক করেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নিরর্থক। নিয়মিত ভাবে ঔষধ সেবন, পথা গ্রহণ ও পরিচর্যাতির আশু প্রয়োজন। অত্যাচার—

যজ্ঞনাথ। আপনার বুদ্ধিবৃত্তির অতিশয় সৎক্ষে আমি ক্রমেই সন্দেহান হয়ে উঠছি মশায়। মহার্য ওষুধ সেবনেই কেবলমাত্র রোগ নিরাময় হয়, এ কথাই সত্যতা আমি স্বীকার করি না।

কবিরাজ। আজ্ঞে, ব্যাধি যেখানে প্রবল, তার চিকিৎসাদিও সেখানে প্রবলতর করা প্রয়োজন। তাই আমি 'মহাশক্তি রসায়ন' অমিত্যেজ 'স্বর্ণবটিক' অমৃত-

আদর্শ সালসা মহর্ষি চরকের আবিষ্কৃত ৬৪ প্রকার জীবনী-শক্তি বুদ্ধিকর। আয়ুর্বেদীয় ভেষজ সংযোগে এবং ভারতীয় ধাতুর ও ভারতবাসীর প্রকৃতি অনুসারেই প্রস্তুত। বিধিমত ব্যবহারে—

যজ্ঞনাথ। অমুগ্রহ করে আপনার শাস্ত্র ব্যাখ্যা বন্ধ করুন। এখন আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে চিকিৎসা বিষয়ে আপনার জ্ঞান-আদি অতিশয় সীমাবদ্ধ। যে কারণে একজন পীড়িতকে নিরাময় করতে গুভাগমন করে গৃহস্থ অবশিষ্ট স্তম্ভ মানুষকেই অস্তম্ভ করবার উপক্রম করেছেন। অতএব, যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর এ গৃহের চিকিৎসাকার্য হাতে বিরত হওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি।

কবিরাজ। (আশ্চর্য হয়ে লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়ালেন) অ্যা, বলেন কি! রোগিনীর জীবনের এমনত আশঙ্কাজনক অবস্থায়—

যজ্ঞনাথ। ততোধিক আশঙ্কাজনক অবস্থায় এ গৃহের হতভাগ্য গৃহস্থামী উপনীত হয়েছেন, অতএব—(বাধার ইঙ্গিত)

কবিরাজ। (বৃন্দাবনকে) বৃন্দাবনবাবু, নিতান্ত দুঃখিত অন্তরেই অগত্যা আমি বিদায় নিচ্ছি। তবে, আপনার সহধর্মিণীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কেবলমাত্র একটি কথা বলে যাচ্ছি যে অতি সস্তর সূচিকিৎসা, সুপথ্য ও সুপরিচর্যা বিষয়ে বিশেষ তৎপর না হলে তাঁর জীবন সম্বন্ধে নিয়তিশয় আশঙ্কা বর্তমান। দুর্গা দুর্গম হয়ে, দুর্গা দুঃখ হয়ে.....(প্রস্থান)

বৃন্দাবন। অ্যা, সত্যিই তাড়িয়ে দিলে? ওর রোগের এই বাড়াবাড়ির সময়! তবে ও মরুক, মরেই শান্তি পাক। বাবা, তুমি এমন পাষণ্ড, হৃদয়হীন! এ সময়ে একটা জীবনের চেয়ে ঐ কতকগুলো রূপোর খণ্ডই বড় হলো? ওঃ ভগবান, পিতাপুত্রের এই সম্বন্ধ! না, না, আর এক-মুহূর্ত এ বাড়ীতে নয়। দেখি অন্তত নিয়ে গিয়ে বাঁচাতে পারি কিনা।

যজ্ঞনাথ। অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ। ছেলেবেলা থেকে তোকে খাওয়াতে পরাতে যে ব্যয় হয়েছে তা পরিশোধ করার নাম নেই, আবার বড় বড় কথার ফুলঝুরি কাটা হচ্ছে।

(চীৎকার শুনে শ্রামাকান্ত, হরমোহন ও মম্মথ এই



এই শোনো শ্রামাকান্ত ভায়া, গুণধর ছেলের বাক্য-  
গুলো। বলে কিনা কতকগুলো স্নপোর খণ্ড। চিরটা  
কাল বাপের পরসায় রাজা-উজীর মেরে এলেন বাবু, একটা  
কানাকড়ি বোজগারের নাম নেই, আবার কুলোপানা চক্কোর  
দেখানো হচ্ছে।

শ্রামাকান্ত। কি হলো দাদা, ভোর হতে না হতেই  
পাড়া যে মাথায় উঠলো, ইয়ে হয়েছে—

যজ্ঞনাথ। তা চলে যাবিতো যা, ভয় দেখাচ্ছিন কাকে ?  
[ এমন সময় গোকুল (চার পাঁচ বছর বয়স) কাদতে  
কাদতে এলো। ]

গোকুল। (বুন্দাবনকে) বাবা, মা কত বলচে না কেন,  
আমার খিদে পেয়েছে।

বুন্দাবন। কথা বলচে না কিরে! অঁয়া, কি হলো তবে,  
কথা বলচে না কেন.....(বলতে বলতে ভিতরে গমন)

গোকুল (যজ্ঞনাথকে) দাচ্ছ, খিদে পেয়েছে।

যজ্ঞনাথ। যা, যা, কুতর সব। খিদে পেয়েছে তা  
আমি কি জানি। তোমার বাপকে বলগে যা, সেই খাওয়াবে।

গোকুল। (ক্রন্দন) অঁয়া.....(এমন সময় ভিতরে  
থেকে বুন্দাবনের কান্না ভরা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।)

বুন্দাবন। একই হল, তুমি কোথায় গেলে চলে,  
ও হো হো হো।

পাড়ার লোকেরা। অঁয়া, কি হলো হে (সকলে ভিতরে  
গেল। যজ্ঞনাথ মুখ কঠিন করে তক্তাপোশেই বসে রইলো)।

যজ্ঞনাথ। মরবেই তো, অকুতজ্ঞতার সাজা হবে না  
ভগবানের রাজত্বে! আর এদিকে হয়েছে যত জালা, দুটো  
খুদকুঁড়ো কুড়িয়ে বাঁচিয়ে অপরায়ের জন্ত তুলে বেখেছি,  
তা কারুর সইবে। পাড়া ঝাঁটিয়ে সব এলেন দুঃখ দেখাতে।  
হঁ, দরদ একবারে উথলে উঠছে! (গোকুলকে দেখে, সে  
তখনো চোখ মুছেছে)

আর এই এক আছেন কুদে শাহজাদা। মিনিটে  
দু'বার করে খিদে পায়। ভিটে মাটি সব উজ্জরে বাবে  
অপোগণ্ড পুষতে। এদিকে আর হতভাগা, আর দাঁড়িয়ে  
দাঁড়িয়ে পৃথিবী শুদ্ধ লোককে কান্না শোনাতে হবে না।

(শেষটার স্নেহের সুর)

(গোকুল এক পা এক পা করে তাঁর দিকে যাচ্ছিল, এমন  
সময় অঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ঝড়ের বেগে বুন্দাবন

চুকলো। পিছনে পাড়ার লোকেরা।

বুন্দাবন। (গোকুলের হাত ধরে টেনে এনে) খবরদার,  
যাবি না গোকলে ঐ খুনে দাওর কাছে, এলা টিপে মেরে  
ফেলবে তোকে। দেখলি না, ওষুধ না খাইয়ে কেমন করে  
তোমার মাকে মেরে ফেললো।

যজ্ঞনাথ। থাম্ অর্বাচীন, বেহেড কোথ কা।। কেন,  
ওষুধ খেয়ে কি কেউ মরে না? (পাড়ার লোকদের  
উদ্দেশ্যে) দামী দামী ওষুধ খেলেই দি বাঁচতো, তবে রাজা-  
বাদশারা মেরে কোন্ জুখে? (বুন্দাবনকে) যেমন করে তোমার  
মা মরেছে, তোমার দিদিমা মরেছে, তোমার স্ত্রী তার চেয়ে কি  
বেগী ধুম করে মরবে?

বুন্দাবন। ছি। ছি। টাকার চুড়োয় বসে তুমি  
ধর্ম-অধর্ম, জার-অজার সব ভুলে গেছ, কিন্তু ভুলো না যে  
ভগবানের বিচার থেকে রেহাই পাবে। জলজ্যান্ত একটা  
মানুষকে তুমি হত্যা করলে, তার শাস্তি তোমাকে পেতেই  
হবে। চল্ গোকলে, এ পাপের বাড়ী ছেড়ে এখনি চলে  
যাই।

শ্রামাকান্ত। আহা বুন্দাবন, ইয়ে হয়েছে, এসময়ে জ্ঞান  
হারিও না। এত বড়ো ভুল কোরো না।

হরমোহন। দ্বির হও, অত উত্তেজিত হওয়া সমীচীন  
নয়। এত বড়ো বিষয় আশ্রয় একদিন তোমারই হবে তো।  
উনি বুড়ো হয়েছেন—

মন্নাথ। পত্নীশোক নিদারুণ জানি। তবুও তুমি বড়ো  
হয়েছ, সব দিক বিবেচনা করে কাজ করো।

বুন্দাবন। না, না, আপনারা বৃথা উপদেশ দেবেন না।  
আপনারা তাহলে এখনো ঠুঁকে চেনেন নি।

যজ্ঞনাথ। দূর হ এখনি আমার বাড়ী থেকে। তোকে  
যদি কখনো একটি পরসাত্ত দিই তা হবে গো-রক্তপাতের  
তুল্য, এই আমি বলে দিলাম। তোকে আমার ত্যাজ্যপুত্র  
করলাম। আজ থেকে জানবো যে আমার কোনো ছেলে  
নেই।

বুন্দাবন। বেশ, তাই হবে। আজ থেকে আমিও  
জানবো যে আমি পিতৃহীন। আর তোমার পরসাত্ত  
আমারও প্রতিজ্ঞা, যদি একটি পরসাত্ত তোমার কোন-  
দিন গ্রহণ করি, তা হবে মাতৃ-রক্তপাতের তুল্য মহা-  
পাপ। চল্, চল্ গোকুল, আর এক মুহূর্ত এখানে নয়।

পাড়ার লোকেরা। বৃন্দাবন, যজ্ঞনাথবাবু, এসব কি করেছেন।

(গোকুলের হাত ধরে বৃন্দাবন সবেগে প্রস্থান করলো।

বৃন্দাবন, বৃন্দাবন, শোনো, শোনো (তাদের পিছনে) পিছনে পাড়ার লোকেরাও বেরিয়ে গেল)।

যজ্ঞনাথ। (দরজায় খিল দিয়ে) এই আমিও তোদের দরজায় চিরকালের মত খিল এঁটে দিলাম। দেখি কোন্ নবাবের বেটা আর এ বাড়ীর চৌকাঠও মাড়াতে পারে! তেজ দেখালি কাকে, ওসবে আমি ভয় পাই না। আমিও পরমানন্দ কুণ্ডুর বেটা যজ্ঞনাথ কুণ্ড।

### দ্বিতীয় দৃশ্য

[গ্রামের বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপের নিকটস্থ পথ; শ্রামাকান্ত, হরমোহন ও মন্থাধের প্রবেশ।]

শ্রামাকান্ত। দিনে দিনে পৃথিবীটা কোন্ রসাতলে চলেছে, ইয়ে হয়েছে, একবার বিবেচনা করে দেখেছ হরমোহন?

হরমোহন। এরকমটা যে হবে তা আমি পূর্ব হতেই অনুমান করেছিলাম। ওই যে কথায় বলে না 'সর্বমতাস্তম্-গহিতম' এক্ষেত্রেও হয়েছিলো তাই। অর্থাৎ কিনা, মনুষ্য জাতি বর্তমানে সর্ব স্তরেই ধীরতার পরিবর্তে লক্ষ্যপ্রদান কর-বার প্রয়াসী হয়েছে এবং তারি অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ এমন একটি অশুভ ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম, অর্থাৎ কিনা, এই গ্রামেরই একটি পরিবারে।

মন্থাধ। ভায়া হরমোহন, তোমার ঐ চিরকালে বন্ধিমী ঠাঁটটি পরিত্যাগ করতে এমনো পারলে না, এখন ভায়া সরলীকরণের যুগ, তোমার বক্তব্য একটু সোজা বাংলা করে বলো।

হরমোহন। তোমার মস্তিষ্কটি বরাবরই একটু স্থূল, মন্থাধ। যে পূজার যে নৈবেদ্য। কথা হচ্ছিল যে, আমাদের যজ্ঞনাথবাবুর গৃহের, অর্থাৎ কিনা, ঘটনাবলী অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গেই বুদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার ফলেই না এমন একটা অঘটন—

শ্রামাকান্ত। ইয়ে হয়েছে, অঘটন কেন বলছো, বলো এই হওয়া উচিত। সামান্য একটা বউ-এর জন্ত বাপের সঙ্গে বিবাদ করা কেবল এ-কালেই সম্ভব এবং তার বিষয় পরিণতিও অবশ্যস্তাবী। ইয়ে হয়েছে, যজ্ঞনাথবাবু উচিত কার্যই

মন্থাধ। মানে, তিনি তাঁর পত্নী-বলীভূত পুত্রকে এটাই স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, একটা বউ গেলে অনতি-বিলম্বে আর একটা বউ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু বাপ গেলে দ্বিতীয় বাপ মাথা খুঁড়লেও পাওয়া যায় না। বৃন্দাবনের এ হতেই চৈতন্যোদয় হওয়া উচিত। কি বসেন শ্রামাদাদা?

শ্রামাকান্ত। ইয়ে হয়েছে, তা কিন্তু হবে না। কারণ কলিকালের বিশিষ্টতা এই যে এ সময় ধর্মাদর্ম লোপ পায়।

হরমোহন। অর্থাৎ কিনা, ঘোর পাপে তমসাজ্বর হয় মনুষ্য জাতি, যে কারণে—

মন্থাধ। আঃ, ভায়া হরমোহন, আবার বন্ধিমী আরম্ভ করলে।

শ্রামাকান্ত। আমি কি ভাবছি জানো? ইয়ে হয়েছে, এই দুরারোগ্য পিতাপুত্র বিবাদের ব্যাধি আজকাল বেরকম সংক্রামক আকার ধারণ করেছে, তাতে যদি তা এখন বাহ-বিস্তার করে তোমার আমার ধরেও এসে ঢোকে, তাহলে বিশেষ ঔষিধপাকে পড়বারই সম্ভাবনা। (আর দুজনে ভয় পেয়ে আতকে উঠলো।)

মন্থাধ। আঃ...সেক্ষেত্রে তা যে সত্যি আশঙ্কার বিষয় হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

হরমোহন। অর্থাৎ কিনা, যজ্ঞনাথবাবুর অশুভ উদা-হরণের বিষয় শিশুরূপে—

মন্থাধ। আঃ অসহ্য, ভায়া হরমোহন, এই দারুণ হৃদিতার সময়েও তোমার বন্ধিমী গেল না।

[যজ্ঞনাথের প্রবেশ]

এই যে যজ্ঞনাথবাবু, আমরা পরামর্শ করছি যে কেমন করে আপনার এই দুঃসময়ে—

যজ্ঞনাথ। দুঃসময়? কে বললে? সুসময়, সুসময়, আমার জীবনে এমন আনন্দের দিন আর আসেনি। সবাইকে বিদেয় করেছি। মুক্তি পেয়েছি মুক্তি পেয়েছি।

শ্রামাকান্ত (আড়ালে হরমোহন ও মন্থাধকে) শোকে দুঃখে মাথাটা একেবারে আরাপ হয়ে গেছে। (প্রকাশে) আমরাও তাই বলাবলি করছিলাম যে আপনার এ সময়ে আমাদেরও তো কিছু করণীয় আছে।

যজ্ঞনাথ। কিছু নেই, কিছু নেই। সব অকৃতজ্ঞ, সবাই করো, শেষকালে সব ফুঃ।



হরমোহন। আমরাও তাই বলি, অর্থাৎ কিনা, বিষয় সম্পত্তি সব হারালি, তবু এখনো টনক নড়লো না। আরে বাপু, বউ গেল তো কি হোল, বেটা ছেলে, আবার বিয়ে থাকবে। কিন্তু বাপ গেলেন—

যজ্ঞনাথ। আর একটা বাপ পাবি কি? সব কালের দোষ, বদ হাওয়া বইছে। এদিক দিয়ে দেখুন আমার ছেলেকে। সাতটি চড় এ-গালে মারলে চোদ্দটি চড়ের জন্তু ও-গাল পেতে দেবে, তবু বাপের কথায় টু শব্দটি করবে না। কথায় বলে বাপুকা বেটা।

শ্রামাকান্ত। কি বকব, বকব, করছো মন্থ, এখন এই শোকের সময় ওঁকে এসব কথা বলা কি উচিত হচ্ছে? তা ছাড়া, ইয়ে হয়েছে, আমার ভোলায় মত অমন সোনার প্রতিমে ছেলে থাকতে, ওনার কাছে তোমার ছেলের কথা কইতে সাহস পাও! বলে কিনা, চাঁদে আর বাঁদরে!

হরমোহন। বলেছি তো, ওনার মস্তিষ্কটা বরাবরই একটু স্থূল। তা, বুদ্ধাবনকে কি সত্যিই ত্যাজ্যপুত্র করে দিলেন? মানে, অর্থাৎ কিনা, এতবড় বিষয়-আশয়—এই বুদ্ধ বয়স—

যজ্ঞনাথ। নিজে থেকেই বিদেশ হয়েছে, ভালোই হয়েছে, নাহলে ঘাড় ধরে বার করে দিতাম। এককাঁড়ি টাকা যাচ্ছিল অপোগণ্ড পুষতে। তারপর ঐতো ভক্তির বহর, কোনদিন আমার ভাতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিতো। দিনরাত ঘরের ভিতর বউ-এর সঙ্গে ফিসফিস পরামর্শ, বিষ মেশাবো, বিষ মেশাবো। ভগবান বাঁচিয়েছেন। এবার একলা ঘরে নিশ্চিন্ত হয়ে খাবো, ঘুগবো। (একটু থেমে) তবে ঐ গোকুলটাকে, ঐ হুধের বাচ্চাটাকে নিয়ে গেল। মারবে ওটাকে না খাইয়ে, বেশ দেখতে পাচ্ছি। মার্গে যা, আমার কি, আমার শত্রু বইতো নয়, আমার কি, আমার কি....(বলতে বলতে প্রস্থান। শ্রামাকান্ত অপর দু'জনকে ইঙ্গিতে জানালো যে যজ্ঞনাথের মাথাটা একেবারে গেছে।)

### তৃতীয় দৃশ্য

[যজ্ঞনাথ তক্তাপোশে বসে একটি খাতায় হিসাব করছে। মাঝে মাঝে একটু চিন্তা করছে, আবার লিখছে। লেখা শেষ হলে—]

যজ্ঞনাথ। তাহলে দাঁড়ালো—হুধ এক টাকা, ভাত,

ডাল, মাছ, তরকারি ইত্যাদি দু'টাকা, পরনের জুতা বাঘো আনা, জলখাবার চার আনা, এ ছাড়া বইপত্র, খেলনা, মোটামুটি একুশে পাঁচ পাঁচটি টাকা প্রতি মাসে, অর্থাৎ পাঁচ বারো ঘণ্টা টাকা বার্ষিক একেবারে জলের মত বাজে খরচ হচ্ছিল, শুধু ঐ হুধের বাচ্চা গোকুলটার জন্তুই। তারপর ঐ বেইমান বেন্দাটা আর ওর বউটার জন্তুও কোন্ না-এর তিন গুণ টাকা!....ওঃ, আমাকে একেবারে মাঝ দরিয়ায় ডোবানোর পাকা ব্যবস্থা! কেমন জল করেছে এইবার। এত টাকা সুদ শুদ্ধ—আগুণে গুণে পাওয়া যায় না, সব যেতে বসেছিল। ভগবান দয়াময়, রক্ষা করেছে।

(উদ্দেশ্যে প্রণাম)

[এমন সময় একজন ভিখারীর প্রবেশ]

ভিখারী। ভগোমান যে সত্যিই দয়াময় গো, তাই-তো আমরা বেঁচে আছি। দাও বাবা, দুটি ভিক্ষা দাও। তিনির দয়ায় তোমার সব ভাল হবে।

যজ্ঞনাথ। কে বললে ভালো হবে? মিথ্যে কথা সব, আমার ভালোয় দয়াকার নেই। মিথ্যাবাদী শুণ্ড কোথা-কার, একদানা চালও ভিক্ষা দেব না।

ভিখারী। মিথ্যে কথা নয় বাবা। তিনি ঠিক তোমার ভালো করবেন, দেখে নিও। সবার হুঃখ তিনি দূর করে দেন।

যজ্ঞনাথ। আমার কোন হুঃখ নেই, আমি বেশ সুখে আছি। শুধু ঐ গোকুলটার জন্তুই যা একটু। নইলে হুঃখে তো আমার ঘুম হচ্ছে না!

ভিখারী। তেনাকেও ফিরে পাবে গো। ঐ, তিনি যে দয়ার (প্রণাম) শরীর। তুমি মিছে তিনির ওপর অভিমান করছো।

যজ্ঞনাথ। (চমকে) তাকেও ফিরে পাবো? গোকুল ফিরে আসবে? না, না, তা সম্ভব নয়, তা কি কখনো হয়?

ভিখারী। দাও বাবা, দুটি ভিক্ষা। তিনির রাজত্ব সব সম্ভব, তিনি অবটন ঘটায়, লীলময় (প্রণাম)।

যজ্ঞনাথ। অ্যা, তাই যেন হয়, যেন অবটনই ঘটে। এই নাও, চার আনা পরমা।

ভিখারী। (আনন্দে) তোমার হারানিবি ফিরে পাবে, দেখে নিও। (প্রস্থান)

যজ্ঞনাথ। ফিরে পাবো, গোকুল ফিরে আসবে।

আবার আমার পূজার সময় কাঁধে চেপে বসবে, খাওয়ার সময় থালা থেকে মাছ নিয়ে পালাবে, লেখার সময় দোয়াত উলটিয়ে দেবে! এইসে মাহুরটার ওপরে সেদিন দাছ আমার কত হিজিবিজি এঁকেছে, ঐসে কাঁধাখানা অতখানি ছেঁড়া, সেই গুণধরেরই কীর্তি। ভিখারীটা ঠিকই বলেছে, ফিরে সে আসবেই। কিন্তু কবে, ভগবান, কবে? (উঠে আশ্রমের কাছে গিয়ে একটা কাপড় দেখে) এই কাপড়খানা হুবহুরেই গেলায় দিয়েছিল বলে কত বকেছিলাম অবোধ ছেলেটাকে। (চোখের জল মুছলো। কাপড়খানা একটা সিন্দুকে রেখে) এই তোর কাপড় সিন্দুকে রেখে দিলাম, কাউকে দেবো না। তুই প্রতি বছর একটা করে কাপড় ছিঁড়িস দাছ, আর আমি কখনো বকবো না। তুই শুধু আমার বুকে একবার ফিরে আর ভাই, একবার ফিরে আর।

(এমন সময় বাইরের পথ দিয়ে বাউল গান গেয়ে যাচ্ছিল, উৎকর্ণ হয়ে যজ্ঞনাথ গুনতে থাকে।)

(গান)

পরবাসী, চলে এসো ঘরে।

অনুকূল সমীরণ ভরে ॥

ঐ দেখ কতবার হল খেয়া পারাপার,

সারি গান উঠিল অধরে ॥

আকাশে আকাশে আয়োজন,

বাতাসে বাতাসে আমন্ত্রণ।

মন যে দিল না সাড়া, তাই তুমি গৃহছাড়া,

নির্বাসিত বাহিরে অস্তরে ॥

(গান শেষ হলে হুঁহাতের মধ্যে যজ্ঞনাথ মুখ লুকালো।)

চতুর্থ দৃশ্য

[গ্রামের পথ। কয়েকটি ছেলে জটলা করছে। এদের মধ্যে একজনের নাম নিতাই পাল, দেখা গেল সেই সর্দার হয়ে বসেছে।]

নিতাই। দেখ, ভাই, সেদিন আমি বলছিলাম না যে আমাদের পাঠশালার বুড়ো পণ্ডিত মশায় বড্ড রাগী মাহুর। আমি বাংলা বানান ভুল করেছিলাম, তাই যজ্ঞনাথ নামে

দিলেন! আমি যত্নকে চুপি চুপি বললাম, এই আন্তে মোল। কিন্তু ও গুনলো না, খুব কষে মলে দিল, আর আমার কান ছুটো রাঙা জবার মত লাল হয়ে উঠলো।

অন্য সবাই। তারপর তুমি কি করলে?

নিতাই। কি করলুম? তখন যত্নকে কিছু বললাম না। তারপর যেই না পাঠশালা ছুটি হয়েছে, অমনি হিড়-হিড় করে টানতে টানতে একটা কুয়োর কাছে নিয়ে গেলাম।

সকলে। (সভয়ে) আঃ, কুয়োর কাছে?

নিতাই। হ্যাঁ। তারপর দিলাম ইয়া এক চড় গালে। বললাম, ফিরে, তখন যে খুব কান মলেছিলি, এখন যদি তার ঠ্যাং ছুটো ধরে ঝপাং করে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিই, কেমন হয়?

সকলে। সে কি বললে?

নিতাই। বলবে কি, ভয়েই কেঁচো। এমনি করে সটান গুরে পড়ে আমার পা ধরে ভেউভেউ করে কাঁদা। আমি বললাম, আচ্ছা বা, এবার তোকে ক্ষমা করলাম, কিন্তু ফের যদি আমার কথা না গুনিস তাহলে মেরে একেবারে ঠাণ্ডা করে দোব।

সকলে। (হো হো হাসি) ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে।

নিতাই। এই চলো, গ্রাম্যাকার বাগানে এত বড়ো বড়ো জামরুল ফলেছে, সব সাবাড় করে দিতে হবে। রাজী সবাই?

সকলে। (সম্মত) হ্যাঁ।

নিতাই। তাহলে সবাই আমার পেছনে এমনি করে পা টিপে টিপে চলো.....

(নিতাই-এর সঙ্গে বালকদের প্রস্থান)

[একটু পরে যজ্ঞনাথের প্রবেশ, হাতে হাঁকা]

যজ্ঞনাথ। আঃ, এখানে বেশ ছায়া আছে, এই গাছটার নিচে একটু বসি। (গামছা দিয়ে কপালের বাম মুছে) বাড়ী যেন শশানের মত হাঁ করে খেতে আসছে সর্বক্ষণ, এতটুকু টিকতে পারি না। নইলে এই ভরতপুর বেলা, সারা গাঁ খিগুচে, রোদে পুড়েছে মাঠ-পথ সব, আর আমি ঘরছাড়া বিবাগীর মত হা গোকুল, হা গোকুল বলে ঘুরে মরছি।



বয়সে বুকে আগুন জ্বলে দিয়েছে। পথে পথে আর খুঁজে ফিরি কেন, সে শত্রুর কি আর ফিরে আসবে। (এমন সময় পথ দিয়ে বাউল গাইতে গাইতে গেল, শুনতে শুনতে তজ্জ্বালনের মত যজ্ঞনাথ গাছের গায়ে হেল পড়ে।)

গান

পথ দিয়ে কে যায়গো চলে

ডাক দিয়ে সে যায়,

আমার ঘরে থাকাই দায়।

পথের হাওয়ায় কী সুর বাজে,

বাজে আমার বুকের মাঝে,

বাজে বেদনায়।

পূর্ণিমাতে সাগর হতে ছুটে এলো বান,

আমার লাগলো প্রাণে টান।

আপন মনে মেলি আঁখি

আর কেন বা পড়ে থাকি

কিসের ভাবনায়।

[ যজ্ঞনাথ বেশ ঘুমিয়ে পড়েছে, দুজন গ্রামবাসীর প্রবেশ। ]

১ম জন। ওঃ, গরমটা এবার অসহ্য মনে হচ্ছে, না ?

২য় জন। কলিযুগে মন্দই যে বেশী। তাই শুধু গরম কেন, বর্ষাও আসবে বান ডাকিয়ে, শীতও হাড়ে-মায়ে কামড় লাগাবে, দেখে নিও।

১ম জন। তা যা বলেছ। জষ্টির অন্ধক পেরিয়ে গেল, পোড়া আকাশে এক টুকরো মেঘের দেখা নেই। ( হঠাৎ ঘুমন্ত যজ্ঞনাথকে দেখে ) আর হবেই বা কি করে ( যজ্ঞনাথকে দেখিয়ে ) এইরকম সব মনিষি থাকতে কি দেবতার কৃপা হবে !

২য় জন। কে ঘুমুচ্ছে এখানে ( ভাল করে দেখে ) আমাদের 'যজ্ঞনাথ' না ? গাঁয়ের লোক ওনাকে নতুন নাম দিয়েছে 'যজ্ঞনাথ'।

১ম জন। ঠিকই দিয়েছে। সর্বস্ব নাশ করেছে বলেই তো এমন একখানা খাসা উপাধি দিয়েছে। ( হাস্য )

২য় জন। সর্বস্ব না খোয়ালে আর এই দশা হয়। বুড়া বয়সে কোথায় বেটা আর নাতি নিয়ে সুখ করবি, তা নয় এই আগুনের হলকার মধ্যে এসে ঘুমোর! বলি,

ও যজ্ঞনাথবাবু—

১ম জন। থাক ভায়া, আর এখন ডেকো না। উঠলেই তো গালমন্দ শুরু করবে, এই বোদের তাত্তে তা মুখরোচক হবে না। মানে মানে সরে পড়ি চলো।

২য় জন। তাই চলো, ওনাকে আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই, এখনি গোকুল, গোকুল বলে চোঁচাতে থাকবে। সরে পড়াই ভালো। ( উভয়ের প্রস্থান )

[ নিতাই ও বালকদের প্রবেশ। সকলেই জামরুল খাচ্ছে। ]

নিতাই। কেমন মজা হোল, এখন আরাম করে বলে কোঁচড় ভতি জামরুল খাওয়া যাক। ( যজ্ঞনাথকে দেখে ) এখানে আবার কে ঘুমুচ্ছে দেখো।

বালকেরা। ওরে বাবা, এ যে আমাদের 'চামটিকে'।

নিতাই। ( আনন্দে ) কি বললে, চামটিকে ? ও হো হো হো, দাঁড়াও, একটা খুব মজা করি। ( যজ্ঞনাথের মাথার কাছে চাদর ঝাড়া দিতেই একটা গিরগিটি যজ্ঞনাথের ওপর লাফিয়ে পড়লো। যজ্ঞনাথ খড়মড় করে উঠে পড়তেই বালকেরা হো হো করে হেসে উঠলো। )

যজ্ঞনাথ। এই, কে রে ? ( নিতাই ছাড়া বালকেরা সবাই পালালো। ) এই ছেলেরা, তুই কে ? এতবড় সাহস আমার গায়ে গিরগিটি ছাড়িস্ ? ( নিতাই জ্বক্কেপ না করে চট করে যজ্ঞনাথের গামছাখানি টেনে নিয়ে একটু সরে গিয়ে মাথার পাগড়ী করলো। ) কি, এতখানি আশ্পর্কী ঐটুকু ছেলের, দাঁড়া দেখাচ্ছি। ( লাঠি খোঁজার ছল ) এই, এই ছোঁড়া, তোর নাম কি ?

নিতাই। নিতাই পাল। ( জামরুলে কামড় দিয়ে দেখিয়ে বললো ) খাবে ( আব-খাওয়া জামরুলটা যজ্ঞনাথের গায়ে ছুঁড়লো। )

যজ্ঞনাথ। ( কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে ) ওরে বদমাশ কোথাকার, তাকে ধরলে একবারে আছড়ে মারবো।

নিতাই। ( একটু সরে গিয়ে ) উঃ, মারলেই হোলো।

যজ্ঞনাথ। এই তোর বাড়ী কোথায় ?

নিতাই। বলব না।

যজ্ঞনাথ। বাপের নাম কী ?

নিতাই। বলব না।

যজ্ঞনাথ। কেন বলবি না ?

নিতাই। আমি বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এসেছি।

যজ্ঞনাথ। কেন?

নিতাই। আমার বাপ আমাকে পাঠশালায় দিতে চায়।

যজ্ঞনাথ। ঠিকতো। তোর মত বখাটেকে পাঠশালায় দেওয়া মানে নিফল অপব্যয়। তোর বাপের বেশ বিষয়-বুদ্ধি আছে বুঝি। তা, আমার বাড়ীতে এসে থাকবি? আমি কোনোদিন তোকে পাঠশালার ত্রিসীমানায় যেতে দেব না।

নিতাই। ( নিঃসঙ্কোচে ) হ্যাঁ থাকবো, চলো নিয়ে।

যজ্ঞনাথ। ( কাছে এসে আদর করে ) সত্যি বলছি নিতাই, আমার বাড়ী যাবি, আমার কাছে থাকবি?

নিতাই। সত্যি বলছি তো, কেন থাকবো না।

যজ্ঞনাথ। ( নিতাইকে বুকে টেনে নিয়ে ) ওরে, ওরে নিতাই, তুই আমার গোকুল রে। নিতাই বেশে আবার এ ভাঙ্গা বুকে ফিরে এসেছিস। আজ আমার কী আনন্দ। দাও আমার, এতদিন আসিস নি কেন ভাই, এতদিন কেন আসিস নি? ( বুকে তুলে নিলো )

### পঞ্চম দৃশ্য

[ যজ্ঞনাথের বাড়ী। নানারকম খাণ্ডের রাশি নিয়ে যজ্ঞনাথ নিতাইকে কোলে বসিয়ে খাওয়াচ্ছে। ]

যজ্ঞনাথ। লক্ষ্মী দাও আমার, এই সন্দেশটা খেয়ে নে।

নিতাই। না সন্দেশ নয়, রাবড়ি খাবো। রোজ রোজ সন্দেশ খেয়ে অরুচি ধরেছে।

যজ্ঞনাথ। আচ্ছা, রাবড়ি ও-বেলা আনবো। তবে এই ক্ষীরটুকু খা। তাও না? তবে ঐ সরুলা দুখটা?

নিতাই। কিপটে কোথাকার! আমি আর কোনোদিন দুখ খাবো না। এবার রাবড়ি, রাজভোগ, মালপোয়া, ক্ষীরমোহন না দিলে আমি ঠিক চলে যাবো।

যজ্ঞনাথ। ( দুধের বাটি নিতাই-এর মুখে ধরে ) অমন কথা বলিস নি ভাই, চলে যাবি কোন্‌ হুঃখে? তুই চলে গেলে আমি আর একদিনও বাঁচবো না।

নিতাই। তবে যা খেতে চাই, দাওনা কেন? কত

যজ্ঞনাথ। সব আনবো রে ভাই, নিশ্চয় আনবো। আমার আর খাবার অল্প কে আছে রে বোকা, সবি তো তুই পাবি।

নিতাই। সব মিথ্যে কথা। এই যে আমি বললাম, আমার জন্ম ভালো সিন্ধের জামা, ভালো কাপড়, চকচকে জুতো এনে দাও, তুমি কিসব বাজে জিনিস এনেছো। না, না, আমি ঠিক চলে যাবো।

যজ্ঞনাথ। বারে বারে ওসব কথা বলিস নি দাও। সব এনে দেব তোকে। বুড়ো কিনা, ভাড়াভাড়া সব আনতে পারি না। দেখ না, আস্তে আস্তে তোকে সব এনে দেবো। এখন আমার মাথা থেকে পাকাচুল তুলে দে দিকি।

নিতাই। তাহলে পরসো দেবে তো? এক একটা চুলের জন্ম এক একটা পরসো দেবে তো?

যজ্ঞনাথ। ( হেসে আদর করে ) দেবো রে, তাই দেবো।

[ নিতাই পাকাচুল তুলতে থাকে। গ্রামাকান্ত ইত্যাদির প্রবেশ ]

গ্রামাকান্ত। ইয়ে হয়েছে, এই যে যজ্ঞনাথবাবু, নাতির হাতের আদর উপভোগ করছেন বুঝি, তা ভালো, ভালো।

হরমোহন। অর্থাৎ কিনা, বুড়ো বয়সে আপনার আবার এক অনর্থক ঝগড়াট হলো।

মন্মথ। ঝগড়াট বলে? কোথায় এ বয়সে একটু শান্তিতে থাকবেন, তা নয়, মিছে জঞ্জাল কুড়োনো আর কি!

গ্রামাকান্ত। আর ছেলেটাও কি, ইয়ে হয়েছে, একটু শান্ত থাকে এক মুহূর্ত? চোপের দিন নাকে দড়ি দিয়ে চরকির মত ঘোরাচ্ছে।

হরমোহন। অর্থাৎ কিনা, এ বয়সে এতখানি শারীরিক ঝুঁকি, কোনোমতেই সমীচীন নয়।

মন্মথ। বৃন্দাবন কাজটা উচিত করলো না গ্রামাদাদা।

গ্রামাকান্ত। সেতো আকাশের মত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তুই গেলি গেলি, সঙ্গে গাধাবোটের মত ছেলেটাকে নিয়ে গেলি কোন্‌ আক্কেলে। ইয়ে হয়েছে, পরের কে একটা কে উড়ে এসে এখন তো জুড়ে বসলো? একটা কুটো আর তুই পাবি এর পরে?

হরমোহন। অর্থাৎ কিনা, ভাড়া ভাড়া সব আনতে পারি না।



তো সোনার মত ছেলেপুলে ছিলো, যদি পালন করতাই হয়, পাড়া-প্রতিবেশীকে সরিয়ে কোথাকার একটা কে, কি জাত, কি ধর্মো—

মন্মথ। বিশেষ করে, আমার যখন অমন ক্ষণজন্মা ছেলে—

শ্রামাকান্ত। আঃ মন্মথ, সব সময় নিজের কোলেই ঝোলটা নাই টানলে! ইয়ে হয়েছে, আমারও তো—

মন্মথ। দুষ্টোর, তোমার ইয়ের।

(যজ্ঞনাথের এসব আলোচনা ভাল লাগছিল না, তাই এদের কথায় কোনো সাহা না দিয়ে নিতাইকে নিয়ে ঘর ছাড়ার উপক্রম করলো।)

যজ্ঞনাথ। চল দাছ, পুকুরে হিপ ফেলে তোর জন্ত বড় একটা মাছ ধরে দিই।

(সকলের দিকে তির্যক ভাবে একটা অগ্নিদৃষ্টি দিয়ে নিতাইকে নিয়ে প্রস্থান।)

শ্রামাকান্ত। দেখলে একবার ভাবখানা? আমাদের কথাগুলো যেন শুনতেই পেল না।

হরমোহন। অর্থাৎ কিনা, ব্যাপার বেরকম বন্ধিত হারে কলেবর ক্ষীণ করছে—

মন্মথ। আঃ, ডায়া হরমোহন, ফের বন্ধিমী গুরু করলে?

হরমোহন। ওহে স্থূলবুদ্ধি, অনুধাবন করো। এখন এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে যজ্ঞনাথবাবু এমতাবস্থায় আর বেশীদিন বাঁচবেন না এবং সেক্ষেত্রে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ঐ অজ্ঞাতকুলশীল নিতাইকেই বন্দোবস্ত করে দিয়ে যাবেন।

মন্মথ। সে কখনোই করতে দেওয়া যায় না। গ্রামস্থ প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ, অর্থাৎ আমরা—

শ্রামাকান্ত। এর একটা বিহিত করবোই। আমাদের পুত্রবৃদ্ধদের মত সুযোগ্য উত্তরাধিকারীরা বর্তমান থাকতে, ইয়ে হয়েছে, একটা যে কেউ এসে সব লুটে নেবে, এ কোনোমতেই সহ্য করা হবে না।

হরমোহন, মন্মথ। কিছুতেই না।

[যজ্ঞনাথ আর নিতাইকে আসতে দেখে সবাই চুপ করে গেল। নিতাইকে বুকে নিয়ে যজ্ঞনাথের প্রবেশ।]

নিতাই। মাছ না ছাই, সব মিথ্যে কথা। না, না, এবার আমি ঠিক চলে যাবো বলছি।

যজ্ঞনাথ। চুপ চুপ দাছ, ওরা সব শুনতে পাবে যে।

নিতাই। জানি না।

যজ্ঞনাথ। ভাবিস কেন ভাই। তোকে আমার সমস্ত বিষয়-আশয় দিয়ে যাবো।

নিতাই। ঠিক বলছো, সব দেবে তো?

যজ্ঞনাথ। সব দেবো, সব দেবো। (সেইভাবে প্রস্থান)

শ্রামাকান্ত। শুনলে তো সব? ওঃ ভাসহ। যজ্ঞনাথ-বাবু যেন আমাদের দেখতেই পাচ্ছেন না। এখনি এই, ইয়ে হয়েছে, এরপর এ-বাড়ীর চৌকাঠ ঝাড়ানোও যাবে না।

হরমোহন। অর্থাৎ কিনা, আমাদের দিনও অবসান-প্রায়। এখন কিংকর্তব্যামিতি?

মন্মথ। আমার পরামর্শ শোনো। এখনো সময় আছে, ছেলেটার বাপের খোঁজ করা যাক, তারপর তার হাতে ওকে তুলে দাও। অগ্রথায় আমাদের চোখের সামনে সব কর্পূরের মত উবে যাবে।

শ্রামাকান্ত। আরে, ইয়ে হয়েছে, ছেলেটাও তো এসে ইন্তক চলে যাবো, চলে যাবো কচ্ছে। যজ্ঞনাথবাবুই আদর দিয়ে মাথায় তুলছেন আর সম্পত্তির লোভ দেখিয়ে আটকে রাখছেন। রকম দেখে তো ভাজ্জব বনে যাচ্ছি।

হরমোহন। আর এদিকে ছেলেটার বাপ-মা'র মনেও না জানি কত কষ্টই হচ্ছে। ছেলেটাও তো পাপিষ্ঠ কম নয়। তুই-ই বা পড়ে আছিস কেন হতভাগা, পাজী কোথাকার! অর্থাৎ কিনা, মুখেই শুধু চলে যাবো, চলে যাবো রব, আসলে ষোল আনা সেয়ানা, এতবড় বিষয় সম্পত্তি, বাচ্চা হলে কি হয়, পুরোনজর সেদিকে।

মন্মথ। তাইতো বলছি, চলুন শ্রামাদাদা, ওর বাপ-মা'র খোঁজ নেওয়া যাক। তবে যদি তাড়ানো যায়।

শ্রামাকান্ত। তাই চলো, অগত্যা। (সকলের প্রস্থান)  
[নিতাই-এর হাত ধরে চারদিক দেখতে দেখতে যজ্ঞনাথের প্রবেশ।]

যজ্ঞনাথ। পাড়া-প্রতিবেশীর মোহাগের জালায় অস্থির হয়ে উঠেছি। তোদের এত গাত্রদাহ কেন শুন। বুড়ো বয়সে কুড়িয়ে পেয়েছি অকের যষ্টি, সব হিংসেয় ফাটছে। চল দাছ, স্নান করিয়ে দিই, বেলা বাড়ছে।

[একজন পথিকের প্রবেশ]

কে বাপু তুমি, একেবারে বাড়ীর অন্তরে সৈধিয়ে আসো?

পথিক। ( কাতর স্বরে ) বাবু, একঘটি জল খাওয়াতে পারেন ? অনেক দূর থেকে আসছি, পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে গলা শুনতে পেলাম, তাই এলাম। অপরাধ নেবেন না, বাবু।

নিতাই। তুমি জল খাবে ?

পথিক। হ্যাঁ, খোকাবাবু, এনে দাও না।

নিতাই। বোসো, আমি এখনি আনছি। ( ভিতরে গেল )

যজ্ঞনাথ। আমি ভেবেছিলাম বুঝি গাঁয়ের কেউ। গাঁয়ের লোকের ওপর আমার শ্রদ্ধা কমে গেছে।

পথিক। কেন বাবু ?

যজ্ঞনাথ। বুড়ো মানুষকে ভগবান একটু দয়া করেছেন, পথ থেকে ঐ মানিক কুড়িয়ে পেয়েছি, তা এ গাঁয়ের লোকদের সহ্য হচ্ছে না।

পথিক। কুড়িয়ে পেয়েছেন ? ( নিতাই জল এনে পথিককে ঢেলে দিল। জলপানের পর তৃপ্ত হয়ে ) আঃ, বাঁচলাম, রাজা হও খোকাবাবু। এই আপনার মানিক, বাবু ? খাসা ছেলে। তা.....( একটু ঘেন ভেবে ) একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আপনাকে বলে যাই বাবু। কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে বলেই বলছি। আগের গ্রাম দিয়ে আসতে আসতে শুনলাম, দামোদর পাল নামে কে একজন তার হারানো ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর এই গাঁয়ের দিকেই নাকি আসছে।

নিতাই। ( বাস্তব হয়ে ) কি নাম বললে, দামোদর পাল ?

পথিক। হ্যাঁ গো খোকাবাবু। ( যজ্ঞনাথকে ) আচ্ছা, চলি বাবু। আঃ, জল খেয়ে প্রাণটা বাঁচলো। ( প্রস্থান )

নিতাই। দাড়াই।

যজ্ঞনাথ। কেন রে ?

নিতাই। যার নাম বললো তার সঙ্গে আমি দেখা করবো।

যজ্ঞনাথ। সে কি, ওকথা বলো না। কোথাকার কে, তার সঙ্গে কেন দেখা করবি। চল, মানের বেলা হল।

নিতাই। না দাড়া, আমার এখানে থাকতে ভাল লাগছে না, সেই লোকটার সঙ্গে দেখা করবো।

যজ্ঞনাথ। কি যে বলিস দাড়াই, যার তার সঙ্গে কি

মেলানো করতে আছে ?

নিতাই। না, না, আমি আর থাকবো না এখানে।

যজ্ঞনাথ। এই পাগল ছেলে, তোকে আমি এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখবো, কেউ খুঁজে পাবে না।

নিতাই। ( কোতুকের স্বরে ) অ্যাঁ, লুকিয়ে রাখবে ? কোথায় রাখবে দাড়া, দেখিয়ে দাও না।

যজ্ঞনাথ। এখন দেখাতে গেলে প্রকাশ হয়ে পড়বে, রাত্তির বেলায় দেখাবো।

নিতাই। ( উৎফুল্ল ভাবে ) রাত্তির বেলায় দেখাবে ? বেশ হবে। ( মনে মনে চিন্তা ) আমাকে খুঁজে না পেয়ে বাবা যেই-না চলে যাবে, অমনি সব বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে লুকোচুরি খেলবো। কেউ খুঁজে পাবে না, কী মজা হবে ! ( যজ্ঞনাথকে ) দাড়া, ঠিক নিয়ে যাবে তো ?

যজ্ঞনাথ। নিশ্চয় নিয়ে যাবো।

নিতাই। কি মজা, লুকিয়ে থাকবো, কী মজা।

( প্রস্থান )

যজ্ঞনাথ। আর দেরি নয়, চারদিকে শত্রু। সারা জীবন বুকের রক্ত জগ করে বা খুদকুঁড়ো জমিয়েছি, তার যোগ্য পাহারাদার এতদিনে পেয়েছি। এত কষ্টের ধন, একটা কানাকড়িও কাউকে দোব না, সব তোকেই দিয়ে যাবো দাড়াই। আর এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখে আসবো যে পৃথিবীর একটি কাক-পক্ষীও তোর সন্ধান পাবে না, হা হা হা হা হা হা.....( পর্দা নেমে এলো )।

### ষষ্ঠ দৃশ্য

[ বালিশে মাথা রেখে নিতাই শুয়ে আছে। ঘরের এককোণে হারিকেন জ্বলছে। আন্তে আন্তে যজ্ঞনাথ প্রবেশ করে নিতাইকে দেখতে থাকে। একসময়ে নিঃশ্বাস মুখে পড়তেই নিতাই খড়মড় করে উঠে পড়লো। ]

নিতাই। দাড়া এসেছ ? নিয়ে চলো। আমাকে একলা ফেলে কোথায় গিয়েছিলে ? দরজায় খিল দিয়ে রেখেছিলে কেন দাড়া ?

যজ্ঞনাথ। ( গভীর মুখ ) পাছে কেউ এসে বাধা দেয় সেই জন্তে। চুপি চুপি যেতে হবে কিনা।

নিতাই। কখন যাবে বলো না দাড়া ?

যজ্ঞনাথ। এখনো রাত্তির হয়নি।



নিতাই। হয়নি বৈকি, ঐতো হয়েছে (বাইরে করছে।  
নির্দেশ) ও দাছ, চলো।

যজ্ঞনাথ। দেখছিস না, এখনো পাড়ার লোক ঘুমোয়  
নি।

নিতাই। (উঠে জানলা দিয়ে দেখে) ঐতো  
ঘুমিয়েছে, এবার চলো।

যজ্ঞনাথ। (বসলো) আরো একটু অপেক্ষা কর ভাই,  
তারপর হুজনে মিলে পটগট করে যাবো। (নিতাই-এর  
মাথা কোলে টেনে নিয়ে ঘুম পাড়াতে লাগলো।) আর  
একটু ঘুমিয়ে নে দাছ, অনেকটা পথ হাঁটতে হবে তো।

(একটু পরে নিতাই ঘুমিয়েছে দেখে আন্তে আন্তে  
উঠে একটা পুঁটলিতে কি সব গুরতে থাকে। তারপর  
জানালার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়ালো, আবার ফিরে এসে  
নিতাই-এর মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর নিতাই-এর  
পাশে বসলো।)

নিতাই। (যেন হৃৎস্পন্দ দেখে জেগে উঠে) দাছ, দাছ,  
কই চলো। কত রাত্তির হয়ে গেল।

(উঠে বসলো। এমন সময় দেওয়াল ঘড়িতে ছুটো  
বাজলো।)

যজ্ঞনাথ। চল দাছ, এবার সময় হয়েছে।

(নিতাই-এর একটা হাত ধরলো। পুঁটলিটা হাতে  
তুলে নিয়ে, ইষ্ট দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে, হারি-  
কেনটা নিবিয়ে দিল। তারপর ধীরে ধীরে উভয়ে বেরিয়ে  
গেল।)

### সপ্তম দৃশ্য

(জঙ্গলের মধ্যে একটি দেবতাহীন ভাঙ্গা মন্দিরের  
অভ্যন্তর। একপাশে কতকগুলি পিতলের কলস, মধ্যে  
একটি আসন, সিন্দূর, চন্দন, ফুলের মালা—পূজার  
উপকরণ। প্রদীপ জ্বলছে, ধূপের ধোঁয়ার পবিত্র গন্ধে  
চারিদিক আমোদিত। আর একপাশে একটি কাঠের মই,  
ওপর থেকে ওঠা-নামার জন্তু, কারণ ঘরটি মাটির নীচে। মঞ্চ  
আধো-অন্ধকার। দেখা গেল মই বেয়ে যজ্ঞনাথ ও নিতাই  
নামছে।]

যজ্ঞনাথ। আন্তে আন্তে নাম ভাই।

যজ্ঞনাথ। এই দেখ না কেমন লুকোবার জায়গা।

(নেমে এলো উভয়ে)

নিতাই। (কলস দেখে) ওসবে কি আছে দাছ?

যজ্ঞনাথ। (ঈষৎ হেসে) হাত ঢুকিয়ে দেখ না।

নিতাই। (১টি কলসের মধ্যে হাত দিয়ে) ওরে বাবা,  
এ যে সব টাকা। (সব কলসগুলোর ভেতর হাত ঢুকিয়ে)  
টাকা, টাকা, এত টাকা, দাছ? শুধু মোহর আর টাকা।  
সব তোমার দাছ?

যজ্ঞনাথ। হ্যাঁ, সব আমার। কেমন, আমি তোকে  
বলছিলাম না যে আমার সমস্ত টাকা তোকে দেবো? তবে,  
আমার অধিক কিছু নেই, তবে এই কটিমাত্র ঘড়া আমার  
সম্বল। আজ আমি এর সমস্তই তোমার হাতে দেব।

নিতাই। (আনন্দে লাফিয়ে উঠে) সমস্তই? তুমি  
কি ভালো, দাছ। এর একটা টাকাও তুমি নেবে না?

যজ্ঞনাথ। যদি নিই তবে আমার হাতে যেন কুষ্ঠ হয়।  
কিন্তু একটা কথা আছে। যদি কখনো আমার নিরুদ্দেশ  
নাতি গোকুলচন্দ্র কিবা তার ছেলে কিবা তার পৌত্র কিবা  
তার প্রপৌত্র কিবা তার বংশের কেউ আসে, তবে তার  
কিবা তাদের হাতে এই সমস্ত টাকা গুনে দিতে হবে।

নিতাই (বিস্মিত ভাবে যজ্ঞনাথের দিকে চেয়ে রইলো,  
ভাবলো যজ্ঞনাথ বুঝি পাগল হয়েছে) আচ্ছা, তাই দেবো।

যজ্ঞনাথ। তবে এই আসনে বোস নিতাই।

নিতাই। কেন?

যজ্ঞনাথ। তোমার পূজা হবে।

নিতাই। কেন?

যজ্ঞনাথ। এই রকম নিয়ম।

(নিতাই আসনে বসলো। যজ্ঞনাথ তার কপালে চন্দন,  
সিন্দূরের টিপ ও গলায় মালা দিল। তারপর হাতজোড়  
করে, চোখ বুজে কি যেন বিড়বিড় করে বলতে থাকে।  
তাই দেখে ভীত ভাবে নিতাই বললো)

নিতাই। দাছ, কি বলছো অমন করে, আমার বড়  
ভয় করছে। ও দাছ—

(যজ্ঞনাথ নিরুত্তর। একটু পরে চোখ খুলে এক একটি  
করে ঘড়া নিতাই-এর সামনে এনে বললো)

কুণ্ডের পুত্র গদাধর কুণ্ড তন্ত্র পুত্র প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ড তন্ত্র পুত্র  
পরমানন্দ কুণ্ড তন্ত্র পুত্র যজ্ঞনাথ কুণ্ড তন্ত্র পুত্র বৃন্দাবন কুণ্ড  
তন্ত্র পুত্র গোকুলচন্দ্র কুণ্ডকে কিংবা তাহার পুত্র অথবা পৌত্র  
অথবা প্রপৌত্রকে কিংবা তাহার বংশের জাতি উত্তরাধি-  
কারীকে এই সমস্ত টাকা গণিয়া দিব।”

( নিতাই প্রতিবারই যজ্ঞনাথের সঙ্গে এক একটি ঘড়ার  
মাগনে কথাগুলো আবৃত্তি করলো। শেষ বারের করার পর  
নিতাই-এর জিহ্বা জড়িয়ে গেল। সে হাতে হাত ঘষতে  
থাকে, শেষে খানসরোথের মত হওয়ায় চোখ দুটো বড় হল।  
অত্যন্ত পিপাসা বোধ হল। )

নিতাই। এ-ক-টু জ-ল খা-বো। তে-ষ্টা পে-য়ে-ছে।

( বলতে বলতে মুখ ঢেকে হুঁহাতে মাথা নীচু করলো।  
এসময়ে যজ্ঞনাথ হুঁ দিয়ে দীপ নিবিয়ে আস্তে আস্তে  
নিতাইকে দেখতে দেখতে মই বেয়ে ওপরে উঠে যেতে  
থাকে। হঠাৎ নিতাই মুখ তুলে তাই দেখে ব্যাকুল হয়ে  
জিজ্ঞাসা করলো )

নিতাই। দাছ, কোথায় যাচ্ছ ?

যজ্ঞনাথ। আমি চললাম। তুই এখানে থাক।  
তোকে আর কেউ খুঁজে পাবে না। কিন্তু মনে রাখিস্  
যজ্ঞনাথের পৌত্র, গোকুলচন্দ্রের নাম। আমার এত কষ্টের  
সম্পত্তি আগলাবার জন্তু তোকে যক্ষ করে রেখে গেলাম,  
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

( ওপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল )

নিতাই। (কাঁদতে কাঁদতে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে) দাছ,  
আমাকে একলা ফেলে চলে যেও না। আমি বাবার কাছে  
যাবো, বাবা, বাবা.....

( অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লো )

### অষ্টম দৃশ্য

[ অন্ধকার মঞ্চ। দেখা গেল যজ্ঞনাথ সেই মন্দিরের  
একটি পাথর খণ্ডের ওপর প্রথমে মাটি, ঘাস ও পরে গাছ-  
পাতা, ডালপালা এনে চাপা দিচ্ছে। ]

যজ্ঞনাথ। বাস্, আর কেউ দেখতে পাবে না, কেউ  
জানতে পারবে না। নিশ্চিত, একেবারে নিশ্চিত। আমার  
বুকের পাজরের মত এক একখানা মোহর আর টাকা ভর্তি  
ঘড়া এখন থেকে চিরদিন ধরে পাহারা দেবে যক্ষের মত

ঐ সোনার বরন ছেলে, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। পাজী  
হিংস্রটে বদমাশগুলো ফন্দি এঁটেছিল বুড়াকে মেয়ে সব  
লুটে খাবে, কেমন হয়েছে এইবার, সব জব্দ করে দিয়েছি  
একেবারে। হা হা হা হা হা.....

( কে যেন ডাকলো, “বাবা”। যজ্ঞনাথ চমকে ওঠে )

কে, কে ডাকে, ওরে আবার কে ডাকে।

( সেই স্তূপের ওপর বসলো )

না, না, উঠে আসতে দেবো না, উঠে আসতে পাবি না,  
যতই দাদা, বাবা বলে ডাক্।

( স্তূপের বুকে কান পাটলো )

দেখি, দেখি, শুনতে পাই কিনা। কেউ ডাকছে কিনা  
শুনি। না, না, কেউ না। ভ্রম, ও আমার মনের ভ্রম।

( আবার কান পেতেই লাফিয়ে উঠলো )

ওইবে, ওইবে ডাকছে, বাবা, বাবা বলে কাঁদতে কাঁদতে  
ঐ কে ডাকছে।

( দূরে অন্ধকার জঙ্গলের দিকে চেষ্টে )

ঐ জঙ্গলের গাঢ় অন্ধকারের বুকে চিরে কে যেন কেবলি  
শুসগিয়ে উঠছে না ?

( আবার কে যেন ডাকলো “বাবা” )

ওরে, ঐ সর্বনাশা ডাক যে আমার পাগল করে দিতে  
চায়। ( সস্তরে সরে গেল ) কে, কে ওখানে ? খবরদার,  
খবরদার বলছি ডাকবি না।

( আবার বসে স্তূপের ওপর আদর করে চাপড় দিতে  
দিতে )

ওরে দাছ, চুপ কর, চুপ কর, সবাই শুনতে পাবে যে।  
বোকা ছেলে, বুঝতে পারিস্ না, আমি যে ভোর দাছ। অত  
আদর যত্ন করলাম, আর তুই আমার একটা উপকারও  
করবি না ?

( আবার কে ডাকলো “বাবা”। যজ্ঞনাথ সভয়ে  
পালাতে গেল। বৃন্দাবনের প্রবেশ। বেশবাস বিস্ময়,  
ডাকলো )

বৃন্দাবন। বাবা।

যজ্ঞনাথ। কে, কে ডাকলো ? স্পষ্টে শুনতে পেলাম।

( মুখ ফেরাতেই বৃন্দাবনকে দেখে বিষম চমকে  
উঠলো )

কে, কে তুমি ?



বৃন্দাবন। বাবা, আমি বৃন্দাবন।

যজ্ঞনাথ। কে, বৃন্দাবন?

বৃন্দাবন। হ্যাঁ। বাবা, আমি সন্ধান পেলাম আমার ছেলে তোমার ঘরে লুকিয়ে আছে, তাকে দাও।

যজ্ঞনাথ। (দারুণ বিস্ময়ে চোখ-মুখ বিকৃত করে বৃন্দাবনের ওপর ঝুঁকে পড়ে) তো-র-ছে-লে?

বৃন্দাবন। হ্যাঁ, গোকুল। এখন তার নাম নিতাই পাল। আমার নাম দামোদর। কাছাকাছি সর্বত্রই তোমার খ্যাতি আছে, সেইজন্য আমরা লজ্জায় নাম পরিবর্তন করেছি, নইলে কেউ আমাদের নাম উচ্চারণ করতো না। দাও, গোকুলকে দাও, বলে সে কোথায় আছে?

যজ্ঞনাথ। নিতাই...নিতাই...তোমার ছেলে...মানে, আমারই নাতি গোকুল সে.....হ্যাঁ...এ আমি...এ আমি কি করলাম রে। ভগবান, আমাকে বধির করে দাও, অন্ধ করে দাও, আমার এই হাত দুখানায় বজ্রপাত করে ভেঙ্গে, পুড়িয়ে, গুঁড়ো করে দাও। (বলতে বলতে জ্ঞান হারালো। বৃন্দাবন হ'হাত দিয়ে ধরলো।)

বৃন্দাবন। বাবা, এসব কি বলছো? গোকুল, আমার গোকুল, কি নেই?

(যজ্ঞনাথ একটু সন্নিহিত ফিরে পেয়ে)

যজ্ঞনাথ। বাতাসে কি কারোর কারা শুনে পাচ্ছি। বৃন্দাবন, এই ঘন অন্ধকারের পাশে ফাটিয়ে একটা কাছ

আর্তনাদ কি তোমার কানে ভেসে আসছে বৃন্দাবন?

বৃন্দাবন। (অস্থির ভাবে) বাবা, কি হয়েছে শীঘ্র বলো। আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না।

যজ্ঞনাথ। (স্তূপের কাছে নিয়ে গিয়ে) এখানে কান পেতে শোন দিকি, বাবা বলে কেউ কি ডাকছে?

বৃন্দাবন। (স্তূপে কান পেতে) না, কই না।

যজ্ঞনাথ। শুনতে পাচ্ছিস না? পাবি কি করে? সে যে বাবা, বাবা বলে ডাকতে ডাকতে নিশ্চিন্ত ভাবে শেষ ঘুমে চলে পড়েছে এতক্ষণ, ওরে সে যে এখন তাল তাল মোহর আর টাকার নরম নরম গদীতে ঝক্ ঝক্ হয়ে গ্যাট পাঁকিয়ে বসে এই বুড়োর পাঁজর খসানো সম্পত্তির পাহারাদার হয়ে রয়েছে। তাকে তুই পাবি কি করে, হা হা হা হা হা হা... সে যে এখন সকলের মায়ার দড়ি ছিঁড়ে ঐদিকে (আকাশ দেখিয়ে) নৌকো ভাসিয়ে তরতর করে চলেছে, হা হা হা হা হা হা... কেউ পাবি না আর, কেউ খুঁজে পাবি না তাকে...হা হা হা হা হা...

(উন্মাদের মত হাসতে হাসতে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল)

বৃন্দাবন। বাবা, বাবা, এ তুমি কি করলে বাবা..... ওঃ গোকুল রে, গোকুল আমার, ফিরে আয়, ফিরে আয় (কঁদতে কঁদতে সেই স্তূপের জঞ্জাল আছড়ে ফেপতে লাগলো)।

(দীর্বে দীর্বে যথনিক নেমে এলো।)

—যথনিকা—

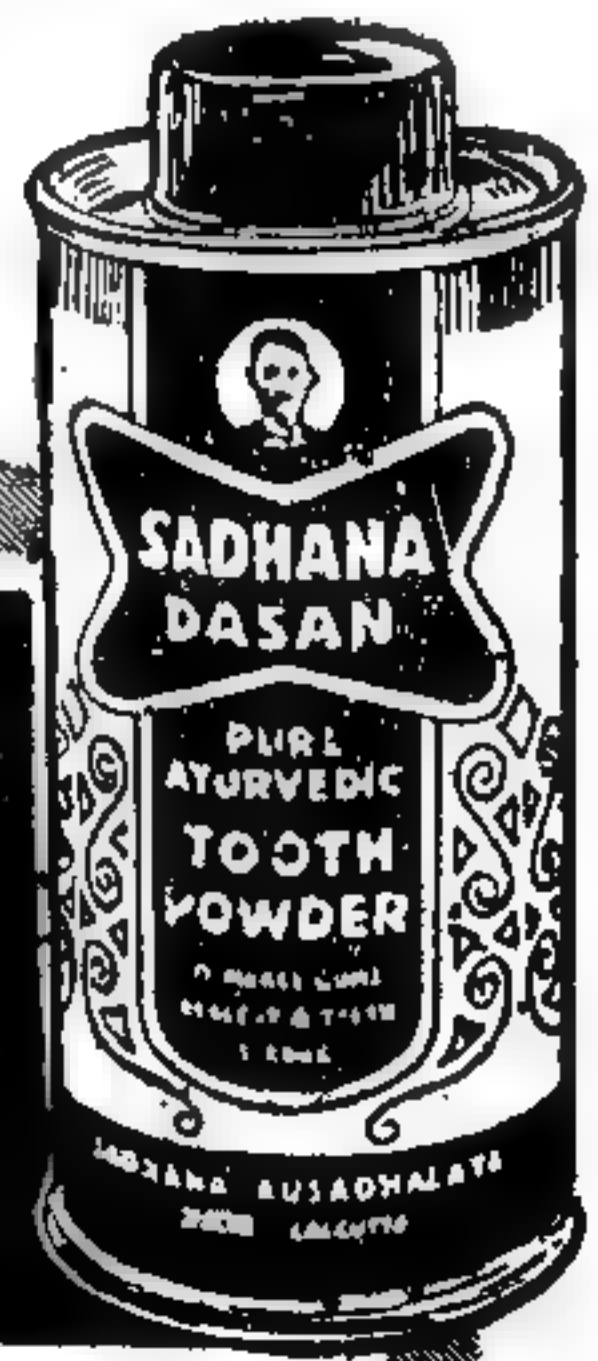
**Kirit** ADVERTISING AGENCY  
REPRESENTATIVE OF  
FAMOUS NEWS PAPERS & MAGAZINES

72, HINDUSTHAN PARK, • CALCUTTA-29

# মুখের দুর্গন্ধ অতি অস্বীতিকর !



মুখে দুর্গন্ধ থাকিলে সমাজে  
অবাধ মেলামেলনা করা যায় না।  
কাজেই ইহা অনেকের জীবন  
দুঃখময় করে। প্রতিদিন সাধনা  
দশন ব্যবহার করিলে মুখের  
দুর্গন্ধ দূর হয়, মুখ জীবাণুমুক্ত  
হয় ও দস্তরাজি সুস্থ, সবল  
ও সুন্দর হয়।



স্বাস্থ্যের  
সুখের  
সম্পদ

সাধনা ঔষধালয় - ঢাকা  
২০৬নং কর্ণওয়ালিস ট্রাট, কলিকাতা - ৬  
সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর  
কলিকাতা-৪৮



অধিক-জীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.  
আমর্ত্যেন্দ্রনাথ, এফ. সি. এস. (লওস)  
এম. সি. এম. (আমেরিকা) ভাগনপুর  
কলকাতার বসারন শাহের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।  
কলিকাতা কেন্দ্র-ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,  
এম. বি. বি. এস. (কলি:) আমর্ত্যেন্দ্রনাথ



# টাকার রং লাল

( সম্পূর্ণ উপভাস )

শ্রীআদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়

( এক )

মরণ। জন্মের কারণ।

আশা নিয়ে ভবিষ্যৎ বাধার সংকরে চিরসমাদি। দুর্মদ আশা-আকাজ্জা পূর্ণ হোক আর নাই-ই হোক, থাক হুয়ে যতই মৌনমূক বেদনা—বর্তমানের জন্ত আকুল আর্তনাদ, সব ফেলে যেতে হবে সে কঠিন নির্মম কালো মৃত্যু-বাগ্নে।

মহা সমাদরে নিয়ে যাবে মহাকাল। বাপা মানবে না। শুনবে না কারো কথা। সে অজানা—অজুত।

প্রিয়জনের আকুল আর্তনাদ, সজল চোখে শ্রাবণের ধারা, সহস্র সৃষ্টির অকারণ স্মরণ, কাল্পনিক ভবিষ্যৎ ভাবনার কলরোল গ্রাহ্য না করে সবার গোখের সামনে থেকে হাসতে হাসতে প্রাণ ছিনিয়ে নেওয়া প্রধান বৈশিষ্ট্য তার।

পৃথিবীতে সবার উচ্চ স্থান তার। এ-এক পরম সত্য শব্দ। ঐতিকটু হলেও সর্বপ্রাণী-গ্রাহ্য, আঁতে বা মারা কথা—মরণ!

অগ্রাহ্য অহমিকাময় অন্তরের অক্ষুট শব্দ সে শুনেও শোনে না। পরম স্বাভাৱে তার বাণী সর্বজন গ্রাহ্য করতে করতে সেই মহাকাল চলতে শুরু করেছে কোন আদিম কাল থেকে। থামছে না, থামবে না কোনদিন। বড় জোর পরমায়ু বাড়িয়ে দিতে পারে প্রয়োজন বোধ করলে। কিন্তু পরল স্বর্গের পরাকাষ্ঠা সে দেখাবেই অর্থাৎ তার ঐতিহ্য বজায় রাখবেই।

সব একদিক, মৃত্যু একদিক। তবু সে জিতছে। জিতেন্দ্রিয় পুরুষের মত নির্ধারিত জয়োল্লাসে লাল জবার মত লাল টকটকে চোখ দুটো জ্বল করে জালিয়ে রেখে লক-

লকে শাবিত জিভটাকে উন্নত লেলিহান শিখার জলন্ত প্রতীকের সদা জাগৃত গ্রহরী যেন সে।

কাঁকি দেবার উপায় নেই তার দৃষ্টিকে। পলক বিহীন সে স্বচ্ছ দৃষ্টি মার্চ লাইটের মত অত্যন্ত কড়া। বজ্র কঠিন বাহু দুটো বাহাতুরে বুড়ো থেকে আতুর ঘরে সন্ত প্রসূত বার সেকেন্ডের শিশুকেও দেয় না রেহাই। অর্থাৎ তার কারবারে ঘুষ নেই, ভেজাল নেই—ফলাও কারবার।

নির্ভেজাল সে কারবার ফলাও করে বিজ্ঞাপনের নিয়ন লাইটে মহাশক্তিশালী সুললিত ভাব ভাবার জালুপ্পর্শে মোহিত করবারও প্রয়োজন নেই।

অতএব মরণ প্রসঙ্গ।

তার যাত্রাপথ সত্য। সত্য তার নাম-মহিমা। তুলনা-বিহীন তকমাধারী বিশিষ্ট সেবাব্রতী যেন সে।

তুলনা ও উপমার দার ধারে না সে সেবাব্রতী। নিষ্ঠুর নিয়তির পরম বিশ্বস্ত ভৃত্য। বিশ্বজোড়া তার খেলা চলেছে অবিরাম। তোয়াকা করে না কারো সমালোচনার, কেননা কারো ত পরিজ্ঞান নেই মৃত্যুর হাত থেকে।

পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে মানুষ তার কাছে পরাজিত। সবার পরাজয়, স্তব্রাং লজ্জার কিছু নেই। সুললিত লজ্জার শাখা লবঙ্গ-লতিকার ভায় ললাটে ধারণ করে সব মানুষ এক সূত্রে গাঁথা।

মরণের বিপরীত দিক জন্ম।

জন্মের পর আসে কর্মের স্থান। পৃথিবীর বুক মস্তন সমতল তুলতুলে জাজিমের মত নয়, দুর্গম যন্ত্রণার্ত বিশাল পৃথিবীর বুক মানুষকে অহরহ বুদ্ধ করে আগিয়ে যেতে হয়।

হুভিষ্ক, মহামারী, হানাহানির প্রবল প্রতাপের কাছে বশুতা স্বীকার করাও মানুষের ধর্মে নয় না, তাই অহর্নিশি চলেছে আশা আর আশ্বাসে বিখাসী হয়ে তার চলার পথ সুগম করবার প্রয়াস। অর্থাৎ নতুন স্বর্ণোজ্জ্বল প্রভাতের রক্তিম চূড়ার দিকে তার ভীক্স প্রথর দৃষ্টি। কল্পনার আলোকিত জীবনের নতুন আশ্বাসের ভৈরবী সংগীত। হৃদয় মন্দিরের বন্ধ প্রকোষ্ঠে সে এক মধুর স্বরে একাকী একতারা বাজাচ্ছে। কখনও আশা কখনও নিরাশার ছবি পর পর চলচ্চিত্রের ছায় হৃদয় গুহায় দেখাচ্ছে নির্ভয় ও ভয়ের স্বরূপ। মানুষ টলছে আবাব টলতে টলতে সামলাচ্ছে। অনন্ত কাল থেকে তাই চলেছে মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা আর টানা পোড়েনের খেলায় খেলোয়াড় হয়ে দিগ্ভ্রান্তের ছায় ছুটে বেড়ানো।

সাধারণতঃ মানুষ ভাবে এক একটা দিক। কেউ পৃথিবীর কথা, কেউ দেশের কথা, কেউ নিজের কথা। ভেবে ভেবে হুশিষ্ণায় তলিয়ে যাচ্ছে—তবু ভাবছে। ভাবাটাই তার কাছে সাধনা। ভেবেই তার আনন্দ। ভাবনার একটা কিনারা আবিষ্কারের প্রচেষ্টা।—সে ভালই হোক আর মন্দই হোক।

ব্যক্তিগত ভাবনাটাই আজকের মানুষের মনে প্রবল। সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে তেমন কেউ ভাবে না—আত্মকেন্দ্রিক সুখাভিলাষই প্রধান কাম্য। তা' হলে পৃথিবীর এত দুর্দশা কেন হবে? কেন এ মাটির পৃথিবীতে নেমে আসবে না স্বর্গরাজ্য, কেন তার জন্তু পাড়ি দিতে হবে ঘরের রাজ্য ফেলে অজ্ঞ রাজ্যে?

উপাধির সঙ্গে সামঞ্জস্য না থাকলেও মুকুল সর্বাধিকারী মশাই নিজেকে তাই মনে করতেন। ধন-মান-গর্ব-অহঙ্কারের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন তিনি সুতরাং তার ওপর কার কি বলবার আছে? আর বললেই বা তিনি গুনবেন কেন—তিনি না লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক?

কালবাজারের দৌলতে তিনি প্রচুর টাকাকড়ি অগ্রায় ভাবে উপার্জন করেছিলেন। ভাবেন নি দরিদ্রের রক্ত চুষেই তাঁর এ রোজগার। আর বটেও ত, সে ভাবনা ভাবলে আর অর্থ রোজগার হয় না? তাই যাতদিন ছিল তাঁর অর্থোপার্জনের অক্লিস্ক্রিয় পথ

ইদানীং তিনি অনুতাপ ভোগ করছিলেন, কিন্তু মরতে চাননি। তবু তাঁকে মরতে হলো, বেহাই পেলেন না মরণের কাছে, হঠাৎ এসে প্রাণ ছিনিয়ে নিয়ে গেল মহাকাল।

ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, ছ'মাস আগে পর্যন্ত নানাবিধ বিপদ থেকে বেহাই, অথও পরমায়ুর জন্তু তিনি করেন নি এমন কাজ নেই। মানে একবার করে বিখ্যাত জ্যোতিষীদের দ্বারা করকোষ্ঠী বিচার, নানাবিধ বহুমূল্য কবচ-পাথর ধারণ এবং বার বার যাগযজ্ঞের জন্তু তিনি লক্ষাধিক টাকা খরচ করেছেন।

মহাশক্তিশালী মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ বাঁচাতে পারলে না সর্বাধিকারী মশাইকে। অর্থাৎ তাঁর সর্বাস্থে মেশানো কালবাজারী প্রসিদ্ধ দেহ-মনটা আর চাপা হয়ে উঠলো না।

(দুই)

স্ত্রী-পুত্র শেষ বিদায় দিলেন সর্বাধিকারীকে।

বিদায়ের ঘণ্টা রীতিমত জাঁকজমকপূর্ণ। বড় ঘরের বড় কথা। সুতরাং কেউ বিস্মিত না হয়ে বরং সাগ্রহে শেষের দিকে তাকিয়ে রইলো।

সর্বাধিকারীর বিপুল নথর দেহ সাধারণ মানুষের বহনোপযোগী নয়, তাই দেহখানা সুশোভিত হলো এক-খানা ট্রাকে। পূর্বেই ট্রাকখানা সাজানো হয়েছিলো নানা ফলফুলের লতাপাতা এবং বিবিধ ফুলের মালা দিয়ে। আলোকমালা সুসজ্জিত মৃত সর্বাধিকারী যে কোথায় যাচ্ছেন তা' সর্বসাধারণকে জানাবার উদ্দেশ্যে আগে-পিছে ছিল ট্রাক ভর্তি হরিনাম সংকীর্তন দল আর ছপাশে শবানুগামীর দল।

মুহূর্তে ধূপ-দীপ আতরের গন্ধে পথ বিমোহিত হয়ে উঠলো। হতচকিত হয়ে উঠলো পথচারীরা।

যারা সর্বাধিকারীর গুণমুগ্ধ তাদের মধ্যে কেউ বললে, 'একজন দিকপাল গেলেন, কেউ বললে, 'দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে অপূরণীয় ক্ষতি হলো'। যারা শত্রু, তারা আড়ালে বলাবলি করলে, 'বাঁচা গেল, মূর্তিমান পাপ বিদায় হলো'।

সেসময় লোকসভার অধিবেশন চলছিলো। সেদিন



পত্র পড়েছেন নিশ্চয় সর্বাধিকারী মশাইয়ের আশ্রয় প্রতি সম্মানার্থে সভায় দু'মিনিট দাঁড়িয়ে মোনতা পালন এবং তাঁর অত্যাশ্রয় গুণাবলীর কথা সংক্ষেপে জানতে পেরেছেন। যাঁরা নিয়মিত সংবাদপত্র পড়েন, তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, ক'দিন পর অসংখ্য সর্বাধিকারী মশাইয়ের গুণমুগ্ধ বন্ধু শোকজ্ঞাপনের উত্তরে তাঁর স্ত্রী-পুত্রের সবিনয়ে পত্রপ্রাপ্তি স্বীকার এবং শ্রদ্ধাবাসরে উপস্থিত হ'বার সান্নিধ্য প্রার্থনা। আমরা জানি, যদিও পরে উত্তম কাগজে মুদ্রিত নিমন্ত্রণ পত্র যথাযোগ্য পাত্রে যথাসময়ে বিলি বন্দোবস্ত হয়েছিলো। বেশ কিছু গাড়ী বিশেষ অতিথিদের আনবার জন্য সকাল থেকে ছোটোছুটি করছিলো। অন্ততঃ বিশটা বিশেষ ব্যক্তি তুংড়ির মত ছুটে বেড়াচ্ছিলো ঘরে বাইরে।

মৃতদেহ সংস্কার হলো সগৌরবে। জনকয়েক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং মিনিট পাঁচেকের জন্য একজন প্রাদেশিক উপ-মন্ত্রীর উপস্থিতি আরও শোভা বর্ধন করলো স্থানের।

পাড়া-প্রতিবেশী সবাই জানলে, সর্বাধিকারী মশাই মরার মত মরেছেন, সুতরাং একটা কাজের মত কাজ হবে। কাজ করে নাম পাবে তাঁর একমাত্র পুত্র রামগোপাল সর্বাধিকারী, ধনী ব্যবসায়ী মহলেও বাহবা পাবে। এক-স্বত্রে গৌণে নেবেন তাঁরা। চাই কি, পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে একটা কিছু করলে এম. এ. পাস করার পর ডক্টরেটের যে সম্মান সেরকম সম্মানও পাবে বিভিন্ন মহলে। অতএব সে পিতার শ্রুতস্থান পূরণার্থে উঠে পড়ে লাগবে, এ আর বেশী কথা কি?

মৃতদেহ সংস্কার করতে খরচ হলো সাড়ে তিন হাজার টাকা। বলা বাহুল্য হাজার টাকার চন্দন কাঠ আর পাঁচশো টাকা নেশা ভাঙু স্মৃতির জন্য খরচ হলো শুধু।

চন্দন কাঠের চিতায় পুড়লে মানুষ কোন্ লোকে যায় জানি না, তবে ধনীর ঘরে সে রেওয়াজ আছে অর্থাৎ চন্দন কাঠের চিতায় পুড়ে মরবার মত সামর্থ্য আছে তাই তারা পোড়ে। হায়! দরিদ্রের পুড়ে মরবার মত কাঠও জোটে না। তবে শবদাহ মাত্রই দু-পাঁচজন নেশাখোরের আবদার মেটাতে হয়, তা' না হলে কাজ হয় না। স্থান-বন্ধু বলে মানায়ও না যে—যেমন উগ্র কাজ তেমন উগ্র নেশা করা চাই ত।

রামগোপাল দিলদরিয়া তখন। যার যা' আবদার মেটাচ্ছে বেশ খুশী হয়ে। মাঝে মাঝে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে, 'আহা, বাবা চলে গেলেন—কিভাবে যে সবদিক সামলে উঠবো!'

মাহস দিলে বন্ধু-বান্ধব ও পিতৃবন্ধু। তার কোন চিন্তা নেই। তারা প্রাণটুকু ছাড়া বাকী সব দিয়ে সাহায্য করবে তাকে। আজকের মানুষ সব পারে, পারে না শুধু মৃত প্রাণ দান করতে, সুতরাং সর্বাধিকারীর মৃত্যুর জন্য তার এতখানা ভেঙে পড়লে চলবে কেন?

একজন পিতৃবন্ধু ইঙ্গিতে ইশারায় প্রকাশ্যেই রামগোপালের কজন যুবক বন্ধুকে বললেন, 'বাবাজীকে সামলাও তোমরা, আমরা ওদিকটা সামলাচ্ছি—' বলেই তিনি স্থানের দিকে মুখ ফিরিয়ে গদগদ কণ্ঠে বলেন, 'চিতা যা' জলছে, আশা—পুণায়া মানুষ—' বলেই তিনি হ'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন।

বাবাজী কিছুক্ষণ আগে ক'-আউন্স ইম্পিরিয়াল ক্রাউন আর গোটা ছধেক সেক্স ডিম শেষ করেছে, এটা নাকি সে কলেজ-লাইফ থেকেই শুরু করেছে। যেহেতু তেমন বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মেলামেশা করতে হলে এবং কচি দেহমানে অহরহ একটা খুশীর আমেজ রাখতে হলে এটা নাকি অপরিহার্য। দেহে ভেজাল না দিলে মনে ভেজাল আদবে কেন।

সামনে গোল্ডফ্লাক সিগারেটের কোটোটা খোলাই ছিল। বাবাজী নাকি চেইনস্মোকার। ফের একটা ধরিয়ে কা'কে যেন বললে, 'বড় অনুতাপ যে বাবাকে বাচাতে পারলাম না; ষাট বছর বয়স এমন বেশী কি? সেদিন কাগজে দেখলাম, আমাদের দেশের এক বৃদ্ধা একশো ষাট বছর বয়সে বেশ বৌচ আছেন, রাশিয়াতে নাকি 'লংজিবিটি' আরো বেশী।'

আর একটা ইম্পিরিয়াল ক্রাউনের বোতল খুলে গেলো সে খানিকটা ঢেলে কে যেন সামনে ধরলে বাবাজীর।

বাবাজী বিনা দ্বিধায় পান করে এবার মনের ঝাঁপি খুললে, 'তোমরাই বল—এ ছঃসময়ে লীনার ডিভোর্স কেস ষ্টার্ট করা কি ঠিক হয়েছে? একদিকে আমি বাবাকে নিয়ে শশব্যস্ত, আর তুই কোন আক্কেলে

তুই কি করবি ?—নিজেই আদালতে স্বীকার করবো। কেন, লীনার বাবা মদ খান না, সপ্তাহে একদিন করে গ্রাণ্ড হোটেল যান না? তাতে তাঁর কোন অসম্মান হয়েছে, না ব্যারিষ্টারী মন্দা যাচ্ছে? আর একথা যদি আমি প্রমাণ করিয়ে দিতে না পারি ত—'মাথা ঝাঁকড়ে এবার সে বলে, 'তা' হলে আমার শাণ্ডীকে ত ডিভোর্স' কেস করতে হত আগেই—হঁ, আভিজাত্যের মুখে ঝাড়ু মারো।'

বন্ধুতা সবাই এক বাক্যে বললে, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়—আরে তুমি রাজী থাকলে বলা না শুনানেই তোমার বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ নিয়ে তুলব! সর্বাধিকারী মশাইয়ের ছেলে বিয়ে করতে রাজী থাকলে লীনার মত আঁই এ পাস নয়, কত বি.এ., এম. এ. পাস মেয়ের বাপ তোমার পায়ে গড়াগড়ি দেবে। এইত কেস ষ্টার্ট হয়েছে শুনেই কত উজ্জলোক তোমাকে কতাদান করবার জন্তে হন্তে হন্তে উঠেছে। লীনা লীন হয়ে থাক তোমার মন থেকে। আসল কথা নাকি, তোমার সঙ্গে বিয়ের আগে কোন এক সিমেন্স-আর্টিষ্টকে সে মন-প্রাণ সমর্পণ করেছিলো—বাপের নাকি তাতে ঘোর আপত্তি ছিলো, তাই ধরে বেঁধে বিয়ে হয়েছিলো—এখন মন ফের উড়ুউড়ু করছে, তাই নানারকম গলদ দেখিয়ে ডিভোর্স' কেস করা। ফুঃ....

লীনার কাকী অদূরে দাঁড়িয়েছিলেন। ওদের কথা-বার্তা শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে বুঝে আগিয়ে এসে বলেন, 'ছি ছি বাবাজী, এসময় ওসব কথা কেন? তুমি কি এতদিনেও বুঝতে পারনি লীনা কেমন মেয়ে? পরের মুখে বাজে কথা শুনে শুনানে কেন তড়পাচ্ছে? নিজের ঘরের কেলঙ্কারী এভাবে প্রকাশ করার কি কোন বাহ্যিকরী আছে? তোমরা বিবাস কর আর নাই কর, যেমন লীনা, তেমনি তার বাবা। অমন মানুষ এ-যুগে খুব কমই মেলে!—উঠে গিয়ে দেখো, চিতার পাশে বাপ মেয়েতে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে। লীনা ত তার খণ্ডরের মৃত্যু সংবাদ শুনে থেকে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে, শুনানেও দু'বার অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল'।

'তবে কেস করেছে কেন মশাই? কেসটা তেমন জমবে না বুঝে বাপ মেয়েতে সময় বুঝে এখানে এসেছেন বুঝি?'

'সব কথা তোমাকে এখানে বলা উচিত নয় বাবাজী, তবে না বললে তোমার বন্ধুতা অন্যরকম ধারণা করতে পারেন তাই এবার আমাকে আসল কথাটা বসতে হল। তোমাকে সংশোধনের জন্তে তোমার বাবার পরামর্শেই ডিভোর্স' কেস করা হয়েছে—মান ইচ্ছান্তেব ভয়ে যদি তোমার চরিত্রের সংশোধন হয়, তাই! কিন্তু আজ ত তোমার বাবা বেঁচে নেই, সবদিক সামলানো দায় হবে, এসব চিন্তা করেই—'

'ব্যারিষ্টারী চাল আমি বুঝি খুড়োমশাই, আমি সকুল সর্বাধিকারীর ছেলে—ওগব ছেলে ভুলানো কথা বলে আমাকে ভোলাতে পারবেন না।—আমি যে কি 'চীজ' তা' বুঝতে জানতে আপনাদের বহু দেরি। হাঃ—হাঃ—হাঃ—'

আমার কথা বিশ্বাস কর বাবাজী, তোমার মা'-ও একথা জানেন। তা' ছাড়া তোমার সন্তান লীনার গর্ভে, এসময় ওসব করবার সময়ও নয়। বেশী ঘাঁটিদো না, তোমার বাবার হাতের লেখা চিঠিও আছে আমাদের কাছে।

লীনা কাছে এসেছে তখন। ভিজ়ে গলায় বলে, 'বিশ্বাস কর সব সত্যি, মরণ যেমন সত্যি তেমনি এসবও।—পরে তোমাকে সব খুলে বলবো।'

'শুনান নয় বেন ষ্টেজ'—দূর থেকে কে বেন বলে।

রামগোপাল ধীর কণ্ঠে জবাব দেয়, 'জীবনটাই অভিনয় দাদা, ভেবে দেখলে, না—মনে হবে না'। এবার লীনার দিকে চেরে বলে, 'এসো লীনা, আমরা আবার সংসার পাতিগে সুখে স্বচ্ছন্দে—ভুলে যাও অতীতের কথা। তা' ছাড়া জন্ম হলেই মৃত্যু আছে। সেজন্ত আকুল হলে চলবে না। আমাদের বাচতে হবে, তারপর বাবার মতই একদিন আসতে হবে শুনানে। মরণ প্রসঙ্গ—মরণ অজের।—তুমি কি তা' বিশ্বাস কর না?'

ধরা গলায় লীনা বলে, 'করি বই কি! চলো, ওদিকের কাজ সারা হয়েছে, আমরা স্নান করে বাড়ী ফিরে যাই। তোমার জামা কাপড় আমার সঙ্গেই আছে।'

রামগোপালের বন্ধুতা পরস্পর মুখ তাকাতাকি করে বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে।

( তিন )

অখণ্ড পরমায়ুর স্বত্বাধিকার নিয়ে মানুষ জন্মেছে এ তার কপট ধারণা। কিন্তু মানুষ বুঝেও বুঝতে চায় না,



সে জন্মের দিনই মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে নিয়ে এসেছে। এসেছে তার পরমায়ুর দণ্ড-পল-কম্পনের নিভুল হিসাবের নিশান হাতে করে।—সময় হলেই যেতে হবে সে অনন্ত লোকে।

প্রভাত সূর্য যখন রক্তিম আভায় পূর্বের আকাশের কোলে আবীর ছড়িয়ে দেয়, আঁধার লজ্জায় মুখ লুকায়। আবার যখন অন্ত যায় প্রভাত-সূর্য, আঁধার এসে জাঁকিয়ে বসে। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে চলেছে তাই আলো আঁধারের মত জন্ম-মরণের চক্রাকার খেলা।

জন্ম থেকেই মানুষ মৃত্যুর দিকে আগিয়ে যাচ্ছে। যাবার আগে নানা খেলায় মত্ত হচ্ছে। হাসি-কান্না ভরা এ পৃথিবী যেন তাকে নিত্য নতুন আলেয়ার মক সাগরে স্নান করচ্ছে। যদিও পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে কোটি কোটি মানুষের চরণ স্পর্শে এ ধরনী ধত। পাহাড়-নদী-অরণ্য-রাজপথ তার ইতিহাস জানে এবং মিছিলও চলেছে তাই বহুদিন থেকে। বিচিত্র এ-মিছিলের চরিত্র, চলমান আলেখ্য বৈচিত্র্য প্রতিটি ধূলিকণাও যেন বিস্মিত হয়, মানুষ কিন্তু বিস্মিত হয় না। মানুষের কাছে পরম বিস্ময় মৃত্যু।

বিধাতার কি অদ্ভুত ইঙ্গিত। অথচ মানুষ জন্ম থেকেই সহজ সত্য পথ মেনে নেয় না। সহজ-সত্য-অনাড়বর জীবন যাপনে মানুষের যুক্তি শাস্তি নেই—বৈচিত্র্য না থাকলে জীবনই যে বৃথা।—আশ্চর্য, আলেয়ার পিছে মানুষ ছুটেছে, ছুটে ছুটে হরহান হয়ে যাচ্ছে—তবু ছুটেছে, ছুটেই তার শাস্তি। আত্ম অহমিকা—অথচ পরমায়ুর অধিকারী হয়েছে সে জন্ম থেকে—এ অলৌক ধারণার বশবর্তী হয়ে চলে তার মায়ামূগের পিছে নিরন্তর পশ্চাদ্ধাবন।

মুকুল সর্বাধিকারী মশাই জন্ম থেকেই ধন-মান-যশের অধিকারী ছিলেন না। ছলে বলে কৌশলে তিনি সেসব অধিকার করেছিলেন। দরিদ্র-দুর্বল মানুষ যারা তারা বলেছিলো ‘ভাগ্য’, আর যাদের চোখ টাটিয়েছিলো তারা আড়ালে বলাবলি করেছিলো, ‘সব অধম’ আর মুকুবির জোরে’। সহজ সত্য পথে চললে মানুষের চলে যেতে পারে, কিন্তু এতখানা হতে পারে না, অধর্মের আশ্রয় বিনা।

মুকুল সর্বাধিকারী বলতেন, ‘এ বাহু দুটোর জোর আর

তার সঙ্গে চাই ভাগ্যের প্রসন্নতা আর অবিচলিত সাহস।

অবশ্য অস্বীকার করা যায় না তার সুপ্রসন্ন ভাগ্যের কথা, যদিও প্রচুর বাধা বিপত্তির মধ্যে তাকে ভাল সামলাতে হয়েছে। বালিগঞ্জের বিরাট বিরাট সৌধের পাশে যখন তাঁর আধুনিক ছকের বাড়ীখানা আকাশ-ছোয়া আশা নিয়ে হুহু করে বেড়ে ফুল-ফলগাছ থেকে যেখানে যেমন-টির প্রয়োজন সেসব স্থাপিত হয়ে তাক লাগিয়ে দিলে প্রতিবেশীদের, সেসময় তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আড়ালে মুচকে হেসেছিলেন, সবার অলক্ষ্যে বুকখানাও স্ফীত হয়ে উঠেছিলো গর্বে, তাঁর দীর্ঘদিনের একটা মস্ত বড় কামনা আজ পূর্ণ হয়েছে।’

আশা আর আখ্যানে বিখাসী মুকুলের হৃদয়ে ছিল আরও অনেক আশা। স্বপ্নের মাধুরী মাখা মনের কোণে মেঙুলো ঘুরপাক খাচ্ছিল। ধীরে ধীরে করতলগত করতে হবে কামনা-বাসনা।—ছকে বাধা হাসি, মেপে মেপে কথা বলা তার দীর্ঘদিনের মক্সো করা, সেসবের মোক্ষম প্রয়োগে সব দিকান্ত পরিপূর্ণ হবে। ধৈর্য ধরে পুষিয়ে নিতে হবে তার কাম্যবস্তু। এ তার চাই-ই চাই।

অতবড় ইমারত দেখে চোখ টাটিয়েছিলো অনেকের। তাই এনফোর্সমেন্ট বিভাগে খবরও গিয়েছিলো তড়িৎদ্রি।

মৃত্যুবাণ!

তদন্তের পূর্বাভাষ পেয়েছিলেন মুকুল। তার কুটিল কালা শয়তানী চোখ দুটো প্রথমটা টাল খেয়ে গিয়েছিলো। দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তারপর সামলে নিয়ে সোজা চলে গিয়েছিলেন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিষ্টার সোমের কাছে।

মিষ্টার সোম বছরে বহু টাকা পান মুকুলের কাছে, আইনকে বুদ্ধাসুষ্ঠ দেখিয়ে এবং নানা ফলি ফিকিরের পরামর্শ দিয়ে। এবারও পরামর্শ দিলেন কিভাবে তিনি উত্তরে যাবেন এনফোর্সমেন্ট বিভাগের শ্রেনদৃষ্টি থেকে। আইন আর রীতির ধার ধারেন না মুকুল। কিভাবে টাকার জোরে সব উলটে দেওয়া যায় তিনি জানেন। আসল কথা এ বিপদ থেকে উদ্ধার না পেলে তিনি সম্মান বাঁচাবেন কি করে? কি ভাবে আশায় আশায় জিইয়ে রাখা হৃদয়ের

মিষ্টার সোমকে মোটা টাকা 'ফি' দিয়ে সত্ত্ব কেনা নতুন মডেলের গাড়ীখানা জোর স্পীডে চালিয়ে উৎফুল্ল-চিত্তে বাড়ী ফিরেছিলেন মুকুল। তিনজন সি. এ. সাতদিন গঙ্গদ্বম হয়ে এনফোর্সমেন্ট বিভাগের কর্তাদের তাক লাগিয়ে দেবার ভয় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরী করে দিয়েছিলেন মোটা টাকা দক্ষিণা নিয়ে।

মুকুলের সামান্য বিত্ত-বুদ্ধি আজ বেড়ে গেছে অনেক-খানি। তিনিই বাড়িয়েছেন ঠকতে ঠকতে। এ না হলে কেমন করে সবদিক বজায় রাখবেন তিনি? পরস্পর প্রভাষণ করার যুগ এটা। সুতরাং তীক্ষ্ণ প্যাচালো বুদ্ধির প্রয়োজন। প্রয়োজন মিটিয়েছিলেন তিনি সবার অলক্ষ্যে, গোপনে পড়াশোনা করে। কাউকে জানতে দিতেন না, ধরাও পড়েন নি তিনি সামান্য বিত্তের মানুষ।

### ( চার )

তৈরী কাগজপত্রগুলো চোখ বুলিয়ে মনোমত হয়েছে কিনা পরীক্ষা করছিলেন তিনি সেসময়।

গভীর রাত্রি তখন।

চিন্তিত মুখে উঠে এসেছিলেন পাকুল সর্বাধিকারী। তাঁর জী। মুখ চোখে তাঁর ঘুমের ছায়া।

খুঁটিনাটি ভাবে কাগজপত্র পরীক্ষা করছিলেন মুকুল। সেসময় তিনি ডুবে গেছেন গভীরে। সে-গভীরতার পরি-মাপ পাকুলের দ্বারা সম্ভব নয়। রাত ন'টা থেকে একটা পর্যন্ত তিনি একটি বারও ওঠেন নি। চাকর চা দিয়ে গেছে মাঝে মাঝে, তিনি কখনও খেয়েছেন কখনও খান নি। অনবরত টেনেছেন কড়া চুরুট। কাউকে বিশ্বাস নেই, কারও যোগ-বিয়োগ সঠিক বলে গণ্য করার নেই, অতি বড় বিজ্ঞেরও ভুল হয়। তাই পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন। এসব চিন্তা করেই তিনি কাগজপত্র নিয়ে বসেছেন। গোপনীয় কাগজপত্র সব বাস্তবন্দী করে রেখে এসেছেন এক বিশ্বাসী বন্ধুর কাছে। সময় থাকতে সাবধান, তবু মনটা অস্থির হয়ে আছে।

পাকুল অধৈর্য হয়ে ওঠেন :—'শোবে চলো কত রাত হয়েছে।'—ঘুম জড়ানো কণ্ঠ তার।

কথাগুলো কানে যায় না মুকুলের। ফের একটা খাতার

হিসাব বজায় আছে কিনা, থাকলেও তা' বাস্তবের সঙ্গে কতখানি মিল সেসব চিন্তা করতে থাকেন। মনের দর্পণে জ্বরের জোরালো সমর্থনে মিলিয়ে নিতে চান। যেন তিনি পরাজিত না হন, ধরা না পড়েন আইনের প্যাঁচে।

ফের একটা চুরুট ধরিয়ে একমুখ ধোয়া ছাড়েন মুকুল।

বিরক্তির ঝাঁজ প্রকাশ করেন পাকুল দেবী।—'বরখানা কড়া চুরুটের গন্ধে ভরপুর, চলো শোবে—রাত হয়েছে অনেক—কি করছো তুমি ছাইপাশ হিসেব-নিকেশ।'।

মুখ তুলে মুকুল এবার পাকুলের দিকে তাকান। বলেন—'এ অগ্নি পরীক্ষার সময় এরকম ব্যবহার আশা করিনি তোমার কাছে?'

ভয় পেয়ে যান পাকুল। মুহূ মোলায়েম কণ্ঠে বলেন, 'এত রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে না?'

বজ্রকঠিন কণ্ঠে মুকুল বলেন, 'না! কেন কাজের সময় বিরক্ত করো? খাওয়া-শোওয়া ছাড়া মুকুল সর্বাধিকারীকে আরও অনেক কাজ করতে হয়—অনেক কিছু চিন্তা করতে হয়। ভুলে যাচ্ছে কেন—তা' যদি না করতাম, বালীগঞ্জের এ-সৌধ আমার স্বপ্নেই রয়ে যেতো, বাস্তবে পরিণত করতে পারতাম না কোনদিন। এত টাকার মালিকও হতে পারতাম না।'।

'এত সব ঝামেলায় দরকার কি বাপু, তার চেয়ে সুখ শান্তি অনেক ভাল। এর চেয়ে নবীন কুণ্ডু পেনের ভাড়া বাড়ীসাই ছিল ভাল।'।

'হু—বসো সামনের চেয়ারখানায়, আর দশ মিনিট মাত্র।'। আবার কাজের মধ্যে ডুবে যান মুকুল।

ভীত ভাবে চেয়ারে বসেন পাকুল। বুঝতে পারে না সে এভাবে তাকে বসতে বলার অর্থ কি! কেনই-বা বাস্তবে বললে—কোনদিন ত তাকে এ-রকম গভীর কণ্ঠে কথা বলে না।

কাগজপত্রগুলো গুলিয়ে রেখে ধীর গভীর কণ্ঠে মুকুল বলেন, 'নবীন কুণ্ডু পেনের ভাড়া বাড়ীর কথা বলছিলেন না?'

'ই্যা, অতসব হাঙ্গামার চেয়ে তাই ভাল নয় কি? অন্ততঃ সে সুখের ছিলো—শান্তির ছিলো, আমার মতে।'।

হাঙ্গামা যদি না করতাম, আজ গ্রামের সে মেঠো বাড়ী



কোনদিন? তুমিও আমার ভালবেসেছিলে আমার হাজার বছর জন্মেই—সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে বালীগঞ্জের লোক থেকেই আমার সঙ্গে চলে এসেছিলে আমার অর্থ দেখেই, তাই না?—আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবার কথা উঠতেই কেন তোমার বাবা 'না—না' করে উঠেছিলেন, জান? কিন্তু আমি জানি, সে আমার দারিদ্রের জন্মেই! তারপর এক দরিদ্র ঘরের মেয়ে শ্রামলী এলো আমার জীবনে। পাঁচটা বছর যুগ করলে আমার সাংসারিক দারিদ্রের সঙ্গে, কিন্তু শান্তি পেলে না একবিন্দু, তারপর একদিন বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। বেথে গেল পতিব্রতীর চিহ্ন, আমার বিপদ-আপদের প্রণদানের সঙ্গিনীর শেষ স্মৃতি চিহ্ন হাতিমুখে। সে কোনদিন হার মানলে না, আমার দারিদ্র, আমার অক্ষমতার কথা মনেও ঠাঁই দিলে না। আজও আমার মনে পড়ে, চোখের সামনে ভাসে তার মধুর হাসি, তার সান্ত্বনার বাণী আজও আমার কানে বাজে পাকুল। তাই মনে হয় বিপদে যে ধৈর্য ধরে স্বামীর বিপদকে নিজের বিপদ মনে করে সব দুঃখ হাতিমুখে সহ্য করলে তার অদৃষ্টে কেন সুখভোগ হল না? জানো পাকুল, জগতে আসল-নকলের পার্থক্য কি জান, আসল ফাঁক ও ফাঁকি জানে না, কিন্তু নকল ফাঁক ও ফাঁকি খোঁজে—তার সবেতেই ভেজাল। আমি জানি ভাগ ভাবে ভেজাল কাণে বলে, যেহেতু আমি ভেজাল নিয়ে কারবার করি। অনেক তফাত পাকুল, শ্রামলীর সঙ্গে তোমার অনেক তফাত। হোক না সে দরিদ্রের মেয়ে, তবু সে তোমার চেয়ে অনেক বড়।'

'আমি কিন্তু তোমাকে সেভাবে একথা বলিনি। তুমি বিশ্বাস কর—' ফুঁ গিয়ে কেঁদে ওঠেন পাকুল।

'চুপ কর, শুকামি রাখ—আর কোন কথা বলে আমাকে বিরক্ত কর না। যদি বাড়াবাড়ি কর, দেখেছো—' বলে দেওয়ালে ঝুগানো রিভলভারটার দিকে একটা আঙুল দেখাল মুকুল।

'সেই ভাল, শেষ করে দাও আমার এ বিকৃত জীবনটা। সবার অলক্ষ্যে এখানে রয়েছি, কিন্তু আমার বিশ্বাস, গ্রামের লোক আজও আমার কথা নিয়ে কুৎসা রটায়, আমার

হঠাৎ প্রচণ্ড রবে হেসে ওঠেন মুকুল। একদিন যারা আমার বিক্রয় করেছে আজ তাদের মুখে চুনকালি লেপে দিয়ে তোমাকে নিয়ে ঘর বেঁধেছি। কিন্তু কেন জান, তাদের আশ্রিজাত্য আর অহংকার ভাঙবার জন্মেই। আজ তাদের মত দশ-বিশটা সংসারের সম্পদ আমি যে কোন মুহূর্তে কিনতে পারি। দরিদ্র মুকুল সর্বাধিকারী গ্রামের মধ্যে ধনী প্রশান্তবাবুর বিধবা কন্যাকে অর্থ মাহাত্ম্য দেখিয়ে নিমেষে টেনে এনে তুলেছে কলকাতার বালীগঞ্জে। যদিও তারা নকল স্বামী-স্ত্রী, তথাপি সবাই জানে, পাকুল সর্বাধিকারী তার বিয়ে করা বউ। কিন্তু তাদের সম্পর্ক ভেজাল। ভেজালের কারবার করে মুকুল সর্বাধিকারী বড় হয়েছে, তার স্ত্রী ভেজাল হবে, আরও পাঁচটা ভেজাল উপপত্নী থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য কি বলে?'

টেবিল থেকে মাথা তুলে সরবে কেঁদে ওঠেন পাকুল। বলেন, 'না—না, আমি বিশ্বাস করি না।—আমি ছাড়া তোমার কেউ নেই।'

'তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে আমার কিছু এসে যায় না।'—কথাগুলো এমন ভাবে মুকুল বলেন, পাকুলের সর্বাঙ্গে যেন ভাঙিলোর বিহুতি ছুঁয়ে যায়। জালা করে ওঠে গোটা শরীর।

একটা চুরুট ধরিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান মুকুল। তারপর জোর জোর করে কটা টান দিয়ে বলতে শুরু করেন, 'গ্রামের হীন দরিদ্র মুকুল সর্বাধিকারীর সঙ্গে বিয়ে দেবার প্রস্তাব প্রথমে তোমার বাবাই করেছিলেন। যেহেতু আমার আর কিছু না থাক, আমি নাকি রূপবান। মনে আছে বোধহয়, ছোটবেলায় আমাকে অনেকে 'শিমুল ফুল' 'পিতলের কাটারি' বলে ধিক্কার দিতো। সে যাই হোক, তিনি অবস্থাপন্ন মানুষ, তাঁর বিষয়-সম্পত্তি থেকে আমাদের অর্থাৎ তাঁর মেয়ে-জামাইকে কিছু দেবেন এ-কথাই শুনেছিলাম। হঠাৎ একদিন শুনলাম, তিনি তাঁর মত বদলেছেন। তোমার বিয়ে হলো সুশীলবাবুর সঙ্গে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, বিধাতা বিয়ের তিন বছরের মধ্যে সুশীলবাবুকে ছিনিয়ে নিলেন তোমার কাছ থেকে। অর্থাৎ তোমাকে আসল সংসার থেকে সরিয়ে এনে আমার নকল সংসারে নকল জীবন বাপনে বাধ্য হবার পথ প্রশস্ত করে দিলেন।'

আমি পুরোপুরি সংসারী, যদিও দারিদ্রের জাঁলায় জঁলে পুড়ে মরছি। ভাবলাম, এভাবে দাঁচা যায় না। যে কোন প্রকারে অর্থ রোজগার করতে হবে আমাকে। পেটে বিত্ত-বুদ্ধি নেই তেমন, চাকরি দেবে কে? কি ভাবে কোথায় অর্থ পাব?

কথা বলতে বলতে বাইরের ফাটে এলেন মুকুল। আকাশে তখন গুরুগুরু দশমীর টাঁদ সুরু হতে থাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। নিঝুম শহর। মাঝে মাঝে ছ-একখানা গাড়ী বোম্বয় বিশেষ প্রয়োজনে যাতায়াত করছে।

### (পাঁচ)

পুনরায় বসে এসে টোকেন মুকুল।

পাকল তখন বিপর্যস্ত ভয়ে।

কি যেন একবার ভেবে নিলেন মুকুল। তারপর বলতে শুরু করলেন, 'তারপর এলো আমার জীবনে পরম শুভলগ্ন। শোন কিভাবে—'

সেবার মহেশগঞ্জের জমিদার কৃষ্ণকান্ত পাল মশাই নায়েব-গোমস্তা এবং ক'জন পেয়াদা নিয়ে গ্রামের কাছারিতে এসেছেন।

শুনলাম গ্রামের অধিকাংশ প্রজার পাঁচ-ছ' সনের খাজনা বাকী। তাই তাঁর সদলবলে আগমন। তিনি যে কোন প্রকারে খাজনা আদায় করবেন।

প্রবল প্রতাপাবিত কৃষ্ণকান্তবাবু ছিলেন সে চাকলার ঘর। প্রজা ঠাণ্ডাবার পদ্ধতি ছিল তাঁর অভিনব। তবে শুনেছি, শুধু হাতে না পেলে ভাতে মারবার কাজেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অপূর্ব কৌশলে প্রজার ঘরে আগুন, হালের বলদের জাবনায় গোপনে বিষ প্রয়োগ, পেয়াদা দিয়ে বাড়ীর বউ-বিশদের অপমান—এসব ছিল তাঁর প্রজা জব্দ করবার প্রথম শ্রেণীর কৌশল।

পেয়াদা এসে আমায় ডাক দিলে।

জবাব দিলাম, 'যাচ্ছি—'।

রাগ্নাবর থেকে ছুটে বেড়িয়ে এলো শ্রামলী।—'তোমার পায়ে পড়ি, যেও না—তুমি যেও না—। শুনেছি, জমিদার-বাব লোক ভাল নয়, কারও সম্মান রাখেন না।'

হয়ে আসব না, প্রয়োজন হলে অপমান করে আসব।'

'সে অধিকার তোমার নেই, পাঁচ সনের খাজনা বাকী যাদের, তাদের অহঙ্কার করা সাজে না।'

'কিন্তু তাদের দেবার সামর্থ্য থাকলে অকারণ যে অপমানিত হতে চায় না; সে-কথাটাই তাঁকে জানিয়ে দিতে চাই। তুমি বাঁধা দিও না।'

শ্রামলী ভয় পেয়ে কেঁদে ফেললে।

আমি বেড়িয়ে এলাম ঘর থেকে।

রোগ্যকে একটা আরাম চেয়ারে বসে আছেন কৃষ্ণকান্তবাবু। ছ-পাশে জনকয়েক তাঁবেদার। যার মধ্যে প্রধান ভাবকের ভূমিকায় ছিলেন তোমার বাবা। নায়েব-গোমস্তারা আপনাপন কাজে মগ্ন। উঠানে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন প্রজা করজোড়ে বসে আছে—যেন তারা পুজার উৎসর্গীকৃত বলি।

আমি পৌছোতেই গোমস্তা আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন কৃষ্ণবাবুর সঙ্গে এবং আমার দারিদ্রের কথা জানিয়ে দিয়ে আমার পাঁচ সনের খাজনা বাকীর কথাটা বললেন অত্যন্ত তচ্ছিল্য ভাবে।

আমি নামক অপদার্থ তখন লজ্জায় মাথা হেঁট করেছি। আমি দরিদ্র, আমি জমিদারের খাজনা শোধ করতে পারিনি অতএব আমি তাঁর কাছে যুগ্য। তাঁর কাছে আমার অক্ষমতা বুঝি অমার্জনীয়—কিন্তু কেন?

গড়গড়ানলে কয়েকটা ঘন ঘন টান দিয়ে কৃষ্ণবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'খাজনার টাকা এনেছো?'

'আজ্ঞে না—'

'কেন?'

'যোগাড় করতে পারি নি—'

'এটা কি একটা কথা—? খাচ্ছে-দাচ্ছে দিবি, চেহারাখানাও দেখছি বেশ নাজসবুহ, অথচ সামান্য খাজনার টাকাটা যোগাড় করতে পার না? হাল সন পর্যন্ত কত বাকী হে?'

গোমস্তা বললেন, 'চার পাঁচ বিঘা জমি মাত্র। সুদ, তত্ত্ব সুদ নিয়ে আঁজ্ঞে—পঞ্চাশ টাকা বার আনা।'



‘কিন্তু এ-বছর অজন্মা, তা’ ছাড়া এ আষাঢ় মাসে আমার পক্ষে টাকা পয়সা যোগাড় করা বড় কঠিন। বুদ্ধ মা-বাবা, বিয়ের যোগ্য ছ’টি বোন আমার ঘাড়ে—ভাদ্রের খাওয়াতে পারতেই আমি হিমশিম খাচ্ছি, একটা চাকরি না হলে—’

আমার কথা শেষ না হতেই বাঙ্গকণ্ঠে তিনি বলেন, ‘হাসালে যে হে, মা-বাবাকে বুড়ো বয়সে দেখবে না, বোনদের বিয়ে দেবে না—হুঁ, দেখছি এখনও কচি খোকাটি হয়ে থাকতে চাও—বলি, ওহে গুনছো তোমরা—’ বলেই কৃষ্ণ-বাবু পার্শ্বচরদের দিকে চেয়ে সরবে হেসে উঠলেন।

‘হো-হো, হি-হি, হাঃ-হাঃ’—বিচিত্র ভঙ্গীতে হেসে উঠলেন পার্শ্বচররা।

তাদের হাসি থামতেই আমি বললাম, ‘দেখুন, অক্ষমতার গ্লানি আমার মনেও থাকে। দেয় কিন্তু নিরুপায় হলে তাকে যতই পীড়ন করা হোক বেদনা ছাড়া কিছু লাভ হয় না।’

‘হুঁ, তত্ত্ব কথাও বেশ জানো দেখছি, যাকগে, তিন দিন সময় দিলাম, এর মধ্যে খাজনা মিটিয়ে দিতে হবে,—আমার এখন অনেক কাজ।’

‘চেষ্টা করবো—’ বলে আমি চলে এলাম।

গ্রামলী একটা কিছু অবটন ঘটান আশঙ্কায় ঘর বার করছিলো অনেকক্ষণ ধরে। আমাকে চিন্তিত ভাবে ফিরতে দেখে বললে, ‘কি খবর?’

‘তিন দিনের মধ্যে খাজনা শোধ করতে হবে—এই তাঁর আদেশ।’

ছিল একগাছা লিকলিকে হার ভরি খারেকের—সেটা খুলে দিলে সে। ‘জমিদারের খণ শোধ করো আগে।’

‘না—’ বলে হারগাছা খুলে দিলাম গ্রামলীর হাতে।

‘ও, আমার জিনিস বুঝি নিতে নেই! তোমার অপমানের চেয়ে হারগাছাটাই আমার বেশী হলো বুঝি? বেশ।’

মাত্র চার ভরির মত পোনার গহনা ছিল গ্রামলীর। হারগাছা ছাড়া আর সবই আগে শেষ হয়েছে। সেটা আর নিতে মন সরলো না। বললাম বুঝিয়ে তাকে, ‘হুঁদিন চেষ্টা করে দেখি, যদি যোগাড় না হয় তখন না হয় এটা বিক্রি করা যাবে।’

‘দেখো যেন লজ্জা করো না’ বলে নিজের কাজে চলে যায় গ্রামলী।

অন্তরে এক অনির্বচনীয় অনাবিল আনন্দ পেলাম সে-সময়। ভগবান আমাকে দরিদ্র করে সংসারে পাঠিয়েছেন, কিন্তু সেদিন সে-মুহূর্তে যে স্বর্গীয় আনন্দ পেলাম তার তুলনা হয় না। চলচ্চিত্র সাজানো দৃশ্য দেখে এবং বানানো সংলাপ শুনে যদি আমরা তা’ সংসারে প্রত্যাশা করি—ভুল হবে। কিন্তু আমি বোধহয় তার চেয়েও বেশী পেয়েছি। সত্যকার প্রেমে মুগ্ধ হয়েছি তার। কিন্তু তাকে কিছুই দিতে পারিনি, এমনকি তার মৃত কালে স্মৃতিকিংসারও ব্যবস্থা করতে পারিনি।

তিনদিন পর ফের আমার ডাক পড়ল জমিদারের কাছারিতে। গেলাম বিকৃত হস্তে। বিধাগ্রস্ত চিত্তে। অবশ্য ঠিক করেছিলাম আগে থেকে যদি আজ কোন কটু মন্তব্য শুনে হত বখোঁচিত উত্তর দেবো। কিন্তু কেন জানি না, কৃষ্ণবাবু যাওয়া মাত্র বললেন, ‘সেদিন তুমি চাকরির কথা বলছিলে ন? আমার একজন ভ্রাম্যমান রাধুনীর প্রয়োজন। এই ধর না আমার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে যাবে, খাওয়া পরা বাদে মাসে পনের-ষোল টাকা মাইনে পাবে, পারবে তুমি? শুনেছি, লোকের ভোজ কাজে ভাল রান্না করো—এ চাকরায় বেশ স্মৃতিচিহ্ন আছে তাতে তোমার?’

বেকার বাড়ীতে বসে আছি তখন আমি। বললাম, ‘খুব পারব, তবে মাইনেটা কুড়ি টাকা করে দিতে হবে।’

‘আটকাবে না তাতে—’

আমার খাজনা বাকীর কোন কথা উঠল না। পরদিন থেকেই চাকরিতে বহাল হলো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, ছুঁচ হয়ে ঢুকবো আর ফাল হয়ে বেড়োবো। এই সুরোগ, ধনী হতে হলে এরকম পরগাছা চাই।

চাকরিতে বহাল হওয়ার কিছুদিন পর গ্রামলী আমায় ছেড়ে চলে গেল। আমার মনে রেখে গেল একটা কালোছায়া। অতৃপ্তিকর হৃদয়াবেগ। শোক সন্তপ্ত আমি নিজেকে শক্ত করলাম। যে যায় আর ফিরে আসে না। আমার টাকা চাই। টাকা ছাড়া এ-যুগে এক পা ফেলা বিপজ্জনক। সংসার চালানো ত বটেই। এখন সব ভুলে আমাকে অর্থ উপার্জন করতে হবে। দরিদ্রের শোক প্রকাশের ত সময় নেই।

আমার দিদির বহুদিন আগেই বিয়ে হয়েছিলো। বোনদের চোখের জল দিয়ে এক সমালোচনা

তাদের দেখেই বিনা পণে তাঁর দুই ছেলের বিয়ে দিতে রাজী হলেন। আমি কিছুটা নিশ্চিত হলাম। মা-বাবা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

( ছয় )

বছর তিনেক পর।

আমি তখন কৃষ্ণবাবুর কাছে রীতিমত স্নেহের পাত্র হয়ে পড়েছি। আমার বাবা ছাড়া তাঁর খেয়ে তৃপ্তি হয় না। কি ঘরে, কি বাইরে।

সেদিন লাটের টাকা দাখিলের শেষ দিন। কৃষ্ণবাবু আমাকে সঙ্গে নিয়ে জেলা সদরে গেলেন।

হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তার ডাকলাম। তিনি তাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাসের পরামর্শ দিলেন সেদিনটা। প্রেসার বেড়েছে।

কৃষ্ণবাবু কাছে ডাকলেন আমাকে। 'টাকাটা তুমিই জমা দিয়ে এস। ট্রেজারীতে মোক্তারবাবুর কাছে গেলে তিনি সব ঠিক করে দেবেন। শুনলেন ত ডাক্তারের কথা? কি চূপ করে রইলে যে—পারবে না?'

আমি বললাম, 'পারব'।

কৃষ্ণবাবু আমার হাতে দশ হাজার টাকার খলিটা দিয়ে বললেন, 'খুব সাবধান'।

সে বাজারে দশ হাজার টাকার মূল্য অনেক। এখনকার একলাখ টাকার মত।

আমার গোটা শরীরে রক্ত ঢপাঢল দ্রুত হল, বুকের স্পন্দনও গেল বেড়ে। দারিদ্র্য কবলিত ভীকু লাগায়িত চোখ দুটো হয়ে উঠলো উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভরপুর।--দশ হাজার টাকা! আমার কাছে তার মূল্য অনেক--অনেক। সারা জীবনেও হয়ত এত টাকা রোজগার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

অবশ্য আমার হৃৎস্রোত যে আমি সংসারে দরিদ্র হয়ে জন্মেছি। তবে হুনিয়া সূক্ত সবাই যদি ধনী হয়, ধনাঢ্যের মহিমা থাকবে কি! মানুষের মনুষ্যত্ব যে কোথায় গুঁড়িয়ে মিশিয়ে যাবে ধরণীর বুকে তারও কুল-কিনারা পাওয়া যাবে না। কিন্তু এভাবে কি বাঁচা যায়? সংসারের দারিদ্র্যের এক ভয়ঙ্কর রূপ সদাসর্বদা আমাকে খোঁচা দিচ্ছে। আমি

মরছি। স্ত্রী দারিদ্র্য বরণ করে নিয়েছিলেন। বটে, কিন্তু আমি যে তার মৃত্যুকালে স্মৃতিকিৎসা করতে পারিনি। সে কি আমার কম দুঃখের? বছর খানেক আগে মা-বাবা ছ-মাস আড়াআড়ি মারা গেছেন, তাঁদের উপযুক্ত মত সেবা-যত্ন করতে পারিনি—সে কি আমার মন-বিদীর্ণ দুঃখের নয়?

তবে কি আমার দশটা রত্নাকরের মত হওয়া উচিত ছিল? এ-যুগে ত রত্নাকর ভিন্ন ধনী হওয়া যায় না। পরস্ব অপহরণ—সে যেভাবেই হোক—এ ভিন্ন জগতে সং ভাবে ধনী হওয়া কল্পনের পক্ষেই-বা সম্ভব? আজ যে ধনী তার অতীতের কথা জানলেই বুঝতে পারা যাবে, তার ভিত্ত একদিন নড়বড়ে ছিল কিনা, তার মূসধনের টাকা কিভাবে পেয়েছিলেন তার পূর্বপুরুষ?

দশ হাজার টাকা!

আমার জীবনমূর্ত মন যুহুর্তে সজীব হয়ে উঠলো। ভবিষ্যৎ অন্তরে রুদ্ধ থাক। আপাত সুখই কামা! দারিদ্র্য থেকে আমাকে মুক্তি পেতে হবে। পাপপুণ্যের হিসাব করা আমার নয়, যিনি অলংকা তা' করেন, তিনিই করুন। তা'ছাড়া বর্তমান নিয়ে যাওয়া সর্বদা হিমশিম খাচ্ছে তাদের এত জমা-খরচের হিসেব কেন পাপপুণ্য নিয়ে? যুক্তিতর্ক মানবার প্রয়োজন কি?

কাতরাতে কাতরাতে কৃষ্ণবাবু বললেন, 'টাকাগুলো আর একবার গুনে নাও ভাল করে।'

আমি ভাগ্যবান। খলির মুখটা খুললাম।

অধিকাংশ একশো টাকা—কিছু দশ টাকার নোট। আমার জীবনে কোনদিন একশো টাকার নোট হাতে পাইনি। রাজমুকুটের ছাপ শোভিত একশো টাকার নোট ছোঁয়া আর আকাশ ছোঁয়া একই বলে মনে হলো তখন আমার। ভাগ্যবান রাজা। আর একশো টাকার নোটগুলো বাবা কাগজের মত বাঙুল বেঁধে নিন্দুকে রাখে তারাও সৌভাগ্যবান। অর্থ মহিমাতে তারা গোটা হুনিয়া মুঠোর মধ্যে রাখতে পারে। দেহের বল থাক আর নাই-ই থাক, এই টাকার খেলা চলেছে হুনিয়া জুড়ে আর বুজির মারপ্যাঁচ।

নব্বইখানা একশো টাকার নোট আর বাকী সবই



প্রতিটি একশো টাকার নোট শুনি আর কপালে ছোঁয়াই ক্রমবাবুর অলক্ষ্যে।

সব টাকা গুছিয়ে থলিতে গুরে ফেললাম। থলিটা বুকে ছোঁয়ালাম।—দশ হাজার টাকা!

ক্রমবাবু এবার বলেন, 'বাও, দেরি করো না, তিনটে বাজে। ই্যা আর এক কথা, পঁচিশটা টাকা বেশী নিয়ে যাও—প্রয়োজন হতে পারে।'।

'হুর্গা হুর্গা'—বলে বেড়িয়ে পড়লাম। বুঝিবা চির-বিদায় এখন থেকে।

অলক্ষ্য লোভ নামক রিপুটা তখন আমাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেছে। আমার মত মকেল পেয়ে সে যেন ভীষণ খুশী। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার ইঙ্গিত-আঙায়ে আমাকে এখন থেকে সরে যাবার তীব্র ব্যাকুল অস্বরোধ। অন্তরের কলিত প্রাণাদ, অজস্র অর্থ যেন আমার সামনে তখন স্পষ্ট।—ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসতে লাগল আমার অতীত।

কিন্তু সব কিছুর ওপর রয়েছে মানুষ। মানুষের জীবনে একদিকে আছে দুঃখ, বেদনা, ব্যর্থতা, আর অন্য দিকে অবশ্যই আছে প্রীতি-প্রেম-সত্যনিষ্ঠার মহান আদর্শ। তবু দারিদ্র, আদর্শের দেবতার করুণ মুখছবিকে কিছুতেই মনে প্রাণে গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না সব সময়। তখনও আমার মন মলিন হয়নি, আমি হলফ করে বলতে পারি, এত দুঃখ কষ্টেও অন্তর দীপ আমার তখনও মহান সত্যের জ্যোতিতে অনির্বাণ। দুঃখ কেবল, দারিদ্রের আগুন মেড়াতে পারিনি আমি। মন সগা বুড়ু। আমি কি শুধু বিশ টাকা মাইনের চাকরিতেই জীবনভোর তৃপ্ত থাকব? নামগোত্র-হীন মুকুল সর্বাধিকারী কি অপরিচয়ের ধূত্রাল ছিন্ন করে মনোমত্ত সংসারের সন্ধানে যাত্রারস্ত করতে পারে না আর? বুক ফুলিয়ে যারা তাকে এতদিন ঘৃণা করেছে তারা কি তার এ অপকর্মের কথা মনে রাখবে তখন?—কেউ রাখে না, বরং ধনী-মানীদের অতীতের ইতিহাস ছাই চাপা দিয়ে তাকে কোণীন্তের আঙিনায় এনে স্তব্ধভাবে মুখর হয়ে ওঠে। আড়ালে ঘৃণা করলেও সামনে রাখে নকল সম্মানের উপঢৌকন। দস্তুর কৃত্রিম জগতে মিথ্যার কঠিন আবরণ উন্মোচন হয় একদিন বাটে,

কিন্তু সেজন্ত কেউ মাথা ঘামায় না তেমন। আর যারা ঘামায় তাদের ঘা' খেতে খেতে জীবন যায়। দারিদ্র পশু সমাজকে এক ধাপ আগিয়ে দেয় মাত্র।—যার ধাপ হাজার হাজার। লক্ষ্যে পৌঁছোতে অনেক দেরি।

ইচ্ছা-অনিচ্ছার সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগলাম আমি। কি করি? মাথাটা গুলিয়ে উঠছে বার বার। তবু যেন স্বপ্নময় কল্পনার ছবিগুলি চোখের ওপর পিপাসাময় হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। সর্বপ্রাণী আগুনের দিকে ধাবমান হলাম আমি।

দশ হাজার টাকা!

ঝাঁপিয়ে পড়লাম লোভের আগুনে। দিশেহারা হয়ে পড়লাম রঙীন স্বপ্নময় কল্পনায়। যেন মেঘের আড়ালে আমি চাঁদ হয়ে হাসছি। দেখছি পৃথিবীটাকে কত ক্ষুদ্র। আমি বুঝি পৃথিবীর একজন হয়েও কতদূরে—সত্যের জগৎ থেকে আমি একটি বিচ্যুত আত্মকুল ছাড়া কিছু নই! আশ্চর্য!

রইলেন পিছনে পড়ে আমার মনিব। আমি যে এতদিন তাঁর ভৃত্য ছিলাম, ডাবতেই পারছি না। বাকী কটাফে অন্তরকে তাচ্ছিল্যের হাসি দেখিয়ে লোভের সঙ্গে মিছিলি পাতিয়ে আমি যথাস্থানে টাকা জমা না দিয়ে পোজা চলে এলাম কলকাতায়।

### (সাত)

অধর্মের নামাবলী গায়ে চড়ালাম।

অন্ধকার জাঁতসঁতে একটা গলিতে ঘুপচি মত খোলার ঘর ভাড়া নিলাম দশ টাকা ভাড়াতে।

একটা বাসে টাকার থলিটা বন্ধ করে রাখলাম। তাঁ থেকে নিলাম মাত্র পঁচিশো টাকা। ফিরিওয়ালার সাজবো আপাততঃ। নাম বদলালাম। আমি মুকুল সর্বাধিকারী হলাম দীনবন্ধু রায়।

ফিরিওয়ালার সাজ, কথাবার্তা, হাঁকডাক রপ্ত করে নিলাম কিছুদিনের মধ্যে। পাড়ার বাসিন্দাদের মনে কোন সন্দেহই রাখতে দিলাম না। কলকাতায় আর কে কার খবর রাখে?—বিশেষ করে আমার মত একজন ফিরিওয়ালার।

টাকার টাকা টানে বুঝলাম। বছর খানেক কাপড়-জামা

ফিরি করে পাঁচশো টাকা খরচ খরচা বাদে এক হাজারে দাঁড়াল। মনে আশার আলো সঞ্চিত হয়ে আমার উচ্চাশাকে যেন তুলে ধরলে হিমালয়ের উজ্জ্বল শৃঙ্গে।

এসব করলেও আমি খবর রাখি, আমার কৃতকর্মের জন্ত কৃষ্ণবাবু কি করছেন। চিন্তা করি কিভাবে পুলিশের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে হবে।

ইঠাং একদিন সংবাদপত্রের এককোণে দেখলাম, শোক সংবাদ—“মহেশগঞ্জের জমিদার কৃষ্ণকান্ত পাল মশাই অনন্তধামে গমন করেছেন সত্তর বছর বয়সে।”

পুলিস কিন্তু আমাকে আমার পালিয়ে আসার দিন থেকে গোটা ভারত জুড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সংবাদপত্রেও বার বার সেকথা লোকচক্ষে তুলে ধরা হয়েছে।

বছর দেড়েক পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। ভারতের নানাস্থানে যুদ্ধের ব্যাপারে এরোড্রাম স্থাপনের বিজ্ঞাপন দেখলাম—কন্ট্রাক্টর চাই।

আমি শ্রীদীনবন্ধু রায় সাহসে ভর করে আবেদন করলাম যথাস্থানে। পেলাম একটা কাজের কন্ট্রাক্ট। লাভ হলো প্রচুর। বাসা বদলালাম উত্তর কলকাতায়।

শুধু এরোড্রাম তৈরী নয়, সে সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহেরও একটা কন্ট্রাক্ট পেলাম।...তিন বছর পর দশ হাজার এক লক্ষতে পৌঁছলো। তখন আমার একজন প্রাইভেট সেক্রেটারী ও দু'জন ম্যানেজার কাজকর্ম দেখাশোনা করছে। আমি তাদের মনিব। তারা আমার কথায় ৬৪'বস করে। তারা আমার চেয়ে শিক্ষিত হতে পারে, কিন্তু আমার বুদ্ধি ও বুদ্ধির মারপ্যাঁড় ভিন্ন কোন বিশেষ কাজে হত দিতে পারে না। আজ আর আমি একশো টাকার নোট কপালে ছোঁয়াই না। দশ হাজার টাকা গুনতে আধঘণ্টা সময়ও লাগে না। হাঁটুর তলায় নোটগুলো ফেলে বড় ভোর চার-পাঁচ মিনিট সময় লাগে।

তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেমে গেল। কিন্তু আমার অর্থ লালসার উন্নত আবেগ ধামল না। অহরহ অর্থ উপার্জনের জন্ত যুদ্ধ চলতে লাগল—ফাঁক আর ফাঁকির সঙ্গে। শুধু ধর্মে ব্যবসা হয় না, অধর্মের মিশাল চাই। টাকার নেশায় মেতে উঠেছি তখন আমি। বড়বাজারের

প্রথম তোষামোদ, খোসামোদ—তারপর মিতালির পরাকাষ্ঠায় তাদের কাছে যে অমূল্য উপদেশ পেয়েছি জীবনে তা' ভুলব না। বুঝলাম ব্যবসা করে শুধু অর্থোপার্জন নয়, মানুষের পরমাণু তিলে তিলে কমান্বার জন্ত এদের অবদান চিরস্মরণীয়।—আমি তাদের সমগোত্রীয় হয়ে গেলাম। আমাকে আঁধার থেকে আলোর নিচে এলেন তাঁরা। আমি ব্যবসা শুরু করলাম। আমার ট্রেনিং প্রয়োগ শুরু করলাম বিভিন্ন নিরীহ দ্রব্যসত্ত্বাবের ওপর। সেসব নিত্যনতুন প্রসাধনের প্রসঙ্গে নির্ভেজাল ষ্ট্যাম্প মারা মোড়কে টিনের বাক্সে বন্দী হয়ে দেশে দেশে বেলুনের মত ছুটতে শুরু করলো। সেসবের চাহিদা বাড়তে লাগলো দ্বিগুণ-তিনগুণ পর্যন্ত। নকলের জয় হোক।

আমার ব্যবসায়ী শুরুদের তখন দু-চোখ ছানাবড়া। স্বীকার করেন প্রকাশ্যে তাঁরা, ইয়া। ছোকরা ব্যবসা কাকে বলে জানে। তবে মনে রেখো ছোকরা, সর্বদা মনে রাখবে, সাহস চাই। বুক ফুলিয়ে যা' খুঁদী করবে, কেউ কিছু করতে সাহস পাবে না, প্রয়োজন বোধে দু-পাঁচ হাজার রোপেয়া ছুঁড়ে দেবে। বারো ধরবার জন্তে জাল পেতেছিল, তাবাই 'স্ফালুট' করে সরে যাবে হাজার গজ দূরে।

আমি তখন সম্পূর্ণ ভেজাল। রাতদিন ভেজাল চিন্তা করি। ভেজালের কারবারে আরও হাত পাঁকাবার দ্রষ্টামিতে মশগুল।

ইঠাং একদিন শুনলাম, আমার ভূতপূর্ব মনিব আমার নামে দশ হাজার টাকা সহ পলায়নের যে কেস করেছিলেন, তা ডিসমিস হয়ে গেছে। পুলিশ গ্রামে গিয়ে গ্রাম্য জন-সাধারণের কাছে আমার বিষয়-সম্পত্তি ইত্যাদির বিবরণ ও কৃষ্ণবাবুর দরবারে আমার চাকরির পদবী শুনে সদরে রিপোর্ট পাঠিয়েছিল যে একজন রাঁধুনীর হাতে দশ হাজার টাকা দিয়ে লাটের টাকা দাখিল করার ঘটনা হাত্যকর ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়। যেহেতু তাঁর দুজন নায়েব, পাঁচজন গোমস্তা, সদরে দু'জন বাঁধা মোক্তার, একজন উকিল থাকতে একটা অশিক্ষিত রাঁধুনী বামুন গেল লাটের টাক, জমা দিতে। এ ঘটনা বিশ্বাস করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি যে কোন কারণে টাকা দাখিল করতে অসমর্থ ছিলেন, এই তাদের ধারণা। গ্রাম্য জন-



সবাইকে হারিয়ে শোকে হুঃখ পাগল হয়ে দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিংবা গর্বিত জমিদারের কাছে কোন বিষয়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে হয়ত অককূপে বন্দী হতে বাধ্য হয়েছে—এ তাদের অনুমান।

পুলিশের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে আদালত আর 'কেস'টা বেশী দিন জিইয়ে রাখবার সার্থকতা খুঁজে পেলেন না। কেস ডিসমিস হয়ে গেল।

বুঝলাম, সৌভাগ্য দেবীর অপার করুণা নীরবে বর্ষিত হচ্ছে আমার ওপর। আমি নবীন বলে বলীয়ান হলাম। আমার অন্তরতম প্রদেশে যে একটা গুপ্ত কাঁটা ছিল, সেটা আপনাপনি উপড়ে গেল ভাগ্যদেবীর প্রসন্ন দৃষ্টির ফলে।

আমি আমার আসল নাম ফিরিয়ে নিলাম।

আমার দেহ-মনও কলুষিত হয়েছে তখন অতি মাত্রায়। ঘর বাধার চেয়ে সে স্বপ্নময়, মোহময় কুহকিনীদের ডাক, তাদের প্রসাধন লাক্ষিত দেহ-মনগুলো অধিকার করে রয়েছে আমার দেহের প্রতিটি গোমকুণগুলো পর্যন্ত।

### ( আট )

তারপর সেদিন বালীগঞ্জে দশ কাঠা জায়গা কিনে রেজিস্টারি করে নিয়ে জোর স্পীডে গাড়ী ঠালাচ্ছি। আনন্দ উৎসাহে হৃদয় মেতে উঠেছে কত ভাড়াভাড়ি গৃহনির্মাণ করতে পারি তার পরিকল্পনায়। দ্বিতীয় মহাবুদ্ধি ব্রিটিশ সরকারের জয়ের চেয়েও আমার আজকের এ জায়গা কেনার যুদ্ধ-জয়ের তুলনা নেই। বহু কসরত করে জায়গাটা আমার কবলিত হয়েছে। দালালী, উপদালালীতেই গেছে দশ হাজার টাকা।

আমি ব্যবসায়ী মহলে এতদিনে কুশীন হলাম। সম্পূর্ণ নিকষ কুলীন, যেহেতু টাকা-গাড়ী-বাড়ীর অভাব রইল না আর আমার।

মনের ক্ষুধিত্তে গাড়ী নিয়ে চলে এলাম লেকের ধারে। বসলাম গিয়ে একটা বেঞ্চে।

কেন জানি না, ভাবতে ভাল লাগল আমার অতীত। বসে বসে সিগারেট টানছি আর ভাবছি। আজ জায়গা কিনলাম এবার ঘর আরম্ভ হবে। কিন্তু তারপর? কার

ব্রহ্মাণ্ডে আমি ছাড়া কে-ই বা আছে আমার? হু-চোখ ফেটে জল এলো, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম।

ভুলে গেছিলাম আমি কাঁদতে। দীর্ঘ একযুগ ধরে আমি বেপরোয়া হয়ে আছি। আমার আমি ছাড়া সুখ-হুঃখ নেই। ভেজাল ছাড়া আসল নেই। নকলের জয়গান গেয়ে আসছি এতদিন। নকলের জয়মালা পেয়েছি ভাগ্য-দেবীর কৃপায়। সব আছে আমার, নেই শুধু ঘরকে ঘর বলে স্বীকার করবার মত একজন; থাকে ছাড়া ঘর বাধা যায় না।

শ্রামণীকে মনে পড়ে গেল। এতদিন পর তার কথা স্মরণ করে মনটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যেন সেদিনের সে দারিদ্র-অভিশপ্ত দিনগুলো আমাকে আজকের দিনের সঙ্গে তুলনা করতে বাধ্য করলে।

পিছন থেকে কে যেন ডাকলে, 'মুকুলদা—মুকুলদা—'

'তুমি পারুল, না?'

'হু—'

'এখানে কোথায়?'

'দাদার বাসায় এসেছি।'

'কতদিন হলো?'

'প্রায় এক বছর—'

'হু, শুনেছি, তোমার দূরদৃষ্টির কথা—'

'সেকথা থাক মুকুলদা, তোমার কথা বলো! আমরা ভেবেছিলাম, তুমি হয়ত বেঁচে নেই!'

'তবু বেঁচে আছি, এবং সদস্যানে—'

'তার মানে?'

'সে অনেক কথা পারুল, পরে বলবো।'

'খুব ব্যস্ত বুঝি, এখন?'

'না, তেমন কিছু নয়, তবে—'

'থাক, বাধা থাকলে বলতে হবে না, আর—'

'বাধার কথা নয়, কিন্তু—'

'কিন্তু কি মুকুলদা?'

আমি চোখ মুছতে ভুলে গেছিলাম। হু-চোখে অশ্রু-ধারার চিহ্ন দেখে পারুল বলে, 'একি তোমার হু-চোখ লাল —হু-গালে অশ্রুধারা!'

বলে কুমাল দিয়ে চোখ দুটো মুছলাম।

‘মুকুলদা, বুঝতে পারছি, তুমি এখানে বসে কাঁদছিলে সবার অলক্ষ্যে। কিন্তু এখানে ত লোকে আনন্দ পেতে আসে, তুমি কাঁদছিলে কেন বলবে?’

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, ‘বলবো পারুল বলবো।’ আমার কথা জানাবার মত কেউ নেই ত্রিসংসারে। তোমাকেই বলবো, বলে তৃপ্তি পাব বোধহয়।’

‘সেকথা বলতে পারি না, তবে বলতে হবে। এবং এমুণি।’

‘উঠে দাঁড়িয়েছিলাম কিছুক্ষণ আগে। বসে পড়লাম হুজনে একটা বেঞ্চ।’

পাঁচ মিনিট চুপচাপ বসে থাকলাম। সত্য বলবো না মিনো বলবো এবং কিভাবে কথাটা আরম্ভ করি, ভাবতে লাগলাম।

পারুল অধীর হয়ে উঠেছে তখন। বললে—বেশী দেরি হলে দাদা-বৌদি ভাববেন, আমি বরং উঠি আজ।’

কাপড়ের আঁচলটা ধরে টান দিলাম। ‘দরকার হলে পৌছে দিয়ে আসবো। তবে পারুল, তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, আমি তোমাকে যা’ বলবো কোনদিন কাউকে প্রকাশ করবে না বলো?’

‘দিলাম, এই তোমার গা-ছুঁয়ে বলছি মুকুলদা। ভগবান আমার সর্বনাশ করেছেন আর পরকালের মাথা খেতে চাইনে।’

‘পরকাল মান তুমি?’

‘তুমি বুঝি মান না?’

‘মানি, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাই না।’

‘কিন্তু একদিন ঘামাবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সেদিন অতীতের কথা স্মরণ করে হয়তো বুঝবে, আসল সত্য অর্থ নয়, প্রতিশ্রুতি নয় এবং সে আসল সত্য সন্ধানের জন্য মন-প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠবে। তখন মাথা খুঁড়েও অতীতের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। অনুশোচনার দিক্কারে মনপ্রাণ জলে পুড়ে থাকে হয়ে বাবে, গীতার ভগবান বলেছেন—’

‘বুঝেছি, তুমি গীতা পড়—’

‘হ্যাঁ, গীতাই এখন আমার জীবনের সাথী।’

‘কিন্তু গীতার শ্লোক নিয়ে মেতে থাকার মত বয়স’

তোমার নয়। বাধ্য হয়ে মনপ্রাণ সমর্পণ করলেও অন্তর কি ঠিক সায় দিচ্ছে তাতে তোমার? আমি জানি কামনা-বাসনার বস্ত্র অকালে হারিয়ে তুমি এ-সবের চর্চায় কাল কাটাচ্ছে। মাত্র, কিন্তু মনপ্রাণ দিতে পারনি?—পারলে কলকাতায় দাদার বাসায় এসে মুকুল সর্বাধিকারীর সঙ্গে দেখা হতেই তার বিষয় জানবার কৌতূহল থাকত না।’

‘মুকুলদা, তুমি আগের ব্যাপার নিয়ে খোঁটা দিচ্ছে মাত্র। আর এক কথা, ধর্ম গ্রন্থ পড়লেই মানুষ দেবতা হয়ে যায় না। আমাকে মাপ করো মুকুলদা, আমি বাই।’

‘আজীবন তোমরা দরিদ্রকে হীন নীচ ভেবে আগছো, দেখছি আজও সে দেমাক যায়নি তোমাদের।’

‘তুমি কি ঝগড়া করতে চাও আমার সঙ্গে?’

‘না, আমার কথা শোনাতে চাই।’

‘যদি না তুমি?’

‘তোমার কৌতূহলের জেতেই শোনাতে চেয়েছিলাম, তবে শোনাবার আগ্রহ তেমন নেই। অবশ্য আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি শুনবে। আজ রাগ করে উঠে গেলেও পরে শোনাবার আগ্রহে ছুটে আসবে। হয়ত সেদিন আমার সঙ্গে দেখা না-ও হতে পারে।’

সুন্দর হাসিতে মুখখানা ভরে ওঠে পারুলের। ‘তোমাকে ত জানি, বাপরে বাপ, কথোতে পারবার যো নেই তোমার সঙ্গে। জাহ্নমাখা কথা কেবল।’

‘শুধু কথোতে জাহ্ন নয়, দেহ-মনেও জাহ্ন আছে। তুমি সব কথা শুনে বুঝবে আমি একজন আশ্চর্য জাহ্নকর।’

‘বেশ বাপু বলো—’ বলে মুকুলের কাছ ঘেঁষে বসে পারুল।

‘সব কথা সত্য বলবো?’

‘ইচ্ছে হলে, বলতে পার।’

‘নির্ভয়ে?’

আবার হেসে ওঠে পারুল। ‘অভয় দিলাম—’

‘শোন তবে—’

কোন কথা গোপন বা করে আত্মপ্রোক্ত খুলে বললাম তোমাকে। আমার সব কথা শোনার পর তুমি বিস্মিত হয়ে গেলে, ‘সত্যই তুমি জাহ্নকর মুকুলদা—তোমার আকাশ-কুসুম স্বপ্ন সফল হয়েছে শুনে খুব খুশী হলাম।’



জানো মুকুলদা, জোর অবরুদ্ধিতে আপনার কামনার বস্তু ছিনিয়ে নিতে হয়, বসে বসে তপস্বী করলে পাওয়া খুব চকর।—সে তোমার অন্তরের বে কোন কাম্যবস্তুরই হোক।

'তুমি সমর্থন করছো, তা' হলে? ভেবেছিলাম, গীতামৃত পান করে ঘুণা ছাড়া কিছু পাব না তোমার কাছে।'

শুক বিশ্ময়ে মুকুলের মুখের দিকে চেয়ে রইলো পারুল। হু-চোখ তখন তার জলে ভরা।

বললাম, 'তুমিও ত লেকে এসেছিলে আনন্দ পাবার জন্যে, কীদছো কেন?'

'হাসা-কাদার স্থান-সময় নেই মুকুলদা' কীদছি কেন জান, কেন সেদিন—না-না থাক সে আমার অন্তরের কথা, এখন স্বীকার করছি, সারাজীবন আমার মকড়মির তুল্য। বা আমার দূরদৃষ্ট, উঠি কেমন?' বলেই উঠে দাঁড়ান পারুল।

আমি বললাম, 'তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে না ?'

'না, একাই যেতে পারব। তবে তোমাকে একটা অনুবোধ করি, যর হলেই যর বেঁধো, কেমন? তা' না হলে শান্তি পাবে না, পরিপূর্ণ স্থখ নেই তাতে।'

'বুঝেছি তোমার অন্তরের কথা। তোমার অন্তরের বেদনা আমার মনেও গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে। কিন্তু একটা কথা, ভেজাল মুকুল সর্বাধিকারী ভেজাল বউ নিয়ে ঘর করতে কুংখিত নয়, যদি তুমি রাজী থাক—'

'মুকুলদা—আমার কামনা-বাসনা আজও আমার মস্ত মনে অটুট রয়েছে। তোমার গাড়ী-বাড়ী-টাকার কথা শুনে আমিও যে তখন থেকে মোহজালের আবর্তে স্বপ্নময় কল্পনার না ভাসছি, তা, নয়। আজ তোমাকে আমার প্রাণের কথা খুলে বললাম—গীতা আমাকে সাস্থনা দিতে পারে না, যেহেতু বার প্রাণের গীত নিঃশব্দ, সে নিঃশব্দ

**সুলেখা**  
**ঐতিহ্য**  
**দেশে ও বিদেশে সমান প্রিয়...।**



**সুলেখা**  
**ফাউন্টেন পেন-এর তালি**

এই সব রঙে পাবেন :

রু. র‍্যাক • র‍্যাক • র‍্যাক  
সেড • গ্রীন • ভায়োলেট

**সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ**  
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২



বীণাতে গীতার বাণী প্রবেশ করে না। করলেও তা' মর্মস্পর্শী নয়—'

‘এত ঠুনকো তোমরা, প্রথমটা ত আমাকে পাভাই দিচ্ছিলে না। ভাবছিলাম, প্রস্তাব করলেই প্রত্যাখ্যান করবে এবং ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে প্রশান্তবাবুর বিধবা পত্নী প্রায়শ্চিত্তের জন্ত বাড়ী গিয়ে পুরোহিত ডাকবে।—ভাবতেই পারিনি, এত সহজে তুমি ধরা দেবে। আজ প্রত্যক্ষ হলো, তোমরা যত কঠিন তত সহজ।’

‘বিশ্বাস কর মুকুলদা, তোমাকে আমি প্রথম জীবনে মন-প্রাণ দিয়ে চেয়েছিলাম। ভালবেসে ছিলাম তোমার সুন্দর স্বাস্থ্যটাকে। কি চমৎকার চেহারা! আজ আন্দাজ চল্লিশ বছর বয়সেও তুমি যেন পূর্ণ যুবক। যাকে পেয়েছিলাম তাকে দুর্ভাগ্য বশতঃ হারিয়েছি অকালে, একি আমার কম দুঃখ? বাবা-মা মারা গেলেন, দাদা-বৌদি গ্রাফ করেন না—আমি তাঁদের ভার বোঝা। তুমি বুঝবে না মুকুলদা—এ অভিশপ্ত জীবনের জ্বালা বুঝবে না। শুধু স্বামীশোক ভুলবার জেতেই গীতা পড়ি না—গীতা পড়ি, সর্বদা দাদা বৌদির খিচখিচ ভুলবার জেতেও। মনটা কিন্তু পড়ে থাকে অন্তরীক্ষে। কিন্তু নিকরায় আমি, হাত-পা শিকলিতে বাধা।’

‘কিন্তু ছিঁড়তে হবে সে বাধন। উড়তে হবে মনের আনন্দে। অতীত রসাতলে দিতে হবে। যাবে আমার নবীন বুড়ু লেনের বাড়ী বাড়ীতে?’

‘তুমি কি তা' চাও?’

‘লোভ আমার আজও যায়নি—’

‘কিন্তু একটা শর্ত—’

‘বলো—’

‘আমি কোন সন্তান চাই না—’

‘কিন্তু বাস করবো আমরা প্রকৃত স্বামী-স্ত্রীর মত। রাজী আছো?’

‘বলো কোনদিন ঘৃণা করবে না।’

‘রূপবান বলে যাকে মনে কর, সে কখনও রূপবতীকে ঘৃণা করে না। চলো আর দোর করে লাভ নেই।’

‘সেই ভাল গো আমার, চলো ঘর হারিয়ে আবার ঘর বাঁধি গে—’

‘আর সেই ঘরের লক্ষী হবে পারুল সর্বাধিকারী— প্রসিদ্ধ নকল কারবারী মুকুল সর্বাধিকারীর গৃহলক্ষী।’

সত্ত্ব কেনা গ্র্যান্ডেসডার গাড়ীতে চেপে দুজনে এসে ওঠে নবীন বুড়ু লেনের বাড়ীতে:

(নয়)

ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজে।

পারুলের দু-চোখ ছাপিয়ে তখন জল ঝরেছে শ্রাবণ ধারার মত। মুকুলের কণ্ঠে কোন প্রতিবাদ করতে সাহস করে না সে। সব সত্য। তবু সেদিনের সে প্রতিশ্রুতির কোথাগ যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। সেদিনের মুকুল সর্বাধিকারীর সঙ্গে আজকের মুকুল সর্বাধিকারীর বহু প্রভেদ। আগেকার সে প্রেমশীতল স্পর্শের মর্মস্বাদ পরিণতি এই প্রথম। বুঝতে পারেনি সে তাকে ঘুমবার আবেদন জানাতে এসে, এভাবে নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা তথা অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কঠোর আঘাত দেবে। কতদিন কত রক্তপূর্ণ গুণ্ডাজ করবার সময় তাকে ডাকতেই সবিনয়ে বলেছে, ‘দীজ—এক মিনিট—’ তারপর হাসতে হাসতে উঠে এসে বলেছে কোতুক কণ্ঠে, ‘আমি সব উপেক্ষা করতে পারি, ব্যবসায়ের দু-পাঁচ হাজার লোকসানও সহ্য করতে পারি—পারি না কেবল তোমার ডাক উপেক্ষা করতে।’

‘কেন বলো ত?’

‘অগত্যা আগুনে যে বাধা হয়ে আত্মহুতি দিয়েছিলো তাকে উদ্ধার করে এনে আর জ্বালাতে চাই না পারুল। সে শান্তিতে থাক, সুখে থাক এই চাই।’

‘কারবার তোমার নকল নিয়ে বটে কিন্তু ভালবাসা তোমার নিখাদ। কষ্টপাথরে যাচাই করে দেখলেও এক কুঁচো খাদ পাওয়া যাবে না।’

‘জানো পারুল, ভগবান মানুষকে নিখাদ করেই পাঠান কিন্তু আমরা মানুষবা দেহ-মনে খাদ মেশাই ইচ্ছামত। মেশাতে মেশাতে অনেকের এমন চেহারা হয় যে আসল মানুষটাকে আর চেনাই যায় না, যেমন আমি। তুমিই একদিন বলেছিলে, গীতায় ভগবান বলেছেন—’

‘শোক আর গীতার শোক আত্মজ্ঞাত হবে না।’



অনেকদিন পর।

বালীগঞ্জের বাড়ীটা তৈরী হয়েছে। রামগোপালের বিয়ের পর তারা নতুন বাড়ীতে উঠে এসেছে। বাড়ীখানা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল পাঁকলের। মহেশগঞ্জের জমিদার কৃষ্ণকান্ত পাল মশাইয়ের বাড়ীতে ছোটবেলায় একবার ভোজ খেতে গিয়েছিলো সে। বাড়ীখানা দেখে খুব ভাল লেগেছিলো তার। অনেকে বলেছিলো তেমন বাড়ী নাকি সে তল্লাটে নেই।—সে-বাড়ী আর এ-বাড়ীর কত তফাত। মহেশগঞ্জের জমিদারের অট্টালিকাকেও হার মানাতে পেরেছে তার স্বামী। এ কি কম গর্বের কথা। সে পুরানো আমলের অট্টালিকার সঙ্গে এ নতুন ছকের নানাবিধ কারুকার্যের কোন তুলনা হয় না। কত সময়, কত অর্থ

যে ব্যয় হয়েছে, তার হিসেব নেই। বলেও ফেলেছিলো সেদিন উৎফুল্ল চিত্তে, 'কৃষ্ণবাবুর অট্টালিকাটাকেও হার মানিয়েছো তুমি।'

মুচকে হেসেছিলো মুকুল। 'তাই নাকি?'

বেশ মনে আছে, নবীন কুণ্ডু লেনের ভাড়া বাড়ীতে বছর খানেক একত্রে বসবাসের পর একদিন মুকুল বলেছিলো সক্ষেদে, 'কিন্তু কোথায় সেন একটা মস্তবড় ফাঁক থেকে যাচ্ছে, অবশ্য তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি—ভেবে দেখলাম তা' লজ্বন করা যায় না। তবু যেন—'

'তবু কি, খামলে কেন, বলো?'

'সংসার পাতলাম, বরও তৈরী হবে ধীরে ধীরে, তবু যেন কোথায়—'

## সচিত্র শিশির

মাসিক পত্রিকা আষাঢ়, ১৩৭৩ হইতে ৪৬শ বর্ষ, আরম্ভ হইয়াছে। সডাক বার্ষিক মূল্য ৪/- সডাক বাৎসরিক মূল্য ২৫/-। পূজা সংখ্যা বর্ধিতাকারে প্রকাশিত হয় কিন্তু গ্রাহকদের বর্ধিত মূল্য দিতে হয় না। আষাঢ় হইতে গ্রাহক হইতে পারেন। গ্রাহক-মূল্য মনিঅর্ডারে পাঠানই শ্রেয়, কারণ, ভি-পিতে লইতে হইলে ৬০ পরস্যা অতিরিক্ত খরচ পড়ে। নমুনা-সংখ্যা পাইতে হইলে ৩০ পরস্যা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইবেন।

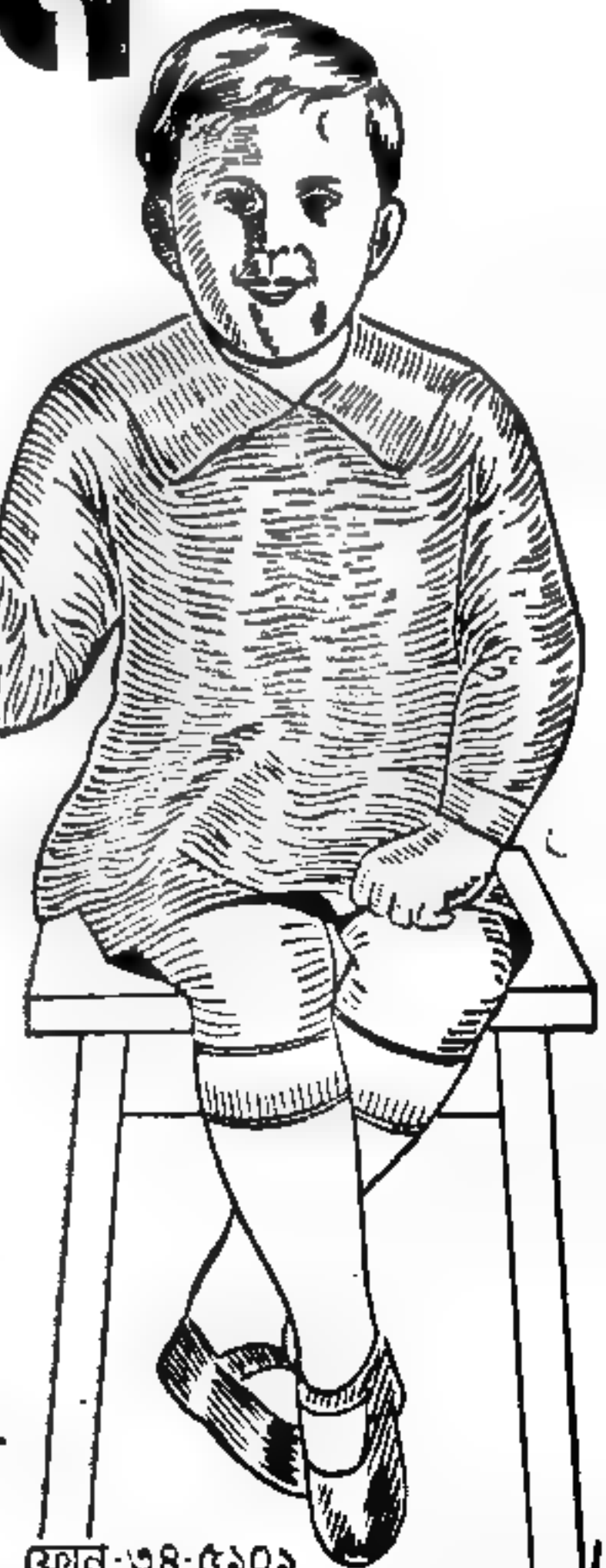
শিশিরে গল্প রচনাদি যে কেহ পাঠাইতে পারেন, ছাপাইবার যোগ্য হইলে ছাপা হয়। অনেক সময়ে মনোনিবেশিত রচনাও স্থানান্তরের জন্ত বিলম্ব ছাপা হয়। শিশিরের জন্ত প্রেরিত রচনাগুলির নকল রাখিয়া পাঠাইবেন।

শিশির কার্যালয়

# বেরী মলম

দাদ, হাজা, খোস,  
পাঁচড়া, চুলকানি,  
ফোড়া, ঘামাচি,  
পোকাকামড়,  
ও একজিমার  
অব্যর্থ মলম।

কাপড়ে দাগ লাগেনা,  
বেদনা নাশক ও সিঞ্চকর



ফোন-৩৪-৫১০১

আনন্দজন্ম হাথর এণ্ড কোং জোড়ামাঁকো কলি-৭

‘আমি বুঝতে পারছি না তোমার কথা।’

‘বুঝা উচিত কোথায় যেন একটা বড় বকসের কাঁক থেকে যাচ্ছে।’

পাকুল নীরবে মুকুলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মুকুল বলে, ‘আজ আমি সব পেয়েছি। বা’ ভিন্ন মনে শান্তি পাচ্ছি না তা’ তুমি না চাইলেও আমি চাই। আমার পরে কে এসব ভোগ করবে?’

‘ভুল করেছে। গো তুমি আমার ঘরে এনে। বরং বিদেয় করে দাও সময় থাকতে—’

‘না পাকুল, ভুল আমি করিনি। আর যদি ভুল করেও থাকি ভুল সংশোধন করতে বেশী সময় লাগবে না।’

‘তুমি কি আবার একটা বিয়ে করতে চাও?’

‘না’ একটা সন্তান চাই।

‘কিন্তু—’

তুমি নিশ্চিত থাকো। আমি আসল মুকুল সর্বাধিকারী, দীনবন্ধু রায় হয়ে বহুদিন আত্মগোপন করেছিলাম, নামটা প্রকাশ করেছি কিছুদিন আগে কিন্তু নকল মনটা বিসর্জন দিতে পারিনি। আমি নকল সন্তান চাই, তাতে আমার এতটুকু বাধবে না। তোমার কি তা’তে কোন আপত্তি আছে?’

‘ওধু নিজের দিকটা দেখলে ত সংসারে বাস করা যায় না। আমার তাতে একবিন্দু আপত্তি নেই গো, তুমি যাতে সুখী হও, শান্তি পাও, তাও আমার দেখা কর্তব্য। তোমার সুখ আমার সুখ—তোমার দুঃখ আমার দুঃখ।’

কিছুদিন পর একটা ফুটফুটে স্নেহের ছেলে এনে পাকুলের কোলে তুলে দিয়েছিলো মুকুল, ‘আমাদের সন্তান—’

উল্লসিত হয়ে ওঠে পাকুল, ‘খুব চমৎকার দেখতে—’

হু’জনেই খুশী হয়েছিলো তারা। এক অনির্বচনীয় আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলো সেসময়। আজও রামগোপাল জানে না, তারা তার নকল মা-বাবা। ছেলেটা ভাগ্যবান। তারা ত জানে, ছেলেটা কোথায় কিতাবে পাওয়া গেছে—মুকুলই শুনিয়েছে সে-কাহিনী।—তবু যেন ছেলেটা তাদের নিজের ছেলেরও বেশী।

শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন অতি প্রত্যুষ।

একটা জরুরী কাজে বেড়িয়েছে মুকুল। গাড়ী চালানো জোর স্পীডে। রাস্তার একটা মোড় ঘুরতেই হেড লাইটের আলোতে চোখে পড়লো একজন জীলোক একটা শিশুকে ডাষ্টবিনে ফেলে দিতে উত্তত।

গাড়ীটা থামিয়ে ফেলে মুকুল।

মহিলা ভয় পেয়ে কাপড়ের আঁচল দিয়ে নবজাতককে ঢেকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ে।

গাড়ী থেকে নেমে মুকুল ধমকে ওঠে, ‘কে তুমি? এটা ভোরে এখানে কেন?’

‘আমার পরিচয় আমি ছাড়া কিছু নেই। এখানে কেন জিজ্ঞেস করবেন না বাবু, তবে এটুকুই বলি, ‘আমি মা হয়েছি, কিন্তু সন্তান কাছে রাখবার ক্ষমতা নেই।’

‘আমাকে ভিক্ষে দেবে, ছেলেটা?’

‘নিজের সন্তান কি কেউ কাউকে ভিক্ষে দেয় বাবু? তবে আমি অভাগিনী তাই—’

ভেজাল মনটা যুহুর্তে নরম হয়ে ওঠে মুকুলের ঐ হতভাগিনীর কথা শুনে। পকেট থেকে পাঁচশো টাকার একটা বাণ্ডিল হাতে দিয়ে বলে, ‘এটা নাও—’

একটা হাত বাড়িয়ে বাণ্ডিলটা হাতে নিয়ে মেয়েটি বলে, ‘কি এটা, বাবু?’

‘টাকা—’

বিস্ফারিত নেত্রে মেয়েটি বলে, ‘টাকা? এ যে অনেক টাকা।’

‘হু—পাঁচশো—’

‘হয়ত সেদিন এ টাকাটা পেলে আমার বিয়ে দিতে পারতেন বাবা, কিন্তু পাঁচটা টাকা বের করবার ক্ষমতা ছিল না বাব—’ হু-পাশে মাথা নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে মেয়েটি। তারপর ছেলেটাকে রাস্তার মাঝে শুইয়ে দিয়ে টাকার বাণ্ডিলটা মুকুলের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অক্ষমতা সত্ত্বেও সে প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে যায় একটা গলির মধ্যে দিয়ে।

মুকুল নবজাতক শিশুটিকে কোলে তুলে নিলো, তারপর টাকার বাণ্ডিলটা। মেয়েটির কথা শুনে তার মনে পড়ে গেল, বাবার দারিদ্র্যের জন্ত তার দিদির বিয়ে হয়েছিলো অসং পাত্রে আর এর বিয়েই দিতে পারেনি তার বাবা। আজ সে যে জীবন বাপন করে তার জন্ত দায়ী কে?



হুট মনে বাড়ী ফিরে এলো মুকুল জরুরী কাজ ফেলে রেখে।

( দৃশ্য )

অতীতের কথা স্মরণ করে স্বপ্ন বলছে মনে হয়। অতীত আর ফিরে আসে না সত্য, তাই অতীতের অভ্যন্তরে মনটাকে প্রবেশ করিয়ে একটা অনির্বচনীয় মধুর স্মৃতি মগ্ন করে সাময়িক ভাবে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, তেমনি তাতে মনের অবক্ষয়ও হয় বেশ কিছুখান। অকপটে মনের দর্পণে অতীতের ছবি প্রতিফলিত করে অমু-শোচনার দিক্কারে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত বুকের আগুন দিয়ে জালিয়ে বার্থতার গ্লানি বুকু অস্তরের চাওয়া-পাওয়ার হিসেব-নিকেশ করা ছাড়া কি বা লাভ? তবু যেন অতীতের ভাবনা-ব্যাকুল মন মুহূর্তে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সময় সময়। মনের বিভিন্ন গতি, বিভিন্ন বয়সে যে রকমারি পথে পরিচালিত করে রঙীন করানায়, তার জন্ত দায়ী নিজেকে করা ছাড়া কাউকে দায়ী করাও যায় না। —অদৃষ্টকে দিক্কার দেয় পাকল, এই অজানা অদৃষ্ট!

কাঁদছে আকুল হয়ে পাকল। স্বামীহারা হয়ে এ-রকম কান্ন কঁদেছিলো। হৃদয়ে গাঁথা আছে সে-কান্না। আজ আবার কাঁদলে, সে মৃত স্বামীর কথা স্মরণ করে। ভুল। যায় না তাকে; তার স্মৃতিকে। প্রথম যৌবন আর প্রথম প্রেম ভোলবার নয়। হঠাৎ কত আইন প্রণয়ন, মেয়েদের দ্বিতীয় বিবাহের দিক্ আইন। কিন্তু আজও সে ভুলতে পারে না প্রথম স্বামীকে। পারবেও না ভুলতে এ-জীবনে। সব পেয়েছে সে—মাতুষ যা' চায় তাই; কিন্তু পেয়ে ত শান্তি নেই। এতদিন তুলিয়ে বোঝেনি, আজ এ প্রোঢ় বয়সে বার বার যেন মনে হয়, সেই ভাল ছিলো। সেই ছিল সুখের। সেদিন তার বড় সাথের, বড় সুখের। প্রথম প্রেমিককে হারিয়ে নতুন প্রেমিকের মন জুগিয়ে চলা, তার সব কিছু ইচ্ছাকে মেনে নেওয়া বড় কঠিন। অন্তর যেন মনে-প্রাণে কিছুতেই সার দিচ্ছে না। সেদিন বালীগঞ্জের লেকে যে ভুল করেছে সে ভুল সংশোধনের আর উপায় নেই। অদৃষ্টে সুখ না থাকলে এমনই হয়। অতীত অবিচারের সাজা আছে। মাতুষের নজর এড়িয়ে

গেলেও বিধাতার দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। যায় না বলেই সে পরজন্মের কোন পাণের ফল ভেবে তার বৈধব্য-দশা মেনে নিয়েছিলো। আবার যত সহজে সেদিন সে মুকুলকে স্বামী বলে মেনে নিয়েছিলো আজ তত তুচ্ছ কারণেই তার মনের আগুন আবার জলে উঠেছে এ-মুহূর্তে। পূর্বস্মৃতির পুনরাবৃত্তি ভাল লাগছে না তার। কেবল মনে হচ্ছে, আবার ডাক ছেড়ে কঁাদে সেদিনের মত, 'কোথা গেলে গো তুমি—'।

অন্তরের সুদূরতম প্রদেশে যে তৃষ্ণা ছিল, আজ তা' মিটে গেছে মনে হয় পাকলের। আজ চাওয়া-পাওয়ার সীমান্তে এসে থুঁজছে কি যেন ব্যাকুলতার। অবশ্য যে বাকি বক্ত ভাগবাসে তার তত সামান্য কথায় আঘাত পায় সবচেয়ে বেশী। তাই সে সহিতে পারছে না মুকুলের কটু কথাগুলো। যেন হল ফুটেছে সর্বান্তে। কথাটা অজ্ঞাতাবে ঘুরিয়ে বললে কি হতো? তা' না বলে যুগান্তরের মসীমাখা স্মৃতিত কুৎসিত জীবনের পুনরাবৃত্তি। আত্ম-অহমিকার এ-এক কুৎসিত দৃষ্টান্ত। অবশ্য একদিন সে ভালবেসেছিলো মুকুল সর্বাধিকারীকে নয়, তায় চেহারা-টাকে। সুন্দর স্মৃতিম লালিত্যমাখা দেহটা ছিল তার কাছে লোভনীয়। দেখলে চোখ ফেরানো যেতো না। যৌবনে চঞ্চলতা বশতঃ বাসা বেঁধেছিল দেহাশ্রয়ী প্রেম, কিন্তু মনের একান্ত গোপনে সত্যকার যে প্রেম, তা' ছিল অজানা। তাই বাবা একদিন মাকে বলেছিলেন গোপনে, 'শুধু চেহারা দেখলে চলে না, তার গুণাগুণ, শিক্ষাদীক্ষার কথাও ভেবে দেখতে হবে। ব্যর্থ দেখতে হবে তাদের মিলন শুভ হবে কিনা!'

গাড়ী-বাড়ী-টাকা!—আকাশের টাঁদ যেন হাতে পেয়েছে মুকুল। অন্ততঃ তাই সে মনে করে। কিন্তু ভেবে দেখতে রাজী নয়, তাঁদের কলঙ্ক বিধ্বজন জানে—জানে তার কলঙ্কমাখা কাহিনী!

প্রশান্তকে সে সত্যই ভালবেসেছিল। তার মহৎ হৃদয়ের উজ্জল দৃষ্টান্ত আজ তার কাছে আরো মহীয়ান হয়ে উঠেছে। প্রাণ বলি দিলে শেষে জনসাধারণের স্বার্থে। গুনলে না নিষেধ বাপের। মুখের ওপর তীক্ষ্ণ শ্লেষকণ্ঠে জবাব দিলে, 'নিখ্যাকে সত্য বলা আর সত্যকে চায় বলে

মানতে রাজী নই আমি। আপনি সংযত হন নচেৎ আমাকে বাধ্য হয়ে আপনার বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে।’

বাপের জমিদারী আভিজাত্য অহঙ্কারের রক্তিম পরশ তখন পর্বত প্রমাণ। ‘প্রজাদের কাছে আমাকে হেয় হতে হবে? তুমি পুত্র হয়ে তাতে সাহায্য করতে চাও?—যাও, কিন্তু তোমার প্রাণ যদি আমার অনুচরদের অজ্ঞাঘাতে যায়, আমি দুঃখিত হবো না—ভগবান যেন সেজন্ত আমাকে তোমার প্রাণবলির জন্ত দায়ী না করেন।—বোমা—বোমা—’

বেড়িয়ে আসে পাকুল। সেও গুনছিলো জানালা দিয়ে পিতাপুত্রের বচসা। এসে প্রণাম করে খণ্ডরকে।

মনীশবাবু করুণ কণ্ঠে বলেন, ‘আমি ওকে শাস্ত করতে পারছি না মা। যা’ কিছু করছি সবই তো তোমাদের মুখ তাকিয়ে, কিন্তু ও তা’ আজও বুঝলে না। দুর্ধর্ষ লাঠিয়ালদের ত তুমি জান, ওরা আজ পর্যন্ত কোথাও হেরে আসেনি, ওরা যে কালও এ প্রজা-বিদ্রোহ রণে হারবে না—সে আমি জানি। তবে ও আমার পুত্র কিনা, তাই ভয় হয়, হয়ত ও আর ফিরে আসবে না। আর ওকে ফিরে পাব না—’ সরবে কেঁদে ওঠেন এবার মনীশ মজুমদার।

পাকুলকে সব বুঝিয়ে প্রশান্ত যখন প্রজাদের বধিত খাজনা মকুবের জন্ত লড়তে বন্ধপরিকর জানালে এবং হাতে-নাতে প্রমাণ করে দিলে, তিন হাজার টাকা সরকারে জমা দিয়ে চার হাজার টাকা মুনাফা পাচ্ছেন বাবা, আবার কেন অকারণ দেড় হাজার টাকা খাজনা বাড়বে প্রজাদের? নিরীহ প্রজাদের কোন মঙ্গল চিন্তা না করে আশ্চর্য ভাবে নিজের সুখের জন্ত খাজনা বধিত হবে কেন তার সন্তোষজনক জবাব কে দেবে?

পাকুল বাধা দিতে পারেনি প্রশান্তকে। শুধু নীরবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিল, ‘ভগবান ওকে জীবিত রেখো। সেদিনের স্বপ্ন যেন তার নিফল হয়।’

জীবিত ফিরে আসেনি প্রশান্ত। তার প্রাণহীন বীভৎস মূর্তিটা যখন কাছারী প্রাঙ্গণে আনা হলো, মনীশবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন, ‘ভুল করেছি আমি—ভুল করেছি উনবিংশ শতাব্দীর গর্ব বজায় রেখে। ভেবে দেখিনি, যুগ বদলেছে। উঃ—’

এরপর পাকুল ফিরে এলো পিতৃগৃহে। মা-বাবা চলে

গেলেন তিন বছর আড়াআড়ি। দাদার গলগ্রহ হলো সে। তারপর সে গলগ্রহ থেকে রেহাই পাবার জন্তে নতুন করে মনে প্রাণে জেগে উঠলো, প্রেম-সুখ-ভালবাসা মুকুলের আন্তরিকতায়।...দ্বিতীয় জীবন শুরু করলে, তার সঙ্গে সব কিছু ভোগের আশায়। যা সে পায়নি অথচ পাবার ব্যাকুলতা মনের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করছিলো প্রশান্তের মৃত্যুর পর থেকেই। দেনা-পাওয়ার হিন্দব মেলাতে বসেছিলো সে, কিন্তু ভেবে দেখেনি সেখানে সব নকল, মনের মানুষটি পর্যন্ত নকলের চরম পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে, সেখানে সব ভেজাল। ভেজাল দিয়ে ব্যবসায়ী লাভবান হয় বটে, কিন্তু ভেজালখাত খেয়ে মানুষ মৃত্যুর দিকে ক্রমশঃ আগিয়ে যায়, নানা ব্যাধিতে জলে পুড়ে মরে। সেও ভেমনি আজ এক অগ্নিহীন চরম চিন্তাতে যেন জলে উঠলো দাউদাউ করে, মৃত্যুর দিকে আগিয়ে চলেছে দ্রুত-বেগে।—ভেজাল প্রেম দুর্বিসহ।

এ প্রাণটার জন্ত আর মায়া হয় না। অথচ যেদিন দেহে ফুটে উঠলো নতুন কুঁড়ি, যৌবন ডাক দিয়ে গেল দেহের প্রতিটি কণার কণার, হৃদয় উঠলো নেচে ময়ূরীর মত, সে আবেগপ্রবণ মন চঞ্চল হয়ে উঠলো তার শুভাগমনে। ধন্ত হলো বৃদ্ধ জীবন। স্বর্গ পেলো বৃদ্ধি হাতে। আপনা-আপনি কার অজানা তুলির টানে মুখর হয়ে উঠলো দেহের প্রতিটি অঙ্গ—কেশপাশ থেকে পায়ের আঙুলের ডগা পর্যন্ত। মধুর স্বরে দেহ-মনের বন্ধ প্রকোষ্ঠে বীণা বেজে উঠছে যেন অবিরাম।

রূপবতীর রূপ ফুটে উঠলো। পাকুল গর্ব অনুভব করলে। সে রূপের পূজারী হবে কে? কে তার রূপের মূল্য দেবে? কোন্ রূপবান? চলতে থাকলো তার দেহ-মনের অনুশীলন আরও নিখুঁত ভাবে। মনভ্রমরা গুনগুন করছে সদাসর্বদা মনের গোপন মন্দিরে। শিব-পূজার সময় বাড়িয়ে দিলে সে যদি শিব সন্তুষ্ট হন, তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। শিবমন্দির ধূপদীপ, পূজা তোত্রে মুখর হয়ে উঠলো। ক্রমশঃ অলক্ষ্যে ব্রহ্মরূপ চমকলো এভাবে একটানা সাধনার মনের মানুষ চাই নিখুঁত—সুন্দর।

তারপর ভ্রমর এলো তার জীবনে। পিতামাতার যত্নে তার দীর্ঘদিনের মনোকাগ্নি পূর্ণ হলো। মনে মনে যে



মানুষটিকে ভালবাসার একটা অংশ দিয়েছিলো সবার অজান্তে তার চেয়ে কাছেই মানুষটি অনেক ধনী, উচ্চ শিক্ষিত—রূপে যা' সে একটু খাটো। মন তার বহু উজ্জ্বল। সে ধনী হয়েও অর্থপিপাসু বা স্বার্থান্বেষী নয়, চান দরিদ্রের মুখেও হাসি ফোটাতে।

মুখের হাসি আর মনের হাসির বহু তফাত। দুইয়ের যোগাযোগে যে হাসি ফুটে ওঠে মুখে, সে হাসি কত সুন্দর। সে প্রশান্ত হৃদয়ের হাসির রূপ আলাদা। মানুষের আকৃতিই মানুষ নয়, মানুষের মত মানুষ কজনই-বা হতে পারে? মানুষ হতে গেলে সাধনার প্রয়োজন। যে অনাবিল প্রেম তিলে তিলে বহু অক্লান্তি, কষ্টসাধন করে জন্মজন্মান্তর ধরে আয়ত্ত করতে হয়। বহু ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হয়।

হেসেছিলো প্রশান্ত একদিন তার কাছে। সে মধুর হাসি আজও তার নির্জীব ক্লান্ত চোখের সামনে ভেসে ওঠে মাঝে মাঝে।—অথচ তা' কত ককণ!

‘পারল আজ একটা খুব মজার স্বপ্ন দেখেছি!’

‘কি স্বপ্ন?’

‘ওনবে?’

‘মজার স্বপ্ন ওনতে ইচ্ছে হয় না বুঝি?’

‘আজ্ঞা, স্বপ্ন সত্য বলে মনে হয়, তোমার?’

‘বোধহয়, না—’

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সত্য। না হলেও একদিন তা' সত্যে পরিণত হবে। অথচ যদি তা' তোমার জীবনে সত্য হয়ে ওঠে আমি তাতে [ব সুখী হবো। যদিও আমার মৃত্যুর পর তোমাকে আমার আরাধ্য দেবতা বলে মেনে নিতে বলি না, তবে যদি কোনদিন মনে পড়ে আমার সমাধিতে সিরাজের বেগম লুৎফা যেমন বিধবা হলে সমাধি-মূলে অশ্রুজলে পূজা করে গেছে অহর্নিশি, তেমনি নয়, মাঝে মাঝে দুটো ফুল ছড়িয়ে দিয়ে এসো।—তোমার টাপার কলির মত ঐ আঙুলের স্পর্শে ফুলগুলো আমার সমাধির বুকে দিলে আমার আত্মা সুখী হবে। ফুলের স্পর্শে আমি পাব সুখস্পর্শের আশ্বাদ। আশীর্বাদ করবো



# মিন্স প্রেন্টারে

## পুড়ার শাড়ির ডামারোহ

### বেগারসী রেশম ও তাঁতবস্ত্র দেখিয়েছেন?

৩৩/১৫, বিপিন বিহারী গার্লস স্ট্রিট, বহুবাজার বার্কিট, নতুন কলিকাতা। ফোন : ৩৩-৮৮০০

তোমায়, তোমার বাকী জীবন সুখের হোক—পারবে না ?

পারলে তু-চোখ তখন জলে ভরা।

হেসে উঠলো প্রশান্ত। অনাবিল সে হাসি।

হাসি দেখে পারুলের কান্না গেল বেড়ে।

‘আর অমন করে ওসব কথা বলো না। তোমার ডাটা পায়ে পড়ি। আমি সহিতে পারছি না গো! তোমার স্বপ্ন মিথ্যে হোক, মিথ্যে হোক তোমার সমাধিতে আমার ফুল দেওয়া! লুৎফার হুঃখ শুনে আজও আমার প্রাণ কঁপে কঁপে ওঠে, সহ্যভূতিতে মন ভরে ওঠে। বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় একটা বোবাকান্না। আর হতভাগ্য সিরাজের জন্ত হাহাকার করে ওঠে মনটা।—হায় সিরাজ, বুঝি-বা সে শাপভ্রষ্ট দেবদূত!’

পারুলকে কাছে টেনে নেয় প্রশান্ত। চোখ দুটো ক্রমাল দিয়ে মুছে দিয়ে বলে, ‘কঁদতে নেই! ছি! থাক, আমার মনের কথা শুনে যখন কঁদছো—স্বপ্নের কথা আর শুনে হবে না—’।

জেদ ধরে পারুল। ‘না বললে আমি কিছুতেই তোমাকে উঠতে দেবো না। বলতেই হবে।’

‘শোন তবে সে মজার স্বপ্ন—’

‘কঁদছো তুমি আকুল হয়ে আমার মৃতদেহের পদতলে বলে। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার রক্তাক্ত কলেবর একটা জয়ের উল্লাসে থেকে থেকে উৎফুল্ল হয়ে উঠছে। হাজার হাজার নরনারী আমার মৃতদেহ দেখবার জন্তে ভিড় জমিয়েছে কাছারি প্রাঙ্গণে। তাদের মুখে কথা নেই, শোক প্রকাশের ভাষা নেই। সবাই চোখে জল। কঁদছে তারা প্রবল শত্রু মহামাণ্ড জমিদার পুত্রের মৃতদেহ দেখে। আর মনে-প্রাণে অভিশাপ দিচ্ছে জমিদারী নিপাত যাক। সবাই মাথা হেঁট করে আছে তোমার কাছে, লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না বুঝি তারা। আমার মৃত্যুর জন্ত সব দায় দায়িত্ব যেন তাদেরই। আমি দেখছি আর হাসছি। সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলাম, তোমাদের ওপর যে জুলুম হচ্ছিলো, তা’ থেকে তোমাদের উদ্ধারের সংকল্প নিয়েছিলাম—তাতে তোমাদের হুঃখ বা লজ্জার কি আছে? প্রাণের মায়া বড় নয়, আগে অবিচারের প্রতিবাদ। আমি জমিদার পুত্র না হয়ে যদি তোমাদেরই একজন হয়ে জন্মাতাম? আমার লজ্জা আমি

ধনীর ঘরে জন্মেছি, কিন্তু ধন-মান-বশের কাঙাল হতে চাইনি। তাই সেসময় পিতৃ অমুচরদের ক্রোধে দাঁড়িয়ে ছিলাম। নায়েব-গোমস্তা-পেয়াদারা আমার রণ হুকার দেখে সরে গেছিলো, বায়নি কেবল দুর্ব্বল লাঠিয়ালরা। আমি জানি পেছন থেকে তাদের সাহস দিচ্ছিলেন স্বয়ং আমার পিতা। জলছিলো তোমাদের কুটিরগুলো রাতের অন্ধকারে দাউদাউ করে আর আর্ত নরনারীরা বুকফাটা আকুল আর্তনাদ করছিলো শীতের রাতে।

সহ হলো না আমার। তাই ছুটে গেলাম। এ হতে দিতে পারি না। ঐর্ষ্য-লোভে নিরপরাধ মানুষগুলোর বুক এ শক্তিশেল আমি বিদ্ধ হতে দেবো না। যদি প্রাণ বলি দিতে হয়, সেজন্য আমি হুঃখিত নই। কেন অকারণে যখন তখন তাদের খাজনা বাড়বে?—অধিকারের অগ্রা অহকার শেষ করে দিতে হবে; ইংরেজ শোষিত-শাসিত এ নির্ব্বীৰ্য মানুষগুলোকে সাহসী করে তুলতে হবে, তা’ না হলে দেশমাতৃকার স্বাধীনতা পিছিয়ে যাবে অনেক দূরে। লাঠির আঘাত বারো সহ্য করতে পারবে না, লাঠি ধরতে বারো ভয়ে ভীত—তারা কি কোনদিন ব্রিটিশ সরকারের সিপাহীদের গোলাগুলির সামনে বুক পেতে দিতে সাহস করবে?

তোমাকে সব বুঝিয়ে বললাম, তুমি না বলতে পারলে না। শুধু জটাজুঁধারী সেই দেবাদিদেব মহাদেবের কটোতে মাথা কুটে লাগলে, ‘ঠাকুর তুমি ওকে বাঁচিয়ে রেখো। জমিদারী চাই না আমরা, চাই সব কিছুর বিনিময়ে ওর জীবন ভিক্ষা।’

পারুল ভাঙা ভাঙা গলায় বলে, ‘তোমার স্বপ্ন মিথ্যে হোক। আমি তা’ চাই না—চাই না—চাই না—’

সম্মেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল প্রশান্ত, ‘তুমি ভেবো না—এ স্বপ্ন সত্য না-ও হতে পারে।’

অথচ সে স্বপ্ন সত্য হয়েছে পারুলের জীবনে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে।—নিজেকে নিজে বিক্কার দিলে সে, ‘এই তার ললাটের লিখন’!

(এগারো)

গুরুগভীর কণ্ঠে ফের বলতে শুরু করলে মুকুল,—  
উনিশ-শো সাত চল্লিশ সাল।



ভারত স্বাধীন হলো।

হঠাৎ একদিন কোম দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিনিধি এলো আমার কাছে। আমার ফিরিওয়ালা জীবন থেকে আজ কিভাবে এতবড় লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা ফাঁদতে পেরেছি তার ইতিহাস জেনে কাগজে ছাপবে তারা।

যে ভেজালের কারবারে সিদ্ধহস্ত, তার জীবনীও যে অধিকাংশ ভেজাল, তা' কাগজের প্রতিনিধি জানবে কি করে? এ গোপন খবর রাখা কজনের পক্ষেই-বা সম্ভব? সুতরাং তারা চাইল নবীন ভারতের জনসাধারণকে আমার কুদ্র থেকে বৃহৎ ব্যবসায়ের কথা সগর্বে জানিয়ে আমাকে এক জলন্ত হুঁটাত হুঁটাত স্থাপন করে দেশবাসীকে ব্যবসা ইত্যাদিতে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসী হতে।

আমি আমার ব্যবসা কাহিনীর সঙ্গে ভেজাল দিলাম শক্তকরা নিরানব্বই ভাগ। জলো না পানসে সে পরখ কে করবে? আর যদিও-বা কেউ করে তারা নিজেরা যে কতখানি নির্ভেজাল তা' হৃদয়ঙ্গম করলে চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় নেই। এ বিশ্বাস আমি করি, যেহেতু জহরী জহর চেনে। অর্থাৎ আমার নকল আমিজে একখানা নকল বাবছাল চাপিয়ে দেওয়া হলো। জানো শোধহর, সেই গর্দভের বাঘের চামড়া গায়ে দিয়ে কৃষকের ক্ষেতে ফসল নষ্ট করার গল্পটা।

পরদিন সংবাদপত্র দেখে আমার ব্যবসায়ী গুরুরা ফের আর একদফা পিঠ চাপড়ে দিয়ে গেল, 'সাবাস'।

কোন মাসিক পত্রের সম্পাদক ধরলে, ধারাবাহিক ভাবে আমাকে জীবনী লিখতে হবে।

আমি বলি, 'সম্ভব নয়—'

তিনি বলেন, 'সেকথা বললে স্তনছিনে স্তার, আমরা 'পেপার' পড়ে বুঝেছি, সামান্য পুঁজির ব্যবসা থেকে কি ভাবে আজ আপনি লাখ-লাখ টাকার ব্যবসা ফেঁদেছেন। সুতরাং আমার অনুরোধ, দেশের মানুষকে ব্যবসায়ের সে ইঙ্গিত দয়া করে জানাবেন। আজ আপনি দেশের একজন খাঁটি ব্যবসায়ী। আপনার নাম দেশে কেন বিদেশেও পৌঁচেছে। নবীন ভারত গড়তে আপনাদের সাহায্য চাই— চাই আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে নবীন ব্যবসায়ীদের ব্যবসারে উদ্বুদ্ধ করতে। শুধু চাকরি নয়, ব্যবসা করেও যে মানুষ

দেশকে তথা নবীন ভারতকে বঞ্চিত করবেন কেমন? শিশু-রাষ্ট্র গড়তে কি আপনার কোন অবদান আশা করতে পারি না?'

'লেখা তেমন আসে না কিনা আমার।'

'কোম প্রয়োজন নেই! আপনি কি সাহিত্যিক যে আপনার কাছে কথামিলি আশা করবো? তবে দয়া করে একটু অবসর করে মানে একদিন করে আমাদের প্রতি-নিধির কাছে ধারাবাহিক ভাবে কিছু কিছু বর্ণবেন; তিনি ঠিক জুড়িয়ে লিখে নেবেন—মানে ধারাবাহিক ভাবে বেরোবে কিনা কাগজে?'

বুঝলাম, আমার স্বরূপ ওরা আসল বলে বাজারে ছাড়বে। আমার অক্ষমতার কথা বুঝলেও সাধারণের কানে তুলতে রাজী নয় এরা। ভেজাল দিয়ে আমাকে হয়তো কোনদিন সাহিত্যিক বলে চালিয়ে দেবে সাহিত্যিক-দের আসবে কিংবা কোন সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতি বা প্রধান অতিথি হবার অনুরোধ জানাবে।

ভবিষ্যতের ভাবনা আমি তেমন ভাবি না। আজও ভাবলাম না। ক'লাইন বলতেই সম্পাদক মশাই 'নোট' করে নিয়ে সুখ্যাতি করে বললেন, 'আজ এই পর্যন্ত থাক। বড় চমৎকার বললেন স্তর, কলম ধরলে আপনাকে পাকা সাহিত্যিক বলেই মনে হবে। আবার একমাস পর আমাদের পত্রিকার প্রতিনিধি এসে কিছুক্ষণের জ্ঞা বিরক্ত করবে আপনাকে, আজ গৌঃচন্দ্রিকা হয়ে থাক। অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার।' বলে তিনি ব্যাঙ্কের একখানা চেক টেবিলে রেখে বললেন, 'আপনার দক্ষিণা'।

দেখলাম একশো টাকার চেক।

কাগজ বের হতেই একখানা বিনামূল্যে পেলাম। পড়ে দেখলাম, আমি যা' বলিনি তারই বেশীর ভাগ। আমার আসল চাপা দিয়েছিলাম, নিজেকে জাহির করার জন্তে, সম্পাদক মশাই সেটাকে আরও চাকচিক্য করতে গিয়ে আসলের অপমৃত্যু ঘটিয়েছেন।—আমি বুঝি রূপকথা রাজ্যের মানুষ।

দৈনিক পত্রিকা সংক্ষেপে একটা স্তম্ভ ছেপেছিলো, এরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গোটা ব্যবসায়ী জীবনী ছেপে আমাকে শুকতারার মত উজ্জ্বল করে তুলতে চায় ব্যবসায়ী

ওঁনতে চায়, হলোই বা তা' ডেজাল !

অর্থের কাঙাল ছিলাম আমি। যশ-মান চাইনি বা পাইনি জীবনে। তা'ও ভাগ্যের প্রসন্ন দৃষ্টিতে এসে গেল। লোকচোখে আমি ছিলাম আদর্শ ব্যবসায়ী। স্ত্রীর ব্যবসায়ী মহল আমাকে তাদের সমিতির একজন হোমডা-চোমডা সভ্য করে নিলেন এবং দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে আমাকে তাঁরা বিধান সভার সভ্য নির্বাচনের জন্ত আগে ভাগে তৈরী থাকতে বললেন। আমি না-না করতেই তাঁরা জয়চাক বাজিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে দিলেন। আমি কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়লাম।

পাকল বললে, 'ক্ষতি কি ? এতে ব্যবসারে কোন ক্ষতি হবে না আর এরও প্রয়োজন আছে, বেহেতু রাজনৈতিক মহলে ঘনিষ্ঠতা তোমার নকল জীবনে রক্ষা কবচের ভায় কাজ করবে। তোমার আসলটা চেপে গিয়ে তোমার নকলের জয়গান প্রচারিত হবে। কে তোমার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর নিচ্ছে ? তুমি অমর্ত্য করতে পারবে না।'

মুকুল ধনুবাদ দিলে পাকলকে, 'এ রকমটি না হলে সহধর্মিণী ! তুমি বুদ্ধিমতী। আজ তোমাকে একছড়া মুক্তার মালা উপহার দিচ্ছি—চলো গাড়ী নিয়ে মেড়িয়ে পড়ি।'

সাধারণ নির্বাচনের তোড়জোড় আরম্ভ হলো।

যারা কল্পিনকালে মুকুলের নাম জানত না, চিনত না, তাকে তারা টাকার জোরে বানিয়ে তার সাত পুরুষের নাম কতদিনের চেনাজানা, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তার অবদান ইত্যাদি সববে প্রচার শুরু করলে। এবং সে-সঙ্গে ব্যবসারে বিরাট সাফল্যের কথা গগনভেদী চীৎকারে মুখরিত করে তুললে। পাড়ার লোকগুলো 'থ' বনে গেল। টেলি-ফোন ও সাফাৎকারে ব্যতিব্যস্ত করে তুললে, 'যা-হোক মশাই, এমনি করে গা-ঢাকা দিয়ে আছেন ? আপনি এত-বড় মানুষ, দেশের জন্ত এতখানা করেছেন, সেকথা কি আমাদের জানতে দিতে নেই ? বহু পুণ্যফলে আমরা আপনার মত লোককে বিধান সভায় পাঠাতে পারবো আশা করছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার জন্ত

সপ্রশংস দৃষ্টিতে আত্মপ্রচার স্থখের, তার পেছনে যদি থাকে জয়চাক, সে হলো আরও তৃপ্তিকর। নিজেকে আর বিশেষ বেগ পেতে হয় না। আর এ না হলে নাম জাহিরও বৃথা হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, মুকুলের তখন ব্যবসারে তেমন দৃষ্টি দেবার সময় নেই। প্রাইভেট সেক্রেটারী, ম্যানেজার-দের ওপর সম্পূর্ণ ভার দিয়ে সে তখন লাটাইয়ের মত ওয়ার্ডের বিভিন্ন পার্ক ও ময়দানে নির্বাচনী বক্তৃতা দিচ্ছে। সভাপতি, প্রধান অতিথির স্থান অক্ষুণ্ণ করছেন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়ীর দেওয়াল, গাইট পোস্ট, পথচারীদের ব্যবহার্য নর্দমা, রিক্সা-ছোড়াগাড়ীর পেছন, বড় বড় বৃক্ষের শাঁড়ি পর্যন্ত মুকুল সর্বাধিকারীর নির্বাচনে সাফল্যের জন্ত লাল মোটা মোটা হরফের জাহ্নু মগোরবে প্রচারের সাহায্য করছে। নির্বাচনে ব্যবহার্য গাড়ীগুলো এমনকি তার গাড়ীখানা পর্যন্ত যে কোন রঙের তা'ও লাটারণের বুঝার উপায় নেই, আদল রঙ চাপা পড়ে গেছে পোষ্টারের অভব্য ব্যবহারে।

মনের ভেতরটা যার পঙ্কিলতার পরিপূর্ণ, তার কাছে দৃষ্টিকটু বলে কিছু নেই। ওপরের চাঁকটিকাই মনের মাপ-কাঠি বলে অনেকের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তারপর আছে মন কেড়ে নেবার জাহ্নুমন্ত্র—ভাষার ইজ্জতাল। বাক্য বিভাসের অপূর্ব কোশল। চাটুকারদের স্বার্থস্থানে স্তব-স্ততির চমৎকার প্রয়োগ।

ভোটদানের মন জয় করে ফেললে মুকুল। প্রমাদ তার ব্যালট বাক্সগুলো। ভোটপত্রে প্রায় ঠাসা। অবশ্য বিনিময়ে সে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। দেশ থেকে নাকি সে ডেজাল-হুঁসিতি খেঁটেই দূর করে দিতে চেষ্টা করবে, তার আন্তরিক ইচ্ছা দেশোন্নয়নে আত্মনিয়োগ, তাতে ব্যবসারে কিছু ক্ষতি হলেও।

বিজয়ব্যক্তিদেব কাছে এসব কথা ভূতের মুখে রাম নাম মনে হলেও মুহূর্তে সাবাস দিলেন সর্বাধিকারীকে এবং আপনাপন মনোবাঞ্ছা পূরণের দাবি পেশ করে উৎসাহিত করলেন তাকে।

নির্বাচনী সফর এবং আনুসঙ্গিক ব্যয় ও নির্বাচনে জেতবার জন্ত ভাড়া করা মানুষদের পেছনে বেশ কিছু অর্থ ব্যয় সার্থক হলো সর্বাধিকারীর। বেতার ও সংবাদপত্র



## (বারো)

এরপর সে কতখানি দেশের জন্তে আর কতখানি নিজের জন্ত কাজ করেছে, সে-সবের হিসেব-নিকেশ কেউ করলে না বরং তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে লোকসভার পাঠাবার দৃঢ় সংকল্প করলে। প্রথমটা 'না-না' করলে মুকুল। ব্যবসায়ের নাকি এসব সময় বায়ে বেশ কিছু ক্ষতি হচ্ছে তার। অতএব সে আর লোকসভার সঙ্গে যুক্ত হতে চায় না। তবে ব্যক্তিগত ভাবে বতটুকু পারবে দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবার প্রতিশ্রুতি দিলে।

কিন্তু নাছোড়বান্দা স্বাক্ষর করা ছাড়লে না। বরং উঠে পড়ে লাগলো এবং তার আগামী জন্মদিনে সভা ডেকে এ-বিষয় নিয়ে আলোচনার দিন স্থির হলো।

সেদিন ছিলো মুকুলের জন্মদিন। কবে কোন অন্ধকার তুল্য ঘরে দারিদ্রের নামাবলি গায়ে জড়িয়ে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। কেউ জানে না। অথচ জন্মদিনের ঘটা পালন কেন সাড়ম্বরে হচ্ছে সে কথা জানতে হলে বিশিষ্ট নাগরিকদের লোকসভা নির্বাচনের মুখে তার এমন একটা শুভ জন্মদিনের প্রারম্ভিক প্রস্তুতি নাকি অনেককে উৎসাহিত করবে তাই এ প্রকৃষ্ট পন্থায় আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, অবশ্য একথা ধুন্ধুর ব্যক্তি মাত্র জানেন।

মুকুল অনেক ভেবে চিন্তে জন্মদিনটা হিসেব করে বের করেছে। ছোটবেলায় তার মা বলতেন গল্পছলে,—

শ্রাবণ মাস।

আকাশ হ'দিন ধরে মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টি ঝরছে অঝোরে। ঠাণ্ডার প্রকোপে চাষীরা পর্যন্ত ঘরের বাইরে যেতে পারছে না।—পৌষের শীত যেন ভুল করে শ্রাবণে এসে উপস্থিত হয়েছে। এমনিধারা এক সাতই শ্রাবণ মুকুলের জন্মদিন। যে ঘরটায় তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন, জলে ভেসে যাচ্ছে। গতবার কিভাবে যেন খড়ের গাদাটা পুড়ে গিয়েছিলো, সেজন্ত আর ঘর ছাওয়ানো হয়নি। গরীবের মেয়ে ছোট থেকেই দারিদ্রের সঙ্গে সুপরিচিতা, তাই তাঁর সেসব কষ্ট কষ্ট বলেই মনে হচ্ছিলো না। তা' ছাড়া অধিক বয়সে মুকুলই তাঁর একমাত্র পুত্র-সন্তান। কত দেবতার কাছে মানত, সাধু-সন্ন্যাসীর কবচ ধারণ করেই তাঁর এ অভীষ্ট বস্তু সিদ্ধ হয়েছে সুতরাং মায়ের প্রাণে এসব কষ্টের

কোন মালিগের ছায়াও স্পর্শ করেনি।

খুশী হলেন মুকুলের বাবা। সেদিনই মনে মনে ঈশ্বরের কাছে সন্তানের জন্ত দীর্ঘ পরমায়ু, ধন-মান-যশের প্রার্থনা জানিয়ে নামকরণ করলেন 'মুকুল—'

মা আপত্তি করেছিলেন, 'ঠাকুর দেবতার এত নাম থাকতে মুকুল নাম রাখতে গেলে কেন?'

'গাছের কচি শাখার কোলে মুকুল দেখা দেয়, তারপর ধরে গুটি, এরপর ফল—' বুঝিয়ে বললেন তিনি স্ত্রীকে।

'মুকুল—আমার প্রাণের মুকুল—' স্নেহে জড়িয়ে ধরেছিলেন সন্তানকে। বেঁচে থাক, সুখী হোক, এ আশীর্বাদও জানিয়েছিলেন স্নেহপ্রাণে। গরীবের পক্ষে ধনী হ'বার আশীর্বাদ কার্জ লাগবে না ভেবে হয়তো আশীর্বাদ করতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলেন। তবু ডাগর ডাগর চোখ ছোটোর দিকে চেয়ে মনে বোধহয় ভেবেছিলেন, 'এ ছেলে একদিন অতুল ঐশ্বর্যের মালিক হবে। কি মিষ্টি চেহারা।'

মায়ের অন্তরের আশীর্বাদে কার্পণ্য থাকে না। আশীর্বাদে দোষ কি? দীর্ঘদিন পর পুত্রপ্রাপ্তি প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন ভগবান, এসব ভেবে মা ছেলেকে গভীর আবেগে বুকে টেনে নিলেন, গায়ে ঢাকা দিলেন তাঁর পরনের কাপড়ের ছিন্ন মলিন অঞ্চলটুকু। বক্ষ সংলগ্ন করে দেহের উত্তাপ দিয়ে শিশুকে রক্ষা করলেন ঠাণ্ডার হাত থেকে। আজ তাঁর মন খুশীতে ভরা।

প্যাণ্ডেল সাজানো হলো নামকরা শিল্পীদের দিয়ে। ভাড়া করা ফটোগ্রাফার বিভিন্ন ভঙ্গীর ফটো নিচ্ছেন মুকুলের। সাংবাদিকরা যথা সময়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ না করার জন্ত ধৈর্যচ্যুত। তাঁরা বহু পূর্বেই মুকুলের সংক্ষিপ্ত মুদ্রিত জীবনী হস্তগত করেছেন, যাকী মাত্র আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বাদ্যের নাম সংবাদপত্রে না ছাপলে সংবাদপত্রের ওপর খড়াহস্ত হন, তাঁদের নাম ও ভাষণের মামুলী সালসার সংক্ষিপ্ত রূপায়ণ নোট করা।

এক ঘণ্টা দেরি করে বেলা ন'টার মাইক ঘোষণা করলে অনুষ্ঠান পরিচিতি।

আজও বেশ কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা মাইকের সাড়া পেলে হজা করে দেখতে যায়, কি হচ্ছে,—আবার

হু-চাঁরখানা গান হলে রাজ্যের ভিখারীগুলো মনে করে কোন ভোজকাজ হচ্ছে। অবশ্য শেযোক্তদের পেটের জালা নিবারণের জন্য আজকের এ অনুষ্ঠান নয়। কালোবাজারী টিকিয়ে রাখবার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টাকারী মুকুল সর্বাধিকারীর পুণ্যময় দীর্ঘজীবন লাভের জন্য সমবেত ভক্তমণ্ডলীর ৬৬গবৎ সমীপে সশ্রদ্ধ প্রার্থনা ও লোকসভার প্রার্থী হিসাবে সর্ব সন্মুখে উপস্থাপিত করা। যারা এ সবেস হোতা তারা এরকম একজন মুকুলী পেয়ে যত। তার ওপর ভুঁড়ি-ভোজন, নির্বাচনী দাঁও—সেসব তো আছেই।

যা' হোক অনুষ্ঠান পরিচিতির পর উদ্বোধন সঙ্গীতের থাকায় বেশ কিছু বাজে লোক গণ্ডির বাইরে দাঁড়িয়েছে তখন। হাড় হাডাতে, অর্ধ উলঙ্গ ভিখারীগুলো এঁটো পাতা চাটবার তালে নির্লজ্জের মত এসে গ্রহণ গুণ্ডিতে শুরু করেছে—তারা জন্মদিনের অর্থ বোঝে না,—জন্ম থেকে শুধু পেটের জালা বুঝতে আর হ্যাংলার মত এঁটো পাতা চাটতে শিখেছে।

এ হেন অনুষ্ঠানে অদূরে হ্যাংলাগুলোকে দেখে কেমন যেন দৃষ্টিকটু মনে হলো মুকুলের। অবশ্য সে মুখে কিছু বলতে পারলে না জন্মদিনের প্রকৃত ভাব বজায় রাখবার জন্যে। পারুল অতিথি অভ্যাগতদের আদর আপ্যায়ন করছিলো প্যাংগুলের ওপর সুশোভিত কার্পেটের ওপর মখমলের জুতো পায়ে দিয়ে। আজ তার বেশবাস স্বর্গের ইজ্রাণীকেও হার মানিয়েছে। স্বামীর মনোভাব বুঝতে পেয়ে কাছে গিয়ে কানে কানে বলে, 'শুধু একটা দিন সহ্য করতে পারবে না—থাকলোই-বা দাঁড়িয়ে?'

মুকুল সন্মতি দিলে। জানি না আর কেউ সেসময় হ্যাংলাগুলোকে দেখে লজ্জায় অধোবদন হয়েছিল কিনা। তবে ধৈর্য ধরে লজ্জার মাথা না খেলে নাকি এরকম অনুষ্ঠানে যোগদান অসম্ভব!—ধৈর্যের জয় হোক!

কোন একজন বিশিষ্ট মঞ্জীর সভাপতিত্বের কথা ছিল আজকের এ অনুষ্ঠানে। তিনি ঘণ্টাখানেক আগে অনুস্থতার কথা জানিয়েছেন, তবে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন দৃঢ়কণ্ঠে। অগত্যা কর্পোরেশনের একজন হোমড়া-চোমড়া কাউন্সিলারকে সভাপতি করা হলো।—প্রধান অতিথি অবশ্য যথাসময়ে পৌঁছেছিলেন। অপ্রধানরা দিব্য প্রকৃষ্ট বদনে স্ব-স্ব আসনে, কেউবা জায়গা না পেয়েও নিজগুণে

গুণাবিতের নমুনা স্বরূপ তাঁর দাঁড়িয়ে রইলেন অধৈর্য না হয়ে।

সভার কাজ আরম্ভ হলো।

রকমারী ফুলের মালা, খেত চন্দন, ধান-দুর্বা, ধূপ-দীপ, শঙ্খধ্বনির আয়োজন পূর্ব থেকেই ছিলো—মেসবের সদ্যবহার হলো ধুরন্ধর মানুষদের দিয়ে।

পূর্ব-প্রস্তুতি ও নির্দেশ অনুযায়ী ক'জন মুকুল সর্বাধিকারী-ভক্ত বক্তা গুণগানে মুগ্ধ হয়ে উঠলেন। কেউ কেউ দাতাকর্ণের সঙ্গে তাঁর তুলনা করে, দেশের ক'জন মহা-মানবের সঙ্গে একাগ্রনে বসিয়ে দেশের কল্যাণের জন্য তাঁর দীর্ঘ পরমায়ু লাভের জন্য প্রার্থনা ও শুভেচ্ছা জানালেন গদগদ ভাষায়। মাঝে মাঝে স্তাবকদের গগনভেদী করতালিতে পার্কের ক'টা পাখী ভয়ানক হয়ে উড়তে লাগলো। ব্যথিতা প্রশংসা সহ্য করতে না পেরে।

কেউ জানতে পারলে না, গণ্ডির বাইরে এক কঙ্কালসার সন্তানের জননী শীর্ণ হাতের স্নেহ স্পর্শে নামকরা সর্বাধিকারীর দীর্ঘ সু-প্রার্থনারত বিভিন্ন বক্তার সুরে সুর মিলিয়ে তার সন্তানকে আজকের দিনে আশীর্বাদ জানালে অন্তর মথিত অশ্রুজলের সাথে।

বেশ মনে আছে হুতাঙ্গা জননী, আজ থেকে ঠিক সাত বছর আগে এমনি দিনে এ ছেলেটি জন্মেছিলো। সেদিন তারা অগ্র এক শহরে ছিলো। জ্যোৎস্না ধারায় পৃথিবী যখন হাসছে ঘোমটা ঢাকা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে—বসতিহীন শহরের শেষপ্রান্তে একটি গাছের নীচে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো। ছেঁড়া ময়লা ঝাকড়া জড়িয়ে শিশুকে কোলে তুলে নিলে নিরাশ্রয় জননী।—একটি পারিজাত ফুলের সৌরভ যেন তার মনপ্রাণকে আকৃষ্ট করে তুলেছে তখন। সন্ত প্রসূতির কোন কষ্ট কষ্ট বলেই বোধ হচ্ছে না তখন। চোখ-মুখে তার আনন্দের ছাপ, অন্তরে জ্যোৎস্না ধারার প্রাবন।

গরুর ছুপ নেই, হরপিক্স নেই, প্রসূতি বা শিশুর পরিচর্যা করবারও কেউ নেই। আছে শুধু মাথার ওপর খোলা আকাশ, বিধাতার অক্লপণ আশীর্বাদ আর কীণাকার মাতৃস্তন। স্তন থেকে ক্ষরিত দুধ শিশুর মুখে যাচ্ছে, চুকচুক করে টানছে, মিটিমিটি চাইছে আর মাঝে মাঝে ট্যা-ট্যা করে কাঁদছে। জানতে পারছে না সে,



কোথায় এলো, জীবনটা তার পৃথিবীর কোন্ কাজে লাগবে। সবচেয়ে বড় সমস্যা কুখার অন্ন কি ভাবে জুটবে?

শিশুর পিতা ধীরে পাশে ছিলো। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে বৃক্ষতলে মাতৃশব্দে শায়িত শিশুর মুখ দেখলে। চোয়াল বসা গাল দুটো আনন্দে ফুলে উঠলো কিনা বুঝা গেল না, শুধু বিড়বিড় করে বললে, 'ভগবান, ভিক্ষুক-কুলকে বাঁচিয়ে রাখতে তোমার এত দয়া কেন?'

ভগবান শুনলেন কিনা জানি না, কিন্তু তার কিছুদিন পর নানা কারণে শিশুর পিতা তাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে কোথায় বেন চলে গেল।

গর্ভধারিণী মায়ের মেহ নাকি অকুপণ। তাই সে শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। ভিক্ষা করে বেদিন বা' জোটে হুজনে ভাগ করে খায়। কখনো কোলে, কখনো পিঠে নিয়ে পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়ায়। ফেলে পালাবার করুণাও করতে পারে না।—সবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিশু ক্রমশঃ দিন-মান-বৎসর অতিক্রম করে বড় হতে থাকে। তবে তাকে পাঠশালা যেতে হয় না, উলঙ্গ হয়ে থাকার জন্তে কেউ তিরস্কার করে না, বাসী-পচা, এঁটো পাতা চাটার জন্তেও কেউ অস্থখ-বিস্থখ হবার ভয় দেখায় না—অর্থাৎ গুরুগিরির তাড়না থেকে সে নিশ্চিন্ত।

সে এখন রপ্ত করতে শিখেছে, কেমন করে মানুষের কণ্ঠে পথিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। ভোজ কাজের নিদর্শন মাইক কেমন সুরে বাজে, ভোক্তার চব্বী-চোব্বী-লেহু-পেয় প্রমাদী ডাষ্টবিন নামক গল্পের থেকে তাদের সম-গোত্রীয় কুকুরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি বা নক্ষি স্থাপন করে খেতে হয় বা সুরোগ পেলে আগে ভাগে জেতার আনন্দে ও তাদের ঠকানোর আনন্দে বেকুবের মত হাসতে হয়।

সর্বাধিকারীর ছায় নামজাদা মানুষের সঙ্গে নরকের এক অপদার্থ শিশুর জন্মদিন পালন বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। তবে মানুষের মনের কথা কেউ বুঝতে পারে না, এই বা' সুবিধা।

জন্মদিন পালন ও নির্বাচনী আলোচনা সভাতে বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হলো। এক নজরে—সর্বাধিকারীর জয় যে অনিবার্য তাতে কারও নাকি বিক্ষুব্ধ সন্দেহও রইলো না।

এরপর সমাধা হলো ভোজনপর্ব। তার পরেই ভুক্তা-বশেষ সহ পাতাগুলো শিলারুটির ছায় ডাষ্টবিনে পড়তে লাগল ঝপঝপ করে।

শিশুর লালসা কাতর চোখের দৃষ্টি দেখে একটু ফাঁক পেয়ে তার মা যায় পরিবেশনকারীদের কাছে কিছু খাবার সংগ্রহের জন্ত। ভোজপুরী দারোয়ানের শ্রেনদৃষ্টি এড়ায় না। ছুটে আসে লাঠি হাতে, 'নিকালো হিঁয়াসে—'

শিশু যায়না ধরে, 'চলো মা, আজকালকার কুকুরগুলো বড় পাজী, আগে ভাগে গিয়ে খেয়েখেয়ি করে, কিছুতেই আমাদের খেতে দেবে না। তাড়াতাড়ি চলো না।'

শিশুকে বুঝিয়ে বলতে পারে না মা, আজ তার জন্মদিনে সে তাকে কিছু খাবার উপহার দেবে।—মনে কি থাকে ছাই সেসব! তাদের আবার জন্মদিন।

মুকুল স্থির থাকতে পারে না আর ভিখারীদের অসন্তোষ দেখে। প্যাঙল থেকে বজ্রকণ্ঠে নির্দেশ দেয়, 'দূর করে দে জানোয়ারের দলটাকে—ওদের জালাতে এঁদের মান-সম্মান রাখা দায় হলো দেখছি। সব এসে ভিড় জমিয়েছে খাই-খাই করে। হুঁ, যত অপদার্থ আর অপগুণের জালাতে দেশটা ছেয়ে গেল, দেখছি।'

প্রধান অতিথি তখন চেয়ারে বসে সিগারেট টানছেন। মুকুলের কথা শেষ হতেই তার কথায় সায় দেন, 'সাঁচ্চা বাত বলেছেন, সর্বাধিকারী—ওদের জন্তেই দেশটা উৎসর্গে যেতে বসেছে। আমার হাতে যদি 'পাওয়ার' থাকতো ওদের গুলি করে মারতে হুকুম দিতাম।

সভাপতি বলেন, 'শহর থেকে ভিখারীগুলোকে তাড়াবার কি কোন আইন নেই মুকুলবাবু? আগামী সিটিং-এ এ নিয়ে একটা আইন পাশ করানো যায় না?'

উপায়ত্তর বিহীন মা অদূরে দাঁড়িয়ে কাতর মনে ভাবে, সত্যিই কি আমরা এ-পৃথিবীতে জন্মাবার মত জন্মেছি যে পৃথিবীর মানুষের অঙ্গে ভাগ বসাবো।

ছেলেটা মায়ের কাপড় ধরে টানাটানি করে।

আপন মনেই বিড়বিড় করে মা, 'হতভাগার জন্মদিনে যদি প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করতে হয়, আমি প্রাণ খুলেই বলবো, আজ তোমার মৃত্যুদিন পালনই আমার কাম্য—কিন্তু আমি মা হয়ে তা' বলতে পারব না—পারব না।'

দারোয়ান লাঠি নিয়ে ছুটে আসে।

ওরা তখন মান-অপমান, লাঠির আঘাত তুচ্ছ করে পেটের দায়ে ডাষ্টবিনের পাশে কুকুরগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। গাড়ীগুলো হর্ণ বাজাতে বাজাতে বেড়িয়ে যায়। মাইকে বাজছে তখন—“সার্থক জন্ম আমার—”

সবার অজান্তে কিন্তু ঐ মাতৃ-হৃদয় কাঁদছে অন্তরের নিভৃত কক্ষে। তবে পেটের জালায় শোক ছুঁতে চাপা দিয়ে কুকুর আর সহধর্মীদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ছাড়া উপায় কি তাদের? জন্ম থেকে এই ভো করে আসছে তারা। ভিখারী জীবন কিভাবে কখন থেকে তার পূর্বপুরুষরা শুরু করেছে ভাবতেও পারে না। ভাবে এই বুদ্ধি তাদের পেশা। সমাজচ্যুত ছিন্নমূল মানব সমাজের কাছে কবে থেকে যে উদ্ধা পিণ্ডের মত এরা ছিটকে পড়েছে এবং কিভাবে ভিখারীর সৃষ্টি সে আদিত্যর আবিষ্কারও সহজ সাধ্য নয়। অথচ দিনের দিন তাদের সংখ্যা বাড়ছে। লালসাকান্তর মন কিন্তু ভিখারী জীবনকে মনে প্রাণে সমর্পণ করে না। পারুল সর্বাধিকারীর মত সাজ পোশাক তাদের মনেও বার বার খোঁচা দেয়। কিন্তু তা' পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়—মানব-সমাজে মনুষ্যত্বের মহিমা জানাবার মত মনের পাঠশালা না খোলা পর্যন্ত।

### ( তেরো )

জানলাটা খুলে বাইরের দিকে একবার কি যেন দেখলে মুকুল। ঘণ্টা দেড়েক দেরি আছে প্রভাত হতে। অস্পষ্ট কুয়াশা নিবিড় ভাবে ভোরের আলোর টুঁটি টিপে ধরেছে। যেমন করে আজ ‘এনফোর্সমেন্ট’ বিভাগ তার টুঁটি টিপে ধরবার জন্ত বক্রপরিকর। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশার যেমন চিহ্ন থাকে না, তেমনি তার সে অনাগত বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার পথ পরিষ্কার হয়ে আছে। সব নিভুল—ফাঁকিকে ফাঁকি দেবার ফন্দি ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মত স্বচ্ছ? আজকের অভিজাত জীবনে এই বুদ্ধি পরমার্থ—ফাঁক আর ফাঁকি জানাই জীবনের মূলমন্ত্র। মনে মনে হাসলো সে—বিচিত্র ক্ষুরধার সে হাসি।

ধরালে দেশলাই কাঠি জ্বলে একটা চুরুট। বারকয়েক পায়চারি করলে পারুলের সামনে দিয়ে। ঘুম নেই চোখে, জড়িয়ে আসছে না চোখ দুটো এত রাত জেগেও। জড়িয়ে আসছে বুদ্ধি জিহ্বা আর পূর্বস্মৃতি। না-না, শেষ করতে

হবে কথাগুলো, পারুলকে জানাতে হবে সব কথা। ভাল ভাবে বেখে না, জানে না তাই তার বিপন্ন অবস্থাতেও ঘুমবার আবেদন জানালে হেনেমানুষের মত, জানতে চাইলে না তার উদ্বিগ্ন মনের অবস্থা। তার মুখ চোখেও লক্ষ্য করা গেল না এতটুকু বিষন্ন ভাব। সে যেন তার কেউ নয়, শুধু সুখভোগের সঙ্গিনী। কিন্তু কে তাকে দিয়েছে সে অধিকার? কে এ অতুল ঐশ্ব্যের ভোগলালসা বাড়িয়ে দিয়েছে? বিশেষ সুখ সংবাদে সে তাকে আনন্দ সহকারে দিয়েছে কত মূল্যবান পুরস্কার। তুচ্ছ দোষ ত্রুটি তো উপেক্ষা করে আসছে বহুদিন থেকেই।

গলগল করে একটা বোতল গলার টেলে দিয়ে খালিয়ে নিলে গলাটা। মনটাকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে। এতটুকু খাতির করে তাকে কথা বলবে না। পূর্বস্মৃতি রোমন্থনের জন্ত চুপচাপ বসে পড়লো একটা চেয়ারে। তলিয়ে ভাবতে লাগলো মুকুল—বিগত দিনের কথা।

হুঃখে অর্ধৈর্ষ হয়ে উঠেছে পারুল। তার নিদ্রাও ছুটে গেছে অনেকক্ষণ। যেন মুকুল তাকে চাবকে খাড়া রেখেছে। এমন ভাবে আজ তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে এতকথা শুনেতে হবে ভাবতে পারেনি কোনদিন। এখানে এসে থেকে শুধু পেয়েছে আবরণ আর আভরণ, সত্যকার শাস্তি সুখ তেমন কিছু পায়নি বলেই বোধ হয়। তবু রামগোপাল তাকে ‘মা’ বলতে অজ্ঞান, সর্বদা রয়েছে তার স্নেহধারার একটা উন্মাদনা, তাতেই সে সবকিছু ভুলে আছে। কিন্তু আজকাল তা'ও যেন উবে যাবার উপক্রম। যা' সে শুনেছে রামগোপালের সম্বন্ধে তার ভবিষ্যৎ পরিণতি ভেবে ভীষণ ভয় হয়।

পারুল কথাটা শোনবামাত্র মুকুলের কানে তুলতে দেরি করেনি। বড়লোকের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। বলতে গিয়ে অপদস্থই হতে হয়েছিলো তাকে সেদিন, একটা কড়া ধমকও উপরি পাওনা হয়েছিলো তার।

‘কি যা' তা' বাজে কথা বলছে পারুল? আমি বিশ্বাস করি না—তা'ছাড়া একথা যদি সত্যই হয়, উতলা হবার কোন কারণ নেই।’

‘কি বলছে তুমি?—ছেলে কলেজ লাইফেই মদ শুরু করবে, সেই সঙ্গে অন্ত্যন্ত আনুশঙ্গিক দোষে জীবনটা কলুষিত করবে আর তুমি আমি তা' জেনে শুনেও ছেলে-



টাকে সংশোধনের চেষ্টা করব না ?

‘না—সে গোঁৱ জীবন যাপন পাড়ারগায়ে চলতে পারে, এখানে নয়। আমাদের মত স্ট্যাণ্ডার্ডের ঘরে এরকম ছ’একটা ছেলে বয়ে যায় তাতে কোন ক্ষতি হয় না এমন— যদি কাজের করে নিতে পারা যায়। ওকে আমি ঠিক কাজের করে নিচ্ছি দেখুনো ?—তখন এমন নেশার ধরবে, যে—’

‘শোন—’ আরও কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায় পাকুল। ‘আমাদের দু-চারটে নয়, একমাত্র ছেলে—তা’ও আবার—’

‘থাক সে কথা—’

‘কিন্তু তাকে যদি সময় থাকতে সাবধান না করো, ও শেষে আমাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে—’

‘না পারে না। এত অভুল ঐশ্বর্য বিরাট অট্টালিকা ফেলে বাছাধন কোথাও যেতে পারে না। তা’ ছাড়া সে যে সব মহলে মেলামেশা করে, যা নিয়ে কারবার করে, তাতে অটেল পরসার দরকার। পাখে কোথায় ?’

ছেলেটা বুদ্ধিমান। এত অল্প বয়সে বি. কম. পাশের নজীর দিদিআলয়ে বোধহয় খুব কমই আছে। উপযুক্ত জলসেচের ফলে ফসল বেড়েছে মনের আনন্দে; কে তার পিড়ামাত, কোথায় তার জন্ম সে-সবের জোয়াকা বা নীতির হিসাবে ধরা না দিয়ে। ছেলেটা ভাগ্যবান বই কি! জা’ না হলে যেদিন তার সামনে ওভাবে হঠাৎ পড়বে কেন— অমন কত শিশুই তো পথে পড়ে থাকে। ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে সে তাকে অনেকখানি নির্ভর করতে পারবে, ওরব সামান্য দোষ ত্রুটি নিয়ে নিজেকে আর ব্যতিব্যস্ত করতে পার না।

কিছুদিন আগের কথা। রামগোপালের কলেজ লাইফের বিশিষ্ট বাক্ষরী লীলার বাবা হঠাৎ একদিন তাকে টেলিফোন করেন, তিনি তাঁর মেয়ের সঙ্গে রামগোপালের বিয়ে দিতে আগ্রহী। সম্মতি পেলে পাকা কথাবার্তা বলে সামনের ফাকুনে বিয়ে দেবেন।

মেয়েটির সঙ্গে রামগোপালের ঘনিষ্ঠতার কথা জানতো



● কোমল প্রকৃতি তরুণ

● মস্তিষ্ক বিকল রোগে

● মৌরসে মনস্তত্ত্ব উন্নয়ন তরুণ



অভীভূতের সেই...

মহাশক্তিমানের

হিমকল্যাণ

কেশ তৈর

আজও সবার সেবা



মুকুল। একবার পাকুল মারফত তার মতটা জেনে নিয়ে ছেলের পছন্দ মত মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে দিয়ে দিলেন ধুমধাম সহকারে।

লীনা বুদ্ধিমতী। স্বামীর দোষত্রুটি সংশোধন করতে চাইলে গোপনে কত সাধ্য সাধনা করে। রামগোপাল এক-জুয়ে। কোন কথা শুনেই চাইলে না লীনার। শেষে কথাটা তার মা-বাবার কানে গেল। ব্যারিষ্টার সাহেব বেহাইয়ের সম্মতি নিয়ে একটা মিথ্যে 'ডিভোর্স' কেস' শুরু করে দিলেন অনজ্ঞোপায় হয়ে।

প্রথমটা না-না করেছিলো মুকুল। শেষে বেহাইয়ের পরামর্শ না মেনে উপায় ছিল না। 'দেখুন, আপনি বিরাট ঐশ্বর্যের মালিক, আপনার জীবদ্দশায় সেসব তছনছ না হতে পারে কিন্তু আপনার অবর্তমানে বাবাজী যথেষ্টাচারিতার ফলে হয়তো একদিন পথের ভিখারীও হতে পারে। তখন? বরং সময় থাকতে সাবধান.... অবশ্য সবই আপনার মতামতের ওপর নির্ভর করে। কেউ জানবে না, এটা মিথ্যা 'কেস'। যদিও জানি, আপনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন তাকে সংশোধন করার কিন্তু কতটুকু সে শুধরেছে? আমার একমাত্র মেয়ে, বেহাই মশাই তার প্রাণে কোন ব্যথা আমরা সহ্যে পারব না। যদিও আমি অইনজীবী তথাপি 'ডিভোর্স' কেস' করে মেয়ের দ্বিতীয় বিবাহ প্রাণ থাকতে দিতে পারব না। না-না, এ আইন—কেন জানি না, আমার মনঃপুত নয়। সে আমার ধাতে গইবে না। তা' ছাড়া আপনি আর একটা দিক ভাবুন, আপনার শুধু ব্যবসা নয়, রাজনীতিতেও যথেষ্ট সময় ব্যয় করতে হচ্ছে। এই ধরুন না সভা-সমিতি লেগেই রয়েছে মাঝে মাঝে, তারপর লোকসভার অধিবেশনে বেশ কটা দিন ব্যয় হচ্ছে—তাতে আপনার ব্যবসায়ের ক্ষতি হচ্ছে কিনা? কিন্তু বাবাজী যদি এ দিকটায় ভাল নজর দেয়, আপনি অনেকখানি নিশ্চিন্ত হতে পারেন, এ ছাড়া আপনারও ত ব্যয় হচ্ছে, ছোট থেকে নাকি অমানুষিক পরিশ্রম করে আসছেন—শরীর বলেও ত একটা কথা আছে।

পাকুল কাছে বসেছিলো। সব শুনে একটা উত্তর দেবার জন্তে উসখুস করছিলো অনেকক্ষণ থেকে, তবে মুকুলের মুখে কোন উত্তর না শুনে কিছু বলতে পারছিলো

উচিত। তার বাবা কতটুকু ছেলের সম্বন্ধে খোজ রাখে? বাড়ীতে ঘুমবার সময়টুকু ছাড়া বাকী সময়টা তো বাইরে বাইরে কাটে তার। বাড়ী ফিরতে এক একদিন রাত বারটা-একটা বেজে যায়।

খাবার দিতে গিয়ে পাকুল কতদিন ছেলের মুখে মদের গন্ধ পেয়েছে। এক একদিন না খেয়েই শুয়ে পড়েছে শরীর ভাল নেই অজুহাত দেখিয়ে। কিন্তু সে বুঝতে পেরেছে, কেন সে খেলে না, কেন অত রাত করে বাড়ী ফেরে। বলেও ফেলেছিলো একদিন সহ্য করতে না পেরে, 'গোপাল তুই মদ খাস'?

ভীষণ চালাক রামগোপাল। জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলে, 'আজ কিছুতেই বন্ধুরা ছাড়লে না, মা। আমি যত বলি, খাব না—তারা কিছুতেই ছাড়বে না। তাই এক গেলান—' 'এসব খেতে নেই বাবা, আর কখনো খেও না', বাবা। 'কেমন'?

'না—আর কিছুতেই নয়'!

গোপাল কথা শোনেনি পাকুলের। আবার খেয়েছে কতদিন। বার বার সে বন্ধুদের মাথায় সব দোষ চাপিয়ে দিয়েছে—অসুস্থ বদনো—শেবে পাকুল ওরকম প্রকৃতির বন্ধুদের সাথে মিশতে নিষেধ করে দিয়েছে তাকে।

গোপাল জিভ কেটেছে সলজ্জ ভাবে, 'কি বলছো মা? বন্ধুরা কি আমার যে সে ঘরের ছেলে? সব আমাদের মত ঘরের, কেউ কেউ আরও বড় ঘরের! ব্যারিষ্টার উমেশ ভট্টাচার্য্য নাম শুনেছো? তার মেয়ে লীনা, বড় ভাল মেয়ে। মদ খাব না বটে কিন্তু আমাদের সঙ্গে মিশতে তার সম্মানে এতটুকু বাধে না। তারপর বিশ্বাস আইরন্ ফ্যাক্টরীর মালিক ত্রিদিববাবুর মেয়ে দোলনচাঁপা, সে তো একদিন ক্লাবে না গেলেই কৈফিয়ত চাইবে—না-না ওদের সঙ্গে আমি কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারব না।—এ সব কি বলছো, মা'।

হাতের বাইরে ছেলে চলে গেছে। তাকে আর গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখা সম্ভব নয় তাই স্বামীকে এসব কথা জানিয়েছিলো পাকুল। সেসময় সংশোধনের চেষ্টা করলে হয়তো ছেলেটা এতখানা বাড়াবাড়ি করতো না। আজ-কাল তো সব দিন বাড়ীই ফেরে না। সকালে উঠেই নগদ



সকালের দিকে ঘণ্টা তিনেক ব্যবসা দেখে তারপর খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে। কোথায় যায়, কেন যায়, কখন বাড়ী ফেরে সে কথা নাকি জানে না মুকুল। তাই সুবোধ বালকই মনে করে ছেলেকে। কিছুদিন আগে বাড়াবাড়ির কথা শুনে কেবলমাত্র গোপালকে ডেকে বলেছিলো, 'গোপাল, এমন কোন কাজ করবে না তুমি, যাতে আমার মান মর্যাদায় আঘাত পায়।'

গোপাল নতমুখে বলেছিলো, 'আপনি নিশ্চিত থাকুন। সেরকম কোন কাজ করবো না, বাবা।'

'আমি নিশ্চিত তবে মাঝে মাঝে কথাটা কানে আসে কিনা।'

'বাজে কথা, আপনি বিশ্বাস করবেন না।' গোপাল বেড়িয়ে গিয়েছিলো ঘর থেকে মিথ্যে কথা বলে। একটুও ছুঃখ পায় নি—এ বুঝি তাদের মত ঘরের ছেলেদের একটা সাধারণ নেশা। এ না হলে বের হবে কি করে ঘরের বাইরে? বজুরাই-বা তাকে পিঠ চাপড়ে সাবাস দেবে কেন? মোসাহেবের দল ঘিরে থাকবেই-বা কোন উল্লাসে?

পাকুলের দিকে চেয়ে এবার মুকুল বলে, 'তুমি কি বলো? বেহাই মশাই যা' বললেন, তা' করা কি ঠিক হচ্ছে?—গোপালকে বরং আর একবার বুঝিয়ে বললে হতো না?'

'গোপাল তোমার নাগালের বাইরে। বেহাই মশাই যা' বললেন, তা' করলে বরং ছেলেটার পরকাল ভাল হবে। তা' ছাড়া যা' করা হচ্ছে, সে তো নকল—যদি এরকম ব্যাপার দেখে সে লজ্জিত হয়, তখন না হয়—'

বুকের কাছে কেমন যেন ব্যথা অনুভব করে মুকুল। 'হ্যাঁ, ঠিক কথা বলেছো, নকল—নকল 'কেস'। মুকুল সর্বাধিকারী এ-জগতে নকলের কারবারে সিদ্ধ হস্ত, সব নকল—নকলে নিকমকুলীন হয়ে গেছে। তাই করুন বেহাই মশাই, সেই ভাল। সবদিক ভেবে চিন্তে যা' ভাল করুন, আমি এ নিয়ে আর ভাবতে পারছি না। কাল সকালেই দিল্লী যেতে হবে, তারপর আমার অনেক কাজ—আমার সব নকলকে আসলে পরিণত করতে হবে। প্রমাণ

আমার হিসেব-নিকেশ লেনদেন আমল মাজে সজ্জিত। অঙ্কে এতটুকু খুঁত নেই, অর্থাৎ ধুলো দিতে হবে, এনফোর্সমেন্ট বিভাগের কর্তাদের।'

'হঁ, এও এক মস্ত বড় খামেলা।'

অট্টহাসি হেসে মুকুল বলেন, 'কিন্তু তারা জানে না, আমি ধরা ছোয়ার বাইরে। তাদের চোখে ধুলি নিক্ষেপ করতে করতে নিজে ধুলিসাং হয়ে যাবো তবু ধরা দেবো না। না—না এ অহংকারের কথা নয়, আমাকে ধরা সোজা কথা নয়। ধরলে ধরা পড়তাম বহু আগেই।'

বেহাইয়ের সন্মতি নিয়ে চলে যান উমেশবাবু।

### (চোদ্দ)

লোকসভা অধিবেশনে গিয়ে শাস্তি পায় না মুকুল। ভারত সরকার ব্রাক-মানি উদ্ধারের জন্তু উঠে পড়ে লেগেছেন। কালোবাজারী বন্ধ করতে হবে। দেশের ব্যবসায়ী, ধনী সম্প্রদায় টলটলার মান। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। কিভাবে যুগের মত সে ধন বেঁধে রাখা যায় সে উপায় খুঁজতে দৌড়াদৌড়ি করেন আইনজ্ঞদের কাছে। নিজেদের কোশল চূড়ান্ত বলে বিশ্বাস হয় না। বেশ কজন বড় বড় ব্যবসায়ী ইতিমধ্যে ধরা পড়ে গেছেন।

অধিবেশন শেষে বিষন্ন মনে কলকাতায় ফেরে মুকুল। ছঃসংবাদের একটা কিনারা করা চাই। এনফোর্সমেন্ট তো লেগেই রয়েছে পেছনে।

তিন মাস পর আজ রাতে সব কিছু হিসাব-নিকাশ তাঁর মতে নিভুল এবং ধরা ছোয়ার বাইরে বলে দৃঢ় বিশ্বাস হলো। কিন্তু যাকে সে জ্ঞী বলে সেদিন বাণীগঞ্জের লেকে গ্রহণ করেছে, সে আজ এতবড় বিপদের কথা জেনেও নির্বাক। জানে না সে যদি তাকে ধরতে পারে এনফোর্সমেন্ট বিভাগ, বেশ কিছুদিন জেলে পচে মরতে হবে। তার সমগ্র বিষয় সম্পত্তি বিক্রি করেও ছাড়ানো যাবে না। সরকারের কঠোর মনোভাব। জনসাধারণের ছুঃখ কষ্ট ঘোচাতে বন্ধপরিষ্কর। মুষ্টিমেয়র হাতে অতুল ঐর্ষ্যের দ্বারা কোন সফল না। তাতে দেশের উন্নতির পথে যে বিরাট অকুরায় তা' আজ কে না জানে? প্রতিদিন

যায়। বেশ বুঝতে পারে মুকুল, সেও তো সেরকম  
ছনীতির অভিযোগে যে কোন মুহূর্তে অভিযুক্ত হতে পারে,  
তখন ?

দেশের মানুষ আজ কুখ্যার অন্ন, রোগে ভুবি, পরনের  
বস্ত্র, শিক্ষা চায়। তারা মানুষ হতে চায়। এসব যদি  
না মেলে প্রয়োজন মত, স্বাধীনতার অর্থ কি ? স্বাধীন  
চিন্তাধারার অবসর কোথায় ? জ্ঞান-বিজ্ঞান কি ভাবে  
প্রস্তুত হবে এসবের জালায় মানুষ অহরহ জগলে ? কিন্তু  
যারা ছনীতির আশ্রয় নিয়ে তাদের অখাত-কুখাত,  
কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করে দুনাফা লুটছে সমাজের নিম্ন-মধ্য  
স্তর থেকে তারা কি তাদের অতি লাভের লালসার স্বার্থে  
এদের জীবন ধারণের মান নিম্নস্তরে পৌঁছে দেবার জন্ত  
দায়ী নয় ?

মানুষের মত বাঁচতে চায় জনগণ। ভবিষ্যতের নামে  
অপবাদ দিতে নারাজ, মনুষ্যত্বের দাবি নিয়ে তারা আজ  
জাগ্রত। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত প্রচুর অত্যাচার  
গোলাবারুদ আজ প্রয়োজন, পরলোভী রাজ্যের লেলিহান  
শিখার মোকাবিলা এই সাধারণ মানুষই করবে, সুতরাং  
দেশের অত্যন্তরে তাদের দাবি না মিটালে হীনবন হয়ে  
পড়বে দেশ—দেশোন্নয়নে প্রচুর বাধার সৃষ্টি হবে।

প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পেতে চায় মানুষ। বিশ্বাদে  
ভরে গেছে তাদের মন। একদিন অদৃষ্ট বলে মেনে এসেছে  
সব কিছু নির্বিবাদে। অথচ এখনও অধিকাংশ লোক,  
যারা মরতে বসেছে তারাই ভেবে মরে এটা পাপ ওটা  
পুণ্য। না খেয়ে শুকাবে কই মাছের মত, তবু নির্জীবের  
মত—ক্লীবের মত যুগাবে অদৃষ্ট আর পরকালের দোহাই  
মেনে। ভবিষ্যতে ভাল হবে, পরকালে সুখী হবে—এসব  
বকসুল ধারণায়। বর্তমান রইলো যার নিছক, ভবিষ্যৎ  
হবে প্রাণবন্ত ! অদ্বুত ধারণা ! মনের নিক্তির বিস্ময়-  
কর মাপকাঠি। না খেয়ে এরা ধনীদেব খররাত দিচ্ছে  
সজ্ঞানে-অজ্ঞানে।

জনগণের মনে আজ তাই স্বতঃই উদ্ভিত হয় কিসে  
আমাদের কল্যাণ !

“মহা বিদ্রোহী রণকান্ত  
আমি সেইদিন হব শান্ত,

অত্যাচারীর খড়্গ কুণাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—

বিদ্রোহী রণকান্ত

আমি সেইদিন হব শান্ত।”

অধিকাংশ মানুষ শান্তিপ্রিয়। শান্তিই কাম্য তাদের।  
অসাধু ব্যবসায়ী, গোপন কারবারের ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে  
তাই আজ দেশের মানুষের অতি সাধারণ বিদ্রোহ। তারা  
বাঁচতে চায় বাঁচার মত। টাকা কাল নয়—টাকার রং  
লাল। পরস্যা থেকে টাকা—সব লাল। ধনীর দিন্দুকে  
জমে তাজা রক্ত আর লাল নেই, জমে বিবর্ণ হয়ে গেছে  
লজ্জায়।

সরবে চীৎকার করে ওঠে মুকুল। ‘টাকার রং লাল—  
কাল নয়—লাল—লাল—লাল—’

ভয় পেয়ে বার পাকল। ভীত দৃষ্টিতে তার দিকে  
চায়। কথা বলতে পারে না। বলবে কি, তাকে যেভাবে  
আজ অপমান করতে আরম্ভ করেছে, প্রত্যাভ্রম করলেই ত  
রীতিমত একটা দক্ষযজ্ঞ বেধে বাবে।

‘টাকা কাল নয়—লাল। আমি বলছি, লাল।  
তাজা রক্ত জমে কাল হয়ে গেছে মুষ্টিমেয়র অবৈধ  
আওতায় এসে।’

পাকল উঠে দাঁড়ায়। ফের তাকায় মুকুলের দিকে।  
সে ভয়াবহ দৃষ্টি তাকে রীতিমত বিচলিত করে। তবু সাহস  
সঞ্চয় করে ভয়াবহ কণ্ঠে বলে, ‘তুমি এভাবে চীৎকার করছো  
কেন, গো ?’

‘কেন চীৎকার করছি, সে তুমি বুঝবে না। না-না,  
সে বোধশক্তি তোমার নেই। আমি আজ প্রচুর টাকার  
মালিক হয়েছি বটে, কিন্তু এতদিনে জানতে পেরেছি টাকার  
রং কালো নয়, লাল—জবাফুলের মত টকটকে লাল।  
গরীবের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে উপার্জন—সরকার  
গঠনমূলক কাজে যে পরস্যা খরচ করেন, তা’ ধনীর  
অট্টালিকা, ব্যাক ব্যালান্সের জন্ত নয়, দরিদ্রের দারিদ্র  
ঘুচানো ওথা দেশের সম্পদ বাড়ানোর জন্তই সে পরিকল্পনা।  
কিন্তু আমরাই সে টাকার সম্পূর্ণ সদ্যবহার না করে, গ্রাণ্য  
অধিকারীর অধিকার জোর করে কেড়ে নিয়ে বিলাস বাসনে



জন্ত দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। দেশ বিদেশ থেকে অঙ্গ অঙ্গ টাকা খণ করে আনা হচ্ছে দেশকে সমৃদ্ধ করার জন্তে, কিন্তু মাথখানে এই লালসা কাতর ধনী সম্প্রদায় শুধু লাভের অংশ নয়, অতি লাভের লালসায় প্রচণ্ড অস্তবায়। খাণ্ডে ডেজাল দিই, খাণ্ডদ্রব্য মজুত রেখে ছিনিমিনি খেলি অথচ যারা ফসল ফলায় তারাই হুঃসময়ে খাণ্ডের জন্ত আমাদের দরজায় এসে মাথা কোটে।—নির্মম পাষণ আমরা, আমাদের প্রায়শ্চিত্তের সময় এসেছে।’

### ( পনেরো )

একটু থেমে মুকুল বলতে শুরু করে, ‘তুমি তো জানো আমার দারিত্রের কথা, সবদিন পেট পূরে খেতেও পাইনি আমরা। বিশেষ ভাবে মনে থাকে দেয়, দিদির বিয়ে নিয়ে। তোমার মনে আছে বোধহয় বাবার দারিত্রের জন্ত দিদির বিয়ে হয়েছিলো অপাত্রে। দিদি জীবনে সুখী হয়নি। কিন্তু কেন? তার রূপ-গুণ দুইই ছিল, ছিল না বাপের অর্থ তাই তাকে বাধ্য হয়ে বাপের অন্তরের অনিচ্ছা থাকলেও সাধের সীমা বুখে সে প্রৌড়কেই স্বামীরূপে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছিল।’

বেদনার্ত কণ্ঠে মুকুল বলে চলে, ‘আমার দিদির ফরসা রং। শান্ত-সুখী-নিটোল গড়ন—সৌন্দর্যের দেবতা যেন অরূপণ হস্তে রংয়ের তুলি বুলিয়ে দিয়েছিলেন দিদির সর্ব অবয়বে। আহা কি চোখ! কি জ্ঞা! কি স্নেহমল চাক কপালখানি। আর অপরাপ্ত কুঞ্চিত কেশ—তার বুঝি সত্যিই তুলনা নেই। ভিখারী বাপের ঘরে ইচ্ছাশীল দেহৈর্ঘ্য নিয়ে জন্মেছিলো দিদি।’

বরের বয়স পঁয়তাল্লিশ। দ্বিতীয় পক্ষ তাঁর। চেহারা-খানা অতি কর্কশ। উচু উঁচু দাঁত। বসা বসা গাল।—কপালের বলিরেখাগুলো সুস্পষ্ট।

এই বর?

বর এসে পড়েছে শুনে শাঁখে ফুঁ দিতে দিতে ছুটে গেলাম। বিপুল আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং রঙীন করনায় বিভোর তখন আমি। না জানি, জামাইবাবু কেমন রঙ-চঙের হবেন।

মুঠো খই ছিটোচ্ছে পালকির ওপর। কে কে যেন শাঁখ বাজাচ্ছে।

কিন্তু আমার বুকে তখন কে যেন সজোরে ছাতুড়ি পিটোচ্ছে। হাতের শাঁখ হাতেই রইলো; বাজাতে পারলাম না। এই আমাদের জামাইবাবু? দিদির বর? একটা আধবুড়ো লোক, আমাদের পাড়ার হরি ঘটকের মত চেহারা। দিদির লক্ষ্মীপ্রতিমার মত চেহারা, ওঁর পাশে মানাবে কি? অনেক বিয়ে দেখেছি কিন্তু সাধারণতঃ এরকম বয়সের বর ত দেখিনি? দিদি ত বরকে দেখেনি, দেখলে পছন্দ হবে? আজ তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিনে বসে বসে কাঁদবে না ত? ওঃ—বাবার কি কোন আকোশ নেই? মা কি কানেও শোনেন নি কথাটা?

একরাশ প্রশ্ন মনের মধ্যে এসে জমা হলো। কিন্তু কাকে এ প্রশ্নের জবাব চাইব?

শাঁখ হাতেই ছুটে গেলাম মায়ের কাছে। মা তখন খুব ব্যস্ত। এক সময় মাকে একাকী পেয়ে জিজ্ঞাস্য করলাম, ‘মা—জামাইবাবু বুড়ো কেন?’

মা একটু হেসে বললেন, ‘বুড়ো বলতে নেই বাবা। শুনতে পেলে তোমার দিদি হুঃখ করবে, জামাইবাবু রাগ করবেন’।

ক্রান্তির দিনে শ্রান্তি হরণে

সুবোধ ব্রাদার্সের

দাজিলিং চা

সুবোধ ব্রাদার্স

কলিকাতা ১১

‘তবে ঘটক মশাইয়ের মত চেহারা ওলোকটার সঙ্গে দিদির বিয়ে দিচ্ছে কেন?’

মা বোধহয় সব কথা জানতেন, তাই সাসুনা দিয়ে বললেন, ‘বুড়ো কেন হবে? ও তোর মনে হচ্ছে। কত বিষয় সম্পত্তি ওঁদের জানিস?—তোর দিদি কত সুখে যে পড়ল এবার।’

বুঝলাম, মা আমার আসল কথার জবাব এড়িয়ে যাচ্ছেন। কি জানি, কেমন করে আমার সে শিশুমন অসন্তোষে ভরে উঠলো। বিয়ে দেখতে প্রবৃত্তি হল না। রাতে কিছু খেলামও না। ওপরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙলো দিদির ডাকাডাকিতে। ভোর বেলায়। দিদি তখন বধূর সাজে। মানিয়েছে চমৎকার। একি! দিদির গায়ে এক-গা গহনা উঠলো কখন! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম আমি। দিদির রূপ যেন আরও ঝলমল করে উঠেছে। পরনে বেনারসী শাড়ী, ব্লাউজ, তাতে উগ্র সেন্টের গন্ধ আর মুখখানা স্নো-পাউডারে লালিত হয়ে কত সুন্দরী না হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি সিঁথির সিঁছরে দিদির মুখখানা হয়ে উঠেছে সর্ব সৌন্দর্য বিভূষিত।

‘আয়, উঠে আয়—মা বললেন কিছু খাসনি? ইশ পেটটা একবারে খালি—ওঠ—ওঠ—’ দিদি হাত ধরে টেনে তুললে বিছানা থেকে।

চোখ কচলাতে কচলাতে নীচে নেমে এলাম। দিদি বোধহয় কৌতুহলবশতঃ বাসর ঘরের দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো। আমিও।

দিদির বাক্সবীরা এবং ঠাকুমা সম্পর্কিতা কজন প্রতিবেশী তখন জামাইবাবুকে ঘিরে ধরেছেন। কে কি বলছিলো জানি না কিন্তু অস্পষ্টভাবে একটা কথা মনে আছে।

‘একটা গান গাওনা হে জামাইবাবু?’

‘গান যে জানি না—’

‘গাইবে কেমন করে তাই—গানের বয়স কবে পার হয়ে গেছে, এখন হরিনামের পালা।’

‘না-না কোন কথা শুনবো না, অন্ততঃ একখানা গাঠাকুট্টা হবে।’

‘ও-মা গান জানেন না, এ কেমন জামাই গো—যেমন জান গাওনা হে—হু-চার কলি।’

কে যেন ফস করে বলে উঠলো, ‘ভোবড়ানো গালে গান জমলে তো’! বাকী সবাই ‘হো-হো’ শব্দে হেসে উঠলো।

দিদি নির্বাক হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে তখন। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, দিদি ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ছাড়াচ্ছে আর দেখলাম হাজারকের আলোতে—তার হু-চোখের কোণে অশ্রু চিকচিক করছে।

মা আমাকে টেনে নিয়ে কোলে বসিয়ে খাওয়াতে থাকলেন—খেতে ভেমন স্বাদ পেলাম না। সামান্য কিছু খেয়ে ফের ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

আমার দিদির সে রূপ আর দেখিনি। বিয়ের পর কেমন যেন শুকনো শুকনো দেখাতো। তার সে বন্দিনী-ক্লিষ্ট আত্মার কারা যেন আমি শুনতে পেতাম।

পরে শুনেছিলাম, দিদির রূপে মুগ্ধ হয়েই জামাইবাবু দিদিকে বিনা পণে বিয়ে করেছিলেন। তা’ না হলে তাঁর মত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে জামাতারূপে পেতে বাবার সর্বস্ব বিক্রি করেও সম্ভব হতো না। জামাইবাবু তাঁর প্রথম জীবন সব অলঙ্কার দিদিকে উপহার দিয়েছিলেন।—বগতে লজ্জা নেই, বিয়ের খরচ-খরচা বাবদ বাবাকেও কিছু নগদ টাকা দিয়েছিলেন গোপনে।

আজ আমার মনে হয়, দিদি জীবনে সুখী হতে পারে নি। দিদির মুখেই শুনেছিলাম, বিখব্রজ্ঞাও বত প্রকারের নেশা আছে জামাইবাবু তা’ থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। অষ্টপ্রহর মাতাল হয়েই থাকতেন। দিদিকে অবশ্য বেশীদিন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি। জামাইবাবুর মৃত্যুর তিন বছর পর দিদি কলেরায় মারা যান।

মাঝে মাঝে চোখ ফেটে জল আসে আমার। মনে হয়, কাকন-কৌলীতের দোহাই দিয়ে জগতে যে কোন বস্তুর মূল্য যাচাই হতে পারে, কিন্তু একজন প্রোঢ় বা বৃদ্ধের পাশে কামনা-বাসনা মুখরা নবীনা যুবতীর জীবন-যৌবন বলি দেওয়া সমাজের এক নিষ্ঠুর শাস্তি ছাড়া কিছু নয়। আর তা’ আমার মনে ভীষণ আঘাত দেয় বলেই তোমাকে সেদিন বালীগঞ্জ লেক থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম—বিয়ে করার কথা জানিনি।



শয্যাশ্রয়ী হতেন না। বৈঠকখানায় মাভাল হয়ে গড়াগড়ি যেতেন। মাঝে মাঝে কলকাতা-লক্ষ্মী থেকে বাইজী আনিয়ে দিনের পর দিন নাচ-গান শুনে বিভোর হয়ে অজস্র অর্থ ব্যয় করতেন। তাঁর বন্ধুরা শাঁসালো বন্ধুকে নিত্যা নতুন নেশায় তন্ময় করে রাখতেন—দেহ ও মনের খোরাক জোটাতেন অদ্ভুত উপায়ে।

দিদি বলতো, 'বড়লোকের ঘর কিনা, এসব দোষ ধনী আর অভিজাত্যের নামে খণ্ডিত হয়।'

'জামাইবাবু কি ভাল হবেন না, দিদি?'

জ্ঞান হেসে দিদি বলতো, 'আমার সতীন বিশ-বাইশ বছর ধরে গুঁর হাতে পায় ধরেও মতিগতি বদলাতে পারেন নি বলে, শুনি শেষে নাকি বিষ খেয়ে তিনি মনের যন্ত্রণা লাঘব করেছেন—আমি ত কোন্ ছাড়'।

আমি শিউরে উঠতাম, 'দিদি যদি তার সতীনের মত বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে? বলতাম, আমাদের গ্রামের জাগ্রত দেবী, কালী-নারায়ণ মেরাই চণ্ডীর পূজা করিয়ে পুষ্প-কবচ পাঠিয়ে দেবো, দেখবে জামাইবাবু ঠিক ভাল হয়ে যাবেন।'

দিদি শুক হাসি হাসতো, ভাবতো—এ বুঝি বিধাতারও অসাধ্য।

আমি তখন কিশোর, তাই দিদি আমাকে সব কথা বলতো না। জামাইবাবুর মৃত্যুর পর যখন গেলাম, তখন দিদি সব কথা খুলে বললে, জামাইবাবু নাকি অনেকদিন ধরে এক কঠিন ব্যাধিতে ভুগছিলেন। ক্রমশঃ অসুখ বেড়ে ওঠে, ডাক্তার-বোজা-বজিরা হার মানতে বাধ্য হয়। যেহেতু সামান্য একটু স্নেহ হলেই ফের অনিয়ম অত্যাচার করতেন। শেষে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন। অবশ্য এ গোপন কথা। যেহেতু জামাইবাবুকে এ জন্ত মর্গে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়নি। 'হার্টফেল' করেছেন বলে খবর রটিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

(ষোল)

তাই বলছিলাম পারুল টাকার রঙ লাল, কাল নয়। যে টাকাটা তৈরী হয় সেটা রক্তের বিনিময়েই তখন টাক-শালে তৈরী হচ্ছে—বিলিয়ে দেওয়া বা অত্যাচার ভাবে সিন্দুকে জমাবার জন্ত নয়। রীতিমত তার মূল্যায়ন স্থির

করেই এ পরিকল্পনা। তা' যদি না হবে—মানুষের জীবনের সঙ্গে টাকার মাপকাঠি হবে কেন? কেন অর্থ ছাড়া বিয়ে হয় না? অর্থাভাবে আমার দিদির জীবনের একটা অপরিহার্য পরিচ্ছদ থেকে বঞ্চিত হতেই-বা হলো কেন?

দিদি কোনদিন সুখী হতে পারেনি। আমরাও। পরে এ নিয়ে মা-বাবা দুজনকেই আক্ষেপ করতে শুনেছি। কিন্তু আমরা হিন্দু। বংশগৌরব, সমাজ, কৌলীক—এসব মানতে হবে তো!—তাই সেকথা ভেবে মাঝে মাঝে হৃদয়ের অতল-সাগরে তলিয়ে যাই, এ আমার মনগড়া হুঃখ নয়, সত্যকার মর্মভেদী বেদনা—যা' অতি সত্য। কি আর বলবো, সেদিনের কথা পারুল—আমি জানি দরিদ্রের ঘরে সব কিছুর দীনতা স্পষ্ট। আমি দেখেছি সেসময় কতজনকে ভাল কথা বলতে গিয়েও হাতাম্পাদ হতে হয়েছে, কত সৎ কামনা-বাসনা দলে পিশে শেষ করে দিতে হয়েছে। কত অজ্ঞান-অবিচার নীরবে সহ্য করতে হয়েছে। যদিও মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে—দারিদ্র্য টুটি টিপে ধরেছে—সাবধান!

সহসা পারুল বলে, 'মনে আছে, একদিন বলেছিলাম, আসল সত্য অর্থ নয়, দেখছি আজ তুমি তা' বুঝতে পেরেছো!'



‘বুঝেছি মানে? আমার দেহের কঙ্কালগুলো পর্যন্ত টের পেয়েছে যে আসল সত্য অর্থ নয়। টাকা—সে তো লাল, ঘোর রক্তবর্ণ!’

পারুল অনুনয় কণ্ঠে বলে, ‘তুমি ধামবে?’

মুকুল তার কথায় কান দেয় না। আপন মনে বলে চলে, ‘আজ অতীতের কথা বার বার মনে আসছে। ভুলতে পারছি না অতীত, অতীত যেন আমার প্রিয় বন্ধু! অতীতের সে নয়নাঙ্গ, প্রাণটাকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছে। আকাশে বাতাসে আজ বায়ুকের নিঃশ্বাস, সে বিযাক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস আজ দূরীভূত করার প্রয়োজন। কাঁদছে দেশের ঘরে ঘরে কত মানুষ অন্ন-বস্ত্র-চিকিৎসার জন্ত, আর আমরা তাদের নয়নজল দেখেও উপেক্ষা করে দিবা আরামে উপর তলার মানুষ হয়ে তাদের ব্যঙ্গ করছি। শুনেছি নয়নজলে পাষণ গলে, কিন্তু মানুষের হৃদয় কি পাষণের চেয়েও শক্ত। এও শিখলাম, অর্থ মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। আসল শান্তি মনের নিভৃত কক্ষে নিদ্রিত—তাকে জাগ্রত করতে হলে মনটাকে কষ্ট পাথরে বাচাই করে নিয়ে প্রেমের মিশাল দিতে হবে। ফাঁকি আর ফাঁকির উন্মাদনায় ছুটেছিলাম। আজ অনুশোচনায় মন-প্রাণ ভরে উঠেছে। ভাবছি, আজ আমি কোথায়? কোন্ প্রচণ্ড ধাক্কা আজ মনের শতশত দ্বার জাগ্রত করে দিলে?’ সহসা নরম হয়ে পড়ে মুকুল। ‘পারুল, আমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছি!’

‘অন্ত চীৎকার করো না গো—পারুল হয়ে যাবে। শুনেছো?’ ফাঁক পেয়ে ব্যথাতুর কণ্ঠে পারুল বলে।

‘হতে পারি। তবু আমার প্রাণের সে সজল ব্যথাভরা ঘটনাগুলো তোমাকে না বলে ধামতে পারছি না—যা, সত্য, একবিন্দু ভেজাল নেই। সত্যি বলছি পারুল, তুমি বিশ্বাস করো, যা তোমাকে এতক্ষণ ধরে বললাম, তাতে ভেজাল নেই এতটুকু, তবু যেন সব বলা হলো না, বলতে পারছি না গুছিয়ে।—জীবনটা গাঁজামিলে ভর্তি যে আমার! জীবনে পেয়েছি বহু দুঃখ, সুখ ভোগও কম করিনি কিন্তু অনুশোচনা এক্ষণে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।’

‘তুমি ধামবে?’

‘ধামতে বলো না, ধামতে পারছিনে, পারুল। ভেতরটা আজ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। একদিন বুক ফুলিয়ে কালো-

বাজারী করেছি আজ ধরা পড়বার মুখে অন্তর ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছে।

পারুল এবার মুকুলের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে করুণ কণ্ঠে বলে, ‘ওগো সত্যি বলছি, তুমি বিশ্বাস করো, আমি সব জেনে শুনেও কেন তোমার বিপদে সহানুভূতি জানাতে পারছি না। আমার বড় ভয় করে, যদি দুর্বলতাবশতঃ তোমাকে আমার কাল্পনিক ভয় প্রকাশ করে ফেলি—তুমিও দুর্বল হয়ে পড়বে। আমি কি করবো তখন? আমার তুমি মাক্ করো, হাল ভাঙা পাল ছেঁড়া নৌকার মত আমার এ প্রাণটা আর ঘূর্ণিঝড়ের মুখে ছেড়ে দিও না। ভরাডুবির ভাবনা ভাবি না, ভাবি কেবল তোমার কথা। যে ইচ্ছে করলে, আমার চেয়ে দু-পাঁচটা রূপসী স্ত্রী নিয়ে ঘর বাঁধতে পারতো, সে কেন আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধলে! হও তুমি নকল কারবারী, কিন্তু তা’ সন্দেহও তুমি আমার কাছে আসল সোনার মত,—একটি কারণে, তা’ হলো তুমি মহান, তোমার মহত্ত্ব আমার মত হতভাগিনীকে ছায়ার মত স্পর্শিতল করে তুলেছিলো সেদিন—যেদিন আমি ভাগছি চোখের জলে, মনের অনলে।

‘তবু বলছি পারুল, টাকার রং লাল, বতই যা’ করি—এ ধারণা আজ আমার মনে দৃঢ় হয়েছে। টাটকা সতেজ রক্তিম বর্ণ সে টাকার। আজ আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, জীবিকার জন্তই জীবনটাকে কলঙ্কিত করেছি। অধচ আমার বাবা শত দুঃখ কষ্টেও মিথ্যা আচরণ করেন নি। উপবাস করেছেন কতদিন তবু ভিক্ষা চাননি কারো কাছে। আর আমি এমন মোহে ডুবলাম যে, কলঙ্কিত করে তুললাম বংশধারাকে!

‘তোমার হিসেব মিলেছে?’

‘হ্যাঁ। তবে নিদারুণ পরিশ্রম করে যে হিসেব খাড়া করেছি, তা’ থেকে আজ স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে, টাকার রং লাল—গরীবের অর্থ আত্মসাৎ করেই আমার এ অটালিকা, বিলাস-ব্যসন সবকিছু।’

‘তুমি শান্ত হও!’

‘শান্ত নয়, সমাধিস্থ হয়ে থাকবার দিন বনিয়ে এসেছে আমার—চির শান্তিরও বড় প্রয়োজন আমার!’



( সন্ডেরো )

মাস ছয়েক পরের কথা ।

পরের ঘটনাগুলো অতীব মর্যাস্তিক । স্থির হলো না আর মুকুলের সে অশান্ত হৃদয় । যে দেহের শিরায় শিরায় একদিন অর্থশালস উন্মুখ হয়ে উঠেছিলো, আজ সে দেহ-মনের প্রতিটি রক্তকণা অনুশোচনার ভরে উঠেছে । অর্ধ উন্মাদ সে এখন, থেকে থেকে চীৎকার করে ওঠে, 'টাকার রং লাল—কাল নয়, হতে পারে না ।'

বাবসায়ের শিথিলতা এসে গেছে । রামগোপাল অবশ্য এখন প্রায় সময় ব্যবসায় দেখাশুনা করে । যদিও সে তার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে বিবিধ আয়োদ-প্রমোদ থেকে সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত নয় । তবে মুকুল সর্বাধিকারী এনফোর্স-মেন্ট বিভাগ থেকে মাস খানেক আগে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে প্রমাণিত হয়েছে নকল হিসাবের কারচুবিতে । এরপর থেকে সেই যে মুকুল মাঝে মাঝে 'হো-হো' শব্দে হাসে, সে হাসি কারও আভাস-ইঙ্গিতে, অহুন্নয়-বিনয়ে, ভয় দেখিয়েও ধামানো যায়নি আজও । রাতদিন হাসছে আর বিড়বিড় করে বকছে, 'টাকার রং লাল—কে বলে কাল ? হাঃ-হাঃ-হাঃ—'

চূড়ান্ত পাগলামির পর্যায়ে উপস্থিত মুকুল । তবে তাকে রাঁচি পাঠাবার সঙ্কল্প বা পাগলের চিকিৎসা থেকে রাম-গোপাল ও পাকুল হার মেনেছে ।

ওকথা উঠলেই, চীৎকার করে ওঠে মুকুল, 'না-না-না, বৃথা সে চেষ্টা কণো না । আমাকে জীবনের বাকী দিন-গুলো পাগল হয়েই থাকতে দাও । যদি জোর জবরদস্তি করে, গুলি করে মারবো । হাঃ-হাঃ-হাঃ । টাকার রং লাল হয়েও কাল, সে কেবলমাত্র হাতের গুণে আর বুদ্ধি কৌশলে ।'

দেওয়ালে টাঙানো নিজের ফটোর কাছে গিয়ে কখনো চীৎকার করে ওঠে, 'তুমি কি বলো টাকার রঙ কাল ? না-না, এ হতে পারে না, টাকার রঙ লাল—সব টাকাই কিন্তু, তাতে কালিমা লেপন করেছি আমরা । ওঃচিন্ময় মূর্তিতে কালিমা লেপন করেছি আমরা, অথচ হিসেব-নিকেশের কারচুবিতে আইনের কবল থেকে মুক্ত ।

বাইরে জানিয়ে দেওয়া হলো মুকুল সর্বাধিকারী অমুদ্র । ডাক্তারের অভিমত অনুযায়ী কারও সঙ্গে দেখা করা তাঁর পক্ষে ক্ষতিকর । গোপনে টেলিফোনের লাইন কেটে দিলে রামগোপাল । যখন তখন যাকে তাকে ফোন করে কেবল জালাতন করে, 'গুনছেন, টাকার রং লাল—না-না কালো নয় ! কি একমত ? হাসছেন যে ? না-না কাল টাকা বললে চলবে না । নাঃ, হুঃখিত আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না ।—তবে আমি জানি টাকার রং লাল ।'

পাগলও ভাবে । মুকুলও প্রায় সময় নানা বিষয় নিয়ে ভাবনার অন্তল সাগরে তলিয়ে যায় । অদ্ভুত সে ভাবনা—



উৎসাহ ও উপহারে

**রাদুর জুতো**

সুন্দর ও মজবুত

ফোন-৩৪-২৪১২

**রাদুর এণ্ড কোং**

৭৫/এ, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬২

অন্ততঃ তার মত মানুষের।

লোভ আর হিংসা যখন মানুষের সমস্ত শুভ বুদ্ধিকে গ্রাস করে তখন তার এমনই পরিবর্তন হয় যে, তাকে আর মানুষ বলে চেনা যায় না। কিন্তু কত অমানুষও উচ্চ শিখরে বসে নিজেকে মানুষ বলে চোৎকার করে। দরিদ্র-নিরীহ-মুখ মানুষও তাদের মানুষ বলেই ভুল করে, বুঝতে পারে না সব সময় আসল মানুষ কবে ছাই চাপা পড়ে গেছে লোভ আর হিংসার আগুনে। তারা অর্থের দাসত্ব গিরি করে—মলুষ্যত্বের নয়।

পাকল খাবারের থালাটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকে। বলে, 'রাতদিন কেবল বিড়বিড় করে বকছো আর হো-হো করে হাসছো—এও দেখতে হচ্ছে আমাকে। হায় অদৃষ্ট—হায় বিধাতার লিখন।'

'তুমি আজ যা' নিয়ে ব্যথা পাচ্ছে। অথচ যা' কোনদিন ভাবনি, আমিও তেমনি এ অনাগত দিনের কল্পনাও কি কোনদিন করতে পেরেছিলাম? নিজেকে এতদিন রাহুগ্রাসে জড়িয়ে ফেলেছিলাম পাকল, যদিও তার প্রধান কারণ আমার দারিদ্র। তবে কি দরিদ্র হঠাৎ ধনী হলে এ অবস্থা-ই হয়? তবু আজ আমার মনে হয়, সব পেয়েও আজ আমি সব ত্যাগে প্রস্তুত। সর্বত্র বিলিয়ে দেবো দেশের মানুষের কল্যাণে। অগ্নিপরীক্ষা ত হয়ে গেছে, এবার স্বাভাবিক জীবন বাপনে ফিরে যাবো। বড় কষ্টে জোটানো ছু-বেলা ছু-মুঠো অন্ন—যা' আমার অমৃত বলে মনে হয়, সেই পর্ণকুটির—আমার সে বেদনার্ত হৃদয়ের সাক্ষ্য, অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করেই বেঁচে থাক। কি হবে এসব নিয়ে? কি করলাম জাল জুয়াচুরির ব্যবসা করে? কেবলমাত্র জটিল মানসিকতার আক্রান্ত হয়ে জীবন নিয়ে সংশয়ে পড়লাম। একদিন জীবিকার জন্ত মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম, আজ জীবন নিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে খুঁজছি শান্তির পথ।'

(আঠারো)

ঢকঢক করে একটা বোতল শেষ করে ফেলে মুকুল।

পাকল ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'এখন খাবার সময় এসব কেন খাচ্ছে? কে এনে দেয় তোমাকে এসব? গোপাল আমাকে পইপই করে বারণ করে দিয়েছে—এসব খেয়ে মন মেজাজ

কি আরও যন্ত্রণাকাতর হয়ে পড়ছে না?'

'বাকী আছে কিছু? তবু যন্ত্রণার শেষ নেই পারল। তুমি বুঝবে না, সবদা পুড়ে থাক হয়ে যাচ্ছে মনটা। গোপাল মাঝে মাঝে ব্যবসা সংক্রান্ত জটিল ব্যাপারের পরামর্শ নিতে আসে, ফিরিয়ে দিই তাকে। বলি তাকে—তোমার বুদ্ধি বিবেচনামত চলো, আমি আজ শুধু মুকুল সর্বাধিকারী, নকল কারবারী নই। যদি তুমি এতে তৃপ্তি পাও করো, না করো ছেড়ে দাও। আমি এসবের মধ্যে আর নেই। প্রয়োজন হলে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে পথের ভিখারী হয়ে দিন কাটাবো। বিষয় নয়, বিষ—বিষ—মরণ বিষ।'

'গোপাল বলে, 'বাবার বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে। আমি তাঁর কোন কথাতে রাগ করি না মা, তুমিও যেন কিছু বলো না বাবাকে।'

'হ্যাঁ, মাথা খারাপই হয়েছে পাকল। অর্থলালসা কাতর তোমার ছেলে রক্তের স্বাদ পেয়েছে, সে কি এসব ছাড়তে পারে?'

'বোমা কিন্তু প্রতিদিন তোমার খোঁজ নিচ্ছে টেলিফোনে।—বড় ভাল মেয়ে। এ সময় কেসটা 'উইথ ড্র' করলে ভাল হতো না কি?'

'না। তবে আনি মেয়েটা খুবই ভাল। অবশ্য গোপাল একদিন কঠোরতম আঘাতের মধ্যে দিয়ে সাক্ষাৎ পাবে নিষ্ঠুরতম সত্যের। যেমন আজ আমি নকল জীবনের অহংকারে অকস্মাৎ আগত ঘূর্ণি হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছি। আজ যে অট্টালিকায় বসে কথা বলছি, তা' আমার তৈরী বলে অহংকারের কিছু নেই—এসব সর্বসাধারণের। তাদের রক্ত জল করা শ্রমের বিনিময়ে, সে আমি যে ভাবেই যোজগার করি না কেন। আমাদের পৈতৃনৈর সে-নির্মমতা, হৃদয়ের ব্যর্থতার কাছে বার বার ক্ষমা চাচ্ছে সবিনয়ে।

'মনের অনুশোচনা কি প্রায়শ্চিত্তের সাহায্যকারী নয়?'

'হতে পারে। জীবনটাকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়ে কি পেয়েছি জান?—উদ্ভ্রান্তি আর লক্ষহীনতা। পবিত্র ভারতের শাশ্বত নীতিজ্ঞান, মূল্যবোধ যতগুলি মানুষের কাছ থেকে পারি, ছিনিয়ে নেবার জন্তই বুঝি আমি জন্মে-ছিলাম। কি হাতুকের ব্যাপার, সেই নকল আমি আসল বলে



বহু মানুষের কাছে নমস্ত হয়ে থাকলাম। তারা জানলে না আমার ভেতরটা কিসে তৈরী! এরপর হয়ত একদিন ক্যালেন্ডারের পাতায় ছবি দেখবে আমি খাঁটি ব্যবসায়ী হিসাবে ঘরে ঘরে পূজা পাচ্ছি। মহৎ সব কিছুকে পরিত্যাগ করে অর্থ উপার্জনই জীবনের একমাত্র সার্থকতা ভেবে অব্যাহত আনন্দ শ্রোতে গা-ভাসিয়ে দেওয়াই জীবন ভেবেছিলাম একদিন। আজ মনে হচ্ছে, এ জীবন জীবন নয়। পিপীলিকাও খাদ্য সংগ্রহ করে রাখে নিজের জন্ত—দলের জন্য। আমি আমার জন্তে লক্ষ লক্ষ মানুষের কৃতি করেছি—বিরাট করনা বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্তে—এতে মনুষ্যত্বের বাহাহুয়ী কোথায়? সবলের ক্ষুধার জর্প হচ্ছে দুর্বল মানব সমাজ।’

পারুল অধীর হয়ে ওঠে মুকুলের আপন মনে বকবকানি শুনে। কোন সময়ে ছলেবলে ঘুমোবার আবেদন জানায়, কোন সময়ে আবার অল্প কথা বলে তুলাতে চায়, মুকুল কিন্তু সব কিছু অগ্রাহ করে আপন মনে বকে চলে।

‘প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়ি আর তা’ প্রত্যক্ষ করি। সে রোমহর্ষক, বীভৎস দৃশ্য করনা করতেও যেন বেদনাক্রিষ্ট প্রাণ আঁতকে ওঠে ভয়ে। তাই বলছিলাম, এ এক কলঙ্কিত জীবন আমার। আমাদের মসীমাখা ঘৃণিত জীবনের জন্ত বহু শান্তিপূর্ণ সংসার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সুদূর অতীতের স্বপ্নময় জগৎ বলে যা’ আমরা মনে করি তার সঙ্গে আজকের দিনের বহু তফাত। তবু সে দারিদ্র ভাল ছিলো, অন্ততঃ এমন দুশ্চিন্তা ভীতি সঙ্কুল জীবন যাপন করতে হতো না। সেদিনের সুন্দর ছন্দময় জীবনের স্বাদ আর কোন প্রকারেই ফিরে পাওয়া যাবে না অথচ আমার পল্লীর সে সহজ জীবন যাপনের দিনগুলো আজও আমাকে প্রলুব্ধ করে। পয়সার জন্ত কি না করেছি আমি? এইবে ঘটনার পর ঘটনা ঘটে গেল, পেলামও অনেক কিছু—কিন্তু যা’ অন্তরের একান্ত কামনা, ‘শান্তি’ তা পেলাম না।

পারুল বলে, ‘এ তোমার মনের অনুতাপ! এমনি করে কেউ কি ভাবে কৃতকর্মের জন্ত? ওগো, তুমি যাতে শান্তি পাও—পাগলামি ভাল হয়ে যায়, তাই করো, রাত-দিন বকবকিয়ে লাভ কি?’

‘লাভের কথা নয়, লোকসানের কথাই ভাবছি পারুল।

উৎসর্গীকৃত হবে। তবে তুমি সময় থাকতে গোপালকে বলে দিও, আমি তার জীবন যাপনের জন্ত এ বাড়ী ভাড়ার আয় ছাড়া সব কিছু দেশের জন্ত দান করে দেবো। শুনেছো বোধহয়, উইলের কাগজপত্র প্রস্তুত হচ্ছে।’

আঁতকে ওঠে পারুল। বলে, ‘না-না, সে তুমি করতে পারবে না। ছেলেটা যেভাবে মানুষ হয়েছে তাতে তার বাড়ী ভাড়ার আয়ে চলবে না—চলে পাবে না।’

‘না চলে শুকিয়ে মরবে। দেশের কোটি কোটি মানুষ অন্ন-বস্ত্রের জালায় আত্মাহুতি দেবে, আর তোমার গোপাল আলালের ঘরের ছলান হয়ে থাকবে, সে আমি করনাও করতে পারি না। না-না তুমি বাধা দিও না। বলেও কাজ নেই বরং এখন তাকে, পাগল বলেই জানে আমাকে—সব কাজ চুকে গেলে বরং নিজেই জানতে পারবে, যখন তার আর কিছু বলার থাকবে না, নীরবে থাকতে বাধ্য হবে।’

‘তোমার এ মত আমি কিন্তু অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করতে পারছি না। না-না, সে খুব অজ্ঞান হবে। বরং লাখ খানেক টাকা দান করতে পারো কোন সৎ প্রতিষ্ঠানে।

একটা জরুরী কাজে পিতার সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্তে গোপাল এসেছিলেন। সে ঘণ্টাখানেক ধরে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, পিতার মনের শেষ ইচ্ছার কথা

## স র কা রে র

নিজস্ব প্রস্তুত

গব্য স্নাত ও মাখন

আ ছ্যে র প ক্ষে অ প রি হা র্য



## সরকার ডেয়ারী

৩২, ভূপেন বসু এভিনিউ, কলিকাতা-৪।

কানে আসতেই সে ধেমে গেছে। এ কি বলছেন বাবা? তবে কি মিষ্টার সোম গোপনে যে কথা কাল বলেছেন তা' সর্বৈব সত্য! সে শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যা' ঘটতে পারে মনে করে আন্দাজে সব ঠিক রেখেছে, তা' ঋণসত্য হতে চলেছে!

মরিয়া হয়ে ঘরে ঢোকে গোপাল। 'আমার নীরবতার আগে তোমাকেই চুকিয়ে দিই শয়তান। তোমার মনো-বাঞ্ছা পরিপূর্ণ হতে দেবো না। ভেবেছো, সব রোজগার তোমার? আমি কি কম পরিশ্রম করছি, ব্যবসাটা খাড়া রাখবার জন্তে? পাগলামির ভান করে ঘরে বসে আছো ছ'-সাত মাস। মানলাম তুমি পাগল, কিন্তু আমাকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করার বুদ্ধি পাগলামির লক্ষণ নয়—এ তোমার বিরাট অভিসন্ধি।'

পারুল বলে, 'পৃথিবীতে পাগল বহু প্রকারের আছে গোপাল।'

মুকুল আর্জ কণ্ঠে বলে, 'গোপাল তুই বুঝবি না আমার বর্তমান মনের অবস্থা। অন্তর কি চায় আমার। ওরে সত্যি বলছি, টাকার রং লাল, একটা টাকাও কাল নয়—কাল হয় কেবল আমাদেরই কলুষিত মনের কদর্ঘ ব্যবহারে। আমি জানি, টাকার রং লাল। স্বার্থ আর অর্থ ই মানুষের বড় অধঃপতনের মূল।'

সহসা মুকুলের বুক লক্ষ্য করে গোপালের রিঙলভারটা গর্জে ওঠে ছবার।

পারুল চিৎকার করে ওঠে, 'এ তুই কি করলি গোপাল

—ওরে হতভাগা—' অট্টেতত্ত হয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে সে।

বিছানার ওপর বসেছিল মুকুল। এবার ঢলে পড়ে। বকের ওপর গড়িয়ে পড়া রক্ত ধারাটা ডান হাত দিয়ে অলস হাতে মুছতে মুছতে বলে, 'ঠিক আমার বকের এই তাজা রক্তের মত—প্রতিটি টাকা-পয়সা লাল। আমি বুঝতে পেরেছি টাকার রং লাল, জীবন দিয়ে আজ তা' আরও গভীর ভাবে অনুভব করলাম'।—চিরনিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে মুকুল।

পারুলের মুখে জলের খাপটা দিয়ে খাড়া করে তোলে গোপাল। বলে, মা, তুমি কিছুটা বলতে পারবে না, অনেক ভেবে দেখেছি, এ ছাড়া উপায় ছিল না। তুমি কিছু ভেবো না। টাকার জোরে আমি সব কিছু আগে থেকে ঠিক করে রেখেছি। জান তো, আমি প্রসিদ্ধ ডেজাল কারবারী মুকুল সর্বাধিকারীর ছেলে—রামগোপাল সর্বাধিকারী, আমিও সবার ধরা ছোঁয়ার বাইরে।'

'হয়তো তাই সত্য, গোপাল, কিন্তু আমি আজ বুঝতে পারলাম, টাকার রং লাল—একদিন তুইও বুঝতে পারবি। বড় কাল আমাদের মন। কিন্তু আমি ক্ষমা করলেও, কাল আমাদের কোনদিন ক্ষমা করবে না। কালের মানুষও না।

মুহূর্তে পাড়ার শোকের ছায়া নেমে আসে। শহরময়

এ খবর ছড়াতে দেরি হয় না।

## জাগো গো পুনর্বীর

শ্রীমতী শান্তি বসু

যোগে মগ্ন যজ্ঞস্থর

আজ কি হায় কৈলাশে,

নৃত্য করে চারিদিকে

পিশাচেরা উল্লাসে।

অভয় বাণী দানো জননী

নিখিলের ঘরে ঘরে,

জীবন যুদ্ধে পরাজিত

সন্তানগণ তরে।

ভুলেছ কি জননী আমার

অতীত কালের কথা,

অত্যাচারে ত্রিভুবন

যবে হ'ল লাহিতা।

জগত রক্ষিতে জাগো গিরিসুতে,

জাগো গো, পুনর্বীর।

অশ্রু নিধন লগ্ন এল—

আজিকে হায় আবার।



# কিশোর চারণ

শ্রীরমেশচন্দ্র দে

চারণ কিশোর শোভে রণভূমে,  
কৃপাণ পতাকা সঙ্গী তার,  
এক হাত তার ঝাণ্ডা উঁচায়,  
অপর হস্ত খড়্গাকার।

চারণ কিশোর গেছে রণভূমে  
লহিতে বক্ষে অশ্রুলেখা,  
আঁশ মৃত্যুর শ্রেণীতে শ্রেণীতে  
সততই তার পাইবে দেখা।

জগকের তার শানিত কৃপাণ  
বিখ্যাসীতম হস্তে জাগে,  
হরস্ত তার তুর্গা বনাল,  
সারঙ্গ তার পৃষ্ঠভাগে।

“ভারত জননী সুপ্রিয় আমার”

কহে বিহ্বল চারণ শিশু,

“বিখ্যজগৎ হাসিলেও তোমা

ক্রুর বিখ্যাস-হস্তা ইষু,

একটি কৃপাণ অন্তত আমি,

প্রহরিবে তব সঙ্করাশি,

বিখ্যাসী এক সারঙ্গ তব

প্রশংসাতেই উঠিবে ভাষি।”

চারণ বালক ঝাণ্ডা উড়ায়,

স্বর্গ তাহার বক্ষে ঝলে,

কোনো শত্রুর শৃংখল তারে

দলিতে নারিবে চরণ, তলে,

পরমাত্মার স্মৃতিস্বই

আত্মা তাহার নোয়না কভু,

মৃত্যু বীরের বিনত ভৃত্য

মুক্ত বিবেক হৃদয় প্রভু ;

সুপ্রিয় তুর্গ সারঙ্গ তার

উঠিতেছে পুনঃ কথার ভ’রে

অংগুলিগুলি চম্পক সম—

প্রতি তন্ত্রীতে পড়িছে ঝ’রে :

“হে তুর্গ তোমা কোনো পীড়ন

পারিবেনা কভু কলংকিতে,

প্রেমবীর্ষের আত্মা তুমিই

অমৃতলোক প্রসুটিতে,

গীতগুলি তব হ’য়েছে রচিত,

শুধু পুণ্য ও মুক্ত তবে,

ধ্বনিবেনা কভু দাসত্বে তা’রা

আজ্ঞাবাহিত করোৎকরে।”

## ফ্যান

॥ সু-মো-দে ॥

বলে সকলেই ‘কেন ফ্যান নেই,

ঘরে ফ্যান কর ভাই’!

বিনয়ে তাদের আমি বলি এই

ফ্যান পেলে এবে খাই!

চালের অভাবে মরে আপামর

আকাশচুম্বী অতি চড়া দর,

হাততালি দিলে হয়নাতো ফ্যান

দেশে নাকি চাল নাই।

বলে সকলেই ‘কেন ফ্যান নেই

ভাতের বদলে কুটি আটা খায়

ছন্ধের স্বাদ ঘোলেতে মিটার,

অনেকের গম ছ’বেলা আহার

পেট ফুলে আইটাই।

বলে সকলেই ‘কেন ফ্যান নেই

ঘরে ফ্যান করভাই’!

যেন দশভুজা পূজার আগেই

‘পটল তুলে ম খাই।

‘ফ্যানের বাতাস’ বা ‘ভাতের ফ্যান’

শিশিরকুমার মিত্র

## ছোটদের বিবেকানন্দ

খুব ছোটদের জন্য কর্মবীর সন্ন্যাসী  
বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী। জন্ম  
শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই গ্রন্থখানি  
প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১'০০

## মানের মত ছড়া

বহু চিত্র সম্বলিত। মূল্য ২'০০

## কানুর কীৰ্ত্তি (উপজ্ঞান) '৭৫ পঃ

অভিনব প্লট, অনেকগুলি ছবি আছে।

শিশিরকুমার মিত্র বি, এ প্রণীত

## স্বাস্থ্য চিত্রে ও গল্পে ২১

আন্থ্যায়নমূলক কয়েকটি মনোজ্ঞ  
গল্পের মধ্য দিয়া স্বাস্থ্য-রক্ষার মূল  
তত্ত্বগুলি বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।  
বহু একরঙা, দুই-রঙা ও তিন-রঙা  
ছবি। মূল্য ২'০০

ছোটছোট ছেলে-মেয়েরাও পড়িয়া  
বুঝিতে পারিবে।

## শিল্পকলা চিত্রে ও গল্পে

জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কাহিনী  
ও তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্র। মূল্য ২'৫০

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর সম্পাদিত

## ছেলেদের চণ্ডী

চণ্ডীর সুষ্ঠু সুদৃশ্য শিল্পপাঠ্য সংস্করণ।  
অনেকগুলি ছবি আছে। মূল্য ৩'৬২

সুনির্মল বসু

## ছড়া ও গল্প

বহু ছড়া তত্ত গল্প—হাসিতে ভরপুর।  
ছোটদের পাঠোপযোগী। অনেকগুলি  
ছবি আছে। মূল্য ২'২৫

বন্দে আলি মিয়া

## গম্পের আসর

ছোটদের পাঠোপযোগী। মন মাতান  
গল্প। অনেকগুলি ছবি আছে।  
পঞ্চম সংস্করণ। মূল্য ১'৫০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

## গৌতম বুদ্ধ ১'০০

ছেলেদের

## গোপালভাঁড়

হাস্যরসবহুল চটকদার গল্প-কথার  
গোপালভাঁড়ের বেজার নাম। কিন্তু  
বাজার-চলতি সংস্করণ ছেলেমেয়েদের  
হাতে দেবার উপায় নেই। অনেক-  
গুলি গল্পই আদিরসবহুল—কুরুচিকর  
ভাঁড়ামিতে ভরপুর। তাই গল্পগুলি  
থেকে অপাঠ্য ও অশ্লীল অংশ বাদ  
দিয়া এই শিশুপাঠ্য সংস্করণটি শিশুদের  
উপযোগী ভাষায় সম্পাদিত হয়ে  
প্রকাশিত হয়েছে। মূল্য ১'৫০

খুব ছোটদের গল্প

১। ধ্রুব ২। প্রহ্লাদ

৩। উড়োজাহাজ

প্রতিটি গ্রন্থের মূল্য ৫০

লক্ষপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

## মুণ্ডমালার দেশ

আমাদেরই দেশের কয়েকটি অবি-  
শ্রবণীয় কাহিনী—গল্প, নাটক, ঐতি-  
হাসিক ও পৌরাণিক কাহিনী, রম্য  
রচনা—একাধারে সব গ্রন্থিত করে  
ছোটদের দুর্দমনীয় আকাজক্ষা মেটাবার  
আয়োজন করেছেন গ্রন্থকার। প্রাইজ  
ও লাইব্রেরীর পক্ষে অপরিহার্য।  
মূল্য ৩

সত্যরঞ্জন চক্রবর্তী

## ভাই ভাই (উপজ্ঞান) ১'০০

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্তী প্রণীত

## মিশরের উপকথা ১৥০

## চীন-জাপানের উপকথা ২১

প্রতিটি বইতে বহু কোতূহলোদ্দীপক  
গল্প ও পূর্ণ পৃষ্ঠা ছবি আছে।

## ছেলেদের সত্যগ্রাহী

প্রহ্লাদ, ডেনিয়েল, সফ্রেটশ, মীরা-  
বান্ধি, যীশু, গান্ধী প্রভৃতি সত্য-  
গ্রাহীদের বিচিত্র জীবন-কাহিনী—  
ত্যাগের মাহাত্ম্য ছেলে-মেয়েদের সরল  
ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।  
মূল্য ৬২ পঃ

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত

## প্রাচীন-জগৎ চিত্রে ও গল্পে

প্রাচীন জগতের তথ্যপূর্ণ-ইতিহাস ২১

শিশির পাবলিশিং হাউস ২২।২. বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।



## তবু প্রণিপাত

( ১০৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ )

নির্জিত ভারতে

বৈদেশিক শাসনের নাগপাশ হ'তে  
যেদিন মুক্তির বাণী দিকে দিকে হইল ঘোষিত,  
সেদিন কী উচ্ছ্বসিত  
আশা ও আনন্দ-স্রোতে ভেসেছিল লোক !

ভুলেছিল সব' ছঃখশোক—

মাত্র কয়দিন ।

তারপর মরীচিকা মরুতে বিলীন ।

ধনীরা হইতে থাকে ধনী ;

রক্তগত শনি

দেখা দিল দরিজের জন্ম-পত্রিকাতে ।

ত্রিবর্ণ পতাকা হাতে

কোটি নরনারী

স্পর্শ করি' যেই তীর্থবারি

সকল পড়িল,

সে বারিতে বৃষি মিশে ছিল

পুষ্টিগন্ধ নরকের অলঙ্কিত কীট ;

দেশ মাতৃকার পাদপীঠ

ঘেরিয়া দাঁড়াল তাই যত ধূর্ত জীব ।

মুহুর্তে হইল ক্লীব

সব'ভ্যাগী দেশপ্রেমী বীর ।

ভুঁইফোড় যোগিদলে ভরি' গেল নিয়ন্ত্রণা-তীর ।

নাহি অগ্ন, পেয়, পরিধান ।

কাঙালের তরে শত নিষেধ-বিধান ।

জ্বালে ও ভেজালে,

গুণ্ডামি, গুণ্ডামি, শাঠ্য আর কুটচালে

ভরে গেছে দেশ ।

নর ভুলিয়াছে বীর্য, নারী লজ্জালেশ ।

দিবালোকে চলে রাহাজানি ;

সিনেমা-টিকিট লয়ে হয় হানাহানি ।

রাজপথে জমে মহাভিড়,

ট্রাম-বাস হির—

ভুলি' কাঞ্চী-কেদার-হারকা

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দাঁড়াইছে বারান্দা ও ছাতে—

ক্ষণ নেত্রপাতে

চিনিবারে পূজ্যা কোনো পর্দার দেবীয়ে,

কিংবা কোনো স্টুডিয়ার পীরে ।

সব' স্তরে যত ঢোকে পাপ,

তত বাড়ে ব্রহ্মচারী গুরুর প্রতাপ ।

মস্ত দিয়া কানে

নারীকুল জর্জরিত করে পঞ্চবাণে ।

গৈরিকের তলে

নারকীয় লীলা তার চলে ।

গুরু হয় গুরুতর জীঘর-কুপায়,

শিষ্যদের গৃহ ভেঙে যায় ।

শিক্ষক লভিছে দণ্ড ছাত্রদের হাতে ।

নিত্য বন্দ গুরুজন-সাথে—

সিগারেট, হোটেলের খরচ না দিলে,

পোষাকের বরাদ্দ কমিলে ।

নিকর্যা ছেলেরা বলে' পাড়ার রোয়াকে

ধূমপান-ফাঁকে

হিন্দী গানে টকর লাগায় ;

নতুবা বাধায়

তপ্ত তর্ক ম্যাচ-ছবি নিয়ে ।

মেয়েদের চলা দায় সেই পথ দিয়ে ।

সম্বোধন কদর্য ভাষায়,

চিল ছোঁড়ে গায় ।

কেহ কেহ সিদ্ধহস্ত চুরি ও ছুরিতে,

বোমা ছুঁড়ে পারে প্রাণ নিতে !

যে অভাগা সংপথে উদয়াস্ত খাটে,

যত কষ্ট তাহারি ললাটে ।

যারা দেয় লক্ষ লক্ষ আয়কর ফাঁকি,

কোনো পাপ নাহি রাখে বাকি,

অর্থ তরে আপনার আত্মায়ে বিকায়,

হরিসভা, নৈশ ক্লাবে সুখে চোরা-বাজারীরা নাচে ;

ভিখারী তাদের ঘারে মুষ্টিভিক্ষা বাচে ।

বণিকের ঋদ্ধি ক্রমাগত ;

শিল্পপতি-পদভারে রাজতন্ত নত ।

বন্ধুহারা মোরা পৃথিবীতে ।

সদা ত্রস্ত সীমান্তের সমর-সঙ্গীতে ।

অর্থ কমে' আসে রাজকোষে ;

বিদেশের ঋণ লই নিজ কর্মদোষে ।

ভিক্ষা-দত্ত খাই চাল-গম ।

নিয়তি নির্মম—

পথে ঘাটে বস্তির কোটরে

বৎসরে বৎসরে

এক কোটি বিংশ লক্ষ নরশিশু আনে ।

কেহ নাহি জানে

কি খেয়ে বাঁচিবে তারা ?

মানুষ করার ভার তুলে লবে কারা ?

চারিদিকে আর্তনাদ,

হরতাল, রুঢ় প্রতিবাদ ।

স-বেদন নিবেদন, বুভুক্ষা-মিছিল ।

পিঠে পড়ে লাঠি আর কিল ।

ছোট গুলি ; কেঁদে মরি কাঁছনে গ্যাসেতে ।

যমেরে স্মরিয়া দিনে রেতে

চলি পথে, চড়ি বাসে, ট্রামে কিংবা ট্রেনে ।

রাম বা রাবণ প্রতি লেনে ।

এত-যে ছুটিছে কাল-ঘাম,

তবু দুর্গানাম

প্রতি প্রাতে লিখে থাকি জপি শতবার ।

তথাপি মা করুণা তোমা

পারি না জাগাতে ।

ত্রিশ কোটি নিবনের পাতে

পড়ে না প্রসাদ-কণা ।

তুমি নাই ; থাকিলে কি রহিতে উন্নয়ন ?

দুঃসহ এ করভারে, এই ক্লৈবা, এই অনাচারে,

জনতার ক্ষুব্ধ হাহাকারে,

এই ধন-দত্ত, দৈন্ত, নির্বীৰ্য শাসনে,

তুমি রক্ত-সিংহাসনে

রহিতে কি বসি'

আপনাতে আপনি উলসি' ?

তুমি যদি সুখশান্তি না পারিতে দিতে,

অসুরের স্পর্ধারে ভাঙিতে,

তবু তুমি ভারতেরে ডুবাতে পারিতে

প্রলয়ের প্রমত্ত বারিতে ।

মনে হয়, তুমি স্বপ্ন, সমূর্তা করনা,

শোকে দুঃখে নিফলা সাধনা ।

তুমি পশু, মূক, অন্ধ, শ্রবণবিহীনা,

তুমি মায়া, মহাপৃথলীনা ।

তবু নাহি জানি

বারংবার তব নাম, তব রূপ কেন মনে আনি !

তাই ব্যর্থ অশ্রুধারে ভেসে

প্রগতি পাঠাই মাগো তোমার উদ্দেশে ।

( ১৬৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ )

মুক্ত হয়েছে । গঙ্গা পাকা বেদেনী । হাতের মুঠায় চাপ দেয় । কতদিনের ঘুমান সাধ, যেন মিটেতেই চায় না ।

ঝিমান কণ্ঠে বিষন্ন সুরে বটুকলাল বলে—আসবার ক্ষমতা নেই ।—তবু এলাম । জানতে—

গঙ্গা যেন গুনতেই পার না । অফুরন্ত হাসির উৎস আজ তার প্রাণে লুটো পুটি খায় সে উল্লাসে ।

—ওকি কথা! লাল ! আমি যে অবলা, জংলা, ক্ষমতা-হীনা !

—তুই কালনাগিনী !—সর্ব শরীর জলে যায় তার ।

—সত্যি ? তা হলে আমারও বিষ আছে ?

[—বিষে আর সর্ব শরীর জর্জরিত । নির্জীব ক্ষমতাহীন এই শরীর ছবিষহ ।



# সাতপাঁচ

শ্রীনাথ

পাকিস্তানী প্রচার দপ্তরের অপপ্রচারে প্রকাশ—ভারত  
অন্নদিনের মধ্যেই পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবে। এ  
প্রসঙ্গে নেপালী দৈনিক পত্রিকা 'স্বতন্ত্র সমাচার' মন্তব্য  
করেছেন, 'পাকিস্তানের প্রচার গোয়েবেল্‌সকেও হার  
মানিয়েছে।'

—ওদের অপপ্রচার যে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

স্বাধীনতা দিবসে কতিপয় রাজনৈতিক দল, ক্ষমতাসীন  
দলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের দিন ধার্য করেছিলেন—  
এমন শুভদিন কি হাতছাড়া করা যায়?

—পত্রিকা খুললেই বুঝতে পারতেন তাঁরা, 'সর্বদোষ  
হরে পুষ্পা'।

সংবাদে প্রকাশ, 'ইণ্ডিয়ান মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল'  
এবার এক ডজন লতা দিয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণের গবেষণা ও  
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন।

—অবশ্য এর মধ্যে ললিত লবঙ্গ-লতা আছে কিনা  
জানা যায় নি।

বিদেশ সফরান্তে শ্রীকামরাজ দিল্লীতে এক প্রস্তাব  
জবাবে বলেছেন, 'রাশিয়াতে হুখে এক ফোঁটা জল দেওয়া  
হয় না'।

—আমাদের ধারণা, রাশিয়ার অজ্ঞাত বিষয়ে অগ্রগতি  
হলেও, বেচারী গোয়ালারা আমাদের দেশের গোয়ালাদের  
চেয়ে এখনও অনেক পেছিয়ে আছে।

জনাব ভুট্টো স্বাস্থ্যের কারণে মজ্জিত হ'তে অবসর গ্রহণ  
করে বিদেশে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্ত লণ্ডনে গিয়ে এক

গভর্নমেন্ট ও মার্কিন সরকারের নিন্দা করেছেন।

—আমাদের মনে হয়, ভুট্টো সাহেবের মনের স্বাস্থ্য  
পরিবর্তনের আগে প্রয়োজন।

গত শনিবার ২০।৮।৬৬ তারিখে একটি পথের বাঁড়  
কতকগুলো বালকের দ্বারা প্রকৃত হয়ে বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে রক্তাক্ত  
শিং নিয়ে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট-প্রাঙ্গণে প্রবেশ  
করে ছুটাছুটি করতে থাকে।

—নির্বাক পশুটি বিচার প্রার্থী ছিল কিনা বুঝা যায়নি।

স্বাধীনতা দিবসে শ্রীকামরাজ বলেছেন, আমাদের দেশের  
দরিদ্র জনসাধারণ ইতিমধ্যেই অধ'ভুক্ত ও অধ'নয়—তাদের  
পক্ষে আর কোন কিছু ত্যাগ করা সম্ভব নয়।...কিন্তু যদি  
সম্পন্ন-লোকেরা ত্যাগ স্বীকার করেন, তা' হলে দেশ গঠন  
কার্যে বলিষ্ঠ সেবা করা হবে।

—কিন্তু "নায়ে মুখমস্তি" এ শাস্ত্র বাক্য কি অমান্য  
করতে পারবেন তাঁরা সহজে?

একটি সংবাদপত্রের শিরোনাম—'ইন্দোনেশিয়া ও  
মালয়েশিয়ার সম্ভাব্য চীনের গাত্রদাহ'।

—এতে তাপমাত্রা কত ডিগ্রী উঠেছে জানা যায়নি।

সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব শ্রীম্যাকনামারা  
মন্তব্য করেছেন, 'সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ মূলতঃ  
হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ ছাড়া কিছু নয় এবং মার্কিন চাপেই  
তা' বন্ধ হয়েছে'।

—তাজব ব্যাপার! দেখা যাচ্ছে, ভদ্রলোক খেয়ালখুশীর  
মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন; তবে কি "তামখন্দ চুক্তি"-র কথা

# ছোবল

( গল্প )

শ্রীউমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

—বল হরি—হরি বোল।

পায়রাডাঙ্গার অন্তর-আত্মা কেঁপে উঠল। বন বন জঙ্গল  
ঠেলে অমানিশার অন্ধকারের প্রাস্তর থেকে ভেসে আসা  
বুকফাটা হাহাকার! নিশি মাঝে শব্দযাত্রীরা প্রত্যাবর্তন  
করছে। রক্তরূপ বটুকলালের সাক্ষী স্ত্রী মনোরমা তার  
স্বামী-অপদেবতার কঠিন আবদার মুখ বুঁজে বহুদিন সহ  
ক'রেও শেষ রক্ষা করতে পারলে না। সব বিষ। কোমল  
দেহলতা তুহিন-শীতল হয়ে গেছে। বটুকলালের বস্ত্রমুষ্টি  
শিথিল হয়ে যায়...ধরে রাখতে পারলে না সে।

ভাঙ্গা খই-এর মত ছিটকে পড়ে গঙ্গা। রক্তবর্ণ চোখে  
তাকায় আকাশের দিকে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে  
হৃদয়ের জমাট বাষ্প।—জঙ্গল, পশু! সাজ সজ্জায়, চিকন-  
চাকনে, বহুরূপী!

গঙ্গা শশী ঘরামীর মা-মরা একমাত্র মেয়ে...শিবরাত্রির  
সলতে। শশী মেহনতী শরীর দিয়ে মাথার ঘাম পায়ে  
ফেলে মেয়েকে চটকদার করে তুলতে কোন কার্পণ্য  
করেনি। তার বাঁকা নয়নের বিদ্যায় অনেকেই বুক শেল  
হানে। সে ছিল উত্তাল তরঙ্গময়ী স্রোতস্বিনী যেন!  
ক্ষীণ তটিনী নয়—বতায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় অসাবধানীদের।

সুযোগের সম্ভাবনায় বটুকলাল অধিতীয়। ভবিষ্যতের  
চিত্তার দুর্বলতা তার নেই। বাস্তববাদী সে। নির্ভর।  
শ্রেন দৃষ্টি তার প্রখর। ছোঁ মারা তার স্বভাব। খেচ্ছাচারী  
বটুকলাল! গঙ্গার জোয়ার শুক, নিস্তেজ, নীরব। সহজিয়া  
ঘরের ছলল বটুকলাল। হৃদয়ের ব্যবসারে দেউলিয়া হতে  
সে নারাজ। তাই গঙ্গার প্রাণে সে ভাসে না। দৃঢ় হাতে  
ধরে রাখে সে অচঞ্চল হাল।

ভালবোনার শাস্ত বাকুইএর ডাগর মেয়ে মনোরমা তার  
হাতের হাল চঞ্চল করে তুললো। বটুকলাল মুখ ফেরায়  
উজানে। সহজিয়া ঘর। কই না ঘর বাঁধতে।

গঙ্গা ঘোষে ফোলে। কিন্তু বটুকলালের মতি তখন  
অপরিবর্তনীয়। বটুকলাল তখন মনোরমার গভীরে  
হাবুডুবু খেতে থাকে। গঙ্গা নৈরাশ্রে সরে যায়। ফোড়-  
বেষ বকের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে জমে থাকে...যেন অস্তঃশীলা  
যন্ত্র।

বটুকলালের আর ক'দিন। আজুলের হিগাবে ধরা  
যায়। কাল ভৈরবের তাণ্ডব তার শরীরে বয়ে চলেছে।  
যেন মহাক্রুদ্ধ সে। ধীরে ধীরে আবার জেগে ওঠে  
বটুকলাল। পিরাসী মন তার উদার আকাশের নীচে  
ডানা মেলে আবার উড়তে চায়। একঘোঁষে অন্ধকার  
নির্জন জীবনে তার দম বন্ধ হয়ে আসে।

আমতলার পাশে কেঁট সাহার ছোট চাপাঘরটির মধ্যে  
ভানুমতীর খেল চলতে থাকে। তার শিরা-উপশিরায়  
প্রত্যেক ধমনীতে লাভার প্রস্রবণ...মন যেন চঞ্চল কুয়ঙ্গ।

মনোরমা যেন পলাশ ফুল, তাই এত অনাদর।  
ভালবাসা-সোহাগ তার জীবনে স্বপ্ন বলে মনে হয়। ব্যক্তবে  
মূল্যহীন। অত্যাচারই তার একমাত্র প্রাণ্য। বিমার্ক  
ক্লেশপূর্ণ জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। মোহ-আকর্ষণ সব  
শূন্যতার মাঝে বিলীন হয়ে গেছে।

সহজিয়া ঘরে স্ত্রীর কোন বিশেষ মর্যাদা নেই। স্ত্রী  
সহচরী, সেবা-দাসী। স্বামী বা প্রভুর সেবা যত্নে আত্মাহুতি  
দেবে সে। তাতেই পবন তৃপ্তি তার। এতে স্বামীর মনে  
কোন দাগ কাটে না। তারা প্রজাপতির মত মধু খেয়ে



বৃষ্টির ধোঁয়ার রামধনু উঠেছে আকাশে। এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে তার পরশ। বনগা-হীন মন...কোন বন্ধন বা পিছন টানের আশঙ্কা আর নেই। নির্জন বন-প্রান্তে নদীর ধারে সকলের চোখের আড়ালে চলে সেই পুরাতন অভিসার।

ফুলঝুরি ঝরে মুখ দিয়ে। চারধারে ছিটকে পড়ে সোনার টুকরো। জাহ্নকের সন্মোহন...ভয় হয়ে যায় গঙ্গা। ছাড়া কলসী দোল খেতে থাকে জলের গভীরে। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো মনের কিনারায় টেনে আনে সে।

—কতদিন তোকে দেখিনি গঙ্গা। কিন্তু কি চেহারা হয়েছে তোর।

গঙ্গা বাঁকা চোখে তাকিয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসে। রজন রশ্মি...দেহে যেন আগুন জলে ওঠে।

—হাসছিল হাস। আমি এখন পর।

—আজ তোমার খুব দুঃখ, নয় গো?

—কেন?

—ইদ্রী মারা গেল।

—খ্যৎ! ও দুঃখ-টুখা আমার ধাত্তে নয় না।

—সে জানি গো, জানি। নইলে কি আজ আমার এই দশা হয়।

—সত্যি, তোর কি হয়েছিল রে?

—ব্যামো—বড় ব্যামো। মাঝিই তো ভাল করে তুললো আমাকে।

কথা বলার অবসরে কখন মগাল সাপ পেঁচিয়েছে তাকে। গিলবে শনৈঃ শনৈঃ। ক্ষমতাহীনা হয়ে যায় সে। অশাড় পাথর তার শরীর। নড়তেও ইচ্ছা করে না। কিন্তু হঠাৎ যেন গড়ুরের আবির্ভাবে নাগপাশ যুক্ত হ'তে হয় তাকে।

মঙ্গল মাঝি হঠাৎ এসে অকুস্থলে উপস্থিত হয়। জিজ্ঞাসা করে—তু হেথায়! আর আমি তামাম গেরাম চুঁড়ে মরছি।

—আঃ মর্ মিনসে! কলুর বন্দ কোথাকার, চোখে যেন ঠুলি বাঁধা।

বোবা-দৃষ্টি মঙ্গলের। বুঝতে চেষ্টা করে সে।

মঙ্গলের জন্ম উত্তর প্রদেশে। নৌকার গুণ টানতে

চরে নৌকা গেল আটকে। দড়ি ছিঁড়ে মাঝি হ'ল কুপোকাত! আশ্রয় পেল গঙ্গার বুকে। গঙ্গাও আবার অবলম্বন পেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বটুকলাল ধূমকেতুর মত উদয় হয়। শান্ত নীল আকাশটা গরমে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু মঙ্গল শুধু অভয় নয়, সাহসও জোগায়। বেহস্তের ছবি। বন্ধক বা গচ্ছিত থাকে না এক জায়গায়। পঞ্চ পাণ্ডবের দেশে জন্ম তার। দেশে ছোট ভাই রঘুদার হেপাজতে রয়েছে তার মমুরা। সে নির্বিকার।

আগের কথারই জের টেনে মঙ্গল বলে—তু বল, হাসি কেমনে সম্বাধে, এ সময়ে তু নদীর কিনারে।

—না, নদীর কিনারে হবে না তো—তোরা জল ঘরে বসে বসে মালা গাঁথবে।

—সত্যি, সচ-বাত, এসি ওয়ান্তে তুকে হামারা আচ্ছা লাগ'তা। তু ভারি রসিক আছিল।

—বা—বা—ভাগ্। কি আমার রসিক নাগর রে। ঘরে বা। তোর মমুরা পথ চেয়ে কঁদছে।

—নেহি—নেহি, কভি নেহি। এই মান্ পিয়ার উসকা পছন্দাই নেহি।

—সব মিন্সের এক বোল্। বা—বা, গারে হাত দিস না আমার।

—চলো-চলো, গৌসা মাত করো।

আর উত্তরের অপেক্ষায় না বসে থেকে মঙ্গল টেনে নেয় গঙ্গাকে। দৈত্য-কঠিন তার হাত। গঙ্গার ফোলা ফাঁপা শরীরটা এলিয়ে পড়ে। যেন স্বর্ণলতা। পরাশ্রয়ী, কিন্তু খুশীতে উজ্জল হয়ে ওঠে সে। আজ মঙ্গল তার আদর্শ—তারই সেবা যত্নে সে আজ মঙ্গলময়ী।

আজ আকাশ একবারে ফাঁকা। থাঁ-থাঁ করে গঙ্গার নিভৃত অন্তর। মগাল সাপের বন্ধনের দাগ শরীরে না হোক মনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে আছে। আবেশে চোখ বুঁজে আসে তার। কুহকের বংশীধ্বনি শোনে সে কানে। মন তার আনন্দান করে ওঠে।

জলন্ত আগুন শরীরটা তার লাল গন গনে হয়ে ওঠে। উত্তপ্ত নিখাসে এগিয়ে যায় গঙ্গা। সাপটা আজ খোলা

# পিটুর দাদু

## হিরণ্ময়ী বসু

জানলার ধারে চুপটি করে বসে আছে পিটু। সামনের আকাশটাতে কে যেন এক মুঠো আবার ছড়িয়ে লাল করে দিয়েছে। সেই হোলির সময়ে রুহু, বুলু, মিতা, ময়না, যেমন করে মুঠো ভরে লাল রং ছড়িয়ে দিয়েছিল পিটুর মুখে, মাথায়, জামা, কাপড়ে। তখন পিটু হাঁটতে পারত, ছুটতে পারত, আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের মত হড়োহড়ি করে বেড়াত। কতই বা বয়েস ছিল তখন পিটুর।

ওর মা মণিমালা বলতেন, চার বছরের ছেলে হলে হবে কি? কি দসি়া বাবা! এক দণ্ড স্থির হয়ে বসে না।

কথার যেন খই ফুটেছে। এটা কি, ওটা কি, এটা কেন হল, ওটা কেন হল? এত প্রশ্নের উত্তর দিতে পিটুর বাবা মহিমবাবু ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, তবু বিরক্ত হতেন না।

মণিমালা বলতেন, মারো না একটা চড়! খেটে খুটে ফিরে মানুষ এত কথা বলতে পারে?

মহিম হাসতেন। বলতেন, না-না, কোনদিন ওকে তুমি মেরো না মণি। এই তো বয়েস, সব জানবার চেনবার। এখন ওকে খামিয়ে দিলে যে, বরাবরের জন্ত ও ধেমো যাবে।

কথার মাঝখানেই ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বলত পিটু, 'মা-মণি, বলো না চাঁদমামা কে হয় ঐ ঝাঁকড়া মাথা গাছটার? রোজ রোজ ওর ওপরেই উঠে বসে কেন? আমাদের ছাদে আসে না কেন?'

পিটুকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করে মণিমালা তখন চাঁদের গল্প বলতে শুরু করতেন। মারা তো দূরের কথা, বকতেও ভুলে যেতেন।

একটি মাত্র ছেলে পিটু। তার ওপর দেখতে যেমন ফুটফুটে, তেমনি সুন্দর স্বভাব। কিওয়ারগার্টেন ফার্স্ট-য়ের সেরা ছেলে চার বছরের পিটুবাবু। খেলায় পড়াশুনার সবোত্তম সেরা। সব ভাল ছিল পিটুর, কিন্তু স্বাস্থ্যটা যেন মাঝে মাঝে ওকে হিংসা করে জ্বল করে দিত।

পিটুর পাঁচ বছরের জন্মদিনের কথা ওর মনে পড়ে।

খুব ঘটা করে জন্মদিন হয়েছিল সেবার।

স্কুলের বন্ধু, পাড়ার বন্ধু, আত্মীয় স্বজনরা অনেকেই এসেছিল সেদিন। বসবার ঘরটার উপহারের পাহাড় জমে উঠেছিল। কত ছবির বই, দম দেওয়া ইঞ্জিন, উড়ো জাহাজ, ছবি আর কথা তৈরীর বাক্স, টেবিল ল্যাম্প, কলম আর রকমারি খেলনার ছ-তিনটে টেবিল উপচে উঠল।

পিটুর বন্ধুবা কেউ ছড়া বলল, কেউ গান গাইল। মিতা আর কেয়া ধানের ক্ষেতে রোদ ও ছায়ার গানটার সঙ্গে সুন্দর নেচে দেখাল। সবাই ধরল পিটুকে একটা আবৃত্তি করার জন্ত। পিটুর শরীরটা কেমন যেন খারাপ করছিল, তবু সে একটা চমৎকার আবৃত্তি করল। সবাই পিটুকে খুব আদর করল। তারপর রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে যে ঘর বিদায় নিল।

সেই রাতেই হ'ল পিটুর ভীষণ জ্বর। জ্বরের তাপে আর শরীরে যন্ত্রণায় সে খুব কাতর হয়ে পড়ল। ছোট নরম শরীরটা তার একেবারে কঁকড়ে গেল যেন।

ভোর বেলায় পিটুর বাবা ডাক্তার ডেকে আনলেন। একে একে তিনজন বড় ডাক্তার এলেন। সাতদিন পর্যন্ত ঘুম-মাতুষে টানাটানি চলল। তারপরেও পিটুর তিন মাস ধরে চিকিৎসা হল, কিন্তু কোমর থেকে পায়ের দিকটা তার সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গেল। ডাক্তাররা ভরসা দিলেন, পোলিওতে এমন হয় বটে, কিন্তু রোগী আবার সেরে ওঠে, চলাফেরা করতে পারে। তবে অনেক সময় লাগবে, হয়তো ছ-তিন বছরও লাগতে পারে।

সেই থেকে পিটু যেন কেমন হয়ে গেল। কথায় কথায় হাসি, ছুটোছুটি, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যে বাড়ীটাকে সে মাতিয়ে রাখত, সেই বাড়ীটা যেন একটা নিঝুম পুরী হয়ে গেল। মণিমালা সব কাজ ফেলে পিটুকে গল্প শোনান, ভাল ভাল বই পড়েন, দেশ বিদেশের জ্ঞানী লোকের কথা বলেন।

পিটু চুপটি করে শোনে। ছোট ইঞ্জিচেনারটার ওয়ে শুয়ে বই পড়ে আর জানলার ফাঁক দিয়ে রাস্তা দেখে।



রাস্তার ওপাশে ঝাঁকড়া মাথাওয়া বট গাছের ছায়ায় কত লোক বসে বিশ্রাম করে। কত ভিখারী আর সাধু সন্ন্যাসী এসে ধুনি জ্বলে বসে। পিটু চেয়ে চেয়ে দেখে।

পাড়ার কত লোক পথে যেতে-আসতে ধমকে দাঁড়ায়। জানলার গরাদ ধরে পি র দিকে চেয়ে বলে, কেমন আছিস পিটু এইতো বেশ মোটা হয়েছিস, আর কদিন পরেই ভাল হয়ে যাবি।

পিটুর মুখে হাসির ছায়া পড়ে, কিন্তু হাসি ফোটে না। ও বলে, সত্যি বলছ তোমরা, আমি ভাল হব, আবার হাঁটতে পারব?

সবাই বলে, নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবি, ঠাকুরকে ডাক, ভাল হয়ে যাবি বইকি।

তবু পিটু ভাল হয় না, তিনটে বছর পার হয়ে যায় একই অবস্থায়।

মণিমালাও বলেন, তুমি ঠাকুরকে ডাক পিটু, তিনি সবচেয়ে বড় ডাক্তার। তাঁর মতো ওষুধ কেউ দিতে পারে না। তিনি ইচ্ছা করলেই তুমি সেরে যাবে।

বার বার মায়ের মুখে এই কথা শুনে পিটুর মনেও দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল, নিশ্চয়ই ঠাকুর একদিন আসবেন, আর পিটুর হাত ধরে ওকে দাঁড় করিয়ে দেবেন। সেদিন পিটু আবার ছ-পা ফেলে ছুটবে, ঝাঁপিয়ে পড়বে মায়ের কোলে। মা বলেছেন, বিশ্বাসে মিলায় ভগবান। পিটু তো বিশ্বাস করে, কিন্তু কবে, কবে সেদিন আসবে? ঠাকুর তো কই এলেন না এখনও?

ছ' চোখ ছাপিয়ে জল ঝরে পড়ে তার। আকাশের রং বদলান দেখে পিটু। গাছের পাতা-ঝরা দেখে আর যত ভিখারী আসে তাদের ছোট মুঠো বাড়িয়ে একটা করে পরসাদ দেয়। ওরা আশীর্বাদ করে, ভাল হবে খোকাবাবু, তুমি রাজা হবে।

পিটু কখনও হাসে, কখনও কাঁদে। অভিমানে ওর ছোট্ট বুকটা ফেটে চোচির হয়ে যায়।—কেমন করে রাজা হব? আমি যে পঙ্গু, খোঁড়া, আমার পক্ষীরাজ কই? আমি কেমন করে সিংহাসনে বসব, আমি যে চলতে পারি না।

পিটুর কারা শুনে ছুটে আসেন মণিমালা। পিটুর

ঠাকুর তুমি মুখ তুলে চাও। হে ঠাকুর, তোমার অসাধ্য ত কিছুই নেই। তুমি রাজার রাজা, তুমি ডাক্তারের ডাক্তার, তোমার আশীর্বাদ দাও।

এমনি করেই এগিয়ে চলে পিটুর দিন। তারপর একদিন ভয়ঙ্কর ঝড় উঠল। বৈশাখী বুদ্ধ-পূর্ণিমা ছিল সেদিন। পিটু সেই জানলার বসেছিল। দেখছিল, কালো কালো মেঘের ছোট্টাছুটি, গাছগুলোর মুয়ে মুয়ে পড়া, বিদ্যুতের তীব্র ঝিলিক। দেখছে আর ভাবছে, সবাই ছুটে চলেছে—মেঘ, বাতাস, আলো—কেবল পারে না চলতে পিটু।

বড় বড় কালো চোখে জল ভরে আসে। পিটু এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। হঠাৎ ওর নজরে পড়ল একটা খুরখুরে বুড়ো লাঠিতে ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে এগিয়ে আসছে, কিন্তু ঝড়ে তাকে ঠেলে ঠেলে পেছিয়ে দিচ্ছে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল বুড়োটা ঠিক পিটুর ঘরের জানলা বরাবর এসে, আর কাঁপা গলায় চীৎকার করে উঠল, 'ওরে কে আছিস, বাঁচা।' বুড়ো হাত দুটো যেন কেমন আশ্চর্য ভাবে বাড়িয়ে ধরল পিটুর দিকে।

পিটু কঁদে উঠল, ওগো আমি যে খোঁড়া, তোমার তুলব কি করে? তুমি এসো আমাদের বাড়ীর ভেতরে।

বুড়োটার থোকা থোকা সাদা চুল বাতাসে নড়ছে, হাতের লাঠি ঠকঠক করে কাঁপছে, আর কাঁপা গলায় সে বলছে, 'ধর ধর দাঙ, আমার হাত দুটো চট করে চেপে ধর, নইলে এক্সুপি পড়ে মরে যাব।'

ভীষণ জোরে একটা বাজ পড়ল আর পিটু সব ভুলে। লাফিয়ে উঠে জানলার ভেতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে বুড়ো দাঙর হাত দুটো চেপে ধরল।

বুড়ো ফোকলা দাঁতে মধুর হেসে বলল, আয় দাঙ, আয়, দরজা খুলে আমাকে ভেতরে নিয়ে যা। ছুটে আয়, ঘুরে আয়।'

পিটু আর একটিও কথা না বলে ছুটে গেল সদরের দিকে। পিটুকে ওভাবে ছুটে আসতে দেখে রান্নাঘর থেকে মণিমালাও অবাক হয়ে ছুটলেন ওর পেছনে। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না মণিমালা। সাত বছরের রুগ্ন পঙ্গু পিটুর গায়ে যেন কত শক্তি, কত বল। পেছন ফিরে তাকান না পিটু। নিজের হাতে সদরের

খিল খিল ঝড়ো হাওয়ায় ভেতর রাস্তায় নেমে পড়ল।

# জাগো, জননি জাগো !

শ্রীশশীকশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

জাগো, জননি জাগো !

তোমার আর্ত-সন্তান আজ

ডাকিছে তোমারে মাগো !

চারিদিক ঢাকা নিবিড় আঁধার,

আলোকের বেখা নাই কোন ধার,

মোহ-রাত্রির মাঝে তুমি আজ

জীবন-প্রদীপ জ্বালো !

আঁধার নিখিলে জাগাইরা তোল,

তোমার প্রাণের আলো !

জাগো, জননি জাগো !

তোমার আর্ত-সন্তান আজ

ডাকিছে তোমারে মাগো !

অভাব-দৈন্য-হতাশার মাঝে

ডুবেছে বিশ্ব সারা,

কাদিছে নিঃশ্ব নিপীড়িত যত

সব আনন্দ-হারা !

হৃৎখের মাঝে আনো সান্ত্বনা,

দূর ক'রে দাও বৃকের বেদনা,

তব অম্লান জ্যোতির আভার

দিগন্ত উদ্ভাসো !

অস্তর-মসী মুছে দিয়ে তুমি

মধুর হাসিটি হাসো !

জাগো, জননি জাগো !

তোমার আর্ত-সন্তান আজ

ডাকিছে তোমারে মাগো !

হৃদয়-কমলে রাখো মা তোমার

অভয় চরণ দুটি,

দিগন্ত ভ'রি তোমার প্রকাশ

বিধে উঠুক ফুটি !

অধরা তুমি মা দাও আজ ধরা,

এস সম্মুখে বরাভয়-করা,

অম্বর-নাশিনী স্মৃতি-ধরিতা

বিনাশো অশুভ-প্রাণি,

এস কল্যাণি, বিশ্বজননি,

গুনাও অভয়-বাণী !

জাগো, জননি জাগো !

তোমার আর্ত-সন্তান আজ

ডাকিছে তোমারে মাগো !

( পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেষাংশ )

ডাক দিল পিটু, দাহ—দাহ, এই যে আমি এসেছি, অতল রহস্তে !

তুমি কোথায় ? এসো দাহ, এসো !

কোথায় দাহ ? দাহ কি তবে পিটুর মনের ঠাকুর ?

পিটুর দাহ কি তবে মিশে গেল ঐ ঝড়ো হাওয়ার ? পিটুর

কাতর প্রার্থনা শুনে বুঝি একটি বারের অন্ত ছুটে এসে ওর

হাত ধরে ওকে সচল করে দিয়ে মিশে গেল আকাশের

ঝড় কোথায় ? ঝড় থেমে গেছে । আকাশে আবার

ফুটে উঠেছে স্নিগ্ধ কোমল আলো । পিটুর জীবনেও সব

অন্ধকার কেটে গেছে । আবার আলোর ভরে উঠেছে ওর

সামনের অনাগত দিনগুলো !

সম্পাদক—শ্রীতপনকুমার মিত্র





৪৬শ বর্ষ

কার্তিক, ১৩৭৩

৫ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

ছাত্র সমাজে এ-উচ্ছৃঙ্খলতা কেন ?

সমগ্র ভারত জুড়ে আজ ছাত্র-বিক্ষোভের প্রচণ্ড জোয়ার দেখা দিয়েছে। তুচ্ছ-বৃহৎ যে কোন কারণ উপলক্ষ করে আরম্ভ হয়েছে এই ছাত্র-বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভের পেছনে কতখানি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং কতখানি ভাষা অভাব-অভিযোগ প্রতিকারের দাবি আছে, তা' এখনও পর্যন্ত সঠিক ভাবে বলা সম্ভব নয়। এই ছাত্র-রোষের প্রাবল্যে হতচকিত ভারত-সরকার সমস্তার মূল উৎস সন্ধানের আশায় এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি নিয়োগ করেছেন।

বাইরের উদ্ভানিতেই হোক কিংবা অভাব অভিযোগের প্রতিকারের দাবিতেই হোক, ছাত্র সমাজের এক অংশ

পুলিসের পক্ষে হস্তক্ষেপ ছাড়া উপায় থাকে না। অনেকে বলেন, পুলিশ যদি মাথা ঠাণ্ডা রেখে কর্তব্য পালনে সমর্থ হয়, তবে হয়ত বিক্ষোভের বহিঃ প্রকাশ এতটা তীব্র নাও হতে পারে। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, পারস্পরিক উদ্ভানির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানবতার তুলানোর ওজনে কর্তব্য নির্ধারণ সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অভিযোগ জানানোর উদ্দেশ্যে ছাত্রদের রাস্তায় নেমে আন্দোলন করার নিন্দা করেছেন। তিনি এ-ব্যাপারে পিতামাতা ও অভিভাবক-দের সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন। ছাত্রেরা যখন ঈর্ষিত সংঘের পরোয়া না করে রাস্তায় বেরিয়ে এসে ধ্বংস

বিরোধী। আর উত্তর পক্ষের আভিযোয়র ফলে যে অনর্থ ঘটে, তার ঋণ-প্রতিঘাত সহজে ধামতে চায় না। এই অসহনীয় অবস্থার প্রতিকারের উপায় হচ্ছে পারম্পরিক বোঝাপড়া ও বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন হওয়া।

বাস্তববাদী বলে পরিচিত শ্রীকামরাজ ছাত্র-বিক্ষোভের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকেই অভিব্যক্ত করে বলেছেন যে, ছাত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এবং গণনেতাদের মধ্যে পারম্পরিক বোঝাপড়ার বোগমুক্ত ক্রমেই লিখিত হয়ে আসছে। একে অস্ত্রের উপর দোষারোপ করেই স্বীয় দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করছেন। ফলে অবস্থা ক্রমশই জটিল হয়ে পড়ছে। ছাত্রেরা যখন শান্তিপূর্ণ উপায়ের আশ্রয় না নিয়ে নৈরাজ্য এবং ধ্বংসের উদ্ভূত নেশায় মেতে ওঠে, তখন নিঃসন্দেহে তারা শান্তির বোগ্য। আবার কর্তৃপক্ষও যদি নৈরাজ্য-অর্জরিত ছাত্রদের ন্যায় অজ্ঞাব-অভিবোগের তদন্ত এবং প্রতিকারের ব্যবস্থার গড়িমসি করেন, তবে কর্তব্যচ্যুতির অভিযোগ থেকে তাঁরা রেহাই পেতে পারেন না।

ছাত্র-বিক্ষোভের হৃদয় বধে সঙ্গত কারণ থাকতে পারে। কিন্তু তার জন্ত অধৈর্য হয়ে রাতার নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা মোটেই ছাত্রোচিত কাজ নয়। আবার অনেক

সময় দেখা যায়, ছাত্রদের দাবির যুক্তিবদ্ধা কিছুটা নেহাতই দাবির পর্যায়ভুক্ত। অতীতের ঘটনা থেকে দেখা গেছে, বিক্ষোভের ফলে কিছুটা দাবি আদায় হয়। এই বিক্ষোভের নিকট নতি স্বীকার করে সরকার এক বিপজ্জনক নজির সৃষ্টি করে চলেছেন। এ বিপজ্জনক নজির গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত হানতে উদ্বৃত্ত হয়েছে।

বহুবিধ সমস্যা আজ আমাদের বিরে ধরেছে। ঋণ, নিরাপত্তা, আভ্যন্তরীণ আইন ও শৃঙ্খলা প্রভৃতি বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি আমরা। এই অবস্থায় ছাত্র-সমাজ যদি সমস্যার জরুরার না বাড়িয়ে গঠনমূলক মনোভুক্তি নিয়ে হুর্গত সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়, তবে তাই হবে জাতির অগ্রগতির অপরিহার্য পাথর। এর জন্ত প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সংঘম ও সহায়ত্বের সঙ্গে পারম্পরিক অনুবিধার উপলব্ধি।

ছাত্র-সমাজের আজ এই উপলব্ধির দিন এসেছে যে, কেবলমাত্র দাবি আদায়ই নয়, দায়িত্বের বোঝাও তাদেরই গ্রহণ করতে হবে। জাতির ভবিষ্যৎ হিলাবে তাদের সুনামগরিক রূপে গড়ে উঠতে হবে। নতুবা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভিত্তিমূলে এই ছাত্র-অসন্তোষ কঠিন আঘাত হানবে বলে যথার্থই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

## উত্তরায়ণ

বৈভনাথ যুখোপাধ্যায়

উত্তরের হাওয়া যখন নেমে এল  
সূর্য-ভেজ বাড়ে ধীরে ধীরে.....

উত্তরায়ণ।

তির্থক জীবনে ক্রান্তি বদলের পালা—  
কোথা থেকে কোথা বলা যায় না।

তবু যেমন—

প্রকৃতির গতিতে নিজেকে মানিয়ে নাও  
উত্তরায়ণের গতি।

বসে বসে ভাববার নিবিড় সঙ্কল্প।—

সেদিন আর নেই।

বহুদিন আগের গতি সেই ফসিল

গবেষণার পাজীতারা।

গতিই জীবন, গতিই সংগ্রাম।

বত গতি ভক্ত জয়।

একটি সীমাবদ্ধ জীবনের অনেক কাল।

গতি না থাকলে অসমাপিকা ক্রিয়ার বক্ত

ছর্বোধ্য জিজ্ঞাসা।

ভয়হীন প্রতি পদে নিবেশিত।

এ সবাই জানে—

বোঝে খুব কমই—

তবু কালের গতি-চক্রে এ সত্যটাকে

ভুলে যোজাই আগে উৎসাহ।



## রক্ত জগৎ



সত্যিই রাজবোটক বেম !

# সাতপাঁচ

শ্রীনাথ

কুমিনিয়া সফরের সময় চৈনিক প্রধানমন্ত্রী চু-এন-লাই বলেছেন, কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার জন্য ভিয়েতনামের বদি ধ্বংস হয় তবু ভাল।

—কবির ভাষায়,

“তোরা বে বা’ বলিস ভাই—  
আমার সোনার হরিণ চাই।”

কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা টিকেটে সিনেমার বিজ্ঞাপন দিয়ে আয় বাড়িয়েছেন।

—ভবিষ্যতে চিত্রতারকারদের ছবি থাকলেও আমরা আশ্চর্য হব না।

সংবাদে প্রকাশ, কচ্ছের রণ এলাকার গুপ্তচরের কাজে পাকিস্তান কুকুর ব্যবহার করছে।

—চীনা কুকুর কিনা জানা যায় নি।

দিল্লী চিড়িয়াখানার একজোড়া সোনালী বিড়াল এসেছে।

—স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিধি সংশোধনের পর, সোনালী বিড়ালের আদর বাড়ছে কিনা, দলকেরাই বলতে পারেন।

লোকসভার আগামী অধিবেশনের প্রথম আলোচ্য

বিষয় হবে, বিড়ি ও সিগার কর্মী কল্যাণ সম্পর্কিত বিষয়টি।

—সে-সঙ্গে ধূমপায়ীদের উৎসাহ দান, বিষয়টির অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা জানা যায় নি।

সাপের বিষ রক্তানির উদ্দেশ্যে, ‘স্নেক বাইট মিলিফ সোসাইটি’র উদ্দেশ্যে রায়পুরে শুধু সাপে ভিত্তি এক বাগান স্থাপিত হচ্ছে।

—বাগানে হু-মুখো সাপের টাই হবে কিনা সংবাদে সে কথা বলা হয়নি অবশ্য।

শ্রীরাজাগোপালাচারী চতুর্থ যোজনায় খাগু সমস্তা সমাধানের এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করে বলেছেন, ‘আমাদের ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ইঁহর-কুকুর-কাক প্রভৃতি প্রাণীর মাংস আমাদের খাগু জালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে’।

—খাগুটা ছুঁচো-পাজিদের জন্য কিনা সঠিক জানা যায় নি।

সোভিয়েট দেশে যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতা কমানোর জন্য প্রকাশ্য ভাবে তাদের মস্তক যুগ্মনের ফতোয়া জারীর ফলে যুব উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে।

—জানিনা, “বোল্ রাধা বোল্—” গানের গুঞ্জন পুঝাচ্ছেই তাদের কানে গিয়েছে কিনা।

## মধুমিতাকে

চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

আমার পথের চলার দ্রুত একদা আদরে নাশি,  
অনেক আরাম তুমি অন্তরে দিয়েছিলে ভালবাসি।  
আজি কাছে নেই ভুলেও তোমার মনে যদি স্মৃতি জাগে,  
ভাসে প্রাণপটে সে মধুমামিনী যেমনটি ছিল আগে।

যদি দোলা লাগে বসন্তকালে একেলা নিরালা রাতে,  
অথবা আবার চোখে আসে জল শরতের মিঠে প্রাতে—  
সেরা সঞ্চয় তাহলে মানিব এখনো এ ভাঙা মনে,  
পরিচিতা তুমি ক্রমিও আমার আলাপ তোমার সনে।

লহমার লাগি হঠাৎ কখনো বন্ধুর মেলে দেখা,



# মুহূর্তের জগৎ

## সংস্খতি

আমাদের জনসংখ্যা বাড়তে বাড়তে এখন ৫০ কোটি ছুঁইছুঁই করছে। এই বিরাট সংখ্যক জনসমষ্টি বাস্তবিকই সমস্তার বিষয়। অমূল্য বা উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে অস্বাভাবিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে থাকলে, সেটা দেশের পক্ষে মোটেই কল্যাণকর নয়। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ তথা জন্ম-শাসন আমাদের পাঁচ সাল পরিকল্পনায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে।

জন্ম-শাসনের বহু সনাতন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কিন্তু আমাদের পরিবার-পরিকল্পনায় কার্যসূচী প্রধানতঃ আই-ইউ-সি-ডি বা লুপ পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে রচিত। পদ্ধতিটি কেবল যে সবচেয়ে কার্যকর ও নিরাপদ তাই-ই নয়, যে-দেশে অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর এবং যে দেশে ধর্মীয় কুসংস্কার মানুষের জীবন যাত্রা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে অনেক-খানি প্রভাবিত করে, সে-দেশে জন্ম-শাসনের সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা হিসেবেও এটি স্বীকৃতি লাভ করেছে।

কিন্তু সাম্প্রতিক এক সংবাদে প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবার পরিকল্পনা অভিযান “গুরুতর বিপর্যয়ে”র সন্মুখীন হয়েছে। আগে যেখানে গড়ে প্রতি মাসে ১০ হাজার মহিলাকে ‘লুপ’ দেওয়া হতো, সেখানে এখন ঐ সংখ্যা ৩ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। তার চেয়েও মারাত্মক কথা, যারা ইতিমধ্যেই লুপ নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে শতকরা ১০ জনেরও বেশী লুপ পরিত্যাগের জন্ত পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রগুলিতে ভীড় করছেন। এর ফলে কি ‘লুপ’ প্রয়োগের পদ্ধতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে?

সরকার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, লুপ থেকে ক্যান্সার হয় এই ভ্রান্ত ধারণা থেকেই লোকের মনে লুপ গ্রহণে অনাগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য-সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন যে, এ পর্যন্ত ক্যান্সারের কোন ঘটনা তাঁরা পাননি বটে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে লুপ ততটা কার্যকর হয়নি, কেননা রক্তপাত ইত্যাদি বিভিন্ন

যেখানে লুপ প্রধানতঃ এদের মধ্যেই প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানে লুপ প্রয়োগে যদি রক্তপাত ও অত্যাচার উপসর্গ দেখা দেয়, তাহলে জনসাধারণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। আর এইভাবে আভ্যন্তরীণ ক্ষতি সাধিত হলে তা থেকে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই, একথাও বলা যায় না। গত এক বছরে ১ লক্ষ ৬০ হাজার লুপ প্রয়োগের মধ্যে যদি ১০ শতাংশ ব্যর্থতার সরকারী হিসাবটিই সত্য বলে ধরে নেওয়া যায় তাহলেও এটা কম উদ্বেগজনক নয়।

অত্যাচার দেশে—বিশেষ করে দূর প্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে—‘লুপ’ অভিযান যে রকম ব্যাপক ভাবে সফল হয়েছে, তাতে আমাদের পক্ষে এইভাবে ব্যর্থতা বরণ করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। ‘লুপ’ অভিযানের যদি কোন ক্ষতি থাকে, সেটা প্রতিকার না করেই যদি কার্য-সূচীতে ঢিলে দেওয়া হয়, তাহলে সেটা হবে আরও দুর্ভাগ্যজনক।

\* \* \*

পূর্ব-ভারতে দুর্গাপূজা থেকে শুরু করে, উত্তর ভারতে দশহরা এবং দক্ষিণ ভারতে দেওয়ালি ও গণেশ পূজা আমাদের দেশের প্রধান জাতীয় উৎসব। এ সময়ে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেকেই প্রিয়জনকে পছন্দ মত বসন ভূষণে সাজানোর জন্ত চেষ্টা করে। তার জন্ত সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করতেও তারা কুণ্ঠা বোধ করে না। এ হেল মোক্ষম সময়ে কাপড়ের দর চড়ানো এদেশে একটা রেষায়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত বছর পর্যন্ত দর চড়ানোর মওকা চলছিল বেসরকারী বিভিন্ন পক্ষের—কলগওয়ালার, মহাজনের ও খুচরা ব্যবসায়ীর যড়যন্ত্রে। এবার স্বয়ং কেন্দ্রীয় সরকার ১লা অক্টোবর থেকে “কণ্ট্রোল” কাপড়ের দর চড়ানোর অমুমতি দিয়ে পরোক্ষভাবে এ জালে জড়িয়ে পড়েছেন।

# সত্য প্রচারে ভাষা দাও

শ্রীমতী কলকলতা ঘোষ

আশা দাও প্রভু, আশা দাও,  
সত্য প্রচারে ভাষা দাও,  
না-বলা বাণীর যাতনা হইতে  
এবার আবার ছুটি দাও ।  
মহাসুপ্তির ঘোর ভেঙ্গে দিয়ে  
মহাকাগরণে টেনে নাও,  
আশা দাও প্রভু ভাষা দাও,  
অধিনীর পানে কিরে চাও ।

ধরণীর ব্যথা করো অমৃতব  
নিম্নে এস তব বিত্ত বৈভব,  
মৃত চিত্তে জাগাতে চেতনা  
পুনরাগমন হক ভবে,  
নব রূপে এস নরনারায়ণ  
বুক বিধ অমৃতবে ।

অধর্মের এই ভীষণ প্রাবনে  
গভীর হতাশা বহর পরাগে,  
সকল শক্তি দূর করে দিয়ে  
এস হে ধর্ম সংস্থাপনে ।

কলির প্রভাবে কালো হল ধরা  
ধর্মভীরুরা বেঁচে থেকে যরা  
বজ্রনিদানে শকা হরিয়া  
সাহস জাগাও ভীক মনে,  
হ'ক লাক্ষ্য ওগো দীননাথ  
এ বর ধরার ভব মনে ।  
সারা জগতের হতাশার ব্যথা  
দোলা দেয় প্রভু মনে-প্রাণে ।

পুনরাগমন প্রার্থনা করি  
বেদনা ব্যাকুল কঁদে কঁদে মরি,  
মনে মনে ভব শ্রীচরণ ধরি  
গভীর আঁধারে আলোক নেহারি,  
তুমি বিনা আর কে পারিবে বল  
শান্তি আনিতে বিধে,  
অপার অতুল করুণা বিতরি'  
ধনী করে দাও নিঃশ্রে  
নব রূপায়ণ হক ধরণীর  
ধর্ম রহক শীর্ষে ।

( পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেবাংশ )

করে বলেছেন যে, 'গত দু' বছরের মধ্যে মাত্র তিন দফার রাখে। আবার অল্পদিকে ধাপে ধাপে দর চড়ানোর কন্ট্রোল কাপড়ের দর ৬ থেকে ৮ শতাংশ চড়েছে। সে সুপারিশ করছেন। সর্বোপরি কেন্দ্রীয় সরকারের একজন তুলনায় অল্প সব রকম পণ্যের দর চড়েছে অনেক বেশী।' মন্ত্রী যে এরকম চালোয়া বুদ্ধির দ্বারা কাপড়ের কলওয়ালাদের আরও মুনাফা শিকারের ব্যবস্থা করে দেবেন—সে



# চোখের চকোর

সাধন চৌধুরী

হে তপতী, তোমার দখিনাচলে  
যবে তুমি জেলে দিলে দীর্ঘ দীপাবলি  
রাত্রির পড়ন্ত প্রহরে, সে-জ্যোতি করেছি বরণ আমি  
আমার বিমুক্ত বিরাজে ! হৃদয়ের শলিকলা তুমি  
স্বপ্নের শিখরে এসে ললিত ললাম  
এঁকেছিলে জানি আমি  
শ্রীতির ফাণ্ডা দিয়ে । রপিত এক বিদূর্ণ বিনায়ে  
দেখেছি তোমারে । তোমার সমীহা দোলে—দোলে আজ  
হেমন্তের মধুর হিন্দোলে । অবশেষে  
ধীরে এসে নিরেছ আশ্রয় তুমি  
প্রেরণার পোতাশ্রয়ে । হে তপতী,  
তব তকশিলাতটে  
বল বল জাগে আজ কার কুহরণ ? অপ্রতির অবকাশে  
কার তরে এনেছিলে  
অবলম্ব অমৃত আমন্ত্রণ ?

চেতনার চতুরঙ্গে  
দেখেছি তোমার নক্ষত্র নর্তন ;  
প্রমোদ-প্রবাহে—রূপ রসায়নে  
তোমার মলিনাখানি  
ধীরে ধীরে ডুবেছিল জানি ! বেগার্ত বিদ্রোহে  
পূর্ণাশার পরিপজ হাতে  
নিধুবনে  
বল বল কেন তুমি গিয়েছ গোপনে ?  
যুগির ঘনিমা নিয়ে  
তোমার চোখের চকোর  
কার তরে কেল বল  
আজি অশ্রুণোর  
হালসী হারায় !

## সেতুপায়র

শ্রীভানুদাস মুখোপাধ্যায়

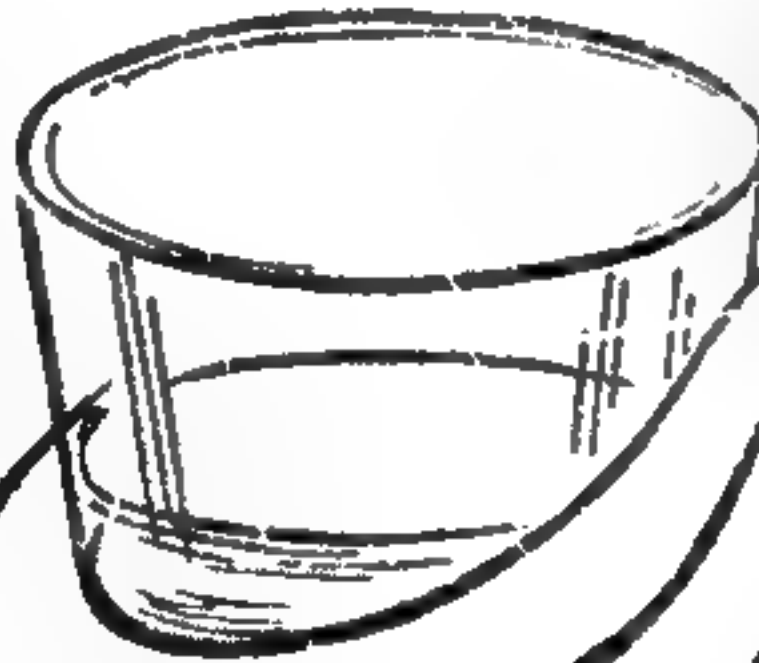
ইংলণ্ডের সমুদ্রে গাভা সে যে গান ধ্বনিত হয়েছিল  
একদিন, কে জানিত সে সজীত গাথা, লবণাধু  
জলোচ্ছ্বাসে পেয়ে ভাষা, ভেসে যাবে পক  
মহাদেশে ! হে মহাকবি, লবাকার ধন হয়ে সাহিত্যের  
শ্রেষ্ঠতম ধনে দিলে আনি' সর্বজন ক'রে অগীর সাধনা ;  
হামলেট আজো আছে, মাতৃ অপরাধের সে  
নিদারুণ ব্যথা আজো তার প্রাণের মাঝে  
তুলিতেছে তীব্র দাহন । ম্যাকবেথ আজো  
নারিকার প্রচণ্ড তাড়নে বীজৎস পাণের  
প্রতি হতেছে উদ্ভথ । ওথেলোর দাম্পত্য

অবিবাহিতা, আগাগোয় হীন চক্রান্ত, ক্রটাসের  
বিশ্বাসহীনতা আজো মর্ত্যজন  
প্রত্যক্ষ করিছে অহরহ ।  
আজ তব বন্দনার তরে আমরা এনেছি শব্দ  
পূর্ব সমুদ্রের তীরে নারিকেল কুঞ্জ মাঝে,  
বহিছে বসন্তানিল, পাণ্ড-অর্ধা  
লয়ে পুরবালা তব প্রতিকার অগ্নান  
কিরণে হয়ে স্নাত, গণিতেছে তোমা আজ  
সর্বশেষ নাট্যকার এ ধরনী মাঝে ।

আহারের পর  
দিনে দু'বার..

দ্রব প্রাণুতে  
প্রাণ্য লীড়ের  
শ্রেষ্ঠ উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান



মহাদ্রাষ্ট্র  
৬ বৎসরের পুরাতন

মৃতসঞ্জিবনী

সাধনা ওষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র  
ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আরুর্কেদ-  
আচার্য, ৩৬, গো মা ল পা ডা  
রোড, কলিকাতা-৩৭



অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,  
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন),  
এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর  
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

৬ ছ' চামচ মৃতসঞ্জিবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-  
দ্রাষ্কারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার  
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-  
দ্রাষ্কারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি,  
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক  
ফলপ্রসূ। মৃতসঞ্জিবনী দুধ ও হজমশক্তি বর্ধক ও  
বলকারক টনিক! ছ'টি ঔষধ একত্র সেবনে  
আপনার দেহের শক্তি ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে  
উৎসাহ ও উদীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ  
স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।



# গল্প বলার গল্প

সুদর্শন চক্রবর্তী

দত্তবাবুই সেদিন জমিয়ে রাখলেন আসরটাকে।

শুরু করলেন তিনি। দত্তবাবু তখন ওয়েজ্‌ লিমিটেডের ইন্সপেক্টর। কি একটা কাজে গিয়েছিলেন মহানন্দপুর শাখা অফিসে তদারক্য করতে। নিয়ন্ত্রণকারী কর্মীর কাজে বেশ কিছু গলদ দেখে যথেষ্ট সন্তর্ক করে দিয়ে এসে যথাযথ রিপোর্ট দাখিল করলেন তিনি। ম্যানেজারের কাছে।

ম্যানেজার সেই রিপোর্ট দেখে দত্তবাবুকে ভৌক প্রশ্ন করলেন, আপনি কি সেখানে ঘুষ চেয়েছিলেন, আর পাননি বলেই কি লোকটিকে যা তা বলে এসেছেন?

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান ইন্সপেক্টর দত্তবাবু। তিনি বললেন, বলেন কি স্যার? আমার জীবনে কখনও আমি ও পথে হাঁটিনি। আর তা পারিনি বলেই না আমি এখনও ইন্সপেক্টর রয়ে গেলাম, আর আমার চেয়ে কম বিশ্বাস লোক সেদিন ঢুকেই আজ অফিসার হয়ে গেল।

ম্যানেজারের বুঝতে দেরি হল না আঘাতটা কোন্ দিক থেকে এল। তাই বললেন তিনি, সাবধান, দত্তবাবু বিপিরিয়াস্! তারপর কলমের মাথাটা দাঁতে চিবিয়ে আবার ম্যানেজার বলতে থাকেন, আপনার নামে এলিগেশন্‌ আছে, আর আমার উপর তার পড়েছে তার এনকোয়ারীর। প্রোপ্রাইটার নিজেকে ডেকে আমাকে এ কথা কন্‌ফিডেন্সিয়ালী বলেছেন। আপনার কি কিছু বলবার আছে এ সংক্ষে?

—কি বলব বলুন, স্যার,—দত্তবাবু কাঁচুমাচু হ'য়ে বললেন, আমি কিছুই জানি না এ সংক্ষে।

—ওঃ, তা হ'লে ধ'রে নিতে পারি আপনার কিছুই বলার নেই, কেমন? খ্যাক ইউ, আপনি এখন আসতে পারেন।

এরপর যা হওয়া সম্ভব, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। দত্তবাবুকে এ চাকরি আর বেশীদিন করতে হ'ল না। চাকরি থেকে বরখাস্তের চিঠিখানা পেয়ে দত্তবাবু দেখা করতে চাইলেন প্রোপ্রাইটারের সঙ্গে। কিন্তু ম্যানেজার দেখা করতে দিলেন না।

বাড়ী ফিরে এলেন দত্তবাবু। কিন্তু একি? সেই কর্মচারীটি এসে জড়িয়ে ধরলো দত্তবাবুকে। কান্দকান্দ করে বলল, আমাকে ক্ষমা করুন স্যার।

এত দুঃখেও দত্তবাবুর এবার হাসি পেল। বললেন, কি হয়েছে?

বলা বাহুল্য লোকটি পরে জানতে পারে যে, দত্তবাবু তার বিরুদ্ধে কোন খারাপ রিপোর্টই দেননি, যথেষ্ট শুধু একটু ব'কেছিলেন দেখানোই। তাই সে বলে, স্যার, আমিই তার করেছিলাম ম্যানেজারবাবুর সম্বন্ধীয় প্ররোচনায়; কারণ তিনিই আমাকে ভয় দেখিয়ে এই ভাবে লিখিয়ে নিলেন, আপনি খারাপ রিপোর্ট দিয়েছেন বলে আমাকে বাঁচাবার আশ্বাস দিয়ে। কি বলব স্যার, ম্যানেজারবাবুর শালা.....তার বিরুদ্ধে গিয়ে এতগুলো পোষা নিয়ে না খেয়ে মরব? তাই এই বিপত্তি!

—ঠিক আছে রায়চরণ, যেতে হবে না তোমায় তাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু কি তার করেছিলে?—বলেন দত্তবাবু অবাক হ'য়ে।

—পাঁচজনের প্ররোচনায় পড়ে লিখেছিলাম স্যার। যখন আপনি আমার বিরুদ্ধে এই সব তথ্যগুলো নিয়ে এলেন, আমি ভাবলাম নিশ্চয়ই কোন খারাপ রিপোর্ট দাখিল করবেন আমার বিরুদ্ধে, কারণ যা করেছি, তা যদি সত্যিই প্রকাশ হয়, তবে নির্ঘাত চাকরি যাবে আমার। তখন এরা আমায় দিয়ে তার করিয়েছে যে, আপনি ঘুষ চেয়েছিলেন, না দিতে পারায় আপনি চটে গিয়েছেন। আপনি যে ওখানে গিয়ে ছ'কাপ চা ও ছ'টো সিগারেট খেয়েছিলেন, আমি ভেবেছিলাম সে দাম আপনি দেননি। কিন্তু পরে আমি খাতায় দেখলাম যে একটি সিকি আপনি রেখে এসেছেন। তা দাম তা হ'য়েছে মাত্র তিন আনা। এত বেশী কেন দিয়েছেন আপনি, তাই বাকীটা ফেরত দিতে এলাম।

—তোমার এ নিষ্ঠা আদর্শ হ'য়ে থাক রায়চরণ। তুমি এসো, তোমার ডিউটির সময় হ'য়ে আসছে।

—হ্যাঁ স্যার, আমি ছেলেপুলে নিয়ে বাস করি স্যার,

আপনি যদি আমার ক্ষমা না করেন সার, আমার সংসারের সর্বনাশ হবে। তাই ছুটে এসেছি আপনার আশীর্বাদের জন্তে।

আরও কত কি বলতে চাইল লোকটি। কিন্তু সব কিছু তার থামিয়ে দিয়ে দত্তবাবু শুধু বললেন অ'ফুট স্বরে, আমি কায়-মন-প্রাণে আশীর্বাদ করছি, তোমাদের মঙ্গল হ'ক রায়চরণ।

এরপরও একমাস কেটে গেছে।

একদিন প্রোপ্রাইটার হঠাৎ ডেকে পাঠালেন দত্তবাবুকে। বললেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত দত্তবাবু যে, ম্যানেজারের সম্বন্ধীকে ঢোকাবার জন্তেই আপনার বিরুদ্ধে এই সব চক্রান্ত। আসলে আপনি যে রায়চরণকে আরও কাজে 'ত্ন নিতে বলেছিলেন, এইতেই হ'য়েছে মারাত্মক ভুলের সৃষ্টি। যাই হ'ক ম্যানেজার যে নিজের স্বার্থ সাধনে এতটা নীচ হ'তে পারে, তা ভাবতেও পারা যায় না। আমি সবই জেনেছি দত্তবাবু, তাই ম্যানেজারবাবুর এলাউন্সও ঢের বেশী বাড়িয়ে দিয়েছি এর শাস্তি স্বরূপ। কারণ, যে কৌশল সে নিজের স্বার্থে লাগিয়েছে, এবার থেকে সেই কৌশল আশাকরি সে কোম্পানীর স্বার্থে নিয়োগ করবে। আর চার্জশিট দিয়েছি রায়চরণকে। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে কোম্পানীর যে নানাপ্রকারে উনত্রিশ টাকা খরচ হয়েছে তার জন্তে তাকেই একমাত্র দায়ী ক'রে। অবশ্য এতেই মেটেনি ঘটনাটা। এরপরও সেন্সর বাজে, তাকে শেষ বারের মত সতর্ক হবার উপদেশ দিয়ে। তবে

চাকরিটা তার নেহাত গেল না তার এই সত্য কথাটা প্রকাশ করার জন্ত, কারণ সে না থাকলে ম্যানেজারের এমন গুণগুলো আমার কাছে অজানাই থেকে যেত।

—অজস্র দত্তবাবু সার আপনাকে,—বলে দত্তবাবু এবার উঠে আসবেন, এমন সময়ে বাধা দিরে আবার প্রোপ্রাইটার বললেন—উঠছেন কি দত্তবাবু, বন্ধন, আসল কথাটাই বলা হল না এখনও, যে জন্তে ডেকেছি।

হাঁ ক'রে চেয়ে আবার দত্তবাবু চেয়ারে বলে ডাকতে লাগলেন, এবার নিশ্চয়ই তার একটা বিশেষ কিছু হিরে হ'য়ে যাবে।

কিন্তু প্রোপ্রাইটার সাহেব হঠাৎ খুবই গভীর হ'য়ে গেলেন। তারপর একটু থেমে বললেন, কি বলব দত্তবাবু, বিজ্ঞেন্স ইন্টারেস্ট ও অফিস ডিসিগ্লিন সবই আমাকে দেখতে হয়। দেখা গেল, ম্যানেজারকে আপনার এই ব্যাপারটা ইন্ডেস্টিগেট করতে মোট খরচ হয়েছে চারশো উনিশ টাকা মাত্র। ওটা আপনার মাইনে থেকে কাটা হয়নি; কারণ, ম্যানেজার ওটা সাবসিডি করতেই বড় বেশী দেরি ক'রে ফেলেছিলেন। অবশ্য আমি জানি, এসব ব্যাপারে আপনি অত্যন্ত পারফেক্ট। তা' এ টাকা দিতে আর দেরি করবেন না মোটেই।

কি বলতে চাইলেন দত্তবাবু। কিন্তু সহসা ব্লাড প্রেসারটা এমনই চাপা হ'য়ে উঠল যে, দত্তবাবু সেখানেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেলেন।

## গান

শ্রীনারায়ণ পাত্র, সাহিত্যমণি

কতো রজনীর বিফল প্রহরে  
জাগার-ক্লান্তি মাখি—  
তোমারে খুঁজিয়া নীরব ব্যথায়  
কৈদেছে ব্যর্থ আখি!

তুমি আসো নাই, রাখো নাই কথা,  
জমেছে হিয়ায় শুধু নীরবতা;  
কেটেছে সময় বাতায়ন 'পরে  
করতল মাথা রাখি!

কতো জীবনের কতো না বেদনা  
এমনি আমারি মতো,  
তব আগমনী আশায় আশায়  
হমেছে বেদনাহত!

তোমার বিরহে আজো কাটে রাত্রি,  
পলে পলে কহে জীবনের আভি,  
এ হৃৎ-রজনী জাধিনা মো' আশ-  
শেষ হতে কতো থাকি!



# সূর্য এখনও ওঠ

( গল্প )

সুধুমার রায়

রাত্তর তখন ১টা বাজে।

খাটের ওপর শুয়ে ম্যাকবেথের কয়েকটা পাতা পড়েছে পলাশ। এমন সময়ে দরজার টক্‌টক করে জোরে টোকা পড়ল। ঠিক টোকা নয়, একরকম ধাক্কা দেওয়ার মতই মনে হ'ল।

বইটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল পলাশ। কে আসতে পারে এত রাতে। ঠিক করে উঠতে পারল না পলাশ। খাট থেকে নেমে দরজার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল—*who's there?*

বাইরে থেকে কোন উত্তর এল না। বইটা টেবিলের উপর রেখে দরজা খুলল পলাশ।—একি ধারা তুমি, এত রাতে। ভয় ভয় হরিণীর মত—মনে হচ্ছে তোমাকে।

কেমন যেন হাঁপাচ্ছিল ধারা। কোন উত্তর না করে পলাশের পাশ কাটিয়ে ঘরে এসে একটা চেয়ারে বসে পড়ল ও। পলাশ ক্যানটা খুলে দিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ওর মুখে চোখে বিষয়ের চিহ্ন। একটু পরে দরজার পাশের চেয়ারে বসে ধারাকে ডাকে, ধারা।

—উ—পলাশের দিকে তাকাল ধারা।

—কি হ'ল এত হাঁপাচ্ছ কেন? যেম্নে যে একেবারে নেমে উঠেছ।

—পলাশ—পলাশ, সর্বনাশ হয়েছে আমার।

—সর্বনাশ!—ব্যগ্রভাষে দরজার দিকে তাকাল পলাশ।

—হ্যাঁ তুমি হয়ত বি—থেকে গেল ধারা।

—ধামলে কেন বল?

—তুমি হয়ত বিশ্বাস করতে পারবে না, কি করে এই পথটুকু এনেছি।—ধামল ধারা। নিজের মনটা আজ ওর কাছে বড় বেশী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সাজান কথাগুলো বলতে গিয়ে বেঁধে যাচ্ছে। মনটা যেন বলছে—এত বড় মিথ্যা কথাটা না বললে কি হত না, বিশেষ করে যাকে সে একান্ত ভাবেই কাছে পেতে চায়। পলাশের দিকে তাকাল ধারা।

—কি ব্যাপার এমন হয়েছে, যার জন্তে মেন ছেড়ে

—প্রবীর আর আভাষ চড়াও হয়ে—ধামল ধারা।

মুখটা নিচু করে একটু নড়ে বসল।

—কি বলছ তুমি।

—কি বিশ্বাস হচ্ছে না, তা হ'লে এত রাতে তোমার এখানে আসব কেন?

—তা বটে।

ওরা নীরব হ'ল। ধারা মেঝের দিকে একই ভাবে চেয়ে নীরবে বসে রইল। পলাশ জানালা দিয়ে মিটমিটে আলো-আসা তারার দিকে চেয়ে রইল। সাময়িক নীরবতার বিষয় মুহূর্তকে ভেঙ্গে দিয়ে প্রশ্ন করে পলাশ—এখন কি করবে তুমি?

—বল?—ছোট্ট উত্তর সমেত প্রশ্ন করল ধারা।

—আমি।

—হ্যাঁ তুমি, তুমি পারবে না পলাশ?—পলাশের হাত ধরল ধারা—তা হ'লে তোমার কাছে ছুটে এসেছি কেন? তুমি ত আমার সব। তুমি এত ভীরা পলাশ, তুমি কাপুরুষ।

—দাঁড়াও একটু চিন্তা করতে দাও।

—না সময় নেই। এত রাতে তোমাকে-আমাকে একবারে এভাবে দেখলে লোকে কি ভাববে বলত।

—তা সত্যি।—কথাটা বেশ যুক্তিবদ্ধ বলে মনে হল পলাশের কাছে।—আচ্ছা—ধামল পলাশ।—আচ্ছা চল তোমাকে রেখে আসি।

—তুমি যাবে পলাশ—*My sweet Palash!*—পলাশের গলাটা জড়িয়ে ধরে ধারা।

হাসে পলাশ—ছোটামি কোর না চল।

—চল।

আগে চলতে থাকে পলাশ পেছনে ধারা। সিঁড়ির মাঝ পথে এসে ঘমকে দাঁড়াল পলাশ। ওকে থামতে দেখে ধারাও ধামল।—কি হল, চল—

—যাচ্ছি,—ওরা কি এতক্ষণ আছে! আচ্ছা, কি নীচ

—তোমার মত মনুষ্যত্বের মূল্য ওরা দেয় না। তাই চাইছে।  
ওদের কিছু করতে বাধে না; চল।

—তা হবে।—আবার পা বাড়াল পলাশ।

কিছু পরে ধারার বাসায় এসে পৌঁছল ওরা। দরজার দিকে তাকিয়ে পলাশ বলে—দরজার শিকল টানা দেখছি, ওরা চলে গেছে নিশ্চয়ই।

—দেখছি ত তাই।

—শিকলটা তুলে দিয়ে কিছুটা ভদ্রতার পরিচয় দিয়ে গেছে।—বলতে বলতে শিকলটা খুলল পলাশ—তুমি এবার যাও ধারা, আমি এখন চলি।

—পলাশ।—সোহাগ জড়ান কণ্ঠে ধারা বলে।

মৃদু হাসল পলাশ।—ভয় পাচ্ছ? আর কিছু হবে না ধারা, তুমি এখন যেতে পার।

—কিন্তু একটু ভেতরে আসবে না তুমি, না আসলে কিন্তু খুব রাগ করব।—চোখের মণি ছোটো নাচিয়ে বলল। যেন নাচছে ভ্রমর-কৃষ্ণ কালো জলে রং বাহারী ছোটো পদ্মকলি।

—রাত বেশী চলে যাচ্ছে না?

—জানি। এত উপকার করলে দয়া করে বাসে কিছুটা তার প্রতিদান দাও।

—বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না ধারা?—বলে ঘরে ঢুকল পলাশ।

—এ সবই ত তোমার জন্তে। তাই একটুও হচ্ছে না। দরজাটা ভেজিয়ে দেয় ধারা।

—কি বাপার, দরজা বন্ধ করছ কেন?

—আমাদের দেখে পাছে লোকে কিছু বলে!—বিছাতের ঝিলিকের মত হেসে ধারা বলল।

—ও, তা' ভাল।—চেয়ারে বসল পলাশ।

—দরজা বন্ধ করলাম দেখে তুমি হয়ত মনে করেছিলে, গুপ্ত কাজ কিছু করব, তাই না?

—ছি, Non-sense-এর মত এমন কথা বল তুমি!

—একে ত আমার Sense নেই তার ওপর 'Non' যোগ করলে!—বলতে বলতে চেয়ারে এসে বসল ধারা।

বেশ কিছুক্ষণ কাটল নানা কথায়। ধারা তার পূর্ব পরিকল্পনামুযায়ী সুরোগ বুঝে হঠাৎ আর্ত চিৎকার করে উঠল। যেন পলাশ জোর করে কিছু অবৈধ কাজ করতে

—ধারা, একি চিৎকার করছ তুমি—ধারা! পলাশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ধারার কাছ থেকে এ ধরনের ব্যবহারের জন্তে আদৌ প্রস্তুত ছিল না পলাশ। ওর মনে হল, এর মূলে গভীর যড়যন্ত্র আছে।

ঘরের দরজা ভেজান ছিল। “কে, কে”—বলতে বলতে উচ্চা বেগে ঘরে ঢুকল প্রবীর আর আভাষ। প্রবীর পলাশের নিকট সরে এসে বলে—একি, পলাশ তুই! ছি ছি, তুই এত নীচে নেমেছিল—তুই না মর্যাদাপিটির দোহাই দিয়ে বেড়াস!

চিৎকার, হই-হউগোলে আকৃষ্ট হয়ে পাশের বাড়ী থেকেও কয়েকজন লোক ছুটে এল। তাদের দেখে আভাষ বলে—দেখেছেন মশাই, একই ক্লাসে আমরা পড়ি। ধারা দেবীকে আমরা বোনের মত দেখি, দেখুন বোনের ওপর ভাইয়ের ব্যবহার! মানুষ যে এত নীচ হতে পারে, আজ স্বচক্ষে তা' দেখলাম।

পাশ থেকে একজন ভদ্রলোক বললেন, ছি ছি মশাই, কি ব্যবহার আপনার! ভদ্রবরের ছেলে বলে মনে হয়, কিন্তু এত নীচ—ইতর—অভদ্র কেন আপনি?

পলাশ তখন কোথায়? একি বাস্তব পৃথিবীর ঘটনা, না অলীক স্বপ্নের মায়াবী কল্পনা! সবচেয়ে আশ্চর্য হল পলাশ ধারার ব্যবহারে। ধারার বিপদে সাহায্য করতে এসে ধারার কাছ থেকে যে কলঙ্কের অস্তিত্ব ঘূণিত বোঝা মাথায় বয়ে নিয়ে যেতে হবে, এ কল্পনাও করেনি পলাশ।—বিশেষ করে থাকে সে ভালবাসে, সেই যে এমন ব্যবহার করবে তা কি করে জানবে পলাশ!

অনেক পরের কথা। প্রায় সবাই চলে গেছে। ঘরে আছে মাত্র তিনজন, অবশ্য পলাশ বাদে। ধারা, প্রবীর আর আভাষ। ধীরে ধীরে এবার মাথা তুলল পলাশ। ওর মাথা তুলতে দেখে প্রবীর আর আভাষ বেশ একটো হাসল। ওদের হাসিতে কান দিল না পলাশ। ও বলতে থাকে, আজ আমার এই অভিজ্ঞতা হ'ল, জগতে বন্ধ আছে প্রচুর, কিন্তু প্রকৃত বন্ধুর যথেষ্ট অভাব আছে। শোন ধারা, তোমাকে আমি ভালবাসতাম, কিন্তু আজ ভালবাসার যে প্রতিদান দিলে চিরকাল তা' মনে থাকবে। কারণ, প্রেমের ক্ষেত্রে এ-ধরনের প্রতিদান এই প্রথম



কিনা! ধারা, তোমাকে আমি—খামল পলাশ। ক্রমাৎ  
দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে আবার বলতে শুরু করে—ভদ্রঘরের  
মেয়ে বলে জানতাম। আজ আমার সঙ্গে যে ভদ্র ব্যবহার  
করলে, অতের সঙ্গে এ ব্যবহার করে নিজের ব্যক্তিত্বকে  
অপমান করে না। তাছাড়া অনেকেই এ ধরনের ভদ্রতার  
সঙ্গে পরিচিত নয়—বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পলাশ।

একি! ধারা যেন একরকম চমকে উঠল। এতবড়  
অজ্ঞানের বিরুদ্ধে একি প্রতিশোধ নিল পলাশ! এর চেয়ে  
যদি অমায়ুষ-ইতর-জানোয়ার বলত, তবে সেটা সহ্য করা  
যেত। পলাশ, তুমি এত বড় এত মহান, অপমানিত  
হয়েও জিতে গেলে! আমি এতটুকু বুঝতে পারিনি, টাকা  
আমাকে পাগল করেছে। তুমি—আমি—

—ধারা দেবী—প্রবীরের ডাকে বাধা পড়ল ধারার  
চিন্তাস্রোতে।—অদ্বুত অভিনয় করলেন—You are  
greatest actress in the world!

ধারা কোন উত্তর করল না।

—এত চিন্তা করছেন কেন? স্বার্থ-সিঁড়ি, প্রতিষ্ঠার  
অন্তে কোন কিছুতেই দুর্বল হলে চলে না ধারা দেবী।  
—এবার আভাষ বলল।

—চুপ!—গর্জে উঠল ধারা—আমি আর গুনতে চাই না  
কিছু।

—অকারণে রাগ করছেন আপনি।

—রাগ করবার কোন কারণই নেই। রাত হয়েছে,  
আমি এবার ঘুমাতে যাব, আপনারা যেতে পারেন।

—Bad luck! আপনি রেগে গেছেন, মানে আপনি  
অস্বাভাবিক হয়ে গেছেন।

—রাগ নয়—আপনাদের প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার করে  
দিয়েছি। আপনাদের ত আর এখানে থাকবার দরকার  
নেই।

—Oh yes! আচ্ছা, Good bye!—বলে ওরা ঘর  
থেকে বেরিয়ে গেল।

—টাকা আনবেন কিন্তু কাল—বলল ধারা।

অন্ধকার রাত্রির বুক চিরে শব্দটা এগিয়ে গেল। উত্তর  
কিছু ফিরে এল না।

ধারা চেয়ারে এসে বসল। ওর মনে পড়ছে, সেদিনের

দিয়েছে, এমন সময় কে যেন বলল—আসতে পারি?

বাইরের দিকে তাকাল ধারা...তারপর কাপড়টা  
গুলিয়ে নিয়ে খাটের ওপর উঠে বসে বলল—আমুন।

ঘরে ঢুকলেন হু'জন আগন্তুক ভদ্রলোক। উঠে দাঁড়াল  
ধারা।

—চিনলাম না ত!—ধারা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

—কলেজে দেখেন নি? আমার নাম প্রবীর চৌধুরী  
আর ও আমার বন্ধু আভাষ দত্ত।

—নমস্কার, বসুন।

—হ্যাঁ এসেছি যখন বসবই ত!—আভাষ এবার কথা  
বলল।

—আগমনের হেতু জানতে পারি কি? অবশ্য বিশেষ  
কোন প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই!

—You are right! আধুনিক কর্মব্যস্ত যুগে  
প্রয়োজন বাতীত আসতে পারি কই!

—আপনি কিন্তু এখনও বসেন নি আভাষবাবু।

—বাস্ত কি ধারা দেবী!

—আমার নাম জানেন না কি!

—নিশ্চয়ই! তা না জানলে আপনার এখানে আসব  
কি করে? আপনার এখানে আরোহণ করবার সিঁড়ি-ই  
ত আপনার নাম!

—তাই বুঝি!—ধারা হাসে।

—বড় বিপদে পড়ে আপনার এখানে এসেছি ধারা  
দেবী!—কোন ভূমিকা না করে আসল কথা শুরু করে  
আভাষ।—কলেজে ভোট ত জানেন?

—কলেজে যখন পড়ি, ওসব জানব না এতে ভাবতে  
পারেন না!

—তা পারি না অবশ্য।

—বিশেষ করে এ-সব রত্ন-বাহারী ছাাবলামি...  
Don't mind—ছাাবলামি, নাটানাচি এসব জানে না  
এমন ছাত্র, বিপরীত ক্রমে ছাত্রী—কলেজে নেই।

—তা ঠিক। যাকগে বা বলছিলাম, আমরা ছাত্র  
ফেডারেশানের পক্ষে দাঁড়িয়েছি। অবশ্য আমি G. S. আর  
ও V.P.-তে—

—বুঝেছি। দয়া করে বিপদটা বলবেন কি—

—তাড়া নয়, তবে আমার দিবানিদ্ৰার ঘোষ আছে একটু। আপনাদের আগমনে তার কিছুটা বিঘ্ন ঘটেছে কিনা তাই।

—কিন্তু দিবানিদ্ৰা শু *Able bodied*-এর জন্তে নয়—  
আভাষ কথা বলল।

—মাইলো খেয়ে সবাই বুড়িয়ে যাচ্ছে—প্রবীর বলল।

হেসে উঠল ধারা। বলল—তা ঠিক মিটার চৌধুরী।

—বিশেষ বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি ধারা  
দেবী। আভাষ বলল।

—বিপদটা কি—

—অভয় দেন যদি বলি।

—আপনাদের মত যুবকদের অভয় দেব আমি! আজ্ঞা  
অভয়ই দিলাম।

—না, অভয় ঠিক নয়, যদি একটু সাহায্য করেন—

—বলুন।

—পলাশকে শু চেনেন?

—চিনি।

—ওর বিরাট Popularity; ও ছাত্র পরিষদের  
পক্ষ থেকে দাঁড়িয়েছে। ওর সঙ্গে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার  
পারছি না।

—সে আপনারা বুঝবেন। আমার ধারা আপনাদের  
কি সাহায্য হতে পারে সেইটা বলুন।

—ওর Popularity আপনাকে নষ্ট করে দিতে হবে।  
চেঁটা করলে নিশ্চয়ই পারবেন আপনি।

—ধন্যবাদ, এবার যেতে পারেন।

—ধারা দেবী—

—আমার ধারা এসব অসম্ভব কাজ সম্ভব নয়। ওর  
Popularity আছে, ও জিতবে। যদি নির্বাচনে জিততে  
চান, আগে Popularity অর্জন করুন। তারপর  
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। Popularity অর্জন করার শক্তি  
কি আপনারদের নেই—

—থাকবে কি করে, এরা অবিকারশই অসৎ! স্বজন-  
পালন নীতি এদের মূলমন্ত্র। ধরুন একজন পরিচিত, সে  
ফি বুক ছাড়াই কলেজ পত্রিকা পাচ্ছে, আর যে অপরিচিত  
সে পাচ্ছে না। তাছাড়া অয়েলিং ব্যতীত এদের কাছ

জিততেই হবে—জিততে গেলে প্রথম কাজ হ'ল পলাশের  
অনপ্রিয়তা খর্ব করা, এবং তা' একমাত্র আপনিই পারেন।

—তাই নাকি! তবে আপনারা ভুল করছেন;  
পলাশের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা শু জানেন।

—শুধু আমরা কেন—প্রবীর বলল—কলেজের সবাই  
জানে।

—তবে, আর একটা কথা, আমি ছাত্র পরিষদে  
বিখ্যাসী।

—এর জন্তে যদি আপনাকে টাকা দি, তা হলেও  
পারবেন না?

—টা—কা।

—হ্যাঁ, টাকা—আভাষ বলল।—দু'শ টাকা পারবেন।

—হু'—শ টাকা।

—হ্যাঁ।

বাড়ী থেকে টাকা পাচ্ছিল না ধারা। বড় টোনাটানি  
যাচ্ছিল ওর! খুব কষ্ট করে কলেজে নিজের টাইল আর  
আভিজাত্য বজায় রেখে চলতে হচ্ছিল। টাকার ওর আজ  
এই যত্নে বড় প্রয়োজন। টাকার গন্ধ পেয়ে দুর্বল হয়ে  
গেল ধারা। ধারার এই দুর্বলতা ওদের দৃষ্টি এড়ায় নি।  
তবুও ও বললে—পারি কিনা দেখলেন না, আগেই টাকা  
দিচ্ছেন।

—আমরা জানি আপনি পারবেন—এই মিন টাকা—  
দু'শ টাকা।—টেবিলের ওপর রাখল প্রবীর।

টাকার দিকে চেয়ে ধারা বলল—কি ভাবে?

—আপনার স্নানতা নষ্ট করেছে, এই অজুহাতে।

জলে উঠল ধারা।—বেরিয়ে যান, যান, যান।—চেয়ার  
ছেড়ে ধারা উঠে দাঁড়াল।

৩০০ টাকা পারবেন আপনি। আর একশ' টাকা  
টেবিলের ওপর রাখল ওরা।

প্রবীর টাকাগুলো তুলে নিয়ে ধারার দিকে বাড়িয়ে  
ধরল—ধরুন

টাকার জাহ্নম্পর্শে দুর্বল হয়ে এই কাজ করেছে, এই  
অভিনয় করেছে ধারা—চিন্তা করতে পারছে না ধারা—  
পলাশের ওপর কি অত্যাচার কাজ করেছে আজ।



ধারার ঘরে বসে। আভাষ বলছে—একটা ভোট পারনি পলাশ। কি কৌশলের ওপর ভিত্তি করে পাশ করলাম দেখলেন, এর নাম Politics, বুঝলেন? এক বছরে হাজার টাকা ইনকাম করতে পারব। এর মধ্যে আবার আপনার তিনশ' টাকা দিতে হ'ল।

কোন উত্তর দিল না ধারা। চিন্তা করছিল, এই নীচ উপায়ে অর্থ উপার্জন না করলে কি হত না!

—ধারা দেবী—

—বলুন?

—বলছি, আপনি যদি এই তিনশ' টাকা না নিতেন, তবে আপনারটা আর আমারটা মিলে এক হাজার টাকা হত।

—কি বলছেন আপনি?

—তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি ধারা—ধারার একটা হাত চেপে ধরল আভাষ।—ধারা I love you—

একটানে হাতটা ছাড়িয়ে নিল ধারা।—বেরিয়ে যান, যান, যান—

—ধারা—উঠে দাঁড়িয়ে ধারাকে ধরবার চেষ্টা করল আভাষ—No shout please, my darling!

চিৎকার করে উঠল ধারা।

কি একটা প্রয়োজনে সেদিন ধারার বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল পলাশ। ধারার চিৎকারে ও থমকে দাঁড়াল।

আবার চিৎকার করে উঠল ধারা।

এক ধাক্কায় দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল পলাশ। ধারা ছুটে এসে পলাশকে জড়িয়ে ধরল—পলাশ, আমাকে বাঁচাও। পলাশ, আমার পলাশ—পলাশের পিঠে মুখ লুকাল ধারা।

সেদিনও কম লোক জমা হয়নি ধারার চিৎকারে।

একজন বললে—দিনে-দুপুরে ডাকাতি!

আর একজন বললে—পুলিস ডাকুন মশাই, পুলিস ডাকুন।

—আপনারা যেতে পারেন; নির্দোষ লোককে দোষ দেওয়া আপনাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।—বলেই ঘরের দরজা বন্ধ করল পলাশ। আভাষ ওদের কাছ থেকে দূরে

জাল, যদি তা নিতুল ভাবে করা যায়। এতে যেমন যশ আছে, তেমনই সম্মান। কিন্তু যদি অভিনয়ের প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়ে যায়, তাতে যেমন ঘৃণা পাওয়া যায়, অভিশাপ পাওয়া যায় ততোধিক। তবে সত্যকে কিছুতেই চাপা দেওয়া যায় না আভাষ।

—Please থামাও আর না—আভাষ এবার মুখ তুলল।

—দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণতা আমাকে এক নীচ করেছে। আমি তোকে দেবেছিলাম কেবল প্রতিযোগী হিসাবে, তোর মহত্বকে দেখতে পাইনি স্বার্থান্ধ বলে। এই মহত্বের আলোকে কমা করিল ভাই, এখন আমাকে যেতে দে—আভাষ মুখ নীচু করে বেরিয়ে গেল।

ধারা বীরবে অস্ত্র দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছিল।

—ধারা!—পলাশ ডাকল।

বীরব প্রত্যুত্তর।

—আমি চলি।

—পলাশ!—সামনে এসে দাঁড়াল ধারা। ওর চোখে জল। বলল, চলি না, বল আসি। তাতে তোমার আবার আসবার প্রতিশ্রুতি পাই। বল—

—আচ্ছা বলজাম।—পলাশ ফলে যাচ্ছিল।

ধারা দরজা বন্ধ করল।

—একি!

—পাপের প্রায়শ্চিত্ত!—টেবিলের ড্রয়ার খুলে টাকা-গুলো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে থাকে ধারা।

ধারা দেয় পলাশ—এ কি করছ?

—চুপ, পাপের প্রায়শ্চিত্ত!—টাকাগুলো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে পলাশের কাছে সরে এল ধারা—একেবারে মুখোমুখি।—পলাশ যা থেকে পাপের উৎপত্তি, তা' থেকে পাপের নিস্পত্তি হয় না।

পলাশ নীরব।

—পলাশ বল না, বল—পলাশের গলা ধরে কানায় ভেঙ্গে পড়ে ধারা।

—হয়, কিন্তু টাকাগুলো কি পাপ থেকে আনল?

—ও কথা শুনেই চেও না পলাশ। প্রবাস বণ তুমি আমাকে ক্ষমা করেছে। Hate the crime, but not the criminal!

# গরমিল

( গর )

শ্রীঅমিল ভট্টাচার্য্য

ক্যামেরার নতুন রীলটা ভরতে ভরতে অশ্রুমনক সুনীল  
ভাবতে লাগল, জ্ঞানদার কোন কিছুই তার কাছে রইল  
না। একটা ছবিও তুলে রাখতে পারত সে, তারও  
সুযোগ হয়নি তার। যা কিছু রইল তার মনে। বাইরে  
তার কিছু পরিচয় পাবে না, পাবে না কোন চিহ্ন।

বেশ কিছুদিন আগে সুনীলের সঙ্গে জ্ঞানদার পরিচয়।  
শ্রী মারা যাবার তিন বছর পরে। ছোটো ছেলের মাঝে  
জীব স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে তার মনে। তবু বত্রিশ বছরের  
সুনীলের মনে অনাথ্রাত-কুসুম জ্ঞানদার যৌবন কি কোন  
সাড়া জাগায় নি?

না। চারিত্রিক শিথিলতা সুনীলের ছিল না। জ্ঞানদার  
আবির্ভাবের পরে তার সঙ্গে অবাধ মেলামেশার মধ্যেও  
কোন আলস-পতনের পরিচয় পাওয়া যায় নি।

বড় ছেলেটাকে প্রথম ভাগ পড়ানোর জন্য জ্ঞানদাকে  
নিযুক্ত করে দিয়েছিল তারই ছোট বোন বিভা।

বিভাই নতুন এসে বাস করা প্রতিবেশিনী জ্ঞানদাকে  
পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল দাদার সঙ্গে।—ইনিই আমার  
দাদা আর এই আমার নতুন বান্ধবী জ্ঞানদা।

নমস্কার বিনিময় হোল।

বসতে বললে সুনীল। জ্ঞানদা সসংকোচে টুলটার  
উপর বসতে বাচ্ছিল। সুনীল একটু হেসে বলেছিল,  
না, না, ওখানে নয়—এখানে—চেয়ারের দিকে ছিল তার  
অঙ্গুলি সংকেত।

বিভা কি কাজে হঠাৎ ঘর ছেড়ে চলে গেল।  
জ্ঞানদাকে সুনীল বললে, ভালই হোল আপনাকে পেয়ে।

ছেলেটার দিকে আমিও ঠিকমত নজর দিতে পারি না।  
যদি বোজ সকালে ঘণ্টা খানেক এসে দেখিয়ে দেন। তা  
আপনার পারিশ্রমিক—

এবার জ্ঞানদা বললে, ওগুলো থাক—

লক্ষ্য করলে সুনীল, জ্ঞানদা বড় বেশী লাজুক।  
কথা বললেও দৃষ্টি তার নিম্নমুখী।

খানিকক্ষণ ছরেনেই চুপচাপ। সুনীল জিজ্ঞেস করলে,  
আপনার কে কে আছে বাড়ীতে?

—দাদার কাছে থাকি। বাবা-মা কেউ নেই।

—ছাখের কথা। লক্ষ্য করল সুনীল, বয়স অল্প  
আঠার উনিশ বছরের কম নয়। বিয়ে দেওয়ার কথা  
হয়ত চিন্তা করেনি তার দাদা। নইলে রূপের সম্পদ কম  
নেই জ্ঞানদার। সহজেই পছন্দ হয়ে যাবে যে কোর  
পাত্রের।

তারপর থেকে জ্ঞানদা এই বাড়ীরই যেন একজন  
হয়ে উঠেছে। বিভা আর সুনীলের মধ্যে সে নিজে  
ডাইবোনের মেহলাত করেছে।

মাঝে মাঝে অশ্রুস্তব করেছে সুনীল, জ্ঞানদার মধ্যে  
কি একটা লুকানো আছে যা সে প্রকাশ করতে পারছে না,  
অথচ তার সমস্ত লজ্জা, নম্রতার মধ্যে বারে বারে সেই বা  
বলা গোপন কথাটাই আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে। এ  
মধ্যে জ্ঞানদার সঙ্গে অনেক আন্তরিক কথাবার্তা হয়েছে  
সুনীলের। মন উজাড় করা কথার কেটে গেছে অনেকগুলি  
অলস সন্ধ্যা তবুও তার মনের গোপন কথাটা জিজ্ঞেস  
করতে পারেনি সুনীল।

( পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেষাংশ )

—করেছি।

—আমাকে বাঁচালে। পলাশ এ-জগতে অলক বন্ধু  
আছে, যারা শুধু বাইরের দিকটা দেখে, অন্তরের দিকটা  
কিছুতেই দেখতে পায় না। তুমিও সেই দলের, এর চেয়ে  
বড় আঘাত আমি কোন দিনই পাইনি।—ছোটো এসে

বিহানার ওপর গুয়ে পড়ে। অশ্রুর বত্মা নাশল ধারার  
চোখে।

পলাশ ধারার চোখের জল মুছে দিতে থাকে বিহানা  
ওপর বসে। এ ছাড়া আর কোন সাহসনার ভাষা শুন  
পায় না ও।



জ্ঞানদা এখন আর শুধু সুনীলের ছেলের গৃহ-শিক্ষিকা নয়, বেন তার বরেরই একজন। বরের কাজে এটা ওটাতে গাহাণ্য করা, মাঝে মাঝে একসঙ্গে হইচই করে সিনেমা দেখতে বা বেড়াতে বেরিয়ে পড়া—এসবও স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

বিভা একবার রসিকতা করে সুনীলের কাছে বলতে যাচ্ছিল, আর কেন, জ্ঞানদাকে ত এবারে ঘরে আনলেই হয়। সুনীল এমন ধমক দিয়েছিল বিভাকে যে, সে আর কথাটি বলতে সাহস করেনি।

বিভাবে ধমক দিয়েই কিন্তু সুনীলের মন থেকে কথাটা মুছে যায় নি। বিভার এই কথার পেছনে যে ইঙ্গিত ছিল তা কি একেবারেই মিথ্যা? অপচ সুনীলের ব্যবহারে এমন কিছু কি প্রকাশ পেয়েছে যা জ্ঞানদার প্রতি তার দুর্বলতাকেই প্রমাণ করে? অন্ততঃ সুনীল লম্পট করে বলতে পারে জ্ঞানদাকে সে নিজের করে পাওয়ার দৃষ্টিতে কোনদিন তাকায় নি।

তবে? হয়তো জ্ঞানদার ব্যবহারেই বিভা এমন কিছু পেয়েছে তার উপর ভিত্তি করে বিভা এমন ইঙ্গিত করতে পেরেছিল।

সুনীল এক একবার সবকিছুর যোগসূত্র রচনা করতে যায় আপন মনে। তার সংসারে জ্ঞানদা! কিন্তু ভোলে যাওয়া সংসারে জ্ঞানদার মত সরলপ্রাণ আর কোমল-হৃদয় একটা তরুণীকে প্রতিষ্ঠা করার পেছনে চরম স্বার্থপরতা ছাড়া আর কি থাকতে পারে?

সেদিন রাত্তায় বেরিয়েছে সুনীল বেড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়েই। হঠাৎ দেখা হয় রবি দত্তের সঙ্গে। এই রবি দত্ত তাকে ভালও বাসে আবার সুখের দিনে জঁঝাও করতে ভোলে না। কোনরকম ভূমিকা না করেই বলল সে, আরে সুনীল, তুমি এত ভাল আর কাজের লোক আগে ত জানতাম না।

সুনীল জিজ্ঞাসা করল, অর্থাৎ?

রবি দত্তের মুখে চাপা হাসি, তাই ত বলছি। মুনি-ঋষির মত তোমার মন। তোমার কথাগুলি বিবেচনা-ভরা, তোমার চালচলন—

বাধা দিয়ে সুনীল বলে, আরে থাম থাম। আমার সম্বন্ধে তোমার এই নবতম আবিষ্কারের হেতু কি জানতে

পারি?

রবি দত্ত বললে, আবিষ্কার আমার নয়, তোমাদের বাড়ীর সেই গৃহ-শিক্ষিকাটির। তোমার বউদির কাছে বলছিল তোমার কথা, সুনীলদাদার মত লোক আর হয় না।

সুনীল এক মুহূর্ত কি বেন ভাবলে। তারপরে হাসি টেনে এনে বললে, ওর মাথায় ছিট আছে মনে হচ্ছে। এই বলে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে গিয়ে বাঁচল। মনে হোল রবি দত্তের মুখখানি তখন পুলকের হাসিতে ভরে উঠেছে।

পরের দিন জ্ঞানদাকে ডেকে সুনীল বলে, আমার সম্বন্ধে প্রচার করার ভার ত তোমাকে দিই নি। রবি দত্তের বউ-এর কাছে তুমি আমার সম্বন্ধে.....

বাধা দিয়ে মুহূর্তে জ্ঞানদা বললে—হ্যাঁ, অনেক কিছু বলেছি। বেশ করেছি। কি করতে চান করুন।

সুনীল আর কিছু বলতে পারে না। খানিক পরে বললে, কিন্তু এর ফলে তাদের মনে কি ধারণা হবে বলতে পারো?

জ্ঞানদা গায়ের কাপড়টা একবার বেন সামলিয়ে নিল। পরে বললে, যা ভাবে ভাবুক গে তারা। আমার আপনার ভাতে কি? আমি যাই এখন, কাজ আছে আমার। বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেল সে।

আর কোন কথা বলার সুযোগ সুনীল পেল না।

আর একদিনের ঘটনা।

কলকাতা থেকে বিকালের ট্রেনে ফিরে এসে হাত-মুখ ধুয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছে। এমন সময়ে বিভা এসে বললে, শুনেছ দাদা, জ্ঞানদার কীর্তি?

—কি হোল আবার?

—মহীতোষবাবুদের সঙ্গে কি ঝগড়াটাই না বাধিয়েছে। ওদের খিটা আমাদের কাছে সব খুলে বলল।

—কিন্তু ব্যাপারটা কি?

—তোমার নামে মহীতোষবাবুর মেয়ে নাকি যা-তা বলেছিল। তাতেই জ্ঞানদা বেশ করে গুনিয়ে দিয়েছে।

—কিন্তু যা তা-টা কি তাই গুনি।

—এই, তুমি নাকি জমিদারী না থাকার পরেও জমিদারী মেজাজ ঠিক রেখেছ। মানুষের সঙ্গে ভাল ভাবে মিশতে জানো না, কথা বলতে জানো না—এই সব। তার

উত্তরে জ্ঞানদা যা মুখে এসেছে তাই বলে দিয়েছে। বলেছে, ওদের মত লোক আর হয় না। তোদের গুটিমুখ সাতজন্য তপস্যা করিস, তবে যদি সুনীলবাবুদের মত হতে পারিস। বলেছে, তোরা জোনাকি, টাদের আলো দেখে তোদের ত হিংসা হবেই। সুদে টাকা খাটিয়ে বড়লোক হয়েছিস, তোরা জমিদারীর মহিমা বুঝবি কি? এইরকম আরো কত কথা।

—জ্ঞানদা বড় বাড়াবাড়ি করছে এখন। ভাল করে সাবধান করে দিতে হবে।

বিভা ছুঁমির হাসি হেসে বললে, দিও তুমিই। আমার দায় পড়েছে।

শেষ পর্যন্ত বাংলায় অনাস' নিয়ে পড়া মেয়ে বিভা বলতে বলতে গেল—তোমারি গরবে গরবিনী হাম, রূপসী তোমারি রূপে।

অবাক হয়ে গেল সুনীল জ্ঞানদার এই ব্যবহারে। এমন করে আপন করে নিতে ঘরের লোকও বুঝি সবসময় পারে না। অথচ এই মেয়েটার সঙ্গে সম্পর্কটাই বা কি?

কিন্তু সেই জ্ঞানদা এমন আকস্মিকভাবে অনেক অপমান অনেক সমালোচনার কেন্দ্রস্থল হয়ে চলে বাবে, একথা শুধু সুনীল কেন, পাড়াপড়শীদেরও কেউ করনা করতে পারে নি।

সুনীলদের পাড়ার একধারে ছিল রাধাশ্রামবাবুদের বাড়ী। রাধাশ্রামবাবু সরকারী পেন্সন ভোগ করছেন। আর তাঁর বড় ছেলে দীপক চাকরি করে খড়াপুরে। মাঝে মাঝে সে এসে হই-হল্লোড করে কয়েকদিন কাটিয়ে যায়। তার নামে চরিত্র-ঘটিত অনেক অপবাদও অনেকের কর্মহীন অবসরের আলোচনায় খোরাক যোগায়। আর ছোট ছেলে সুনীল স্কুলে লেখাপড়া করে।

দীপকের সঙ্গে জ্ঞানদার নাম জড়িয়ে ছ'একটা কথাবার্তা বিভা সুনীলকে সরবরাহ করত। কিন্তু সুনীল বিশ্বাস করত না সে কথা। মেয়েরা যে দৃষ্টিতে মেয়েদের বিচার করে, তার ভাষা জোরাল হলেও কথাগুলো সবসময় যুক্তি-গ্রাহ্য হয় না। তাই অবিবাসের হাসি হেসেই সুনীল প্রসঙ্গ পরিবর্তন করত।

কিন্তু একদিন মধ্যাহ্নে বিভা সুনীলকে বলে, কাল থেকে

তোমার পুত্রের নতুন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করো।

সুনীল বলে, হঠাৎ? কেন? জ্ঞানদার কি হোল?

—তিনি পলাতক, বিভা অচঞ্চল গাভীরে জানায়।

—ব্যাপার কি?

—হেমন কিছুই নয়। দীপকের সঙ্গে তার কর্মস্থলে চলে গিয়েছে। বিয়েটা বোধহয় সেখানেই হবে।

—বিয়ে? জ্ঞানদার? দীপকের সঙ্গে? একসঙ্গে এতগুলো জিজ্ঞাসা আলোড়িত হয় সুনীলের মনে। অফুটে কথাগুলো যেন স্বগতোক্তির মত শোনালো বিভার কানে।

বিভা বললে, ঠিক তাই। আর দীপক ছেলেটিও ত রত্ন। বাপ-মায়ের মতামতের কানাকড়ি মূল্য আছে বলে সে মনে করে না।

সুনীল বলে, তা না হয় না করল। কিন্তু জ্ঞানদা? তার মত মেয়ে শেষ পর্যন্ত দীপককে—হি হি! কথাটা ভাবতেও কেমন লাগছে।

—তা হলেও করবে কি বল। সে ত তোমার খাঁচার পাখী নয়।

সুনীল বলে, তবু যেন ঠিক হিসাবটা মিলছে না। এতদিন ধরে তাকে দেখলাম, বুঝলাম, তথাপি কোথায় যেন গোলমাল থেকেই যাচ্ছে।

বিভা বললে, রক্তের ধারা বলে একটা কথা আছে ত। ওর মা স্বামীকে পরিত্যাগ করে একটা নীচু জাতির ছেলেকে নিয়ে ঘর বেঁধেছিল। জ্ঞানদা সেই মিলনের সন্তান।

সুনীল তবুও যেন বিশ্বাস করতে পারে না। বিজ্ঞানের প্রচণ্ড গতি ভীম-বিক্রমে পুরাতন বিশ্বাস আর মতবাদ-গুলোকে গুঁড়িয়ে নিয়ে চলেছে উর্ধ্বলোকে। তবুও যেন সেই পুরাতন সংস্কারটাই আমাদের মনের যুক্তির দরজার পাহারা দিতে বসে আছে।

সুনীল তবু বলে ওঠে—যাক জ্ঞানদা। ওরা সুখী হোক। দীপকের বাধনহারা মন আশ্রয় খুঁজে পাক জ্ঞানদার মধ্যে।

জ্ঞানদা পেছনে ফেলে গেল না কিছুই—যা কিছু তার রইল সব ভবিষ্যতের মধ্যে।

# এই মন

( গল্প )

শ্রীঅশোক দত্ত

চৈত্রের ক'টা দিন আজ। এখনো অল্প অল্প শীত আছে। মাঝে মাঝে মেঘের মত কুয়াশা জমা হয়ে আছে। কুম্ভার খুব খারাপ লাগে।.....আজকের সকালটাও কেমন ধমধমে। ভিজ ভিজ কুয়াশা চারদিকে। দূরের গাছ-গুলো দেখাই যায় না। সামনের ঘর-বাড়ি, গাছপালা তো আবছা-আবছা, ছায়া-ছায়া চিহ্নের মত।

ছ'টা বেজে গেছে। এখনো কুম্ভাদের পাড়াটা বেন ঘুমিয়ে আছে। বাইরের বারান্ডায় দাঁড়িয়ে দাঁতে ত্রাশ ঘষতে ঘষতে ঘরের ভিতর তাকাল কুম্ভা—সুখাংগু ঘুমচ্ছে। তার পরনে নীল রঙের লুঙ্গিটা হাঁটুর উপর উঠে গেছে। পায়ের কালো কালো পাতলা লোমগুলো সব দেখা যাচ্ছে। ঘুমন্ত সুখাংগুর মুখের দিকে তাকাল কুম্ভা—মুখটা বেন বিবর্ণ, চোখ দুটো কেমন করুণ।

সুখাংগুর মুখের দিক থেকে চোখ সরিয়ে ঘরের দেয়ালের দিকে তাকাল কুম্ভা—ওমা, ঐ আরশোলাটা কোথা থেকে এলো! এইতো সেদিন 'ডাল্ফ' দিয়ে চারদিক ভাল করে স্ট্রে করল ও।

দেয়াল থেকে বাইরে চোখ নিয়ে এলো কুম্ভা। কুয়াশার মেশা এখনো কাটেনি। এখানে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে।.....সুখাংগু তো আটটার আগে কোনোদিন উঠবে না। বাক্বারে বাবা, কি ঘুমটাই না ঘুমোতে পারে সুখাংগু। ঘুম থেকে উঠেই গরম মেজাজে হাঁক দেয়—চা হোল?

কুম্ভা চায়ের পেয়ালা সুখাংগুর সামনে ধরে।

সুখাংগু চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলে—হঁ, এটা আবার চা! এর থেকে তুমার কেবিনে অনেক ভাল চা পাওয়া যায়।

অভিমান হয় কুম্ভার। সুখাংগুর হাত থেকে চায়ের পেয়ালা টেনে নিতে গিয়ে বলে—তুমার কেবিনেই যাও তাহলে।

যায় বিছানায়। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ওঠে সুখাংগু।—এই-এই, দিলে তো বিছানাটার বারোটা বাজিয়ে! তুমি না.....

—আমি কি করলাম, তোমার জন্তেই তো!

হি হি করে হাসে সুখাংগু। বলে—সকাল বেলায় তোমাকে রাগাতে বড়ো ভাল লাগে।

হটাং হটাং করে কিসের যেন শব্দ উঠল। চমকে গেল কুম্ভা। ত্রাশটা হাতে নিয়ে রেলিং-এর উপর বুক ডর দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল—মাল বোখাই একটা স্কুটার এসেছে। কতগুলো বস্তা। কি আছে কে জানে! হিন্দুস্থানী মুটে বস্তাগুলো ঠেলে ঠেলে নামাতে লাগল। হাসি পেল কুম্ভার। পাড়াটা এবারে সজাগ হয়েছে। দোকান খোলার শব্দ—ধুনোর গন্ধ! নতুন দিনকে আমন্ত্রণ জানায় ওরা।.....একটা গরুর গাড়ী হটর হটর করে চলে গেল। কুম্ভা দেখল। কুম্ভা একবুক নিখাস নিল। দূরের দিকে তাকিয়ে দেখল—ভেটারিনারী সার্জন চম্পক রায়ের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। ওদের ঘরটা খুব ভাল লাগে কুম্ভার। ছোট্ট কোয়ার্টার। চারদিক ঘেরা। সামনে অনেকখানি সবুজ লন। ওদের বাড়ি গেলে কুম্ভার বেশ ভাল লাগে। অথচ সূচনা-বোদি বলে—এখানে আবার মাহুস বাস করতে পারে! দেখনা ভাই কুম্ভাদি, এই সামনে ডিস্পেনসারি, ঐ পিছনটায় গরু থাকবার জায়গা। আমার তো দিনরাত গা ঘিনঘিন করে।

সত্যি-ই চম্পককে এই জন্তে খারাপ লাগে কুম্ভার। সেই গরুর পেটের ভিতর হাত চালান করে দেওয়া। তার-পর বড়ো বড়ো ইনজেকশানের নল দিয়ে—। ইশ! ম্যাগো ঘেন্না করে! তা' ছাড়া চম্পকের আর সব ভাল। ভাল অভিনেতা ও। সেবার 'ফুধা' বইটার কি সুন্দর অভিনয় করল—জগা না মাধার ভূমিকায়। নামটা ঠিক তার মনে



ভাল লেগেছিল। কৃষ্ণার ইচ্ছে গেছল—ছুটে ছোঁজে উঠে গিয়ে বলে—।

সুধাংশু ঘুমোতে ঘুমোতে ঘৎঘৎ করে কাসলো। কৃষ্ণা দেখল। ওকে আজকাল বড়ো মায়া লাগে কৃষ্ণার। মাঝে মাঝে আবার ভীষণ রাগও হয়। একবার তো—। না-না, সেসব বাজে কথা ছেড়ে দেয় কৃষ্ণা। সুধাংশুর চোখ মুখ বেশ ফোলা ফোলা। রাতে কখন ঘরে এসেছিল—কৃষ্ণা জানতে পারেনি। রাতে ও ডাত খায়নি। এখনো চাপা পড়ে আছে। কৃষ্ণারও খাওয়া হয়নি। ইজিচেয়ারে বসে একটা পত্রিকা পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে গেছিল। এক ঘুমের ভোর। জেগে দেখে—সুধাংশু বিছানার ওয়ে। লাইটটা নেভান হয়নি। সারা রাত ওটা জেগে জেগে পাহারা দিয়েছে।

সুধাংশু পাশ ফিরল। কৃষ্ণার খুব খারাপ লাগছে। দেয়ালের আরশোলার দিকে তাকাল কৃষ্ণা—একটা টিকটিকি আরশোলাটাকে গ্রাস করার জন্তে সন্তর্পণে এগোচ্ছে। কৃষ্ণার মায়া হ'ল। আহা আরশোলাটা.... তবে কি টিকটিকিটাকে....না-না, সে অত্যাচার। একজনের মৃত্যুই তো আর একজনের সুখা নিবৃত্তি করে চলে আসছে আমাদের চলমান জীবনে।

ও দৃশ্য আর দেখতে পারল না কৃষ্ণা। ত্রাশ ঘষতে ঘষতে দূরের দিকে তাকাল। চম্পক রায়ের কথা ভাবল। সে কি এখনো ওঠেনি! না, ওর ঘরেও জীবন-মৃত্যুর রহস্য চলছে? হয়ত একটা গুরু দশদিন যাবৎ প্রসব যন্ত্রণায় জলতে জলতে আজ সব জালা মিটিয়ে নিচ্ছে।.....

সুধাংশু নড়ে উঠল। কৃষ্ণা দেখল, সুধাংশুর মুখ হাসি-খুশি। ঠিক এইরকম মুখ নিয়েই সুধাংশু চম্পকদের বাড়ি বেড়াতে নিয়ে যায় কৃষ্ণাকে। পাঁচটার সুধাংশুর অফিস

ছুটি। ছুটির পর ঘরে এসে চা খেয়ে স্ত্রীকে বলে—চলো, চম্পকদের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসি। মাঝে মাঝে কৃষ্ণাকে একাও যেতে বলে। কৃষ্ণা অভিমানের সুরে বলে—না বাবাঃ, আমি একা যেতে পারব না।

—তবে রোডস্ ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ি যাও।

—তুমি থামবে?—কৃষ্ণা রেগে ওঠে।

—হঁ, এক শর্তে। তোমায় বের হতে হবে ঘর থেকে। বেশ তো একটা ঘণ্টা বাইরে থেকে বেড়িয়ে এসো। তাছাড়া তোমাকে বলব কি? সবই তো জানো।

হ্যাঁ, সব জানে কৃষ্ণা। তবুও সাবধান করে সুধাংশুকে। কিন্তু সুধাংশুকে প্রতিরোধ করতে পারে না। নইলে চম্পকদের ঘরে কৃষ্ণাকে দিয়ে এসে নিজে পালিয়ে আসতে পারে! এইতো সেদিন এমন কাণ্ডটি করেছিল সুধাংশু! কৃষ্ণার অবস্থা ভালই লেগেছিল। ওদের কোয়ার্টারের সামনে সূচনাবোধির লেডিজ সাইকেলে তখন বেশ অনেকগুলি সাইকেলে কাটাল।

ভারপর চা পর্বটা বেশ আনন্দদায়ক ছিল। তারাকে চা দিতে বলে সূচনাবোধি আর কৃষ্ণা বসে গল্প করেছে। এমন সময় চম্পক কাথা থেকে কি একটা শাড়ি পরে ট্রে করে চা নিয়ে ওদের সামনে গিয়ে বলল—মেমসাব, বাদী চা এনেছে।

সূচনাবোধির রোগই হচ্ছে হাসি। এমন হাসি হাসতে পারে—তেনন অত্ন কেউ নয়। হাসতে হাসতে বলল—ওমা, তুমি যে আয়ার কাপড়টা পরে এসেছ! মাগো! বরটার কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত নেই! দেখেছো ভাই কৃষ্ণাদি, এই পাগল বর নিয়ে সংসার চালাতে হয়! সাপে কি বলে তোমাদের ঘোড়ার ডাক্তার!

সত্যি, কি অদ্ভুত চম্পক! শুধু ছোঁজে নয়, ঘরেতেও

**Kirit** ADVERTISING AGENCY  
REPRESENTATIVE OF  
FAMOUS NEWS PAPERS & MAGAZINES  
72, HINDUSTHAN PARK CALCUTTA-29

সুদক্ষ অভিনয়ের পরিচয় দেয় সে। এই জগেই তো আরো ভাল লাগে চম্পককে!

কুয়াশা অনেকটা কেটে গেছে। সূর্য দেখা যাচ্ছে। রাস্তায় লোক চলাচল বেড়েছে। কোলাহলও সেই সঙ্গে। সূর্যের কিছু আলো ঠিকরে এসে পড়েছে কুম্ভার মুখে, কিছু ঘরের ভিতর লুটিয়ে পড়েছে। কুম্ভা দাঁতে ত্রাশ ঘষতে ঘষতে আবার রাস্তার দিকে তাকাল—ও কে, চম্পক না! চম্পক কি তাহলে সতি আসছে?

ত্রাশটা তাড়াতাড়ি ফেলে রেখে মুখ ধুয়ে নিল কুম্ভা। তারপর ওপর থেকে নীচে নেমে এসে কপাটে খিল লাগিয়ে দিল। আবার ওপরে উঠে গিয়ে সুখাংসুর ঘরে ঢুকে গিয়ে দরজায় খিল ঝুঁটে, পিঠ ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। ভয়ে বুক টিপটিপ করছে।

বুকের ভেতর থেকে কিসের যেন একটা শব্দ খসখস করে উঠল।—ও কালকের সেই চিঠিটা!...না-না, অসম্ভব! চম্পককে কি তার প্রয়োজন? হোক তার ঘামী মা ভাল, ঢুকলেই বা ঘরে মাঝ রাত্তি! ব্লাউজের ভিতর থেকে চিঠিটা বার করল কুম্ভা। দেশলাই জ্বালাল। চিঠিটা পুড়তে লাগল। পুড়ে পুড়ে কাল হয়ে গেল। হুমড়ে বেকে গেল কাগজটা।

কুম্ভা ভাবল—হঠাৎ যেন চারদিকের কোলাহল শুক হয়ে গেছে। পৃথিবীটা যেন খুব জোরে ঘুরতে ঘুরতে স্বাভাবিক হয়ে এলো। সুখাংসু বোধহয় এবার উঠবে। হঠাৎ কিসের একটা শব্দ পেয়ে দেহাতের দিকে দৃষ্টি পড়ল কুম্ভার। দেখলো, বাগ দৃষ্টি দিয়ে টিকটিকটা ত্রাকিয়ে আছে, আর আরশোলাটা ডান মেনে বোঁ বোঁ করে ঘুরছে ঘরের ভেতর!

## সচিত্র শিশির

মাসিক পত্রিকা আঘাট, ১৩৭৩ হইতে ৪৬শ বর্ষ, আরম্ভ হইয়াছে। সডাক বার্ষিক মূল্য ৪/- সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য ২।।০। পূজা সংখ্যা বধিতাকারে প্রকাশিত হয় কিন্তু গ্রাহকদের বধিত মূল্য দিতে হয় না। আঘাট হইতে গ্রাহক হইতে পারেন। গ্রাহক-মূল্য মনি-অর্ডারে পাঠানই শ্রেয়, কারণ, ভি-পিতে লইতে হইলে ৬০ পরমা অতিরিক্ত খরচ পড়ে। নমুনা-সংখ্যা পাইতে হইলে ৩০ পরমা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইবেন।

শিশিরে গল্প রচনাদি যে কেহ পাঠাইতে পারেন, ছাপাইবার যোগ্য হইলে ছাপা হয়। অনেক সময়ে মনোনীত রচনাও স্থানান্তরের জন্ত বিলম্বে ছাপা হয়। শিশিরের জন্ত প্রেরিত রচনাগুলির নকল রাখিয়া পাঠাইবেন।

শিশির কার্যালয়

২২।১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।

# বৈদ্য মলম



দাদ, হাজা, খোস, পাঁচড়া, চুলকানি, ফোড়া, ঘামাচি, পোকার কামড়, ও একজিমার অব্যর্থ, মলম।

কাপড়ে দাগ লাগেনা, বেদনা নাশক ও সিঞ্চকর

ফোন-৩৪-৫১০১

পোল এজেন্ট মাধব এণ্ড কোং জোড়াসাঁকো, কলি-৭

# বিলাস

( গল্প )

অ. কু. বি.

বহর তিনেক আগের ঘটনা।

নমস্কার।

তখন আমি থাকতাম দক্ষিণে। লক্ষীকান্তপুর লাইনে। ঐ অঞ্চলে যারা বাস করত তাদের উপর আমার আধিপত্য ছিল যথেষ্ট। তাদের সবাইকে ধর্মীয় পর্যায়ে ফেলা যেত। এমন কোন লোক ছিল না, যার অন্ততঃ পাঁচ বিঘে ধানের জমি নেই। টাকা-পয়সা যেমন ছিল, তেমন ছিল চোর-ডাকাতির উপদ্রব। অজ্ঞান মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত—এই দীর্ঘ দিম কটির মধ্যে এমন কোন রাত ছিল না যে রাতে কোথাও না কোথাও ডাকাতি হ'ত না। তা সে ছোট রকম ডাকাতিই হোক বা বড় রকমেরই হোক।

ঠিক এমনি এক শীতকালের একদিন বিকেলে গিয়ে-ছিলাম মথুরাপুরে—একটা ডাকাতির তদন্ত করতে। খবর পেয়েছিলাম সকালে। নানা কাজের ঝামেলার সকালে যাওয়া হয়নি। তদন্ত শেষ করে ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে পোশাক পরিবর্তন ক'রে সবেমাত্র বসেছি, এমন সময় চাকরটা এসে খবর দিল, কোন এক বাবু নাকি অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে। আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বললাম, বলগে যা, আজ আর দেখা হবে না। কাল যেন থানায় দেখা করে।

চাকরটা বলল, বলেছিলাম। কিন্তু তিনি শুনবেন না। ভীষণ দরকার নাকি।

মনের বিরক্তি মনেই চেপে রাখতে হ'ল। বললাম, আসতে বল। দেখি কার কি ভীষণ দরকার।

চাকরটা চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন একজন লোক। বেশবাস দেখে মনে হ'ল বড়-ঘরের ছেলে। ডান হাতের পাঁচ আঙুলের মধ্যে তিন আঙুলে তিনটে দামী পাথরের আংটি। গায়ে দামী গরম কাপড়ের পাঞ্জাবি। তার ওপরে একটা শাল আড়াআড়ি ভাবে ফেলা। বয়স বছর তিরিশের মত।

প্রতি নমস্কার করে বললাম, নমস্কার। বলুন।—একটা চেয়ার এগিয়ে দিলাম। বসার পর বললাম, আপনাকে তো ঠিক.....

—চিনতে পারছেন না, এইতো। তা চিনবেনই বা কি ক'রে? আমি তো এখানে থাকি না। দিনকয়েক হ'ল এসেছি। আবার কাল ভোরেই চলে যাচ্ছি। একটা দরকারে আপনার কাছে এসেছি।

—দরকার ছাড়া কেউ আমার কাছে আসে না। বলুন, আপনার কি দরকার।

—না, মানে দরকার ঠিক নয়। দরকার নয় তাই বা বলি কি করে? মানে—

—আপনার বক্তব্য আপনি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন। তাতে আমার ঝাড়া যদি কোন উপকার হয়—সেটুকু উপকার আপনি পাবেন।

—সে আমি জানি। আর জানি বলেই আপনার কাছে এসেছি।—বলে কিছুক্ষণ ধরে কি যেন ভাবলেন ভদ্রলোক। তারপর হঠাৎ এমন এক প্রশ্ন করলেন, যার জন্তে আমি তৈরী ছিলাম না। বললেন, আচ্ছা, আপনি ত গল্প লেখেন, না?

আকাশ থেকে পড়লাম আমি। বললাম, কি বলছেন আপনি?

মৃদু হেসে ভদ্রলোক বললেন, ঠিকই বলছি। আমি জানি, আপনি গল্প লেখেন। আপনার অনেকগুলো গল্প আমি পড়েছি। তাছাড়া.....

বাধা দিয়ে বললাম, দেখুন, গল্প আমি লিখি না। আমার চাকরি-জীবনে ছ'একটা এমন ধরনের ঘটনার সন্মুখীন হয়েছি, যেগুলো আমার কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হ'য়েছে—কেবলমাত্র সেইগুলিই ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করি।

—ঐ একই ব্যাপার। আজ আপনাকে আমি একটা

কিছুক্ষণ আমার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে, বললেন। যদি প্রাণের দয়া করে যেটুকু



জনসাধারণের সামনে তুলে ধরবেন।

একে ত শীতের রাত। তার ওপর কথার কথার বাড়ির কাঁটা আটটার বর ছুঁইছুঁই করছে। এত রাতে এই জ্বালাতন সহ্য হচ্ছিল না। তবুও উদ্ভ্রতা বজায় রেখে বললাম, কিছু যদি মনে না করেন, তবে একটা কথা বলি।

—না-না, মনে করার কি আছে? নিশ্চয়ই বলবেন।

—দেখুন, আমি এইমাত্র মথুরাপুর থেকে ফিরছি। ভীষণ ক্লান্ত আমি। আপনার কাহিনীটা কাল শুনে লেবে না?

—এত রাতে আপনাকে জ্বালাতন করার জন্তে আমিও হুঃখিত। কিন্তু উপায় নেই আমার। আপনাকে আমি আগেই বলেছি যে, আমি কাল ভোরেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। হয়ত আর কোনদিনই এখানে আসব না। তাই Please, একটু ধৈর্য ধরে শুনুন।

—বেশ, বলুন আপনার কাহিনী। তার আগে একটা ছোট প্রশ্ন করি। কিছুকণ আগে বললেন, আপনি কাহিনীটাকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে চান। কিন্তু কি লাভ তাতে আপনার?

—লাভ বিশেষ কিছু নয়। আমি চাই কাহিনীটা বিশেষ একজন লোকের চোখে পড়ুক। জানিনা সে উদ্দেশ্য সফল হবে কিনা। ও কথা থাক। যা বলছিলাম—আমার কাহিনী বাদে নিয়ে, তাদের নাম আমি এখন বলব না।

কণিকের বিরতি।

তারপর বার দুই কেশে নিয়ে উদ্ভ্রলোক আরম্ভ করলেন, আমার কাহিনীর সময়—এখন থেকে এক বছর আগে। কিন্তু তার আগের ইতিহাস একটু জেনে নেওয়া দরকার।

এখানকার 'রায়' বংশের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। এই কাহিনী সেই 'রায়' বংশের শেষ বংশধরকে নিয়ে। ধরে নেওয়া যাক তার নাম দিবানাথ রায়। যদিও এটা তার আসল নাম নয়। লেখাপড়া সে বেশীদূর করেনি। ওসব তার ভাল লাগত না। অর্থের অভাব সে কোনদিন অনুভব করেনি, তাই তার পেছনে চাটুকারেরও অভাব ছিল না। সত্যি তার বাদে বলা যায়। কিন্তু তারা

সবাই সুখের দিনের। দুঃখের দিনের কেউ নয়। ওসব ব্যাপারে মাথা ঘামান দরকার মনে করেনি দিবানাথ। ফলে বা হবার তাই হ'ল। দিনে দিনে অবনতির শেষ সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল সে। ছেলের উচ্ছ্রাণতা লক্ষ্য করেই বোধ হয় দিবানাথের বাবা তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। অমত করেনি দিবানাথ। বাবার পছন্দ করা পাত্রীকে বিয়ে করেছিল সে। কিন্তু রায় বংশের পূর্বপুরুষরা কেউই একজন মাত্র অগ্নিসাক্ষীকরা স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারত না। লোক দেখান একটি করে স্ত্রী সবারই ছিল। কিন্তু তাদের ঘরে বহু নারীর গোপন অভিনয় চলত। তারা আসত রাতের অন্ধকারে আবার ভোর হবার আগেই চলে যেত। যাওয়ার সময় বহন করে নিয়ে যেত 'রায় বংশের' কলঙ্কে—বাদের জন্য হ'ত কোন এক অশুভ মুহূর্তে। কিন্তু পৃথিবীর আলো তারা কেউই দেখতে পেত না। সে সম্ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করা হত তখনই, বখনই তাদের অস্তিত্ব ধরা পড়ত। এসব ব্যাপার এ



অঞ্চলের প্রতিটি লোক জানে। কিন্তু কেউ কোন আপত্তি করে না। যে করে, তারপর দিন থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না। চার-পাঁচদিন পরে হয়ত শোনা যেত, নদীর ধারে মাটির তলা থেকে শেয়ালে একটা অজানা মৃতদেহ টেনে তুলেছে।

সেই পূর্বপুরুষের রক্ত বইছে দিবানাথের প্রতি শির-উপশিরায়। তাই সেও পারেনি একটি মাত্র স্ত্রী নিয়ে মগুঠি থাকতে। দিবানাথের স্ত্রী এসব সহ করতে পারত না। প্রথম থেকেই আপত্তি তুলেছিল। কিন্তু দিবানাথ গায়ে মাথেনি। কারণ, ওরকম আপত্তি প্রথম প্রথম সবাই তোলে। তারপর ঠিক হ'য়ে যায়। দিবানাথ ভেবেছিল, রায় বংশের আর পাঁচটা স্ত্রীর মত সেও একজন। এই ভাবটাই তার হয়েছিল মগু ভুল। বুঝতে পারেনি তাদের সঙ্গে এর একটু তফাত আছে।

প্রথম প্রথম সে দিবানাথকে ঐ পিচ্ছিল পথ থেকে সরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিল। কোন ফল হয়নি তাতে। তারপর একদিন সোজা গাজ বনে বসল, তুমি আর কাউকে এ বাড়িতে আনতে পারবে না।

হেসে বলেছিল দিবানাথ, কেন?

—কেন আবার কি?

—হুকুম না কি?

—যদি বালি, হ'্যা।

—তাহলে বলব, সে হুকুম মানতে পারলাম না বলে আমি ছাখত।

সেদিনও দিবানাথ একই ভুল করেছিল। গুরুত্ব দেয়নি সে কথায়। হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

—একটু দাঁড়ান।—চেয়ার ছেড়ে আমিলাফিয়ে উঠলাম। ছুটে গিয়ে টেনে আনলাম পুরোনো চিঠির একটা বাঁগল। টেনে বার করলাম একটা চিঠি তার থেকে। চিঠিটা খুলে বললাম, আমি পড়ছি আপনি শুনুন।

আমার ব্যবহারে ভদ্রলোক হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি শুনব? কার চিঠি?

—হ্যাঁ আপনি শুনবেন। আর চিঠিটা আমার। শুনুন তাহলে।—ভদ্রলোককে আর কোন প্রশ্ন করতে না দিয়ে আমি পড়তে আরম্ভ করলাম সম্বোধনহীন সেই চিঠি।—

—আমাকে আপনি চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। চিনি বললে ভুল হবে—খুব ভালভাবে চিনি। আমাকে না চিনলেও আমার স্বামীকে আপনি চেনেন। না চিনলেও তাঁর নামটা অন্ততঃ শুনেছেন। তাঁর নাম সত্যরঞ্জন রায়।

কেন আমি আপনাকে এই চিঠি লিখছি, এবার তাই বলি। আমার স্বামী চরিত্রহীন, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্তে এমন কোন কাজ নেই, যা তিনি করেন না। বহু নটীরও আগমন হয় তাঁর ঘরে। আমি এসব পছন্দ করি না। কিন্তু আমার স্বামী আমার কথা শোনেন না। আমি জানি আমার স্বামী এবং তাঁর বিলাস সঙ্গিনীরা সবাই পানাসক্ত। আজ সেই সুরা পানীয়ের সঙ্গে মিশিয়ে রেখে এলাম বিষ। হয় আমার স্বামীকে নয় তাঁর বিলাস সঙ্গিনীকে এর ফল ভোগ করতেই হবে। কাল আপনাকে এখানে আসতে হবে। যদি আমার স্বামী অগত্যা বেঁচে যান, তবে তাঁর ওপর যাতে কোন মিথ্যা দোষারোপ না পড়ে, তার জন্তে এই চিঠি লিখে রেখে গেলাম। আমাকে আপনি পাবেন না। আজ রাতেই আমি চলে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি জানি না। তবে যেতে যে আমাকে হবেই সেটুকু জানি। সেদিনই আমি ফিরব যেদিন জানতে পারব আমার স্বামী ভাল হয়ে গেছেন। অবশ্য যদি তিনি বেঁচে থাকেন।

ইতি—

প্রমীলা রায়

চিঠিটা শেষ করে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। দেখলাম, তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, আমি চললাম। আচ্ছা, নমস্কার।

—কিন্তু আপনার কাহিনীর অর্ধেক তো এখনও বাকী আছে।

—না নেই। যা বলেছি তার সঙ্গে আপনার চিঠিটা জুড়ে দেবেন। তা হলেই হবে। যাবার আগে শুধু বলে যাই, আমিই সত্যরঞ্জন রায়। প্রমীলা রায় আমারই স্ত্রী। আপনার কাহিনীর শেষে লিখে দেবেন, আমি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছি। তার ফেরার অপেক্ষায় আমি চিরদিন বসে থাকব।





৪৬শ বর্ষ

অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩

৬ষ্ঠ সংখ্যা

## সম্পাদকীয়

### নন্দজীকে বিদায় নিতে হ'ল

এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জলজারিলাল নদকে মন্ত্রিত্বের তখত ই-তাউগ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হল। নন্দজী কেন্দ্রীয় কেবিনেটের একজন ছোমরাচোমরা ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি হু'বার অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী ও গত যোল বছর ধরে মন্ত্রিত্ব করার হু'ল্ড সোভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন।

গো-হত্যা বন্ধের দাবিতে ত্রিশূল ও বর্শাধারী সাধুরা ও গো-মাতার ধ্বজাধারী অ-সাধুরা দিল্লীর পার্লামেন্ট ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শনের নামে যে হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তার ফলে সাতটি মানুষের প্রাণহানি হয়েছে, কয়েক শত মানুষ জখম হয়েছে আর প্রচুর ধন-সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে। পরে কংগ্রেস সংসদীয় দলে সকলে নন্দজীর পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং নেহাতই

নিমিত্তের ভাগীদার হয়ে নন্দজীকে কেন্দ্রীয় কেবিনেট থেকে বিদায় নিতে হল।

রাজধানীতে শান্তি রক্ষায় ব্যর্থতা হোম মিনিষ্টারের চরম ব্যর্থতা, সন্দেহ নেই। তা' ছাড়া ভারতের সর্বত্রই আজ আইন ও শৃঙ্খলার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কিন্তু গো-রক্ষা আন্দোলন দমনে নন্দজীর ব্যর্থতাকে যতটা বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছে, তাঁর পদত্যাগ বা মন্ত্রিসভা থেকে বিতাড়নের সঙ্গে তার কোনো বিশেষ সম্পর্ক আছে বললে পুরো সত্য বলা হয় না। কারণ রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের এই বিষয়কর ও অবৈজ্ঞানিক আন্দোলনের পিছনে আরও বহু শক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে এসে জড়ো হয়েছে। নন্দজীর পদত্যাগের সঙ্গে নীতির প্রশ্নের চেয়ে রাজনীতির নেপথ্য ক্রিয়াই বেশি জড়িত ছিল, একথা বললে বোধহয়



ভুল বলা হবে না।

নন্দজীর পদত্যাগে শাসক মহলের একাংশে উল্লাস দেখা দিলেও, শাসক পার্টির এই আভ্যন্তর রাজনীতির খেলায় বিরোধী দল মোটেই অস্তিত্ব বোধ করছেন না। পদত্যাগের পর নন্দজী প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি চিঠিতে তাঁর দপ্তরের সিভিলিয়ান সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে অসংযোগিতা এবং তাঁর নিজের দলের একাংশের প্রতিকূল আচরণ সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করে গোটা ব্যাপারটাকে একটা জেহাদের রূপ দিয়েছেন।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় নন্দজীর পদত্যাগের স্বপক্ষে যে সমস্ত বক্তৃতা দেখিয়েছেন, তা মোটামুটিভাবে আত্মরক্ষামূলক। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে একথা মোটেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি যে, দিল্লীতে গো-রক্ষা আন্দোলনকারীদের উচ্ছৃঙ্খলতা দমনে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ব্যর্থতার জন্য নন্দজীই দায়ী কিংবা এই কারণেই তাঁর পদত্যাগের প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি স্বীকার করেছেন যে, কোনো কোনো বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মিল ছিল না। তিনি যে নন্দজীকে চান না এবং প্রথম দিন থেকেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পদে তাঁকে চাননি, একথা সুবিদিত ছিল। নন্দজীর ভুল হয়েছে এখানেই। গো-রক্ষার কৃত্রিম উৎপাতের আগুনে হাত না পুড়িয়ে তিনি সমস্মানে আগে বিদায় নিলে দলীয় কলহ বাইরে প্রকাশ হ'ত না, নিজেরও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকত।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, নন্দজীর কেন এমন দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হ'ল! এর কারণ একাধিক। এই সব কারণের মধ্যেই নিহিত আছে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের

ব্যর্থতা আর কোটি কোটি মানুষের দুর্দশার ইতিহাস। নন্দজীর মন্ত্রিত্বের হাতে খড়ি হয় বোম্বাইয়ে। সেখান থেকে নেহরুজী তাঁকে নিয়ে আসেন দিল্লীতে। তাই কংগ্রেসের কোনো রাজ্য-সংগঠনেই তাঁর পা রাখার জায়গা নেই, তিনি তাঁর জন্ত কোনো চেষ্টাও করেন নি। তাই শিখর চূড়া থেকে তাঁর এই আকস্মিক পতনে কংগ্রেস সংগঠনের কোনো অংশ তাঁর পিছনে এসে দাঁড়ায় নি। নন্দজী কেন্দ্রীয় কেবিনেটে ছিলেন একটি নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্ব। দলীয় নীতির উদ্বেগে উঠতে চেয়েছিলেন বলে তিনি পেয়েছিলেন প্রতি পদে বাধা। তাঁর সদাচারী জেহাদ তাঁর প্রতি-দ্বন্দ্বীদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি সঙ্কল্প করেছিলেন যে, দু' বছরের মধ্যে ভারত থেকে দুর্নীতি নামক জঁজাল একেবারে খেঁটিয়ে বিদায় করবেন। দুর্নীতির কয়েকটি ছায়ার সঙ্গে তিনি যুদ্ধও করেছিলেন। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি যে, ভারতের উর্বর মাটিতে দুর্নীতির শিকড় বহুদূর অবধি পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে। এটাই তাঁর রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার চরম দৃষ্টান্ত। তাঁর এই সদাচারী মনোবৃত্তির জন্ত স্বভাবতঃই তিনি সিঙিকেটের বিরাগভাজন হয়েছিলেন এবং তাদেরই অনলস প্রচেষ্টায় তাঁর পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

যে দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে নন্দজীকে বিদায় নিতে হল, তা' কারুর কারুর কাছে ব্যক্তিকর বলে মনে হলেও বাস্তবিক পক্ষে তা শোচনীয়। নন্দজীর বিদায়ের মধ্য দিয়ে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কেন্দ্রীয় কেবিনেটে প্রতি-ক্রিয়ালীল কারেমী স্বার্থের প্রাধান্য এখনও অব্যাহত আছে।

## স্বপ্ন-সাদ

মদন দাশ

সকলে তোমাকে দেখে, আমি কেন দেখিনা তোমায়?  
আমার অতল চোখ কত রাতে করেছে বিহার,  
নিফল প্রয়াস মোর—ব্যাকুলিত তোমার ছোঁয়ায়;  
তুমি তো কোথাও নেই ব্যর্থ রাত আশা আকাজকার।

তবুও তুমি আছো এ স্বীকৃতি দিয়েছে পৃথিবী;  
কত রূপে কত সাজে আবিস্কৃত তুমি লো সুন্দরী!  
পলকে মুছিয়ে দাও যত ব্যথা যত দুঃখ-ছবি,—  
হোক সে ক্ষণেক তবু জীবনের আশা ওঠে ভরি'।

তাই অবেষণ করি কোথা তুমি, ছ'চোখে আমার,—

অন্ততঃ আজকের রাতে স্বপ্ন তুমি কর অভিগার।

রঙ্গ জগৎ



তবুও মুখ, তবুও শান্তি, তবু আনন্দ জাগে !

# সাতপাঁচ

শ্রীনাথ

প্রেসিডেন্ট জনসন মেলবোর্নের পথে চলার সময় এক ব্যক্তি লাল ও সবুজ রঙের খলি তাঁর গাড়ীতে ছুঁড়ে মারে। রঙে সমস্ত গাড়ী চিত্রিত হলেও প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পত্নীর গায়ে এক ফোঁটাও রং লাগে নি।.....প্রোঃ জনসন এই ঘটনা নিয়ে পরে রসিকতা করেন।

—রসিক সাগরের গায়ে রঙ না লাগলেও মনে বোধহয় রঙ ধরেছে।

সংবাদে প্রকাশ, উত্তর প্রদেশের কয়েক লক্ষ লোক প্রায় অনাহারে রয়েছে, না হয় শ্রেক ঘাস-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করছে।

—ভবিষ্যতে ঘাস-পাতার কন্ট্রোল হবে না তো?

টোকিওর এক সংবাদ প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব-এর ধারা অমুযায়ী যতদিন না শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত লালচীনের ছাত্রসমাজ লেখাপড়া করবে না।

—ও পাটটা একেবারে চুকিয়ে দিলে কেমন হয়?

ব্রাহ্মের জ্যোতিষীরা, উ খাণ্টের ভাগ্য গণনা করে এক-দল বলেছেন, তিনি পদত্যাগ করলে সরাসরি বাড়ী ফিরে এসে নিজের স্মৃতি কথা লিখতে বসবেন। অবশ্য তিনি যদি তাই করেন, তাহলে তাঁর স্মৃতি কথার বই বেশ ভালই বিক্রি হবে।

—‘করলে’ ‘যদি’—বাদ দিয়ে, আমরা গণনা না করেই বলতে পারি—অন্ততঃ অ-বিক্রি থাকবে না।

শ্রীব্রজেনভ বলেছেন, ভিয়েৎনাম যুদ্ধ অব্যাহত থাকলেও সোভিয়েত-আমেরিকা সম্পর্কের উন্নতি হতে পারে—রাষ্ট্রপতি জনসন এইরকম এক অভূত অঘট এক-ওয়ে মরীচিকাময় স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছেন।

—অপটো দিবানিদ্রা না কপটনিদ্রা শ্রীব্রজেনভ ভেদে দেখেছেন কি?

পুলিসী সূত্রে প্রকাশ, দেশব্যাপী গো-হত্যা নিবারণ আইন প্রণয়নের দাবিতে ২৫৬ জন সাধুকে সংসদ ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

—ভিক্ষার অভাব যে দেশব্যাপী।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে ১৯২৬ সাল থেকে উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ কোর্টে একটি দেওয়ানী মামলা চলছে। এতে ৪২ জন বিচারপতি ও দুই ডজনের বেশী আইনজীবী মামলাটি পরিচালনা করেছেন।—এঁদের মধ্যে স্বর্গত আসফ আলি এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় আইন-মন্ত্রী শ্রীপাঠকের নাম উল্লেখযোগ্য।

—আইনের প্যাঁচে পড়ে বাদী-বিবাদীদের প্রেতাচার। মামলার রায় শোনবার জন্তে কোর্টে ঘোরাফেরা করছে না তো?

গত ১৭।১০.৬৬ তারিখ দৈনিক বসুমতীতে জনৈক পত্রলেখক ‘মায়াবিনী সমবায়িকা’ শীর্ষক চিঠিপত্র শুভে সমবায়িকার কয়েকটি জিনিসের বাজার ছাড়া দরে হত্যা প্রকাশ করেছেন।

—কালবাজারের দৌলতে কে-না ছ-পয়সা কামাচ্ছে মশাই?

চিনখুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমেত আরও আটজন অধ্যাপককে লালরঙা দলের বিচারে প্রতিক্রিয়াশীল বলে সাব্যস্ত করে অধ্যাপকের পদ থেকে অপসারিত করে বাগানের মালীর কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে।

—অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা থেকে বাগানের মালিকানা? লালরঙা জিন্দাবাদ।



# চিরন্তন

সুকুমার মাস্তা

একটি দিনের শেষ—

জীবন-যাত্রার মাঝে মূল্য শুধু গোনা ;

আবার রাতের শুরু—

পথের প্রান্তরে কেন শোনা

কতশত বিদায়ের সুর।

রাতের শিশির পড়ে বড় সুমধুর।

দিন যায় রাত যায়—

পাতা ঝরে কাণ্ডের বন হতে বনে,

একটি হিমেলী মন

দেখা করে শরনে-স্বপনে।

আবার মাঘের শেষে

কখন ধানের ক্ষেতে হাত রেখে রেখে

আমাদের পাতার কুটীরে আশা নামে ;

কিংবা কোন পথে পথে

আমাজান, নীল আর মিসিসিপি তীরে

ঘর ছেড়ে ঘুরিতেছি কবে

রাত আর দিন নাহি থাকে।

পৃথিবীর এই কাজ শেষ হলে তবে

দেওয়া মেওয়া ফুরাতেই হবে,

'রাত-দিন' বাধা হবে বটগাছ, বাবলার ডালে—

একটি হিমেলী হাত একটু ক্ষণের মত

জীবনের অগুতে ছোঁয়ালে।

তখন চিত্রার কাঠ উত্তাপে কাঙা হয়ে হয়ে

পুনাবে তো বার্থ পরিণাম—

সব ভুল থেকে যাবে

কবে থেকে কোথা ছিল ক্ষণিকের ধাম॥

সুলেখা  
ঐতিহ্য

দেশে ও বিদেশে সমান প্রিয়..।

**সুলেখা**

ফাউন্টেন পেন-এর কালি

এই সব রঙে পাওয়া যায় :

ব্লু ব্ল্যাক • রয়াল ব্লু • ব্ল্যাক

রেড • গ্রীন • ভায়োলেট

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ

সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২



# মুহূর্তের জন্তো

## সংক্ষিপ্ত

কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ দপ্তরের খ্যাতি ও কৃতিত্ব সারা ভারতের গৌরবের বস্তু। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের সঙ্গে অনেকে ইউরোপের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডেরও তুলনা করেন। কিন্তু পর পর কয়েকটি অ ঘটন ঘটায় স্বভাবতঃই জনসাধারণের মনে এই প্রশ্ন জেগেছে যে, তবে কি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ দপ্তরের সে গৌরব-রবি অস্তমিত প্রায় না, এর পেছনে অত্ৰ কোন রহস্য আত্মগোপন করে আছে।

পশ্চিমবঙ্গের এক প্রান্ত বেলঘরিয়া, বেলগাছিয়া ও অপর প্রান্ত নিউ আলিপুরে এক শ্রেণী সমাজ-বিরোধী গোষ্ঠীর অবাধ কার্যকলাপের ফলে ঐসব জায়গায় সন্ত্রাস-রাজত্বের সৃষ্টি হয়েছে। যথেষ্ট ভাবে বোমা, বন্দুক ব্যৱহৃত হচ্ছে; আর তার ফলে একের পর এক মানুষের জীবন-হানি ঘটছে। সেখানকার শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, দিনের পর দিন এ ধরনের সমাজ-বিরোধী অ ঘটন সঙ্গে পুলিশ কোন কার্যকরী ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছে। শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের ধন-মান-প্রাণ রক্ষায় যদি পুলিশ ব্যর্থ হয়, সরকারী কর্ম তৎপরতা যদি সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হয়, তাহলে এ কোন্ মনের বলকে আমরা বাস করছি।

রাজনীতির ধূম্রজালে আত্মগোপন করে যদি এই সব সমাজ বিরোধীরা অবাদে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যায়; তাহলে সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা কোথায়? রাজ-নৈতিক আন্দোলন দমনে যতটা পুলিশী ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়, তার সামান্যতম অংশের শক্তিও যদি এই সব সমাজ-বিরোধীদের বিরুদ্ধে কার্যকরীরূপে প্রযুক্ত হ'ত, তাহলে বোধহয় আজ আর এই হুঁত্যাগজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হ'ত না।

সবচেয়ে বেশী ভিড়ের সময় রাস্তায় বের করা হয়। তাঁরা হিসাব খতিয়ে দেখেছেন যে, যত কম সংখ্যক বাস রাস্তায় চালান যায়, তাকে নাকি তাঁদের লোকসানের অঙ্ক কম হয়। অর্থাৎ শহরের বুকে বাস চালান মানেই লোকসানের অঙ্ক স্ফীত করা। অকশান্তের এ এক অদ্ভুত যুক্তি।

পরিবহন যেখানে একটা লাভজনক ব্যবসায়, অব্যবস্থা ও পরিচালন-প্রণালীতে ক্রটির জন্ত সেখানে এটা একটা বিরাট লোকসানের স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাত্রী বহনের একচেটিয়া অধিকার পেয়েও রাষ্ট্রীয় সংস্থা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলেন না। তাই শহরের উপর থেকে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় সংস্থার বাস প্রত্যাহার করে নেওয়ার নীতি স্বীকৃত হয়েছে এবং তার পরিবর্তে বে-সরকারী বাস চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে, শহরতলীর চার পাঁচ শ বাস শহরের সীমানায় যাত্রাভঙ্গ না করে কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত প্রসারিত করা হবে। তার ফলে শহরতলীর বাসে ট্রিপের সংখ্যা কমবে বটে, কিন্তু শহরে যাত্রাভাতেও বেশী যাত্রীরা সীমানায় গাড়ী বদল না করে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত যাত্রায়াত করতে পারবে। ফলে অত্যাধি বাসে ও ট্রামে যাত্রীর চাপ কিছুটা কমবে।

বাসে ও ট্রামে যাত্রী বোঝাইয়ের যে এক অসহনীয় অবস্থা উদ্ভব হয়েছিল, তা থেকে কিছুটা পরিত্রাণ পাওয়া যাবে, এই আশায় জনসাধারণ যথেষ্ট খুশী হয়েছেন। এতদিন সরকারী বাসগুলি টার্মিনাস ছাড়বার পর পাঁচ মিনিট যেতে না যেতে বোঝাই হয়ে যেত এবং বাকী পথের যাত্রীরা জ্বন্ত ভিড়ের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে গাড়ীতে ওঠা-নামা করতে বাধ্য হত। এ ছাড়াও সরকারী পরিবহনের কর্তারা নানা অছিলায় বিভিন্ন দফায় ভাড়া চড়িয়েছেন এবং গাড়ীর সংখ্যা কমিয়ে যাত্রীর ভিড় বাড়িয়েছেন। সরকারী ও বে-সরকারী বাস এবং ট্রাম—এই ত্রি পক্ষের প্রতিযোগিতা চালু থাকলে পরিবহন ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হতে পারে,—পরিবহন ব্যবস্থার একচেটিয়া অধিকার

কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা এতদিনে তাঁদের ব্যর্থতা স্বীকার করলেন। তাঁদের হেপাজত মোট বাসের



# ক্ষয় যাওয়া জীবন

( গল্প )

শ্রীঅঘোরচন্দ্র গুনরান

প্রায় দেড় যুগ আগের কথা। আমি তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। পরিচয় হয়েছিল ছোট্ট একটা মেয়ের সঙ্গে। অপর্ণা তার নাম। বড় মিষ্টি নামটা। জীবনের অনেকগুলো বছর পার করে দিয়েও অপর্ণাকে আমি ভুলতে পারিনি আজও। এখনও ওর কথা মনে পড়লে ক্ষতবিক্ষত অন্তরটা হাঁপাতে থাকে। শূণ্য মনটার ওপর নেমে আসে বিষাদের কালো ঘোমটা।

অপর্ণার কাছে শুনেছি ওদের বাড়ী ছিল পূর্ব-পাকিস্তানের কুমিল্লায়। আমার নিবাস এ বঙ্গে। গ্রামটার নাম তিলডাঙ্গা। অনেকের মুখে শুনেছি ছিল তো দূরের কথা, সরষের চাঁদও আমাদের গ্রামে হয়নি কোনদিন। যাক্কে ওসব কথা। পাকিস্তান হয়ে যাওয়ার পর অপর্ণার শূণ্য হাতে ও সর্বস্ব হারে এসেছিল বলে আমার ঠাকুরদা ওদের বাড়ী করার জন্ত কিছুটা জমি দিয়েছিল। গ্রামে আমাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল।

আমাদের গ্রামে ছোট্ট একটা প্রাইমারী স্কুল ছিল। অপর্ণার বাবা অপর্ণাকে সেই স্কুলেই ভর্তি করেছিলেন। ও তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। আমি তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। ওদের সঙ্গে ভাব জমে গেল। কালক্রমে সেটা আত্মীয়তায় পরিণত হলো। বাইরের কেউ দেখলে বুঝতেই পারবে না যে ওরা আমাদের কেউ নয়।

দেখতে দেখতে বেশ কয়েক বৎসর কেটে গেল। আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। আর অপর্ণা তখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। অপর্ণার বাবা পরেশবাবু মনে মনে স্থির করেছিলেন আমাদের কৃত উপকারের বিনিময়ে তিনি আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হবেন। দাছর কাছে তিনি আমার দম্ভে প্রস্তাব করেছিলেন। দাছর সে প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন।

আন্তে আন্তে কথাটা আমার কানে গেল। অপর্ণারও বুঝতে বাকী রইল না। অবশ্য সেটা অনেক পরে। আমি [ A. পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী এসে Result-এর দিন শুনেছি। অর্থাৎ তখন আমার বন্দী আর অলস জীবন। ইতিমধ্যে অপর্ণার বাবা অপর্ণাকে পড়ানোর জন্ত আমাকে অনুরোধ

করলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে দাছর অনুরোধে রাজী হতে হ'ল। আমি অপর্ণার মাষ্টার নিযুক্ত হয়ে গেলাম।

আমার Result out হল। পাস করলাম। কিন্তু তখন আমাদের উভয়ের উভয়ে না দেখলে এক মুহূর্তও কাটানো অসম্ভব ছিল। অথচ আমাকে কলকাতায় যেতেই হবে। মন মানছে না। কেবল আমার নয় ওরও একই অবস্থা। জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবকাশে অথবা নির্জন সন্ধ্যায় আমার ও বসন্ত—তোমাকে চোখের আড়াল করলে আমি বাঁচব না।

—লক্ষীটি, অবস্থা হয়ে না। আমাকে যে যেতেই হবে। ওর ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত বেশদামের মধ্যে আঙ্গুল চালানো চালাতে বললাম আমি।

—তুমি যাবে যাও। আমি বাধা দেব না। তোমার ভবিষ্যৎ গড়ে তোল। আমি না হয় তোমার জন্ত অপেক্ষা করবো। কিন্তু তুমি আমার ভুলে যেও না। ব্যথার দমকে ওর টানা টানা চোখের দু'কোণ বেয়ে নামলো অশ্রুবত্তা।

—তাও কি হয়! তোমাকে কি আমি ভুলতে পারি পর্ণা। তোমায় যে আমি ভালবাসি। ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম আমি।

কলকাতায় আসার আগের দিন চোখের জল মুছতে মুছতে একটা ফর্দ এ আমার এনে দিলে। তাতে লেখা ছিল তিন-চার সাইজের ফটোগ্রাফ চাই। সপ্তাহে খান দুই চিঠি চাই, শনিবার ও অত্যান্ত ছুটির দিনে বাড়ী আসা চাই ইত্যাদি আরো অনেক কিছু।

ওকে অনেক বুঝিয়ে আমি কলকাতায় গেলাম। কিন্তু আমার দেহটাই গেল। মনটা বাঁধা রইল অপর্ণার আঁচলে। হোটেলের বন্ধুদের কাছে ওকে নিয়ে কত কথাই শুনিয়েছি। হয়ত কালু চাকর বা ভোলা নামে কোন বন্ধুকে ডাকতে গিয়ে ডেকে ফেলেছি অপর্ণা বলে। অনেকদিন নাকি আমি স্বপ্নের মাঝখানে অপর্ণা অপর্ণা বলে টেঁচিয়েও উঠেছি বার বার। পড়তে বসেও মনে পড়েছে অপর্ণাকে।

অনেকদিন যাইনি তিলডাঙ্গায়। লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। ইতিমধ্যে পর্ণা ম্যাট্রিক পাস করে ভর্তি



হয়েছে ওখানকার এক ছোট্ট কলেজে। শুনেছি কলেজে ওর একটা বন্ধুও জুটেছে। নরেন তার নাম। ওর ক্লাসমেট। কোন এক সরকারী অফিসারের ছেলে। স্মার্ট। অভিজাত চেহারা। অপর্ণার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্তে নরেন নাকি অনেকদিন চেষ্টা করেছিল। শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে। বন্ধুত্ব নাকি অন্তরঙ্গতায় পরিণতও হয়েছে। খবরটা আমায় জানিয়েছিল সুদন্ত। ও আমার বিশেষ বন্ধু। সব শুনে আর আমি দ্বিধা থাকতে পারলাম না। গেলাম একদিন তিলডাঙ্গায়। আমার বন্ধুদের মুখে শুনে অপর্ণাকে ওর গুণগ্রাহী বন্ধুর কথা জিজ্ঞেস করলাম। আমার প্রশ্নের উত্তরে ও শুধু কঁদেছিল। ওর চোখের জল থামাতে সেদিন আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমি আমার দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নিলাম আমার ব্যবহারের জন্ত। একটা দাছব কানেও উঠেছিল। তিনি আমাদের বিয়ের ঠিকঠাক করে ফেললেন। আমি B. A. পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী ফিরলেই বিয়ে হবে।

আমার টেপ্ট হয়ে গেছে তখন। ফাইন্ডাল পরীক্ষার জন্ত প্রিপেরার হচ্ছে। হঠাৎ একটা চিঠি পেলাম অপর্ণাকে নিয়ে নরেন পালিয়ে গেছে। যাবার আগে ওরা নাকি রেগে স্ট্রিক করে বিয়েও করে গেছে।

চিঠিটা পেয়ে আমার যে কি হয়েছিল জানি না। আমি নাকি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম—চুনিয়াটা যেন আমার কাছে অন্ধকার হয়ে গেল। কয়েক দিন হাসপাতালে ছিলাম আমি। দাছ খবর পেয়ে আমাকে নিতে এসেছিলেন, আমি কিন্তু বাইনি। পরীক্ষা না দিয়ে রাতের অন্ধকারে

একদিন পালিয়ে গেলাম দেরাছনে।

দেরাছন। একটা ছোট্ট পাহাড়ী শহর। দূর থেকে হিমালয় দেখা যায়। ছোট ছোট পাহাড়ের গায়ে কাঠের বাড়ীগুলো এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। পাইন আর ওক গাছগুলো ভিড় জমিয়েছে এখানে-ওখানে। শহরটাকে দেখলে মনে হয় যেন পাহাড়ের আঁচল চাপা। ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সর্পিলা গতিতে ছুটে চলেছে কঁাকরের রাস্তাগুলো। রাস্তা দিয়ে একা চলতে চলতে পথিক দাঁড়ায়। পথ হারায়। শোনে কোন বিরহী বিহঙ্গের আর্তনাদ। আমিও শুনতাম।

দেরাছন থেকে ফিরে এলাম। মনে করেছিলাম জীবনের স্বাভাবিক গতি থেকে সরে গিয়ে পাবে শান্তি। কিন্তু পাইনি। ক্রমশঃ উজ্জ্বল হয়ে উঠলাম, তবু আমার অতীতকে আমার মনের পাতা থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারিনি।

কতদিন পরে তিলডাঙ্গায় ফিরেছি জানি না। লোক বলে তিন বছর পরে। এসে দেখি দাছ মারা গেছেন আমার চিন্তায়। বাবা রোগ শয্যায় শায়িত। ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে। মা হাউমাউ করে কঁদে ফেললেন। আমার দেখে বাবা মা'র কাছে আমার নামে বিড়বিড় করে কি যেন বললেন। আমাকে কাছে ডেকে কি বলতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর সব কথা না-বলা রয়ে গেল। আন্তে আন্তে নিস্তেজ হয়ে পড়লেন তিনি। এ জগৎ থেকে বিদায় নিলেন। সবাই বললে—আমার জন্তে তিনি অপেক্ষা করছিলেন।

## কল্পনা তোমার মনে

অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য

কল্পনা তোমার মনে কামনার একশ বছর  
সমুচিত্র পায়ে হেঁটে জাপানী ছহিতার মুখ  
চুপকে অসাড় নজর।

কল্পনা তোমার কাছে যৌবন ছরস্তু নদী—  
ঝড়ে মাথা তুলে রাখা উদ্ধত ঘাসের কুসুম  
মাখন শরীরে। সময়েরা ছুখা মরে, যদি

কল্পনা তোমার বুকে জোছনাকে ভোরে টেনে নাও ;  
চোখে রাত হয়ে থাক নির্বাক কাজলের মায়া।  
রোদের ধারালো নখ—ছায়া হয়ে আমাকে বাঁচাও।

# নীড় বাঁধা হল না

( গল্প )

এস. দত্ত

আলোর চাদর ঢাকা! রাতের কলকাতাকে খুব সুন্দর বলে মনে হয়, না? মানস নেত্রে ভেসে ওঠে প্যারী অথবা লণ্ডনের কথা! খুবই স্বাভাবিক। কল্লনাবিলাসী মানুষ কল্লনার জাল বুনতে যে খুব ভালবাসে! লিয়ন লাইটগুলো আলোর বত্ৰা বইয়ে দিয়ে ঝিকিমিকি তারা ঢাকা আকাশের একফালি চাঁদকে যখন বাঙ্গ করে; ভাবি, কী সুখী এই কলকাতার মানুষগুলো! কিন্তু কেউ ভেবে দেখে না পণের নিরাশ্রয় ভিখারীগুলোর কথা, যারা ত'টি পয়সার জন্ত হাত পেতে দাঁড়ায়। কেউ ভেবে দেখে না বস্তির সেই মানুষ-গুলোর কথা, যারা সারাদিন পরিশ্রম করেও একবেলা পেট পূরে খেতে পায় না; যাদের ছেলে-মেয়ে ডাষ্টবিন থেকে ফেলে দেওয়া আহাৰ্য উদরসাৎ করে, যাদের ছেলে-মেয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, হাসপাতালের আউট ডোরেও ওষুধ দেওয়া হয় না।

সেদিন সন্ধ্যায় অফিস ছুটির পর হতুদন্ত হয়ে চৌরঙ্গীর পাশ দিয়ে বাড়ীর দিকে ছুটছিলাম। বাড়ী না বলে বস্তি বলাই বোধহয় ভালো। একটা লোক হাত পেতে দাঁড়ালো আমার সামনে। ধমকে দাঁড়ালাম আমি। বেকুব ও অসভ্যের মত চেহারা তার। বয়স চল্লিশ না হলেও কাছাকাছি হবে। চুলে তার তেল পড়েনি অনেকদিন। মুখ ভর্তি কাঁচা পাকা দাড়ি। পরনের কাপড়টার কথা না বলাই ভাল।

মনিবাগটার মধ্যে ছিলো পঁচিশ পয়সা। এক পেট খিদেয় সংস্থান। ভেবেছিলাম, হাক দত্তের দোকান থেকে ছ'টো রাধাবল্লভী কিনব রাতে খাবার জন্ত। কিন্তু হ'ল না। পয়সাগুলো তুলে দিলাম তার হাতে। তার ক্লিষ্ট করণ মুখে ফুটে উঠল এক ঝলক প্রশান্ত হাসি। তার করণ মুখের লাবণ্য মাখা হাসি চমকে দিল আমার। মনে পড়িয়ে দিলে স্মৃতির সাগরে হারিয়ে যাওয়া একটি মুখ। মনে পড়ে গেল সুন্দর রায়ের কথা। সেও ঠিক এমন

ভাবে হাসত।

গাঁয়ের কলেজে একসঙ্গে পড়তাম আমরা। হ্যাঁ, আমাদের ছ'জনের মধ্যে ভালবাসা ছিল। খুব গভীর স্বচ্ছ প্রেম। কামনার বারিতে তা দোয়া নয়। শরতের শিউলি ঝরা ছপ্পরে অথবা কোকিল ডাকা বাসন্তী সন্ধ্যায় বা বর্ষার দিনে একটা ছাত্তার মধ্যে পাশাপাশি হেঁটে গ্রামের ঘেঁঠো পথ দিয়ে কলেজ থেকে বাড়ী ফিরতাম আমরা ছ'জনে। বেশ ভাল লাগতো। সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়লে আজও শিহরন জাগে দেহে। সেই সঙ্গে মনেও। অতীত দিনগুলোকে ফিরে পাব না জানি, কিন্তু সেই দিনগুলোর স্মৃতি যে মুছে যাবার নয়।

আমার চোখের সামনে দিয়েই তিনটে বছর কেটে গেল দেখতে দেখতে। বি.এ. পাস করলাম আমরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে পা বাড়াবার মতো আর্থিক সঙ্গতি আমাদের ছ'জনের কারওই ছিল না। তাই চাকরির চেষ্টা করতে হল আমাদের। জোড়া দুই জুতো ছিঁড়ে, অনেক জায়গায় প্রণামী দিয়ে, অনেক তেল মাখাবার পর অবশেষে জুটলো রাইটাস বিল্ডিংসে এক'শ বার টাকার একটি কেরানীগিরি। জগ্ন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে যেন বাসবার ক্ষীণ আলো! কিন্তু Distinction পাওয়া Graduate প্রদান রায় ভারতের গোটা কয়েক শহর চব্বি ফেলে, বেশ কয়েক জোড়া জুতো ছিঁড়ে, অনেক প্রণামী দিয়েও একটা চাকরি যোগাড় করতে পারেনি। কিছু চাকরি নেই বলে ভোঁ পোড়া পেট মানবে না, ভাইবোন বুঝবে না। অভাবের জ্বালায়, ভাই-বোনদের মুখ চেয়ে, মায়ের কথা ভেবে সুন্দর যোগ দিয়েছিল সৈন্ত বাহিনীতে।

টীনের সঙ্গে বৃদ্ধ চলছে তখন। তাই ফ্রন্টে ধবংস হয়েছিল সুন্দরকে। কিছুদিন পরে নেফা থেকে একটা চিঠি দিয়েছিলো আমায়। লিখেছিল, তুমি আমার জন্তে

( শেষাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

# অবৈধ

( গল্প )

কৃষ্ণদাস মণ্ডল

অমল এক কাণ্ড করে বসল। সমাজের কাছে সেটা অবৈধ বলেই প্রতিপন্ন হল। অবৈধই বলা চলে। অমল থাকতো কৃষ্ণনগরে ওর এক পিসতুতো ভাইয়ের কাছে। অমলের পিসতুতো ভাই সুব্রত, সুব্রতর বউ অর্পা মনোরমা। এই তিনজন নিয়ে একটা ছোট্ট সংসার বলা চলে। অমল কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে চাকরি করে।

সুব্রতর বউ অর্পা মনোরমা সুখী ছিল কিনা বলা যায় না। তবে মোটামুটি সুখী যে ওরা ছিল তা বাইরে থেকে দেখলে অন্ততঃ বোঝা যেত। ভিতরে কি ছিল তা বাইরের কেউ জানত না। তাত্ত্বিক সচ্ছলতা থাকলেও মানসিক অশান্তি যে চলছিল তা কারও জানবার কথা নয়। ঝড়ের ওপরে ঝড় উঠল অমলের অনুপ্রবেশে। ভেঙ্গে গেল সুব্রতর ঘর খান খান হয়ে। কি করে জানিনা অমলের ভালবাসাগত প্রাণ সহসা মনোরমার অশ্রুতে উদ্বেল হয়ে উঠল। হয়ত অমল এটা জানত যে সে যা করছে সেটা অবৈধ। কিন্তু প্রেমের উত্তেজনার নিজেকে পীড়িত করে তুলল। হঠাৎ আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের মত ধূম উদ্গিরণ হতে লাগল।

মনোরমাও নিজেকে শিথিল করে দিল। কেন ও কি বলতে পারবে? হয়ত পারবে, হয়ত পারবে না। হয়ত আছে ওর পূর্ণতার অভাব। যা নাহ'লে ওর জীবনে

আগবে না পূর্ণতা। সে অপূর্ণতার দরুন অল্প পুরুষের ভালবাসা, সঙ্গ কামনা করতে এতটুকুও বিধা করল না ও।

সেই হিসেবে এই অবৈধ প্রণয়ের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে অমলকে একা দায়ী করা চলে না। কিমিয়ে যাওয়া মনোরমার মনে যেন আবার আনন্দ জাগল। শরতের প্রভাতের রৌদ্রের মত মিষ্টি আভা ফুটে উঠল মনোরমা-মুখে।

সুব্রত নির্বিকার। সংসারের কারও প্রতি অতটা লক্ষ্য করবার, অতটা মাথা গলাবার প্রয়োজন বোধ করে না সে। আসলে সুব্রত ছোটবেলা থেকেই যেন খেয়ালী প্রকৃতির, উদাসী প্রকৃতির। কারও প্রতি তেমন উৎসুক্যও নেই, আবার অবহেলাও নেই। অফিস থেকে ফেরে ক্লান্ত হ'য়ে বা একটু ভালবাসা, একটু পরশ পায় তাতেই সে সু-এর বেশী চায়ও না কোনদিন।

মনোরমাকে তেমন যেন উৎফুল্ল দেখে না অমল। অন্ততঃ আজ দু'বছর অমল এখানে এসেছে, এর মধ্যে দু'জনে দু'জনের অনুভূতি এমন মনে হয় না। কেমন বেশ শিথিলতা, কেমন যেন ছাড়া ছাড়া ভাব। যেন অভাবে দু'জনেই ব্যথিত।

অমল বোঝে কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করে না, শাহিন হয় না। আর দরকারই বা কি? তবুও যেন মরিয়া হয়ে একদিন মনোরমাকে প্রশ্ন করে—তোমাকে এত পূর্ণতা

( পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেষাংশ )

অপেক্ষা করো গীতালি। বৃদ্ধ শেষ হলে, আমরা বহুদিনের কলনাকে সার্থক করে তুলবো। বাধব 'সুখের নৌড়'।

তারপর তিন বছরের মধ্যে সুন্দর কোন খবর আমি পাইনি। মনে করেছিলাম, ওর খবর আর পাব না কোনদিন। মনে করেছিলাম, নেফা সীমান্তের একফালি

বরফ-ঢাকা মাটি রাঙিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছে চিরকালের জন্ত—পেয়েছে মুক্তি। তবু মন মানত না। ভগবানের কাছে কত কৈঁদেছি, প্রার্থনা করেছি, বলেছি, 'হে প্রাণ সুন্দকে একটা বারের জন্ত ফিরিয়ে দাও। তাহলে অনেক কথা বলা হয় নি।'



দেখাচ্ছে কেন বউদি? বিয়ের আগে তোমার চেহারা কত সুন্দর ছিল, আজ এত রোগা হচ্ছে কেন?

মনোরমা পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে একটু মৃচকি ভেসে বলে—কই

—না তুমি বেশ রোগা হয়ে গেছ, নীর্ণ হয়ে গেছ, চোখের কোণে কে যেন কালী মাখিয়ে দিয়েছে। অত্যন্ত দুর্বল হয়ে বসে অমল। যেন মনের কথা সবই জেনে নিতে চায়।

মনোরমা বলে—শরীরটা তত ভালো নেই কিনা। তাতেই নিরস্ত হয় অমল। আর কিছু প্রশ্ন করে না। চায়ের পেয়লা শেষ করে। মনোরমার কথাটা বিশ্বাস করে না অমল।

—আজ তুমি অফিসে যাবে না ঠাকুরপো?

—না আজ ছুটি নিয়েছি; আর শরীরটা কেমন ভাল লাগছে না যেন।

সিগারেটটা ধরায় অমল। চেয়ারে হেলান দিয়ে আবেশে কয়েক টান দেয়। মনোরমা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

দশটা বাজে। সূত্রত অফিসে চলে যায়। যাবার সময় অমলকে প্রশ্ন করে—তুই অফিসে যাবি না অমল?

—না দাদা, আজ শরীরটা ভাল নেই। তাছাড়া ছুটি নিয়েছি।

—ও, বলে বেরিয়ে যায় সূত্রত।

বেশ মিষ্টি ছুপুর। রৌদ্রের প্রখরতা নেই। মেঘ ঢাকা মলিন সূর্যরশ্মি। ঝিরঝিরে বাতাস। খবরের কাগজে মুখ ঢাকা পড়েছে। তন্দ্রা আসছিল অমলের। করুণ চাপা কান্না শুনে হঠাৎ চমকে ওঠে। চুপ করে শুনে থাকে। হ্যাঁ মনোরমাই তো কাঁদছে। চাপা কান্না। আস্তে আস্তে উঠে পড়ে, বারান্দায় এসে পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখে মনোরমা বালিশে মুখ চেপে কাঁদছে। বিস্ময়াবিষ্ট হয় অমল। কেন কাঁদছে বউদি, মনোরমা!

আবার ফিরে আসে নিজের বিছানায়। কোন কূল-কিনারা পায় না। তবে কি দাদার সাথে ঝগড়া হয়েছে! না সেরকম কিছু হয়েছে বলে তো মনে হয় না। ভেবে তল পায় না, কিছুক্ষণ পরে কান্না থেমে যায়।

মন ভেমন বসে না। একটু পরে মনোরমা ঘরে ঢোকে। এটা সেটা গোছাতে থাকে। অমল একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সেদিকে—সত্ত্ব বর্ষণক্লান্ত চোখ দু'টোর দিকে। উদাস সে দৃষ্টি, ব্যথাতুর সে চাওয়া। কিছু না পাওয়ার অব্যক্ত বেদনার চিহ্ন সব চোখ দুটির মানসগানে। অমলের সন্ধানী দৃষ্টি খুঁজে ফেরে ব্যথার উৎস। টেবিলের বইগুলো নীরবে গুছিয়ে রাখতে থাকে মনোরমা।

বেশ স্বাভাবিক ভাবেই মনোরমা বলে—ঠাকুরপো শরীর কেমন আছে? যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব।

খবরের কাগজ দেখতে দেখতে উত্তর দেয় অমল, এখন বেশ ভাল বউদি। তারপর মুখ তুলে বলে, চল বউদি, একটু বেড়িয়ে আসি।

—না ঠাকুরপো তুমি যাও, আমার ভাল লাগছে না।

বউদির কান্নার কারণ খুঁজতে গিয়ে নিজে দিশাহারা হয়ে যায় অমল। ভাবে এখনি জিজ্ঞাসা করবে কিনা। বলতে গিয়েও থেমে যায়। ভাবে, না এখন জিজ্ঞাসা করা ঠিক হবে না। নিজের কৌতূহলকে আশস্ত করে। জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যায়।

উদ্বেগহীনভাবে এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে অমল। দীঘির ধারে পিটুলী গাছটার নীচে এসে দাঁড়ায়। একটা সিগারেট ধরায়। আবার সেই প্রশ্ন, কি হয়েছে বউদির, কেন কাঁদে মনোরমা? একি ব্যাকুলতা, একি অস্থিতি! সর্ব মন জুড়ে যেন বউদির কান্নার উৎস খুঁজতে চায়, চিন্তা সবুজ হাড়ু খেতে থাকে সে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, বেশ অন্ধকারও হয়ে এসেছে। বাড়ীর উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়।

রাত তখন এগারোটা। অমল কেবলমাত্র শুয়েছে। পাশের ঘর থেকে দাদা-বউদির কথাবার্তা ভেসে আসছে। অমল শুনে থাকে।

মনোরমা জিজ্ঞাসা করে—আজ এত দেরি করলে কেন?

সূত্রত উত্তর দেয়—ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম।

—ডাক্তার কি বললেন?

—যা বলে থাকেন তাই। আমি সন্তান উৎপাদনে অক্ষম। তুমি আর একটা বিয়ে কর মনোরমা।

মনোরমার কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় না। হঠাৎ যেন ডকরে কেঁদে ওঠে।

—কৈদো না রমা। আমার অফমতাই সেজ্ঞ দায়ী।  
তুমি আবার বিয়ে কর রমা, আমি বাধা দেব না। তোমার  
মা হওয়ার বাসনা পূর্ণ কর।

অমলের কাছে আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে যায় সব  
কথা। মনোরমার ব্যাপার উৎস খুঁজে পায়। বিছানায়  
শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে থাকে, ঘুম আসে না। অসহ্য  
মনে হয়। অমল ভাবে, আচ্ছা, বউদি কি তাকে ভালবাসে।  
বোধহয় বাসে, তা নাহলে কেন অমলের পরে অত  
ছঁশিয়ারি!

মনে পড়ে একসময় অমলের টাইফয়েড হয়েছিল।  
সারারাত অমলের পাশে বসে হাওয়া করেছিল মনোরমা।  
সময় মত ওষুধ দিয়েছে। কত বিনিদ্র রজনী গেছে। বোধ-  
হয় মনোরমা পণ করেছিল যে, সে অমলকে সুস্থ করে  
তুলবেই। তারপর অসুখের পর কতদিন অমলের হাত  
ধরে এদিক সেদিক বেড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে।

কেন কি কারণে বউদি অতটা করেছিল? অমলের  
মা'ও তো সেই অসুখের সময় এসেছিল। তাঁকে তো রাত  
জাগতে দেখিনি। কেন মনোরমার এত কঠোর চেষ্টা—তা  
হয়তো অমল বুঝতে চেষ্টা করেনি।

দেওয়াল ঘড়িটার বারোটা বাজল। অমল বাইরে  
বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। কে যেন বারান্দার রেলিঙে  
হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মনে হয়। হ্যাঁ বউদিই,  
মনোরমাই। অমল মনোরমার দিকে এগিয়ে যায়।

—এখানে কি করছ বউদি?

কোন উত্তর আসে না অপর পক্ষ থেকে। সেই আলো-  
আধারিতে চিকচিক করে ওঠে মনোরমার চোখের জল।  
আঁচল দিয়ে চোখ মোছে।

—কাঁদছ কেন বউদি? কি হয়েছে আমাকে বল।

উত্তেজনায় সর্বশরীর কাঁপতে থাকে মনোরমার। কিছুই  
বলতে পারে না মনোরমা। বেদনা শুধু অশ্রু হয়ে ঝরে  
পড়ে।

অমল আবার বলে—কৈদ না বউদি, তুমি আর কি  
করবে?

—ঠাকুরপো তুমি আমাকে, তুমি আমাকে বাঁচাও।

—না বউদি, তা হয় না। সেটা যে অবৈধ। আমরা  
লোকচক্ষে ছোট হয়ে যাব।

—চল ঠাকুরপো। আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।  
আজই। এই রাত্রে।

—না বউদি, তা হয় না।

—কেন হয় না ঠাকুরপো? আমি শুধু মা হতেই চাই  
না, আমি তোমাকে ভালবাসি।

—তুমি দাদাকে ভালবাসো না।

—না। ও ব্যক্তিত্ব থাকলেও ভালবাসা বলে কোন  
বস্তু ওর হৃদয়ে নেই। আমার মা না হওয়ার সান্ত্বনা ও  
যদি দেয়, আমাকে ভালবেসে যদি কাছে ডাকে, তবুও আমি  
পেরে উঠি। তবুও আমি নিজেকে বোঝাতে পারি। অত  
নিবিচার, অত Careless মানুষকে ভালবেসে কি পাওয়া  
যায়?

—তবে আজ পাঁচ বছর কি করে কাটালে? যেখানে  
হৃদয় দেওয়ার প্রণ নেই, মা হওয়ার প্রণ নেই, হয়ত  
নির্ভরতা আছে, কিন্তু শান্তি নেই, তার কাছে পাঁচ বছর  
কি করে কাটালে?

—এই পাঁচ বছর যে কি করে কাটিয়েছি, তা  
তোমাকে বোঝাতে পারব না ঠাকুরপো। বেদনার ছুঁচ  
শুধু আমাকে বার বার অসহ্য যন্ত্রণার সম্মুখীন করেছে।  
ব্যক্ত করব এমন কেউ নেই। একদিকে ভালবাসা না  
পাওয়ার বেদনা, অণু দিকে ভালবেসে না পাওয়ার বেদনা।  
আমি যে তোমাকে ভালবাসি কোনদিন তোমাকে সাহস  
করে বলতে পারিনি। কিন্তু আজ আমার মুখ থেকে হঠাৎ  
উপছে পড়েছে, আমি আর সামলাতে পারিনি।

—সে আমিও বুঝেছিলাম বউদি। টাইফয়েডের সময়  
তুমি যেভাবে আমাকে সারিয়ে তুলেছ, তা একমাত্র সহৃদয়  
ব্যক্তিই পারে। তুমি ঘরে যাও বউদি, অনেক রাত হয়ে  
গেছে। দাদা জানতে পারলে হয়ত কি ভাববে।

যাত্র কয়েক দিন পরের ঘটনা। সূত্রত বাড়ীতে ছিল  
না। দেবে পর বাড়ীতে গিয়েছিল। রাত্রিতে বালিশে মুখ  
ঢেকে মনোরমা। শুয়ে আছে। অমল ঘরে ঢুকল। মনোরমার  
চোখে জল। বলল—চল বউদি, আমরা আজই

বিছানার পাশে বসল। আমি ওখানে একটা চাকরি  
রাতে কলকাতা চলে যাব। পথানে থাকব।  
পেয়েছি। তুমি আর আমি ৬০.

মনোরমার মুখটা যেন হঠাৎ উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল।  
মনোরমা একদিন



পরে ও বোধহয় পেয়েছে নির্ভরতা, পরম নির্ভরতা। শান্তি, অবলম্বন। সেইদিন ভোরে কলকাতায় চলে গেল মনোরমা আর অমল।

পরের দিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরল সুরত। এসে দেখে দরজায় তালা দেওয়া। একটা চিঠি তালায় সাথে আটকানো। চিঠিটা খোলে সুরত।

দাদা,

জানিনা আমার এই অপরাধের শাস্তি কি? সমাজের কাছে, তোমার কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। বুড়ির ব্যথা আমি সহ্য করতে পারিনি। জীবনের এক চরম মুহূর্তে আমি এ-কাজ করতে বাধ্য হলাম। প্রেমের উত্তেজনায়

আমি যা করছি, জানিনা এর শেষ পরিণতি কোথায়! জানি পালানটা ঠিক পৌরুষতার লক্ষণ নয়। কিন্তু তোমার সামনে দাঁড়িয়ে একথাটা আমি কোনদিন বলতে পারতাম না। তাই পালাতে বাধ্য হলাম। আমার এই অপরাধের জন্য যে শাস্তিই আমাকে দাও না কেন, আমি সহ্য করব।

ইতি—

অমল

চিঠিটা বন্ধ করে একটু মৃচকি হাসে সুরত। নিজের মনে বলে—কিন্তু আমি কি ভালবাসা চাই না! গভীর দীর্ঘশ্বাস বেচিয়ে আসে অন্তর থেকে। সে নিশ্বাসের ব্যথাই বা কে বোঝে!

## সচিত্র শিশির

মাসিক পত্রিকা আষাঢ়, ১৩৭৩ হইতে ৪৬শ বর্ষ, আরম্ভ হইয়াছে। সডাক বার্ষিক মূল্য ৪/- সডাক হাফ্‌মাসিক মূল্য ২।০। পূজা সংখ্যা বধিতাকারে প্রকাশিত হয় কিন্তু গ্রাহক-দের বধিত মূল্য দিতে হয় না। আষাঢ় হইতে গ্রাহক হইতে পারেন। গ্রাহক-মূল্য মনি-অর্ডারে পাঠানই শ্রেয়, কারণ, ভি-পিতে লইতে হইলে ৬০ পয়সা অতিরিক্ত খরচ পড়ে। নমুনা-সংখ্যা পাইতে হইলে ৩০ পয়সা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইবেন।

শিশিরে গল্প রচনাদি যে কেহ পাঠাইতে পারেন, ছাপাইবার যোগ্য হইলে ছাপা হয়। অনেক সময়ে মনোনিবেশিত রচনাও স্থানাভাবের জন্য বিলম্বে ছাপা হয়। শিশিরের জন্য প্রেরিত রচনাগুলির নকল রাখিয়া পাঠাইবেন।

শিশির কার্যালয়

২২।১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।

# ববী মলম



দাদ, হাজা, খোস,  
পাঁচড়া, চুলকানি,  
ফোড়া, ঘামাচি,  
পোকাকামড়,  
ও একজিমার  
অব্যর্থ মলম।

কাপড়ে দাগ লাগেনা,  
বেদনা নাশক ও সিন্ধকর

ফোন-৩৪-৫১০১

গোল্ডেন মার্ঘব এণ্ড কোং জোড়াসাঁকো কলি-৭



# মুখের দুর্গন্ধ অতি অপ্রীতিকর!



মুখে দুর্গন্ধ থাকিলে সমাজে  
অবাধ মেলানেশা করা যায় না।  
কাজেই ইহা অনেকের জীবন  
দুঃখময় করে। প্রতিদিন সাধনা  
দশন ব্যবহার করিলে মুখের  
দুর্গন্ধ দূর হয়, মুখ জীবাণুমুক্ত  
হয়, ও দস্তরাজি সুস্থ, সবল  
ও সুন্দর হয়।



স্বাস্থ্যের জন্য  
সুন্দর মুখের জন্য

সাধনা ঔষধালয় - ঢাকা  
১০৬নং কর্ণওয়ালিস ট্রাট, কলিকাতা - ৬  
সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর  
কলিকাতা-৪৮



অধ্যক্ষ - জী.যোগেন্দ্র চৌধুরী, এম. এ.  
আর্কিটেক-শাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লওন)  
এফ. সি. এল. (আমেরিকা) ভাগনগুর  
কলিকাতার স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ নরেন্দ্র চৌধুরী, এম. এ.  
এম. বি. বি. এস. (কলি.) আর্কিটেক-শাস্ত্রী।

# প্রাচীন ভারতে যন্ত্রশিল্প

নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার যন্ত্রযুগে জড়-বিজ্ঞানের উন্নতি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছি এবং ভাবিতেছি যে প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে জড়-বিজ্ঞানের চর্চা ছিল না। প্রাচীন ভারত আধুনিক উন্নত বাস্তবিক শিল্পকলা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিল। বর্তমানের এই সমস্ত উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-শিল্পকলা পাশ্চাত্য সভ্যতারই শ্রেষ্ঠ দান। সহস্রাবধিক বৎসর পরাধীনতার দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া আমরা আজ অধঃপতিত হইয়াছি এবং আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস হারাষ্টয়া ফেলিয়া আমাদের মনোবৃত্তিসমূহ দাসমূলভ দীন ভাব অবলম্বন করিয়াছে। তাই আজ আমাদের পূর্ব-পিতামহগণের মহনীয় কার্যাবলীর পুণ্য-গৌরবময়ী স্মৃতিটুকু পর্যন্ত আমরা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি। প্রাচীন আর্য সভ্যতার আলোচনা ও অনুশীলন এক্ষণে অনাবশ্যক বোধে আমরা তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছি এবং ইহকাল সর্বত্র ভোগপরায়ণ নিরবচ্ছিন্ন জড়বাদী প্রতীচা সভ্যতার লীলাবিলাস মুগ্ধ নৈবেদ্যে নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত দীন ও কাতর ভাবে ভাবিতেছি,—হায়, আমরা কত ক্ষুদ্র! আমাদের কি আছে! আর কি-ই বা ছিল! পাশ্চাত্য সভ্যতায় আজ বিজ্ঞানের কি অভাবনীয় উন্নতি-ই খটিয়াছে! আমাদের কি এসব কোনদিন ছিল? আমাদের এই ভারতের প্রাচীন আর্য ঋষিগণ কন্দ-ফলমূল-ভোজী হইয়া বনে বসিয়া তপশ্চা করিতেন এবং প্রাচীন ভারতীয় নৃপতিগণ তীর-ধনুক ও ঢাল-তালোয়ার-গদা লইয়া যুদ্ধ করিতেন। বর্তমানের এই সমস্ত উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশিল্পাদি তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত-ই ছিল। প্রাচীন কালে ভারতীয় ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধক্ষেত্রে গদা ও তরবারি লইয়া আফসোসেই ছিল বীরত্ব—তীর-ধনুক লইয়া লক্ষ্যভেদেই ছিল বাহাদুরি। ইহাই তাঁহাদের সম্বল মাত্র ছিল। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি তাঁহাদের ছিল না—বৈজ্ঞানিক শিল্পকলার কোন ধার তাঁহারা ধারিতেন না। আমরা এক্ষণে এইরূপ মনে করিতেছি।

পরাদীনতার লোহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া বর্তমানের

বেশে জগতের এক কোণে দাঁড়াইয়াছে এবং দীন করুন নৈবেদ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলাস-চটুল রূপরাশি এবং রণ-ক্ষেত্রে উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক বিচিত্র যন্ত্ররাজি ও বিবিধ মারণাস্ত্রসমূহ দেগিয়া বিস্মিত চিত্তে ভাবিতেছে,—জড়-বিজ্ঞানের কি অভাবনীয় উন্নতি! আমরা এক্ষণে মনে করিতেছি যে, প্রাচীন ভারত কেবল অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানেরই অনুশীলন করিয়াছে এবং সৃষ্টিতত্ত্ব অথবা ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় লইয়াই দিনরাত মত্তিক চালাইয়া করিয়াছে। পরকালের ভাবনা ভাবিয়াই প্রাচীন ভারত ইহকালটা নষ্ট করিয়াছে।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিলেও যে প্রাচীন ভারতে জড়-বিজ্ঞানের আলোচনা আদৌ ছিল না তাহা নহে। অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের অধিবাসীগণ প্রধানতঃ দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। এই দুই সম্প্রদায় যথাক্রমে আর্য ও অনার্য নামে অভিহিত হইতেন। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ-বিসংবাদ প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। প্রাচীন ভারতের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, আর্যগণের বিবিধ পুণ্যকীর্তিতেই প্রাচীন ভারত সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আর্যগণেরই যশোগাথায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যগণ সাধারণতঃ ধর্মপরায়ণ, ভ্যাগ-শীল ও পরকাল-বিশ্বাসী ছিলেন বসিয়া প্রধানতঃ তাঁহাদের মধ্যেই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অনুশীলন হইত। পঞ্চাস্তরে অনার্যগণ ইহকাল সর্বত্র ও ভোগপরায়ণ ছিলেন বসিয়া জড়-বিজ্ঞানের চর্চা প্রধানতঃ তাঁহারা করিতেন। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে অনার্যগণের কুকীর্তি বা অখ্যাতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাই হইল সাধারণ কথা। নতুবা ব্যক্তিগত ভাবে হরতো কোন অনার্য আর্য ভাবাপন্ন, আবার কোন আর্য যে অনার্য ভাবাপন্ন না ছিলেন এমন নহে। আর্য ও অনার্যের মধ্যে যে সংঘর্ষ নিয়তই লাগিয়া থাকিত, তাহা মূলতঃ রাজ্য অথবা ধন-সম্পত্তির অধিকার ভোগের ব্যাপার লইয়া নহে। এই বিরোধ সংঘর্ষের একমাত্র হেতুই ছিল,— উভয় সম্প্রদায়ের জীবনের পরস্পর বিরোধী মূলনীতি।



প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। এই অনার্য সম্প্রদায়ই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের বড় একটা ধার ধারিতেন না এবং তাঁহারাষ্ট সাধারণতঃ জড়-বিজ্ঞানের আলোচনা লইয়াই থাকিতেন। ফলে বিবিধ বিচিত্র বৈজ্ঞানিক শিল্পকলায় তাঁহারা প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। বহু অভিনব অত্যাশ্চর্য যন্ত্রশিল্প তাঁহাদিগের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এতদিন পরে যে সকল যন্ত্রাদির আবিষ্কার করিয়া জগতের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে, কোন্ সুদূর অতীতে এই ভারতবর্ষে তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস একটু ধীরভাবে আলোচনা করিলে এ বিষয় বুঝিতে পারা যায়।

বিংশ শতাব্দীর উন্নত পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ জড়-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ সম্পাদন করিয়া যে বিমান যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছে এবং বর্তমান যুদ্ধক্ষেত্রে যে বৈমানিক যন্ত্রশক্তির দ্বারা অঘটন সংঘটিত হইতেছে—অসামান্য সাধন সম্ভবপর হইতেছে; সেই বিমানযন্ত্র যে কতকাল পূর্বে এই ভারতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহার পরিচয় সুস্পষ্ট ভাষায় প্রাচীন গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত রহিয়াছে।

‘কথাসরিৎসাগর’,—একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি।

এই যন্ত্র ‘বাতবিমানযন্ত্র’ নামে অভিহিত হইত। কারণ ইহা উত্তপ্ত বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইত ও শূণ্যদেশে পরিভ্রমণ করিত। এই যন্ত্রে যে কী লক থাকিত তাহার দ্বারা যন্ত্রের গতিবেগ নিয়মিত হইতে পারিত। এই বাত-বিমানযন্ত্রের একবারের গতিবেগ দুই শত হইতে আট শত যোজন পর্যন্ত ছিল। ‘কথাসরিৎসাগর’ গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গেই এ সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে,—

“বাতযন্ত্র বিমানং চ তদ্ব্যমাতীহ মণ্ডুক্ষু যৎ।

যোজনাষ্টশতীং যতি সক্রৎপ্রহত কৌলকম্ ॥

আকুহ্য স্বকুহেহত্মিন্ বাতযন্ত্রবিমানকে।

দ্রুতং ততো গতোহভূৎ যোজনানাং শতদ্বয়ম্ ॥”

এই বাতবিমানযন্ত্র যেক্রপ বেগবান হইয়া উঠে’ উক্তি, সেইক্রপ বেগে আবার নিম্নদেশে অবতরণ করিতেও

কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা কোন সময়ই ঘটিত না। এই যন্ত্রের আয়তন সম্বন্ধে জানা যায় যে, এক সঙ্গে সহস্র ব্যক্তির স্থান সংকুলান হইত। এক সহস্র আরোহী লইয়া এই বিশাল বাতবিমানযন্ত্র নিরাপদে অবতরণ করিত। এ সম্বন্ধে পূর্বকথিত গ্রন্থের এক স্থানে উল্লেখ আছে,—

“তজ্জাহরাদশক্ৰিতমবতীর্ণং বদ-বিমান-বহনং তম্।

সামুচরং নববৎসায়ুক্তং দৃষ্টা বিসিস্মিয়ে জনতা ॥”

এই অত্যাশ্চর্য বাতবিমানযন্ত্র প্রাচীন কালে ময়দানব কতৃক নির্মিত হইয়াছিল। বর্তমানে যাহা ‘এয়ার শিপ’ নামে পরিচিত হইয়া শূণ্যপথে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং সাধারণতঃ জন মনে বিস্ময় জন্মাইতেছে, প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক শিল্পী ময়দানব কতৃক নির্মিত সেই বাতবিমানযন্ত্র কি বর্তমানের এই এয়ার শিপ অপেক্ষা কোন অংশে নূন? বলা বাহুল্য যে এই যন্ত্র বহু ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং ইহা সাধারণের ব্যবহারোপযোগী ছিল না। রাজা-রাজদাগণই এ প্রকার বিশাল বিমানযন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিতেন। তাহারও উল্লেখ রহিয়াছে।

“দৃষ্টা বিমানবাহনশ্চিত্ত ভবিতব্য খচরসাম্রাজ্যম্।

তং সোহভ্যানন্দত সূতং রাজা চরণানতং বধূসহিতম্ ॥”

অসামান্য শক্তিশালী নরপতি ভিন্ন এ প্রকার বিমান-পোত ব্যবহার করা সাধারণের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। বিশিষ্ট কার্যের প্রয়োজনে বিশিষ্ট ক্ষমতাসালী নৃপতিগণই এই যন্ত্র ব্যবহার করিতেন। নৃপতি সূর্যপ্রভ এই বিশাল বিমানপোতে আরোহণ করিয়া চীনদেশ বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। তাহারও পরিচয় একটি শ্লোকে পাওয়া যায়।

“অন্তেদ্যশ্চ বিমানেন সহস্র্যপ্রভা যযুঃ।

চক্রপ্রভাভাঃ সর্বে তে চীনদেশং সপোরবা ॥”

অনার্য ময়দানব এই বাত-বিমানযন্ত্রের প্রথম আবিষ্কর্তা বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মারও যন্ত্র-শিল্পে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় আমরা ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যোত্তিহাসে পাইয়া থাকি। যাহা হউক, প্রাচীন ভারতে বিমানযন্ত্রের আদি আবিষ্কারক বলিয়া একমাত্র যাহার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, সেই বৈজ্ঞানিক মহা-



ময়দানব অনার্য কুলসম্ভূত হইয়াও আৰ্যগণের অনুগত হইয়াছিলেন। তৎকালীন ভারতে আৰ্য জাতির প্রাধান্য দেখিয়া এবং অধ্যাত্ম বিচার মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াই তিনি আৰ্যগণের সহিত বিরোধ-বিসংবাদের প্রকৃতি নাশ করিয়া একান্ত ভাবে তাঁহাদিগেরই আশ্রিত ও অনুগতরূপে থাকিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি আৰ্যগণের উৎসাহ পাইয়া এবং পরামর্শ লইয়া দেবরাজ ইন্দের সভা নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের বিখ্যাত ইন্দ্রপ্রস্থের সভাও তৎকর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। আৰ্যগণের সহিত তাঁহার এইপ্রকার ঘনিষ্ঠতার ফলে তিনি কিন্তু স্বজাতি ও স্বধর্মগণের বিষয় নজরে পড়িয়াছিলেন। স্বজাতিগণের নিকট নানাভাবে লাঞ্চিত হইয়া ময়দানব বিদ্যাগিরির সন্নিকটে ভূগর্ভে এক অভাবনীয় অত্যাশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্যময় মনোহর পুরী নির্মাণ করতঃ আৰ্যগণের বশংবাদ হইয়া কালযাপন করিয়াছিলেন। সে কথা এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে,—

“অস্তি ত্রিজগতিখ্যাতে ময়োগাম মহাসুরঃ ।

আসুরং ভাবয়ৎসৃজ্য শৌরিংশ শরণং শ্রিতঃ ॥

তেন দত্তাভয়শ্চক্রে স চ যজ্ঞভূতঃ সভাম্ ।

দৈত্যাস্ত দেবপগেন্নয়মিতি তং প্রতিচুক্রুধুঃ ॥

তত্তায়াস্তেন বিদ্যাজৌ মায়াবিবর মন্দিরম্ ।

আগম্য মানুরেক্সানং বহ্বাশ্চর্যময়ং কৃতম্ ॥”

এত করিয়াও কিন্তু ময়দানব সেই ‘অনার্য’ই থাকিয়া গিয়াছিলেন। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানবিৎ আৰ্যগণ একদিনের জন্তও এই জড়-বিজ্ঞানের উপাসক ময়দানবকে আপনাদিগের সমযোগ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। জড়-বিজ্ঞানের উপাসক ময়দানব অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানবিৎ আৰ্যগণের কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ লাভের আশায় চিরদিন তাঁহাদিগের অনুগত ভাবেই জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

ময়দানবের এক কত্তার নাম ছিল সোমপ্রভা। তিনি কলিঙ্গরাজের সেনাপতিকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, আমরা বাহুল্য ভয়ে এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। ফলকথা তাহার মর্ম এই যে,—ময়দানব-কত্তা সোমপ্রভা বলিতেছেন যে, আমার পিতা এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য কৌশল-ময় যন্ত্রশিল্প বহুদিন আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি গৌরব করিয়া এ কথাও বলিতেছেন যে, এই ধরিত্রী একটি

পিতার উদ্ভাবিত যন্ত্রসমূহও তেমনি পঞ্চভূতাত্মক। সোম-প্রভা যন্ত্র সমূহের শ্রেণী বিভাগও উল্লেখ করিয়াছেন। যথা জলযন্ত্র, বাতযন্ত্র, আকাশযন্ত্র ইত্যাদি। সে যুগে এই যন্ত্র-সমূহের এইরূপ নামের ভেদ লক্ষিত হইলেও এগুলি যে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর উন্নত বৈজ্ঞানিক যুগের যন্ত্র সমূহেরই অনুরূপ ছিল এমনকি কোন কোনটি যে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল তাহা বুঝা যায়। অতি প্রাচীন কালে এই ভারতবর্ষ যে জড়-বিজ্ঞানেও কতদূর ধীশক্তির পরিচয় দিয়াছিল, এই সকল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞানের এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার,—মহুয়াবিহীন পরিবেষণ প্রথা। আমেরিকার হোটেলে এই ব্যাপার আজ পৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়াছে। কিন্তু এ ব্যাপারও প্রাচীন কালে ভারতবাসীর অপরিজ্ঞাত ছিল না। বৈজ্ঞানিক মহাশিল্পী ময়দানব কোন্ অরণ্যভীত যুগে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের এই কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ময়দানবের নিকট হইতে অনেকেই আবার এই সমস্ত যন্ত্রশিল্প নির্মাণের কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন।

উৎসর্গে  
বেলারসীঃ রেশম বস্ত্র

**সিক্কা প্রটের**

বহুবাজার মার্কেট  
কলিকাতা-১২  
ফোন: ৩৪-৪৮৬০

তদীয় কথ্য সোমপ্রভা এই যন্ত্র নির্মাণ করিতে শিখিয়া-  
ছিলেন। রাজ্যধর নামক জনৈক রাজা এবং তাঁহার ভ্রাতা  
প্রাণধর ও নরবাহন দত্ত প্রভৃতি আরও অনেকে ময়দানবের  
নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া এই সমস্ত যন্ত্রের নির্মাণ  
কৌশল অবগত হইয়াছিলেন। এস্থলে একটি বিবরণ দিতেছি।

কোন সময়ে নরবাহন দত্ত নামক এক ব্যক্তি রাজকথা  
কপূরিকার পরিণয়প্রার্থী হইয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া  
এক অতি মনোহর পুরী দর্শন করিলেন। সেই স্থানে  
কাষ্ঠময় নরনারীগণ যথার্থ সজীবভাবে কার্য করিতেছে।  
কেবল তাহাদের মুখেই কোন কথা নাই। সেই মনোহর  
পুরীর নিকটে হস্তী, অথ প্রভৃতি সমস্তই ছিল। এমনকি  
বারবনিতার পর্যন্ত সেই স্থানে সমাবেশ হইয়াছিল তাহা তিনি  
দেখিতে পাইলেন। নরবাহন দত্ত সেই স্থানে আর একটি  
শাস্ত-শিষ্ট পুরুষকে দেখিলেন। এই ব্যক্তি জড়-বিজ্ঞানের  
উপাসক হইয়াছিলেন এবং ময়দানবের নিকট বৈজ্ঞানিক  
যন্ত্রাদি নির্মাণের কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন। কোন  
কারণে তিনি রাজার কোপানলে পতিত হইয়া তাহা হইতে  
অব্যাহতি লাভের বাসনায় বিমানযানে এই স্থানে আগমন  
করিয়াছিলেন এবং এই জনশূন্য সমুদ্রতীরে এই প্রকার  
অদ্ভুত পুরী নির্মাণ করিয়া ক্রমশঃ রাজ্যবিস্তার করিয়া-  
ছিলেন। সেই কারণে তাহার নাম হইয়াছিল রাজ্যধর।  
এই রাজ্যধরের নিকট নরবাহন দত্ত উপস্থিত হইলে কি ধেন  
এক ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রভাবে বিবিধ ভোজদ্রব্য কোথা  
হইতে উপস্থিত হইতে লাগিল। ভোজনাদি ক্রিয়া যথারীতি  
সম্পন্ন হইল। আহাৰ্য্যে স্থান সমূহ পরিমার্জিত হইয়া  
গেল। মনুষ্যবিহীন এই সমস্ত কার্য বৈজ্ঞানিক কৌশলেই  
সম্পন্ন হইল। কিভাবে কি হইয়া গেল কিছুই বুঝিবার  
উপায় নাই।

এই সকল বিবরণী পাঠ করিয়া কি মনে হয়? বিংশ  
শতাব্দীর উন্নত বৈজ্ঞানিক যুগে আমেরিকার হোটেলে মনুষ্য-  
বিহীন পরিবেশন প্রথার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের এই মনুষ্যীয়  
উপোক্ত বিবরণ মিলাইয়া দেখিলে আমাদের বিস্মিত  
হইবার কিছুই থাকে না। তবে আমাদের বর্তমান অবস্থার  
কথা ভাবিয়া দুঃখ রাখিবার স্থান পাই না।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে আমাদের অতীত গৌরবের

এই প্রকার অনেক পরিচয়ই পাওয়া যায়। প্রধানতঃ “কথা-  
সরিৎসাগর” গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই আমরা বক্ষ্যমান প্রসঙ্গের  
অবতারণা করিয়াছি এবং প্রাচীন ভারতেও যে জড়-বিজ্ঞানের  
আলোচনা ছিল, এই কথা বলিতে চাহিয়াই প্রসঙ্গ ক্রমে  
জড়-বিজ্ঞানের উপাসক ময়দানব ও তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রাদির  
কিঞ্চিৎ পরিচয় উল্লেখ করিয়াছি। প্রাচীন ভারতের পুরা-  
বৃত্ত অনুসন্ধান করিলে আমাদের অতীত গৌরবের অনেক  
কথাই জানা যায়। বিশালকার্য সৌধহর্ম্য এক স্থান হইতে  
স্থানান্তরে নীত হইবার বৈজ্ঞানিক কৌশলও নূতন আবিষ্কৃত  
নহে। এ কৌশলও যে ময়দানব কর্তৃক কতকাল পূর্বে  
উদ্ভাবিত হইয়াছিল তাহারও পরিচয় নানাস্থানে পাওয়া  
যায়। ময়দানব কর্তৃক পরিকল্পিত যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ মহা-  
সভা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইত। এ কথা  
উল্লেখ মহাভারতে আছে।

রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে “পুষ্পক” রথের বহু  
উল্লেখ দেখা যায়। তাহা বিমান-যান ব্যতীত আর কিছুই  
নহে। রাবণেরও পুষ্পক রথ ছিল। রাবণ-নন্দন ইন্দ্রজিৎ  
এই রথে আরোহণ করিয়া মেঘের অন্তরাল হইতে যুদ্ধ  
করিতেন। তৃতীয় পাণ্ডা ধনঞ্জয় পুষ্পক রথে আরোহণ  
করিয়া শ্রীকৃষ্ণসহ কৈলাসে গিয়াছিলেন। তৎকালীন  
ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিমান যন্ত্রের আদি আবিষ্কারক  
ময়দানব যখন কৃতজ্ঞতার পরিচয় স্বরূপ পাণ্ডবগণের সভা  
নির্মাণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি যে পাণ্ডবদিগের জন্ত  
পুষ্পক রথ নির্মাণ করিয়া দিবেন তাহাতে আশ্চর্য কি?  
রাবণের ভাৰ্য্য মন্দোদরী ছিলেন,—ময়দানবের আদরিণী  
কন্যা। সুতরাং ময়দানব কি জামাতাকে পুষ্পক রথ  
যৌতুক দিবেন না? অথবা স্নেহের দোহিত্রকেই তাহা না  
দিবেন কেন?

ফলকথা প্রাচীন ভারতে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অনু-  
শীলনের সঙ্গে যে জড়-বিজ্ঞানের আলোচনাও ছিল তাহার  
বহু পরিচয় এইভাবে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতীয় আর্থ  
ঋষিগণ সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞানের আলোচনার সমাহিত হইয়া  
যেমন অতীন্দ্রিয় ভাব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তেমনি অল্প  
মন্ত্রদ্বায় কর্তৃক স্থূল জড়-বিজ্ঞানও আলোচিত হইত এবং  
তাহার ফলস্বরূপ বহু প্রকার যন্ত্রশিল্পও আবিষ্কৃত হইয়াছিল।



# মিলন মুখে দু'টি নদী

( গল্প )

শ্রী নিরঞ্জন সেন

দেউলেশ্বরের মেলা দেখে ফিরছে গ্রামা। বেশ হাসি-খুশি ভাব নিয়ে—প্রজাপতির মত যেন উড়ে চলেছে। কামনা জড়ানো ওর স্বপ্ন-মন্দির একজোড়া চোখের দৃষ্টি। সব কিছুতেই নতুন করে পাওয়ার আভাস গ্রামার। সঙ্গে ছিল শরৎ। শরৎ ওর মনের মানুষ—আপন জন। তবে এই পথটুকু তাকে একাই যেতে হবে। শরৎ আর আসেনি—কি একটা কাজে আটকে পড়েছে। গ্রামার হাতে একটা কাগজের বাক্স। ওতে অনেক কিছুই আছে—নাথান, তেল, মাথার পিন, ফিতা, আলতা, পাউডার—আরও কত কি টুকিটাকি।

গ্রামা আজ অল্প গ্রামা। ও ঘর বাঁধবে—ছোট্ট একটা ঘর, যেমন ঘর বেঁধেছে ওর সই সোনামণি দেবদাসের সঙ্গে। ঘনবনের দেবদাস আর শালরোহার সোনামণি।

তৃপ্তিতে ভরে ওঠে গ্রামার মন। পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে ভরা কুমারী মন। কামনার মাধুর্যে ভরা ও।

হাসিখুশি ভাব নিয়ে ঘরে ঢুকছে গ্রামা।

—গ্রামা!—মোহিতের ডাক শুনে হাঁচট খেল গ্রামা। ধমকে দাঁড়াল ভীত চকিত গ্রামা।

—দেউলেশ্বরের মেলায় গেছলে কার সঙ্গে?—আপন স্বরা প্রশ্ন মোহিতের কণ্ঠে।

কি উত্তর দেবে গ্রামা? বলবে কি শরৎ-এর সঙ্গে? ওর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত হলো। বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে গ্রামা। এই মুহূর্তে কি ভয়ঙ্কর মানুষ হয়ে উঠেছে ওর বাপ! গ্রামা নিকম্বর।

—শরৎ-এর সঙ্গে?—বাপের হাসি হেসে প্রশ্ন করে মোহিত বাগদী।

—হ্যাঁ!—ছোট্ট উত্তর বেরিয়ে আসে গ্রামার কণ্ঠ থেকে।

আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা চড় এসে পড়ে গ্রামার গালে। আচমকা চড় খেয়ে সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে যায় গ্রামা। হাতের কাগজের বাক্সটাও মাটিতে পড়ে যায়—ছড়িয়ে পড়ে সব জিনিসগুলো।

দপ্প করে জলে ওঠে মোহিত। পায়ে করে মাড়িয়ে দেয় সব। তারপর সব ভুলে নিয়ে গিয়ে আমাগড়ের জলে ফেলে দিয়ে আসে।

—বাবা ওগুলো.....

গ্রামার কথা শেষ হবার আগেই আর একটা চড় এসে পড়ে ওর গালে। তাজিলোর হাসি ফুটে ওঠে মোহিতের ঠোঁটে।

গ্রামার দু'চোখ বেয়ে কান্নার বত্ম নামে। মারুক ওর বাপ যত খুশী—তবুও যদি জিনিসগুলো আমাগড়ের জলে ফেলে না দিত! ভাস্করনের একটা বর্ণহীন ছবি ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

বাপ বেরিয়ে গেল—মণিপুরের মন্দের ভাটিতে। অল্প দিন আরও আগেই যায়—আজই দেরি করেছে।

গ্রামা হাসল—অবজায় ভরা এক টুকরো হাসি।

জীধার নেমেছে।

ঐ দূরে পড়ে আছে রানীপুরের অভিশপ্ত চর। অনেক দিনের চর। কি ওর ইতিহাস কেউ জানে না। রানীপুরের নদী চলে গেছে গ্রামাদের ঘরের কাছ দিয়ে।

উঠনে নেমে আসে গ্রামা। ঘরের ভেতর দম্ব আটকে আসছে ওর। ওর বাপ প্রমাণ করতে চাইছে গ্রামার জীবনে শরৎ বলে কেউ নেই—যদিও থাকে, তাও ভবিষ্যতে থাকবে না।

বাপ যেন ওর কি! রক্তে মাংসে গড়া মানুষ, তবুও মন বলে কিছু নেই যেন! বড় সংকীর্ণ ওর বাপের মন—চেতনা যেন অসাড়। কি এক চক্রান্তের জাল বুনে চলেছে ওর বাপ মোহিত বাগদী। তাই পালিয়ে যেতে চায় গ্রামা। বাপের হীন চক্রান্তের জাল ছিঁড়ে—শরৎকে নিয়ে।

বাতাস বইছে জোরে জোরে—একটানা অশান্ত বাতাস। ঝড় আসবে—তারই সংকেত! ঝড় জলের রাতে ঐ চর থেকে ভেসে আসে একটানা করুণ কান্না—কোন অতৃপ্ত আত্মার আর্ত আকুতি।



রানীপুরের সবাই শুনেছে—শ্রামাও। কে কঁাদে বা কিসের জন্তু কঁাদে তা কেউ জানে না। রানীপুরের সবাই আঁধার-নামা ঝড় জলের রাতে দল বেঁধে ঐ কান্নার অনুসরণ করেছে তবুও কিছুই দেখতে পায়নি—কাছাকাছি যেতেই কান্না থেমে গেছে।

শ্রামার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। বাপের রক্ত-মূর্তি চোখের সামনে তার নাচানাচি করছে।

ঝড় সত্যি এলো—সাঁই সাঁই শব্দ চারিদিকে। গাছের ডাল ডালার শব্দ—মড়মড় মড়াৎ।

নিকষ কালো রাত—বৃষ্টি পড়ছে। কাছের মানুষও চেনা যায় না। তবুও শ্রামা উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। যৌবন ভরা স্মৃতিস্মরণ তার। রূপ আছে শ্রামার। ছাঁচে ঢালা স্নেহের মুখ তার—কামনা ভরা ছুঁটি চোখ।

রানীপুরের পথঘাট সব এখন ফাঁকা। যদি এই সময়ে চর থেকে সেই করুণ কান্নাটা ভেসে আসে! তবে কি করবে শ্রামা? বৃষ্টিতে আর দাঁড়াতে পারে না শ্রামা—দাঁড়িয়ে উঠে আসে।

কান্নার শব্দটা ওদের ঘরের কাছ দিয়েই আসে। অনেক রাতে শ্রামা উঠানে দাঁড়িয়ে শুনেছে বাতাসের সঙ্গে অস্পষ্ট করেকটি কথাও—পালিয়ে যা শ্রামা—পালিয়ে যা।—এ কথার মানে কিছুই বুঝত না শ্রামা—আর কারোর কাছে কিছু বলতও না সে। উঠানের ওপরে একটা ছায়া মূর্তিকে চলাফেরা করতে দেখেছে।

মা'কে মনে পড়ে না ওর—মায়ের কি হয়েছিল তাও জানে না। ও যখন খুব ছোট, তখন থেকে ওর মা ছিল না। ওর ঠাকুমা মানুষ করেছে—কিন্তু সেও এখন নেই। ঠাকুমার কাছে মায়ের কথা জানতে চাইলে কেবল কঁাদত ও। তাই জানতে চায়নি শ্রামা কোনদিন সে কথা।

তবে মায়ের সম্বন্ধে কেমন একটা রহস্য রয়ে গেছে।

আজ আবার ঐ কান্নার শব্দটা ভেসে আসছে—এগিয়েও আসছে শ্রামাদের ঘরের কাছ দিয়ে। ছায়া মূর্তিটাও যেন ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে আর কান্না ভেজা কণ্ঠে বলছে—শ্রামা, তুই পালিয়ে যা শরৎ-এর সঙ্গে। তোর বাপকে তুই বিশ্বাস করিস না। বিয়ের আগে মণিপুরের দয়ালের সঙ্গে আমার ভালবাসা হয়েছিল। কিন্তু কোন কারণে আমাদের বিয়ে হয়নি। তবে দয়ালকে আমি ভুলতে পারিনি—আর দয়ালও। তাই গোপনে ওর সঙ্গে আমার রোজ রাতে মিলন হতো রানীপুরের চরে। দয়াল রোজ রাতে আসতো—আমিও যেতাম—তোর বাপ ঘুমিয়ে পড়লে। মাস তিনেক বাতায়ত করার পর তোর বাপ সব জানতে পারে। লুকিয়ে দেখত আমি কোথায় বাই।

সেদিন অন্ধকার রাত।

দয়াল আসার আগেই সে রাতে আমি চলে এসেছিলাম। দয়াল আসেনি, তবুও আমি বসে আছি। শেষে দয়ালের পরিবর্তে তোর বাপ টাঙি উচিয়ে আমার ঘাড়ে মারল এক কোপ। তারপর আর আমি কিছুই জানি না। আমার অতৃপ্ত আত্মা এই চরে দয়ালের জন্তু কঁাদে কঁাদে ঘুরে বেড়ায়।

ছায়া মূর্তি আঙু আঙু সরে যায়।

শ্রামার মনে পড়ে ওর বাপ বলতো—ঐ টাঙি দেখছিস, ঐ দিয়ে একজনকে শেষ করেছি—এবার তাকে আর শরৎকে। ভালবাসা!

—মা! মা-গো!—বলে আর্তনাদ করে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শ্রামা।

পরের দিন সকালে শ্রামা আর শরৎকে দেখা গেল না। —ওরা চলে গেছে। মিলন মুখে ছুটে চলেছে ছুঁটি নদী।

# কয়েকটি লিমেট্রিক

সরোজ রায়

সেদিনের সব সুবকদলে  
জানে আসলী পলিটিক্স ;  
পাড়ার কোন বইয়ের স্টলে সকাল সন্ধ্যা ব'সে  
বিশ্বখানা চবে,

বিগ্গে বড় জোর  
ফাইন্ড্ কিংবা সিক্স্ ।

সিনেমার নাগক হবে  
কোন এক চুলফাঁপানো কবি,  
টালিগঞ্জে গ্রায়সা হোঁচট খেল  
ছিট্কে পড়ে আজন্মের 'হবি' ।

সরকারী সে-চাকুরে  
সূর্যকিরণ পাকড়ালী  
মনের মধ্যে জল চাপিয়ে  
খন্দরেতে কংগ্রেসী ।

ত্যাখ্ ত্যাখ্ ত্যাখ্  
ম্যাজিক খেলা ত্যাখ্  
মাছের বদল কাঁচকলা খা  
ভাতের বদল আটা,  
দেশের জন্তে লড়তে গিরে  
ত্রেণটা একটু খাটা ।

যুদ্ধ যখন লেগে গেল  
ভারত পাকিস্তানে  
ওরা যে-সব হেরে যাবে  
খবরটা তো আঁচা ;  
ওদের মনে স্লোগান ছিল  
'আপন পরান বাঁচা' ।

বিধবাদের বিয়ে এখন না হওয়াই ভালো,  
ভারা অনেক উপোস করে—  
ভার জন্তে খাওয়া কিছু বাঁচছে কিনা বলো ?

মাধুরিমা ক্লাসের সেবা ছাত্রী ;  
লেকচার দেয় প্রফেসার  
সুন্দর এবং ব্যাচেলার,  
বছর যেতে মাধুরিমা হ'ল তাহার পাত্রী ।

কোলকাতাতে  
পথ মাঝেতে  
যণ্ডুলো বেড়ায় মেতে ।  
তাই না দেখে মানিকতলার ক্রমিকচক্র শর্ম  
একে একে প্ল্যান ক'রে যায়  
কেমন ক'রে দুধ দেবে বাঁড়  
মিটিয়ে দেশের সমস্তটা চালান দেবে বর্মা

বিবাহিত ডাক্তার  
কী বিশাল চোখ তার ।  
সুন্দরী মেয়ে এক রোজ যায় আসে ;  
সে-মেয়ের রোগ যত—  
উবে গেল একদিন কোন মধুমাসে ।  
দ্বিতীয় পক্ষের বধু মন্দ কি আর ?

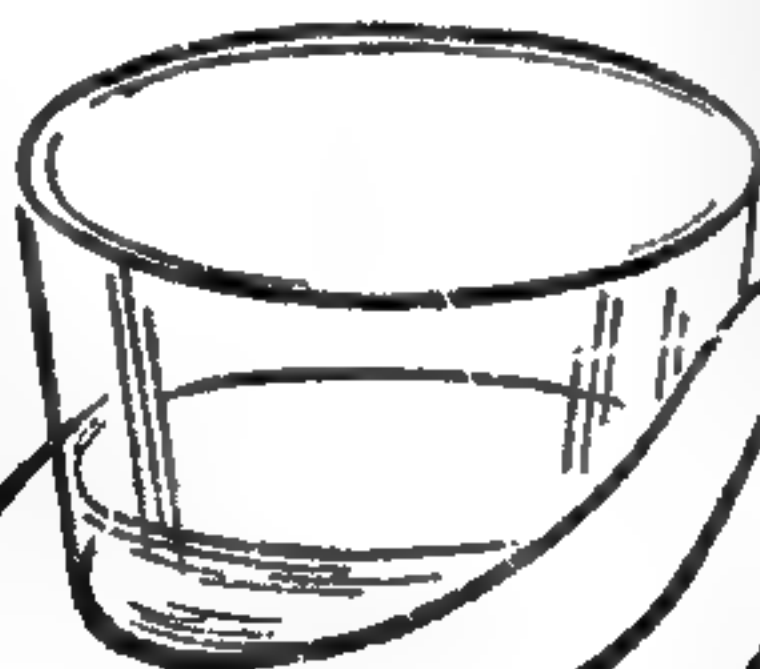
পাড়ার সে-এক বড়দা,  
প্রয়োজনে যোগান দেন  
খড়দা থেকে জর্দা ।  
কিন্তু যদি কোন ফাঁকে  
'হ্যাঁ-স্মার' 'না-স্মার' কম পড়ে  
দেবেন টেনে রদা ।

চারদিকে কড়া চোখ  
প্রেমিকার চাপে রোখ :  
পিতামাতা কেন করে বন্দী ?  
চিঠি লিখে করটা  
ধ'রে রাখি প্রেমটা—  
এখানেও রেশনিং ফন্দি ।

**আহারের পর  
দিনে দু'বার..**

# দ্রব প্রাত্তন খাদ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান



**মহাদ্রাক্ষারিষ্ট**  
(৬ বৎসরের পুরাতন)

**মৃতসঞ্জীবনী**

**সাধনা ও স্বধালায় • ঢাকা**

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র  
ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদ-  
আচার্য, ৩৬, গোয়া ল পা ডা  
রোড, কলিকাতা-৩৭



অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,  
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন),  
এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর  
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

• দু'চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-  
দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার  
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-  
দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি,  
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ করতে অত্যধিক  
ফলপ্রসূ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও  
বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে  
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে  
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ  
স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।



# ভেজাল

( গল্প )

নন্দ সেন

ব্যালকনিটা কি রকম হবে—এ চিন্তায় যখন অস্থির, কিছুতেই থেই মেলাতে পারছি না, কি রকম হলে চারিদিক থেকে হাওয়া, রাতের জ্যোৎস্না আর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যগুলির পরিপূর্ণ উপভোগ সম্ভব হবে—হাল ছেড়ে দিলাম। নিজের বিত্ত-বুদ্ধি সম্বন্ধে জীব সন্দেহটা আরও প্রবল ও প্রখর হয়ে উঠল। সেই মুহূর্তে জীকে ডাকলাম। কাছে আসতেই সত্ত কাগজে আঁকা সুন্দর ছোট বাড়ীটার প্ল্যানটা এগিয়ে দিয়ে মিষ্টি হেসে প্রশ্ন করি—আচ্ছা বলত ওর ব্যালকনিটা কি রকম করা যায়। আচ্ছা ‘বোস-ম্যানসনের’ ব্যালকনিটা বেশ কিন্তু, কি বল?

আমার অনুকরণ প্রিয়তায় ক্ষুব্ধ হয়েই সে উত্তর করে—কেন বোসদের ব্যালকনি বাদ দিয়ে কি নতুন সুন্দর ডিজাইনের ব্যালকনি হতে নেই, না হয় না?

তারপর মুখে একরাশ পরিতৃপ্তির স্রো মেখে একে একে অলিন্দ থেকে আরম্ভ করে সূর্যসুখীর শেষ টবটা পর্যন্ত কোথায় বসলে সুন্দর মানাবে, এক নিঃশ্বাসে বলে গেল। পরিতৃপ্ত হলাম নিজের কচির সাথে ওর পরিকল্পনা মেলাতে গিয়ে। আশ্চর্য ভাবে মিলে গেছে আমার ইচ্ছের সাথে ওর প্রত্যাশা।

তারপর মুহূর্তেই আদরের সুরে জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা, কি গাড়ী কেনা যায় বলত? আমার কিন্তু অ্যামবাগাডর একদম ভাল লাগে না।

একরকম আশ্চর্য হয়েই ও বলে উঠে—কেন? ফিয়ার্ট! সুন্দর সারভিস, বিভিন্ন রং, হালকা গাড়ী—বলবার ভঙ্গী দেখে যুগপৎ হাসি আর করুণার উদ্বেক কবে। প্রথমটার করেন ওর বলার ভঙ্গী। দেখে মনে হয় কোম্পানির ক্যানভাসার! নিঃশ্বাস নেবার আগেই গুণাবলী শেষ। আর শেষেরটার জন্ত মনে হয় এতদিনের দুঃখের সঞ্চিত স্মৃতি। সত্যি বিয়ে হয়ে পর্যন্ত ড্রামে-বাসে ছাড়া নিজেকে ট্যাক্সি মধ্যে কোনদিন বসনা পর্যন্ত করতে পারিনি। যদিবা কোনদিন দৈবাৎ ট্যাক্সি তে উঠেছি, আমার

পালিয়ে গেছে। আহা বেচারী! তবুও শিক্ষার আলো যাবে কোথায়? গাড়ী কিনবার প্রস্নেই নজরটা ঠিক উপরের দিকে চলে গেছে—কেন? ফিয়ার্ট!

তারপর দুজনে জল্পনা করতে বসি। ওর নিস্তরঙ্গ মনে খুশীর ঢেউ ছড়িয়ে পড়তে দেবি হয় না। আমি বলি—বুনকে কিন্তু আমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার ইচ্ছা।

ও সোচ্চার প্রতিবাদ তোলে—না ডাক্তারী।

নিজেকে কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করি। বিনা চিকিৎসায় ওর বাবাকে মারা যেতে দেখে, মনে হয় ডাক্তার ছেলের স্বপ্ন জন্ম নিয়েছে মনের অন্তরে। আহা বেচারী, যাক্গে ওর কথাই থাক।

আমি বলি—সুমির জন্ত তাহলে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার ছেলে চাই।

ও চোখ দুটি দিয়ে মিষ্টি হেসে সম্মতি জানায়।

আবার তর্ক বাধে। বাড়ী নিজে করব, না কন্ট্রাক্ট দেব। ওকে মোটেই বুঝাতে পারি না, সিমেন্টের পার-মিট, চুণের দুপ্রাপ্যতা আর এক নম্বর ইঁট পেতে যে কত ঝামেলা। ও কিছুতেই বুঝতে রাজী নয়। ওর সেই এক গৌ।—কন্ট্রাক্টর বাড়ী ভাল করে না, পছন্দ মত হয় না। ওদের কোন এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ী যাচ্ছেতাই হয়ে গিয়েছিল ইত্যাদি হাজার রকমের কৈফিয়ত। হঠাৎ ভিতরে কড়াইতে কচুর ডালনা পুড়ে বাবার গন্ধে সচেতন হলাম আমরা।

মাত্রাতিরিক্ত কোতূহলকে শাসন করবার ভঙ্গী নিয়ে হাতে ধরা খুস্তিখানাকে দরমার বেড়ায় ঠুকতে ঠুকতে প্রশ্ন করে—বাড়ী, ব্যালকনি, বুন-ডাক্তার, ফিয়ার্ট—কিন্তু টাকা?

আমি সহজ ও সাবলীল ভঙ্গীতে উত্তর দেবার চেষ্টা করি—কেন? বেঞ্জার্স! লটারী!

ও বলে অশ্রুট কণ্ঠে—কত?

একরাশ বিরক্তি নিয়ে তাজ্জিল্যর ভঙ্গীতে বললাম—এক লাখ দশ হাজার।

# দুলভ

## অমির চট্টোপাধ্যায়

জোড়াতালি জীবনের

কালো কালো দাগগুলি

মুছে দিতে চাই,

অশ্রুতে পিচ্ছিল

সপিল পথে আনি

ভালবাসাটাই।

এক মুঠো জুই ফুল

ফণিকের হাসিটার

পারি না যে ভুলতে,

সত্যতা ফাঁসুড়ের

আমি চাই চোখ ধাঁধা

মুখোশটা খুলতে।

ধরণীর আলো দেখা

গুরু হওয়া দিন হ'তে

কান্নার ছন্দটা চিনেছি,

নড়বড়ে ঠেলাগাড়ি

দেহটার চড়ে বসা

গাড়োয়ান মনটার জেনেছি।

সোজা পথে চলবার

সহজ সে ভালটার

শহরের জীবনের খোলটা,

মৃদঙ্গী পোড়া মন বাজাতে চাইলেও

নাহি ওঠে ছন্দের লহরী ;

ভাল কাটে, ভুল হয় খোলটা।

শতমুখী ভিক্ষুক

বহরুপী কুধা তার

লালসার দাঁতগুলি বসিয়ে,

মরণ কামড় দিয়ে

নিতে চায় সত্যেরে

জীবনের মাটি হ'তে খসিয়ে।

ধক্ধকে গোলাকার

আমি তার দুই চোখ এড়িয়ে

পৃথিবীতে শেষ ভালবেসেনি,

চারপের সুরে বাঁধা

মধু খরা মমতার

একফোটা হাসি আজ হেলেনি।

### ( পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেষাংশ )

চোখ তুলে উদাস ভঙ্গীতে ও বলে—পাব কিনা তার  
ঠিক কি ?

—কেন ? স্বয়ং লক্ষ্মী বলেছে পাব।

—লক্ষ্মী ! স্বয়ং !

—হ্যাঁ, তোমার বোন—আমার শালী। কাল তোমার  
বাবাকে দেখতে গেলাম না ? কথায় কথায় লটারীর  
টিকিট কেনার কথা বলাতেই তো লক্ষ্মী স্বয়ং বলল—হ্যাঁ,  
এবার আপনি নির্ধাত Ist prize পাচ্ছেন।

উদাস ভঙ্গীতে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে  
বলল—বিশ্বাস হয় না।

আশাহত, বিক্ষুব্ধ হয়ে আমি পুত্র-কন্যা, স্থান-কাল ভুলে

চিংকার করি জীবন নাম ধরে—তোমরা কি বলত সরস্বতী !  
তোমরাও কি দিন দিন ভেজাল হতে চললে ? তুমি পর  
পর ছ'বার বললে, সংসারে পুষ্টি বাড়ছে, P.U.-টা দিয়ে  
দাঁও যদি কিছু মাইনেটা বাড়ে, পাস করে যাবে—দিলাম।  
দেখলাম নাম নেই লিটে। কাল লক্ষ্মী স্বয়ং বলল Ist  
prize নির্ধাত পাব। তাও বলছ, হবে না—তোমরা কি  
বলত ? কি যেন !

সচেতন হয়ে আমি কান ফিরিয়ে শুনি সরস্বতীর খুস্তির  
আওয়াজ আসছে। কচুর ডালনা কড়াই থেকে নামাচ্ছে।  
চোখ ফিরিয়ে দেখি, সন্ত আঁকা ব্যালকনির প্লান নিয়ে  
ভাবী ইন্জিনিয়ার-ঘরনৌ সুমি হজমের চেষ্টায় ব্যস্ত।



৪৬শ বর্ষ

পৌষ, ১৩৭৩

৭ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

## অনশন একটা দাবি আদায়ের ফিকির

দাবি আদায়ের অমোঘ অস্ত্র হিসেবে অনশনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। শিশুরা যখন তাদের দাবির বিষয়ে কিছুতেই অপরকে প্রভাবিত করতে পারে না, তখন গুরু করে একটানা কাঁদে। আমাদের দেশেও শিশু-সুলভ ঘটনার অনুষ্ঠান হয়ে চলেছে! বিচারশীল বিতর্কের দ্বারা যখন কিছুতেই প্রতিপক্ষকে স্বমতে আনা যায় না, তখন অন্ধ আবেগের দ্বারা নিজের দাবির বিষয়ে অপরকে প্রভাবিত করে কার্য সাধন করাই অনশনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজকের অনশনব্রতীদের অনেকেই গান্ধীজির উদাহরণ দেখান। কিন্তু গান্ধীজি আত্মত্যাগের উদ্দেশ্যে অনশন

অনশন হয়, সেগুলির স্পষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে—চাপ সৃষ্টি করে দাবি আদায় করে নেওয়া। এই অন্ধ আবেগের আধা-হাওয়াব মধ্যে, এই চাপ সৃষ্টির চেষ্ঠার মধ্যে কোন সত্যকার রাজনৈতিক বিতর্ক চলে না। অথচ, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত স্থির করার যে সব প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি আছে, সেগুলি এড়িয়ে গিয়ে কিছু সংখ্যক লোক যদি নিজেদের ইচ্ছা সরকারের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন, তাহলে এই 'ব্ল্যাকমেইল'-এর রাজনীতির শেষ কোথায়?

ভারতের দুই প্রান্তে এক সন্ন্যাসী ও এক সন্তের অনশন সম্পর্কে তুমুল বিতর্কের ঝড় উঠেছে। সন্ত ফতে সিং এবং জগদগুরু শঙ্করাচার্য—দু'জনেই নিজ নিজ অনুগামীদের



প্রশ্ন নিয়ে নিজেকে ব্যাপ্ত করেছেন এবং জগদগুরুও যে-প্রশ্নে অনশন করেছেন, তার গভীর রাজনৈতিক তারপর রয়েছে। এই অনশনের ফলে যদি কোন অনভিপ্রেত বিপদ হয়, তাহলে তাঁদের অনুগামীরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই অনুগামীরা তখন দেশের কোথায় যে কি কাণ্ড করে বসবেন, তার স্থিরতা নেই।

এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী যে দৃঢ় নীতি গ্রহণ করেছেন, তা' সত্যই প্রশংসার। তিনি বলেছেন, পুরোতে জগদগুরু শঙ্করাচার্যের অনশনের দ্বারা স্থির হবে না যে, সারা দেশে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করা হবে কিনা, বা সন্ত ফতে সিং-এর অনশন বা আত্মবিসর্জনের দ্বারা পাঞ্জাব-হরিয়ানার সমস্তার সমাধান হবে না।

সমস্ত যুক্তি-বিতর্ক বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র অন্ধ আবেগ-শক্তির দ্বারা পরিচালিত হওয়া যে মোটেই সূক্ষ্মের পরিচায়ক নয়, সে কথা কারো অবিদিত নাই। সন্তজীর অনশন ও সম্ভাব্য আত্মবিসর্জন সম্পর্কে এবং জগদগুরু শঙ্করাচার্যের অনশন সম্পর্কে দেশের মধ্যে বহু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কোন্ নীতির বলে এঁরা দাবি আদায়ের অস্ত্র হিসাবে অনশনকে বেছে নিয়েছেন? ধর্মগুরুরূপে এঁরা সম্মানিত, এবং এঁদের বহু অনুগামীও রয়েছেন। কিন্তু তাই বলে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এঁরা যদি রাজনীতির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে ফেলেন, তাহলে সেটা দেশের পক্ষে মোটেই শুভ লক্ষণ নয়।

ঈশ্বর ভজনা ও রাষ্ট্র পরিচালনা—হ'টি সম্পূর্ণ পৃথক কর্মধারা। একের অপরের সীমানার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করলে, তাতে বিরোধের সমূহ সম্ভাবনা। পৃথিবীতে সমাজ্যিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে রাজা ও ধর্মগুরুর মধ্যে আনু-গত্য ও ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। এবং তার ফলে বহু অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। ক্রম-

বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের এই কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘোষিত হলেও এর পুনরুত্থান পুনরায় সেই অশুভ সঙ্ঘর্ষের সূচনা করছে।

বিশ্ব নয়। সমাজের সভাপতি যোগীরাজ সূর্যদেব সন্ত ফতে সিং-এর দাবির বিরুদ্ধে পালটা অনশন শুরু করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার যাতে সন্তজীর দাবি মেনে নিতে সীকৃত না হন, এবং হরিয়ানা সম্পর্কে আর কোন পুনর্বিবেচনা না হয়, সেই দাবিতে তিনিও অনশন শুরু করেছেন।

এ ধরনের জুলুম করে দাবি আদায় করার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কিছুটা অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের বিপদ এই যে, সেখানে বহু-জনকে খুশি রাখতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, বহুজনকে খুশি করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত যে সরকারী নীতি গৃহীত হয়, তাতে কিছুটা দুর্বলতার প্রভাব থাকে। অনশন, হিংসাত্মক কার্যসূচীর হুমকি প্রভৃতি 'ব্ল্যাকমেইল'-এর রাজনীতি বাঁরা করেন, তাঁরা এ বাবৎ কাল অমূল্য সরকারী নীতির দ্বারা উৎসাহিত হয়েছেন। আজ যে দেশের এখানে সেখানে বিভিন্ন ব্যাপারে অনশনের হিড়িক দেখা যায়, তার জন্ত এই সরকারী দুর্বলতাই দায়ী। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এই দুর্বলতা চিরতরে দূর করার জন্ত সঙ্কল্প বদ্ধ হয়ে থেকে যদি সেটা কার্যে পরিণত করতে পারেন, তাহলে বাস্তবিকই এ একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে থাকবে।

অনশনরূপী ধর্মগুরুদের নিকট আমাদের এই সবিনয় প্রশ্ন স্বভাবতঃই করতে ইচ্ছা করে যে, মানব জাতির সম্মুখে আজ যে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হয়েছে, তার প্রতি কোন অক্ষিপ না করে, নিছক রাজনৈতিক বিতর্ক বিষয়ের মধ্যে তাঁরা কেন নিজেদের ব্যাপ্ত করে ফেলছেন! মানব-জাতির কল্যাণে ও বৃহত্তর স্বার্থে তাঁদের কর্মধারার পরিবর্তন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

## রঙ্গ জগৎ



চাল না পাই তুখ নেই, কিন্তু এত চেষ্টা করেও টেই ম্যাচের  
একটা টিকিট যোগাড় করতে পারলাম না।

# জীবন

শ্রীতারাপদ দাশ

অনন্ত জীবন-পথে চলেছে মানব-যাত্রী—

নাহি শ্রম, নাহি শ্রান্তি,

নাহি দৈন্ত, নাহি ক্লান্তি,

শুধু চলা আর চলা

কাটিছে দিবস রাত্রি।

লক্ষ্যহীন অনিমেষ, জানে না বিরতি কোথা—

কতো রূপ, আলোছায়া,

বাধা পশ্চাতের মায়া,

কোন সমুখের বাণী

টানে তারে হেথা-হোথা ?

জন্ম-মৃত্যু অক্ষকারে হারিয়েছে বারে-বারে—

ভাঙ্গা-গড়া মাঝে মাঝে

সাজিয়েছে কতো সাজে

হারিয়ে হারিয়ে পুনঃ

লভিয়েছে আপনারে।

আনন্দ-অমৃতে পূর্ণ বিশ্ব জীবনের রেখা—

অখণ্ড এ বিশ্বলোকে,

জলিয়া রহিবে স্নেহে,

সত্যের মহিমা গীতি

অনির্বাক দীপলিখা।

## ভূষণ্ডীর ক্ষত ঝরা মাঠে

শিবেন্দ্র গোস্বামী

অধিতীয় বিধিত বেদনা,

অক্ষম ধমনী বেয়ে প্রতিধ্বনি তোলে—

শ্রদ্ধাহীন হৃদয়ের হতাশার কোলে

গঞ্জয় করে না কিছু, আগ্নেয় অনলে

একা একা দগ্ধ হয়, নেই তা' অজানা।

ময়ূরের রঙীন পেখমে—

আমি দেখি অতলান্ত সাগরের ছবি।

বহুশত শতাব্দীর সবুজ অটবী

দেখে না শাশ্বত চোখে এ যুগের কবি

রেশমের কোমলতা দূরে যায় ক্রমে।

ভূষণ্ডীর ক্ষত ঝরা মাঠে,

ভৌতিক আলোয়া রানী এখন নাচে না,

বাস্তুহারা কলোনীর বাস্তব চেতনা

কাকলী ছাপিয়ে এক সুরের ব্যঞ্জনা

বৈধে নিয়ে সভ্যতার সোজা পথ হাঁটে।

চৈতন্যের উষ্ণ প্রস্রবণে—

নেই আর সেই রাত, মেরুন পাখীরা

ক্রান্তির বলয়ে ভুলে গেল ডানা ঝাড়া।

দীপকের তপ্ত রাগে জৈবিক ফোয়ারা

নিস্তব্ধ করেছে ওরা সঙ্গত কারণে।



# শহীদ

সুদর্শন চক্রবর্তী

—আমি বিয়ে করতে চাই বত্ৰা—প্লাবন শোনাল কথা ক'টা অনেক ইতস্তত করেই। অনেকদিন থেকেই প্রতীক্ষা ক'রে আছে প্লাবন, কিন্তু বলি বলি ক'রে আজ পর্যন্ত শুছিয়ে বলতে পারেনি সে বত্ৰাকে। তাই কথাটা ব'লে ফেলেই প্লাবন কেমন যেন লজ্জিত হ'য়ে পড়ল বত্ৰার কাছে সেই সময়ের মত।

বত্ৰাকে নিরুত্তর দেখে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকিয়ে রইল প্লাবন অন্ধকার আকাশের মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে। সে যেন কিছুটা মিল খুঁজে পেল বত্ৰার চুমকি লাগানো কালো শাড়ীখানার মধ্যে। অদূরের লাইট পোস্টের আলোয় সোনালী চুমকিগুলো তার ঝিলমিল করছে যেন।

কিন্তু বত্ৰা নিরুত্তরে শুধু তাকিয়ে থাকে পা দিয়ে চাপা নরম ঘাসের দিকে। কি জবাব সে দেবে এ প্রশ্নের? বত্ৰা জানত, প্লাবন কি একটা যেন বলতে চায়। তাই সে কিছুটা আন্দাজও করেছিল যে, প্লাবন কি বলবে তাকে। কিন্তু সহসা এভাবে যে প্লাবন একেবারে সামনাসামনি এ-কথার অবতারণা করতে পারে, এতটা বত্ৰা ভাবতেও পারেনি। তাই সে একবার ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখে প্লাবনকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত। আবার চোখ ফেরায় অতৃদিক। মনে পড়ে যায় প্লাবনের সঙ্গে তার ফেল আসা পুরনো দিনগুলো। প্লাবনকে তার ভাল লাগে সত্যিই। প্লাবনকে কাছে পেলে মনে সে আনন্দও পায়। প্লাবনকে দেখতে না পেলে মনটা তার খারাপও লাগে। কিন্তু তাই ব'লে প্লাবনকে একেবারে বিয়ে—এতটা ভেবে দেখেনি বত্ৰা এর আগে পর্যন্ত। তাই সে সহসা এর কোন জবাব খুঁজে পায় না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর বত্ৰা তার স্বভাবজাত ভঙ্গিমায় বলে—‘আজ তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে প্লাবন, কেন বলত?’

—তোমাকে আজ আমি কিছুই লুকাব না বত্ৰা। ক'দিন থেকে বাড়ীতে আমার বড়ই অশান্তি দেখা দিয়েছে আমার বিয়ে নিয়ে। আমি বলেছি বিয়ে যদি করতেই হয়, তবে সে আর কাউকে নয়—বলেই প্লাবন বত্ৰার চশমার

আবার বেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর বলে—রাত হয়ে এল বত্ৰা, আমার জবাব ত এখনও পেলাম না। এবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বত্ৰা প্লাবনের দিকে তাকিয়ে বলে—আজ ওঠ।

নিরুত্তরে দু'টো প্রাণী পথ চলে পাশাপাশি, কিন্তু যেন নিতান্ত অপরিচিতের মতই। বড় রাস্তা পার হয়ে গলির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে প্লাবন থেমে যায়।

বত্ৰা সহসা হাতটা জড়িয়ে ধরে প্লাবনের। বলে—আমায় ভুল বুঝো না প্লাবন, লজ্জাটি তোমার পায়ে পড়ি। তুমি রাগ করো না।—বত্ৰার চোখ দুটো সহসা ছলছল করে জলে।

ধরা গলায় প্লাবন উত্তরে শুধু বলে,—আমায় ক্ষমা কর বত্ৰা, ভুলতে পারবে ত?

—ওঃ, তুমি এতো নিষ্ঠুরও হ'তে পার প্লাবন? কি বলব, যদি বুকের ভিতরটা কি হচ্ছে তা জানতে!—বলেই বত্ৰা চোখ রগড়ায়।

কিন্তু প্লাবন স্থির থাকতে পারে না। কালবোশেখীর ঝড়ে আজ তাকে মাতিয়ে দিয়েছে একেবারে। ভারাক্রান্ত জীবন, অভিশপ্ত বাঁচা, এসব কত কি আজ তার মনের মধ্যে ভিড় করে উদ্দাম ক'রে তুলেছে তাকে হতাশার অন্ধকারে। নিমেষে সমস্ত আলোগুলো তার চোখের সামনে যেন কারেন্ট ফেল করে হঠাৎ। আজ এই প্রথম তার নিঃসঙ্গ একা ব'লে মনে হ'ল। বলতে কি, সে যেন অনেকটা ভয় পেয়ে গেল এই চিন্তায় যে, সমস্ত অন্ধকার তার সমস্ত অভিশাপ নিয়ে টুটি টিপতে আসছে। তাই কোন দিকে আর না তাকিয়ে “শুধু বিদায়” এই কথা কটা ব'লেই প্লাবন আজ ঝড়ের মত ছুটে চ'লে গেল বত্ৰার চোখের সামনে থেকে।

আর বত্ৰা? অশ্রুট স্বরে ‘প্লাবন একটু ফেরো’ ব'লে হাত বাড়িয়েই আবার ধীরে ধীরে সংযত হয়ে বাড়ী ফেরে।

তারপর কেটে গেছে কয়েকটা বছর। শহর ছেড়ে

বতাকে ভোলার চেষ্টা করে সে। ডাক্তার হিসেবে দিনের পর দিন তার প্রভাব প্রতিপত্তি যেভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে নাওয়া-খাওয়ার সময়ও ঠিক থাকে না তার। প্রথম প্রথম সে ভাবত আপন মনেই যে, কি লাভ তার আর বেঁচে থেকে। কিন্তু এখন ক্রমশঃ কাজের মধ্যে এমনই সে ডুবে থাকে যে, নিজের কথা ভাবার একদণ্ড অবসরও আজ তার মেলে না।

সেদিন একটা লোক এলো। মাসখানেক হল যে ইঞ্জিনিয়ারটি এসেছেন, তার অসুখের খবর পেয়ে প্লাবন যায় রোগী দেখতে। গিয়ে দেখে অসুখটা ইঞ্জিনিয়ারের নয়, তার স্ত্রীর। আর রোগটা ম্যানিজিয়াটিক। তাড়াতাড়ি তাকে নাসিং হোমে নিয়ে এসে নাড়ী ধ'রে সময়মত ঔষধ, ইঞ্জেকশন, পথ্য প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করে।

অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাওয়ায় একদিন রক্ত দেওয়ার দরকার হ'য়ে পড়ল। সহকর্মীকে দিয়ে নিজের রক্তটা মিলিয়ে নিয়ে প্লাবন যেন একটা নতুন আলো দেখতে পেল এতদিন পরে। প্লাবনের এই অপূর্ব সুযোগ,—বোধ হয় এরই জন্তে তার এতদিন বেঁচে থাকার প্রয়োজন ছিল।

এবার আর কাল বিলম্ব না ক'রে সহকর্মীর সাহায্যে যতটা দরকার সমস্ত রক্ত নিজের দেহ থেকে আদায় ক'রে

নিল প্লাবন। পরদিনই রক্ত দেওয়া হয়ে গেল।

তিনদিন পরে রোগী চোখ মেলে দেখল। চিনতে পারছে সে আত্মীয়-স্বজনদের, দুটো-একটা কথাও বলছে অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে।

রাত্রি আটটার পর প্লাবন নিয়মিত রোগী দেখতে এল। রোগিনী চিনতে পারল প্লাবনকে। বলল—'তুমি!'—বলেই সে আবার অজ্ঞান হ'য়ে পড়ল।

টলতে টলতে প্লাবন কোনরকমে নিজের ঘরে ফিরে গেল। অল্প এক সহকর্মীকে তখনই সাত নম্বর বেডের রোগিনীকে এটেণ্ড করতে বলল। তারপর কিছুক্ষণ পরে খবর নিয়ে জানল, জ্ঞান এসেছে। এক ঘণ্টা পরে আবার শুনল, ভাল আছে। পরদিন সকাল বেলায় অবস্থা বেশ ভালর দিকে গেল।

আর নয়। এতদিন জীবনটা যে ব্যর্থ ব'লে মনে হচ্ছিল প্লাবনের, আজ তার মধ্যে সে অনেকখানি সার্থকতা খুঁজে পেল। সেদিন যে আলোগুলো সহসা নিভে গিয়েছিল তার চোখের সামনে থেকে, আজ যেন সেগুলো আবার একসঙ্গে জ্বলে উঠল তার চারদিকে।

এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে প্লাবন সেইদিনই দুর্গাপুর ছেড়ে আন্দামানের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল।

## আতাবনে

শ্রীনিখলচন্দ্র তালুকদার

( সেদিন ) যখন বসেছিলাম আতাবনে,  
কত আকুল মুকুল ফুটেছিল;  
উদাস কোকিল ডেকেছিল  
আর গুকনো পাতা ঝরেছিল;

—আনমনে সেই আতাবনে।

উদাসী মন স্বপ্ন বোনে,  
নিরঞ্জে সবুজ-বনের কোণে;  
চমকি' উঠি ক্ষণে ক্ষণে  
ব্যাকুল অগ্নির গুঞ্জরণে;

—মধুপুরে সেই আতাবনে।

খন ছাগ্রার মাঝে আতাব বনে  
গান গুঞ্জরিল আমার মনে;  
সোনাবরা নীল আকাশ ছায়ে  
আলো ঝিলমিল উত্তল বায়ে;  
—মধুপুরে সেই আতাবনে।

# মুহূর্তের জন্তে

## সংক্ষিপ্ত

কলকাতার রাস্তায় বাস্তবিকই পরিবহন একটা বিরাট সমস্যা স্বরূপ। এমনিতেই রাস্তায় পথ চলা দায়; তারপর ট্রামে-বাসে একটু স্থান পাওয়া বা হাতের কাছে সময়মত একটা ট্যাক্সি পাওয়া—সে ত ভাগ্যের কথা! ট্রামে-বাসে পা রাখার মত একটু জায়গা নিয়ে ছোট বড় কত ঘটনা বা দুর্ঘটনা যে ঘটে যাচ্ছে তার হিসাব কে রাখে!

সাধারণের যানবাহন ট্রাম-বাসের উপর অধিকাংশ লোকই একান্ত নির্ভরশীল। এর বাড়ড়-খোলা ভিড় আমাদের চোখ-সহ্য হয়ে গেছে। কিন্তু এইসব যান-বাহনের যখন ধর্মঘট শুরু হয়, তখন গোদের উপর বিষ ফোড়ার অবস্থার সৃষ্টি হয়! সাম্প্রতিক কলকাতার বুকের উপর একযোগে ট্রাম ও বাস ধর্মঘট জনসাধারণকে এক অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে এনে ফেলেছে।

পরিবহন সমস্যার তীব্রতার জন্ত অনেকটা ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন দায়ী। যাত্রী সাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে কর্পোরেশন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, একথা বললে বোধহয় অত্যাুক্তি করা হয় না। যত বেশী সংখ্যক বাস চলে, লোকসানের অঙ্ক ততই বাড়বে—অর্থনীতির এ অদ্ভুত যুক্তি কর্পোরেশন দেখিয়ে থাকেন। তাই তাঁরা যতটা সম্ভব কম বাস চালিয়ে লোকসানের হার কমিয়ে আর সমানুপাতিক হারে যাত্রীদের দুর্দশার একশেষ করছেন। ষ্টেট বাস কর্তৃপক্ষ যদি জানিয়ে দেন কোন্ ক্রমে কত মিনিট অন্তর বাস চলে, তা হলেই বোঝা যাবে যত বাস রাস্তায় চলে বলে ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন দাবি করছেন, তা সত্যি নয়। কারণ তা হলে দেখা যাবে যে, যতক্ষণে তিনটি বাসের চলবার কথা ততক্ষণে একটি বাসও চলেনি।

ষ্টেট বাসের অনুকল্প হিসাবে কলকাতায় কিছু প্রাইভেট বাস চালাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন আর বেশী প্রাইভেট বাস চালাতে দিতে চাইছেন না বলে জানা গেছে। কর্পোরেশন আশঙ্কা করছে যে, তা হলে তাদের লোকসানের বহর আরও বেড়ে যাবে।

কর্পোরেশন নিজেরা বেশী বাস চালাচ্ছেন না, বেশী প্রাইভেট বাস চালাতেও আপত্তি জানাবেন, আবার ওদিকে ট্রাম ধর্মঘট—এখন জনসাধারণের অবস্থা দাঁড়িয়েছে, বল মা তারা দাঁড়াই কোথা!

\* \* \*

প্রবাদ আছে, 'বিধি যখন বাম হয়—'; আমাদের ঠিক সেই অবস্থাই হয়েছে। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে (Struggle for existence) সকলের নাভিধাস উঠেছে, জনসংখ্যার হার হ্রাস করে বেড়ে চলেছে আর মানুষের লোভ, ভোগমি ও দুর্নীতি যেন চক্ষুলাঙ্গার মুখোশ খুলে বিকট মূর্তিতে দেখা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি দেবীও বিক্রপ হয়ে উঠেছেন।

এমনিতেই আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদনের হার অত্যন্ত স্বল্প। তার উপর এ বৎসর পশ্চিমবঙ্গে কিছুটা এবং বিহার ও উত্তর প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে খরা দেখা দিয়েছে। এতে বহু শস্য হানি হয়েছে। আর পশ্চিমবঙ্গে এ বৎসরে ফলনের হারও অত্যন্ত স্বল্প।

এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে স্বভাবতঃই দেশে সরবরাহে ঘাটতি হবে এবং অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, সেই সুযোগে অনেকেই বেশ দু' পয়সা কামিয়ে নেবার চেষ্টা করবে। বলা বাহুল্য এতে সাধারণের দুর্দশা আরও চরমে উঠবে।

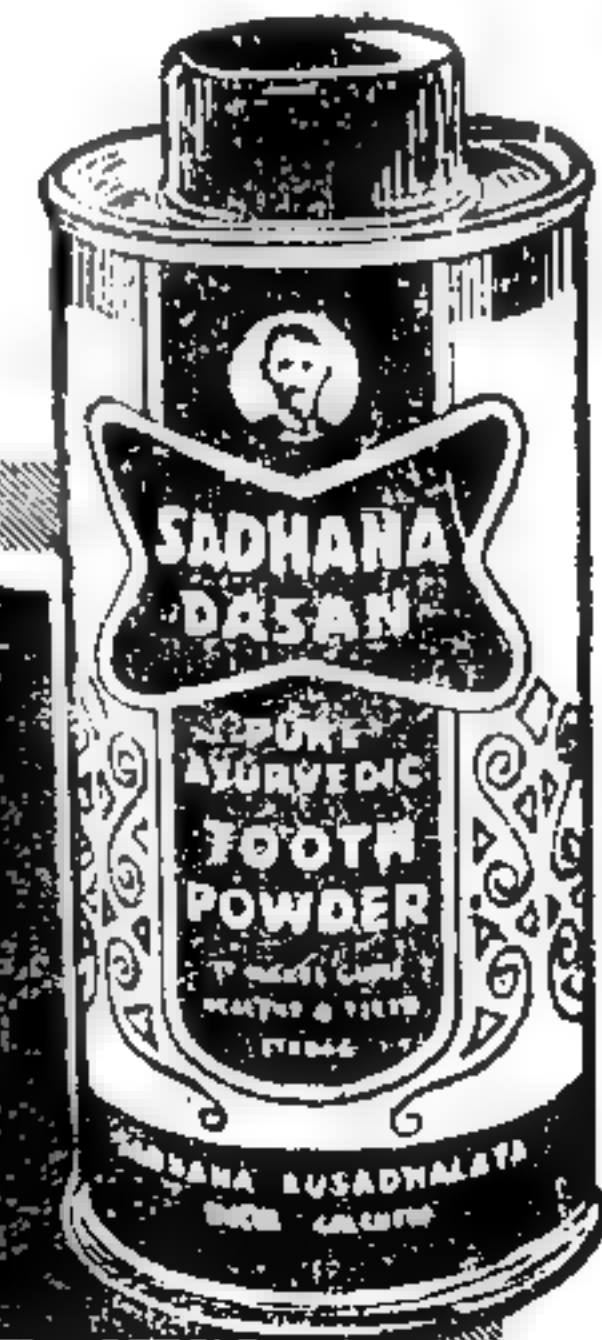
আমাদের চাল-গমের চাহিদার বেশীর ভাগ বিদেশী সরবরাহের দ্বারা মেটান হয়। সেফেক্রে আমাদের জাতীয় চরিত্র যদি এরূপ সত্যাবজিত হয়, তা'হলে আমাদের সম্মুখবর্তী এ কঠিন সমস্যা থেকে পরিভ্রাণ পাওয়া সুদূর-পর্যন্ত। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বিপুল চাপ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে শস্যহানি প্রভৃতি সমস্যা আমাদের নিকট একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। সে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হলে পারস্পরিক সহযোগিতা ও আন্তরিকতা অবশ্য প্রয়োজনীয়।



# মুখের দুর্গন্ধ অতি অশীতিকর!



মুখে দুর্গন্ধ থাকিলে সমাজে  
অবাধ মেলামেশা করা যায় না।  
কাজেই ইহা অনেকের জীবন  
দুঃখময় করে। প্রতিদিন সাধনা  
দশন ব্যবহার করিলে মুখের  
দুর্গন্ধ দূর হয়, মুখ জীবাণুমুক্ত  
হয় ও দন্তরাজি সুস্থ, সবল  
ও সুন্দর হয়।



অশীতিকর  
মুখের দুর্গন্ধ

সাধনা ঔষধালয় - ঢাকা

১০৬নং কর্ণওয়ালিস ট্রাট, কলিকাতা - ৬

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর

কলিকাতা-৪৮



অধ্যক্ষ - ডী. বোমেনচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.  
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এক. সি. এস. (লন্ডন)  
এব. সি. এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর  
কলকাতার রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ,  
এব. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদশাস্ত্রী।

# যা হারায় না

( গল্প )

শ্রীঅজিত রায়

ছোটবেলা থেকেই দুজনের আলাপ। যেত একসঙ্গে ফুটবল মাঠে। একজন ছিল ইষ্টবেঙ্গলের সমর্থক, অল্পজন মোহনবাগানের। লাইন দিয়ে টিকিট কিনে ঢুকতে হ'ত না—মেম্বারশিপ কার্ড যোগাড় করেছিল তারা। ইষ্টবেঙ্গলের তখন দুর্ধর্ষ টিম—পাঁচটি ফরওয়ার্ড বেন পাঁচটি বাথ ছোট্টে যখন বল নিয়ে, আটকায় কার সাধ্য! একজন অপরজনকে পাশ দেয়, সে কাটিয়ে কাটিয়ে নিয়ে বল পেনাল্টি সীমানার মধ্যে ফেলে, সেন্টার ফরওয়ার্ড কিংবা লেফট্ ইন্ লাফিয়ে পড়ে—তারপরে বাঁ পায়ের তীব্র শট, আর বল বেন নেট ছিঁড়ে দেয়। এমনি করে গোল হয়, আর গ্যালারীতে সমর্থকদের জটোয়াল বেন দশ মাইল দূর থেকেও শোনা যায়। যখনই ইষ্টবেঙ্গলের গোল হয় তপতী লাফাতে আরম্ভ করে, আর মন্থ যার চুপ করে। তপতী লাফাতে লাফাতে বাড়ী আসে আর গুরু করে খেলার গল্প। মন্থ নিজের বাড়ী গিয়ে খাটের উপর চুপ করে শুয়ে থাকে। প্রতি সপ্তাহে একবার কি দু'বার খেলা দেখতে যায় ওরা। এমনি করে লীগের খেলা শেষ হ'ল। ইষ্টবেঙ্গল লীগ বিজয়ী হ'ল—তপতীর আনন্দ দেখে কে!

কিন্তু শুধু খেলা দেখা নয়। সকাল সাতটায় উঠে মন্থ তার ঝোলানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাতে আরম্ভ করে। কামানো শেষ হ'লে খবরের কাগজ নিয়ে বসে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে বসে খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে নেয়। ভিয়েতনামে যুদ্ধ চলছে। আমেরিকা হস্তক্ষেপ করেছে। এ যুদ্ধের জন্তু কারা দোষী! ভাবছিল মন্থ। এই সময় তপতী একবার আসে। Economics-এর দু'একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—Duopolyতে value কি করে স্থির হয়, Monopoly আর Imperfect competition-এ তফাত কি? এইভাবে অর্থনীতি ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়। তার সঙ্গে ভাল রেখে চলা সম্ভব হয়

বোঝায়।

তপতী টিপ্তানী কাটে—এরকম করে দাড়ি কামিয়েছ কেন তুমি? এখনও খসখস করছে।

মন্থ কোন উত্তর দেয় না।

—আজ কলেজ যাবে না? তপতী প্রশ্ন করে।

—হঁ, বাব। বলে মন্থ খবরের কাগজের লেখাগুলো দেখে।

—ওমা, নটা যে বাজল। কখন স্থান করতে উঠবে?

—আবার জিজ্ঞাসা করে তপতী।

—উঠব 'খন—গন্তীর হয়ে জবাব দেয় মন্থ।

তারপর তপতীর সঙ্গে দুটো চারটে কথা হয়। Vietnam war-এ কারা দোষী! 'আমেরিকা'—সবলে উত্তর দেয় তপতী।

তারপর তপতী চলে যায়। স্থান খাওয়া সেরে যখন কলেজে রওনা হয় মন্থ, তখন বাসে প্রচণ্ড ভিড়। কোনো-রকমে হ্যাণ্ডেল ধরে ঠাসাঠাসির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে মন্থ। কত মানুষ চতুর্দিকে। এরকম ভিড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে যেতে যেতে তপতীর কথা মনে পড়ল মন্থের। বেচারী কি কষ্টে কলেজে যায়। তপতীর জন্তু মায়া হয় মন্থের। শীর্ণ সুন্দরী মেয়েটি। বাবা ওর কোনো এক Office-এর কেরানী। দশটা-পাঁচটা খেটে যা সামান্য আয় করেন, তা থেকেই কোনোরকমে সংসার চলে। তপতীর একটা ভাল শাড়ী নেই—তার একটু আমোদের জন্তু বাড়তি পয়সা খরচ করা তার বাবার পক্ষে সম্ভব হয় না। মন্থের ইচ্ছে হয় ওর জন্তু মাঝে মাঝে কিছু কিনে দেয়। কিন্তু তপতীর নেবার কোনো আগ্রহই নেই—তা সে যতই স্নেহের দান হোক না কেন। এমনকি কলেজে টিফিনেরও পয়সা থাকে না তপতীর।

বাসের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে নিজের কষ্টের মাঝেই তপতীর দুঃখ অনুভব করতে পারে মন্থ। সাধারণ



সময়ে বেশ কড়া কড়া কথা বলে মন্থ—‘কেন মন দিয়ে পড়াশুনা কর না—একটু মন দিয়ে পড়—অত ছটফটে হওয়ার দিকে ঝাঁক কেন!’ কিন্তু আজ অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল তার।

কলেজে গিয়ে কয়েকটা ক্লাস করে যাওয়ার পর তপতীকে ডেকে নিয়ে কাছের দোকানে মন্থ গেল। ওকে বলিয়ে চা-খাবারের অর্ডার দিল। প্রবল আপত্তি করলেও তপতীকে সেই খাবার খেতেই হ’ল। তপতী যখন খাচ্ছিল, মন্থ তার শীর্ণ সুন্দর মুখের দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

বাইরে মুঠো মুঠো বোদ....উজ্জল ছপুর।

ভবিষ্যৎ জীবনের এক সুখ-স্বপ্ন নিবিড় ভাবে মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে মন্থর। একদিন যখন এই সুন্দর মেয়েটি তার হবে, কত সুখের জীবন—কেমন সুন্দর সংসার হবে। বাইরে নীল আকাশের কোলে বাতাসের চাপে উড়ে বেড়ানো সাদা-কালো মেঘগুলোর দিকে দৃষ্টি রাখলে ভবিষ্যতের সুখের কথাই মনে হয় মন্থর।

তপতীর অভাবের সংসার। এই দৈন্তের মধ্যেও তপতীর কত ধৈর্য! এতটুকু গ্লানি নেই মনে। অত দারিদ্র্যের মাঝেও তার প্রশান্তি আর সুকোমল ভাব মন্থকে অনিবার্য ভাবে আকৃষ্ট করে রাখে। তার খেতে এক Year নাও পড়ে তপতী।

সেদিন আর ক্লাস করল না তপতী ও মন্থ। সেই দোকানে বসে অনেকক্ষণ তারা গল্প করল দুজনে।—‘না, ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতিকে কোনোক্রমেই নিরপেক্ষ বলা যায় না’—এবং কেন বলা যায় না এই নিয়ে মন্থ আরও বলল, ‘ভারতে বৈদেশিক নীতির বাইরের রূপটা যাই হোক না কেন—ভারতের অর্থনীতির ভিত্তি স্বাভাবিক, এবং এক ধনতান্ত্রিক দেশ, শেষ পর্যন্ত ধনতন্ত্রের রক্ষার জন্ত লড়াই করবেই।’

তপতীর মনে হ’ল ওটা নিছক তত্ত্ব কথা। বাস্তবে ভারতবর্ষ সহাবস্থানের যে নীতির কথা বলে, তা যে অন্তরে গ্রহণ করেছে।

সেইদিন বিকেলের দিকে মন্থ তপতীকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেল। তপতী বাসায় এসে দেখে বাবার হঠাৎ জ্বর

উদ্ভিগ হয়ে উঠেছেন—বাবার বিছানার একপাশে বসে বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

তপতী প্রথমে ব্যাপারটা সামান্য ভেবেছিল। তারপর বাবার কপালে হাত দিয়ে দেখল, গায়ে বেশ জ্বর আছে। মাকে বলল ডাক্তার ডাকার কথা। কিন্তু মায়ের কাছে যা সামান্য ছিল তা নিঃশেষ—এখন যে মাসের শেষ! যা আছে তাতে ডাক্তারের ভিজিট-ই কুলোবে না।

তপতী নিজের টিফিনের জমানো পয়সা থেকেই ডাক্তার ডাকতে পাঠাল। ছোট ভাই গেল। বেশ দেরি হ’ল তার ফিরতে। যখন ডাক্তার নিয়ে ফিরল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। ডাক্তার রোগী পরীক্ষা করে গভীর হলেন। তপতী উদ্ভিগ মুখে ডাক্তারের দিকে তাকাল। ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করে দিলেন। বললেন—জীবনের আশঙ্কা আছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে আর পুষ্টির খাওয়ার অভাবে এইরকম হয়েছে।

মাকে শুতে পাঠিয়ে দিয়ে তপতী বাবার শিরে বসে রইল। মাথায় হাওয়া করল, মাঝে মাঝে জলের আপটা দিল—সময়মত ওষুধও খাওয়াল।

পরের দিন বিকেলে আবার ডাক্তার এলেন। রোগী দেখে ওষুধ পালটে দিলেন। কিন্তু তার পরের দিনও জ্বর যেমনপনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

কয়েক দিন তপতীর কলেজ যাওয়া বন্ধ রইল। সে আর মা পাল্লা করে রোগীর সেবা করে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, যে অস্থখটা সামান্য বলে মনে হয়েছিল, ডাক্তারের ওষুধ ও এত সেবা সত্ত্বেও তা আর ভাল হ’ল না—বাবা মারা গেলেন।

মা বাবার বিছানায় আছড়ে পড়লেন। তপতী শুক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের সংসার মোটেই সচ্ছল নয়। সামান্য আয়ে শত অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে তাদের দিন কেটেছে। বাবার আয়ে কোনরকমে সংসার চলেছে তাদের। বাবার মৃত্যুতে সংসারের মধ্যে ভয়াবহ শোকের ছায়া নামল।

বাবার সংকার করে তারা যখন গুটিকয় প্রাণী ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল তখন প্রথম প্রশ্ন হ’ল, কেমন করে এবার তাদের সংসার চলবে। ছোট ভাই এখনও স্কুলে



শহরের এই বাসা—এর ভাড়াও যে অনেক! আর তপতী পড়ছিল মোটে 1st year-এ। ঐ বিপুল নিয়ে এ বাজারে চাকরি জোটানো কত শক্ত।

তবু তপতী তার চেষ্টার ক্রটি করেনি। যেখানে পেরেছে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছে—কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। উপায়াস্তর না দেখে তপতীর মা গ্রামের এক আত্মীয়র কাছে আশ্রয় চেয়ে চিঠি লিখলেন। সেই আত্মীয়র পরিবারে সংসারের সব কাজ তারাই করে দেবে—বিনিময়ে সামান্য আশ্রয় আর সংস্থান তারা পাবে।

আত্মীয়টি সম্মতি জানিয়ে উত্তর দিলেন। তপতীরা শহরের বাস উঠিয়ে সেই বাসা ত্যাগ করে কলেজে নাম কাটিয়ে একদিন সন্ধ্যায় গ্রামের উদ্দেশে পাড়ি দিল।

সেদিন সন্ধ্যায় আকাশে গুটিকতক তারা উঠেছিল। এই নিরাশ্রয় হতাশ পরিবারটি অলক্ষ্যে বিদায় নিল, কেউ টের পেল না।

গ্রামের ধানক্ষেতগুলোর পাশ দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে সবুজ ধানের শীষগুলির উপর সূর্যের আলো প্রতিফলিত হওয়ায় চমৎকার লাগছিল। পাশ দিয়ে চলে গেছে শহরে যাবার রাস্তা—বাস-লরি যাতায়াত করে সে রাস্তা দিয়ে। কিছু পাশেই ধানের মাঠগুলো যেন অলস হয়ে শুয়ে আছে। হু' একটা চালাবর আছে—যারা ক্ষেত দেখাশুনা করে তাদের থাকবার আস্তানা। দূরে গ্রামের কুঁড়েগুলো দেখা যায়—খালি গায়ে মোটা কাপড় প'রে হু' চারজন মাঠের

## সচিত্র শিশির

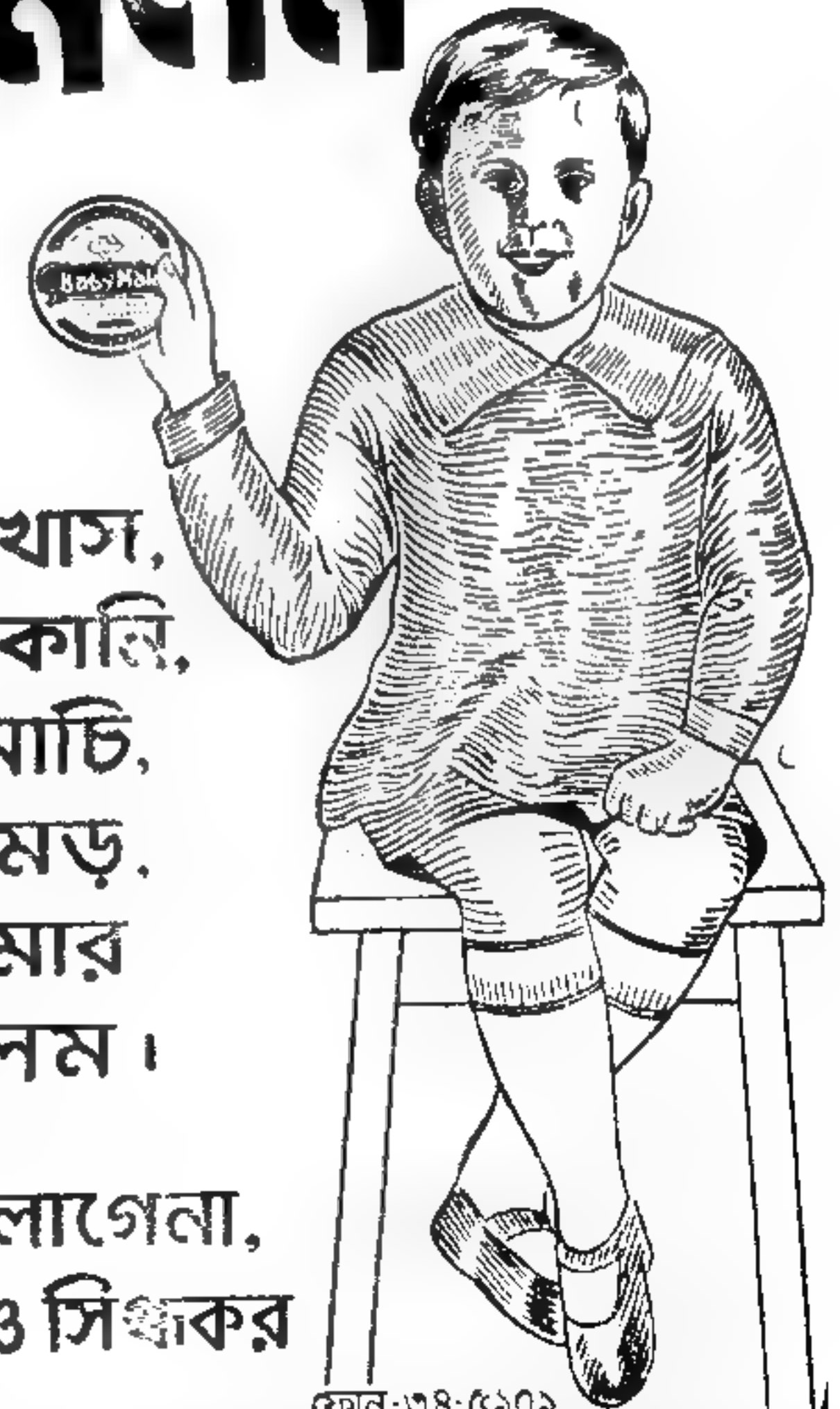
মাসিক পত্রিকা আঘাট, ১৩৭৩ হইতে ৪৬শ বর্ষ, আরম্ভ হইয়াছে। সডাক বার্ষিক মূল্য ৪/- সডাক বাৎসরিক মূল্য ২৫/-। পূজা সংখ্যা বর্ধিতাকারে প্রকাশিত হয় কিন্তু গ্রাহকদের বর্ধিত মূল্য দিতে হয় না। আঘাট হইতে গ্রাহক হইতে পারেন। গ্রাহক-মূল্য মনিঅর্ডারে পাঠানই শ্রেয়, কারণ, ভি-পিতে লইতে হইলে ৬০ পয়সা অতিরিক্ত খরচ গড়ে। নমুনা-সংখ্যা পাইতে হইলে ৩০ পয়সা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইবেন।

শিশিরে গল্প রচনাদি যে কেহ পাঠাইতে পারেন, ছাপাইবার যোগ্য হইলে ছাপা হয়। অনেক সময়ে মনোনীত রচনাও স্থানান্তরের জন্য বিলম্ব ছাপা হয়। শিশিরের জন্য প্রেরিত রচনাগুলির নকল রাখিয়া পাঠাইবেন।

শিশির কার্যালয়

২২১১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।

# বেরী মলম



দাদ, হাজা, খোস,  
পাঁচড়া, চুলকানি,  
ফোড়া, ঘামাচি,  
পোকার কামড়,  
ও একজিমার  
অব্যর্থ মলম।

কাপড়ে দাগ লাগেনা,  
বেদনা নাশক ও সিন্ধকর

ফোন-৩৪-৫১০২

গোল জেট মাধব এণ্ড কোং জোড়াসাঁকো, কলি-৭

দিকে আসছে।

তপতী বেড়াতে থাকে। দূরে দিগন্ত রেখায় আকাশ আর বিস্তৃত মাঠ মিশে গিয়েছে। ঐ রাস্তা দিয়ে বেশ কিছু দূর গেলে যে বাঁধটা তৈরী হচ্ছে, তার তৈরীর কাজ দেখা যায়। অনেক জনমজুর খাটছে। সেই বাঁধ দিয়ে খাল কেটে মাঠে জল আসবে। চলতে চলতে তপতীর মন্থর কথা মনে পড়ে যায়। ও এখন কি করছে? শহর থেকে চলে আসার পর কয়েক মাস কেটে গিয়েছে। মন্থরকে কিছু জানায় নি। সে জানেও না তারা চলে এসেছে। হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয় আর কোনদিন দেখাও হবে না তার সঙ্গে। জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। এখন থেকে শুধু বেঁচে থাকার জন্ত সংগ্রাম। শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের মানি বয়ে বেড়াতে হবে। এখানে তপতী মাসিমার ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়ায়—মা রান্নায় সাহায্য করেন—ছোট ভাই বাজার করে—বাড়ীর অগ্রাণ্ড কাজে সাহায্য করে। এইভাবে তাদের দিন কাটে।

১৯৬৫ সাল। মন্থর B. A. পাস করল। নানা প্রশ্ন তার মনে আসে। পরিকল্পনা দিয়ে দেশের উন্নতি বিধানের বিভিন্ন চেষ্টা চলছে। কোন দিক থেকে আসছে বাধা, কোনো জায়গা থেকে আসছে সমালোচনা। মন্থর অনেক ভেবে সঠিক পরিকল্পনা কেমন হওয়া উচিত স্থির করার চেষ্টা করে। এই ছোটখাটো জলসেচ পরিকল্পনা, কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা—ছাড়া ছাড়া তারি শির তৈরী করা—এর মধ্যে কোথাও গেন ভাল ভাবে সংগঠনমূলক প্রয়াস নেই। ওতে উন্নতি হবার আশা কতটুকু? এ বিষয়ে আলোচনা চালাবার মত উপযুক্ত সঙ্গী সে খুঁজে পায় না।

বহুদিন হ'ল তপতীরা বাসা ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। হঠাৎ তাদের চলে যাবার কি কারণ ঘটল? যাবার আগে মন্থরকে কিছু জানালও না পর্যন্ত। নিভৃতি রাতে ঘরের জানালাটা খুলে দিয়ে খাটে শুয়ে আকাশের মিটি-মিটি তারাগুলো দেখতে দেখতে তপতীর কথা মনে পড়ে মন্থর। জীবনে যারা আসে তারা কত সহজে আর বিনা বিধায় চলে যায়। ও কোথায় গেল, কেন গেল—খোঁজ নিয়েও জানতে পারল না মন্থর।

মন্থর চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছে বাইরে। এতদিন পরে

এই স্থান ত্যাগ করে বাইরে গিয়ে নতুন করে ঘর পাতা অনেক অনুবিধার। তবু উৎসাহ আছে মন্থর মনে। এমনি ছুটে চলাই তো জীবন! দূর থেকে দূর চলা—বন্ধনহীন এ বাওয়ার যেন কোনো শেষ নেই। কাজের জায়গায় এসে একটা Quarter-ও পেলে মন্থর।

ছোট ছোট তিনখানা ঘর। সামনে একফালি একটা বারান্দা। বাড়ীতে ঢোকান মুখে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা ছোট বাগান। সেখানে নানা ধরনের ফুল ফুটে থাকে। বারান্দার চেয়ার পেতে সামনের খোলা প্রশস্ত মাঠের দিকে চেয়ে থাকে মন্থর। মাঠের ঘাসে উজ্জল রোদ পড়ে ঝিকিমিকি করছে। সব যেন কেমন উদাসীন্তে ভরা। কেমন প্রচ্ছন্ন বিষাদে মগ্ন। হাসি পায় মন্থর। কেন—গেলই বা একজন। জীবনে এমনি কতজন আসে আর যায়, হাসে আর চায়—পশ্চাতে ফিরে তাকাবার অবসরই নেই। ঘর বাঁধবার আশা নাই-বা মিটল।

কে একজন এসেছে দেখা করতে। মন্থর বাইরে এল। প্রথমেই আগন্তকের পায়ের দিকে নজর পড়ল। জুতো নেই, খালি পা।

—একটা চাকরি যদি আমার যোগাড় করে দেন.....

মন্থর এবার আগন্তকের মুখের পানে তাকায়—এ যে তপতী! প্রায় সেই রকমই আছে, তবু একটু যেন মগ্ন হয়ে গেছে। চূপ করে থাকে মন্থর। মুখের রেখায় আশা-আনন্দের অভিব্যক্তি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তপতীকে বসিয়ে সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে মন্থর। সব শুনে নীরবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মন্থর। আনন্দে নেচে ওঠে ওর মন।

তপতী বলে—তবে যাই এখন।

না, যেতে দেওয়া আর সম্ভব নয় ওকে। মন্থর ভাবে, আবার ও হারিয়ে যাবে। তপতীর হাতটা ধরে বলে—না, এখানে বসো।

কলকাতায় গিয়ে আবার খেলা দেখে ওরা। মোহন-বাগান হারিয়ে দিল ইষ্টবেঙ্গলকে। আনন্দে টেঁচিয়ে টেঁচিয়ে গলা বসে যায় মন্থর। তপতী চূপ করে থাকে। আবার দুজনে দুজনের কাছে এসেছে—আর কিছুই তাদের মধ্যে ব্যবধান আনতে পারবে না।



# ক্ষণিকের অতিথি

( গল্প )

শ্রীনিরঞ্জন সেন

একবার—দু'বার—তিনবার—আরও একবার দরজার কড়া নড়ে ওঠে।

—কে ?—ভেতর থেকে জী-কণ্ঠের প্রশ্ন ভেসে আসে।

—আমি—পুরুষ-কণ্ঠ উত্তর ছুঁড়ে দেয় দরজার এপাশ থেকে।

—আমি কে ? আমি বলতে কি ব্যব—পাপটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় জী-কণ্ঠ।

এ পক্ষ এবার নীরব।

ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসে দরজা খুলতে তবুও যেন ভরসা পায় না রেবা। দরজা খুলে দিয়ে থাকে দেখল, তাতে দু'পা পিছিয়ে এসে পড়ে যাচ্ছিল, কোনরকমে টাল সামলে নিল রেবা। মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে শৃঙ্খতার ঝংকার শুরু হয়ে গেছে। সমস্ত পৃথিবীটা কাঁপছে। ভূমিকম্প হচ্ছে—চুরমার হয়ে যাবে সৃষ্টি। এ তারই সঙ্কেত।

—তুমি ?—রেবার কণ্ঠে অর্থহীন প্রশ্ন।

উত্তর আসে না—ও পক্ষ নীরব। তাই এবার শ্রীমন্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে রেবা—কি মনে করে এখানে ?

—রেবা—উত্তরের পরিবারে শ্রীমন্তের ঠোট কেঁপে ওঠে।

—তোমার পাপ মুখে এ নাম আর উচ্চারণ করো না শ্রীমন্ত—তুমি যাও। তোমার ছায়া এ বাড়ীতে লাগলে অকল্যাণ হবে।

পাণ্ডুর-নির্ণ শ্রীমন্তের মুখখানিতে হুহুতে ঝলসে ওঠে বাঁকা হাসি। বলে—অপূর্ব কথা শোনালে রেবা—সত্যি তুমি দরদী ! তা না হলে তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে এমন কথা ! অদ্ভুত তুমি ! একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে শ্রীমন্ত।—আরও কিছু বল রেবা—খামলে কেন ? স্বচ্ছন্দে বলতে পার। কেননা বিবেক বলে তোমার কিছুই নেই। তবুও আমি ক্ষণিকের জন্তে আশ্রয় চাই—আমি তোমার অতিথি,—অনুগ্রহ ফুটে ওঠে শ্রীমন্তের কণ্ঠে।

—না, না শ্রীমন্ত, তুমি যাও এখান থেকে। হজ্জা-

সংকোচ কি তোমার কিছুই নেই—বলে রেবা চলে যাচ্ছিল।

—রেবা শোন।

ফিরে দাঁড়ায় রেবা।

—চলে যাব আমি—সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় শ্রীমন্ত। তারপরে একটা খাম বের করে আমার পকেট থেকে। তার ভেতর থেকে রেবার একখানা আবক্ষ ফটো বের করে ওর সামনে ধরে।

পৃথিবী রং বদলায়—আচমকাই।

—দশ বছর আগের—অশ্রুমনস্ক ভাবে উচ্চারণ করে রেবা।

—কত রঙীন স্বপ্নময় সন্ধ্যা—আবেগ ভরা কণ্ঠে বলে শ্রীমন্ত।

তখনকার রেবার সঙ্গে এখনকার রেবার এতটুকুও মিল নেই। দু'চোখ জলে ভরে যায় রেবার। তখনকার শ্রীমন্ত ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অতীতের অনুভূতিতে ব্যাকুল করা পরিবেশ। দশটি বছর ! অতীতের উজ্জল আভা এখনও ওদের মনের পাতায় পাতায় ঝাঁকা রয়েছে ! এই জেগেই অজ্ঞে-ই বিদায় করে দিচ্ছিল রেবা। নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্ত। কিন্তু নিষ্কৃতি এত সহজে পাওয়া যায় না।

—রেবা ! আজকের দিনটা থাকতে দাও। মনে কর আমি তোমার হারানো অতিথি—অনুগ্রহে ভরা শ্রীমন্তের প্রার্থনা।

—তুমি যাও শ্রীমন্ত, অর্থহীন তোমার প্রার্থনা। তুমি একটি অপদার্থ, তা' না হলে পালিয়ে যাও আমাকে ফেলে রেখে ! যাও, আমার নিদ্রিত স্মৃতিকে আর জাগিও না।

—শুধু আজকের দিনটা—এই আমার অনুরোধ—শেষ অনুরোধ। আর কি জান রেবা !

—কি ?

—না খাইয়ে আমাকে বিদায় করে দেবে, আজ তিন



দিন কিছুই খাইনি জল ছাড়া—ধরা পড়ে যাবার ভয়ে—

সত্যি এবার রেবার নারী মনে মায়ার স্পন্দন জাগে।  
অতীতের অস্তিত্ব যেন পরিবেশকে সহজ করে দিল।  
নিঃশেষে হারিয়ে গেল রেবার মন অতীতের স্মৃতির ঘরে।

—তুমি আজ তিন দিন উপোসী?—রেবার ছুঁচোখে  
মায়ার দীপ্তি। ওর সামনে ওরই মনের মায়ুয, যাকে  
ভালবেসে ছিল রেবা। নিঃস্ব পথিক আজ সেই শ্রীমন্ত!

—এখানে এস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন—রেবা এগিয়ে  
এসে শ্রীমন্তর হাত ধরে। অতীতের স্বীকৃতি! এগিয়ে  
যায় শ্রীমন্ত। উপস্থিত এই নিরাপদ আশ্রয়। সান্ত্বনাও  
বটে। অতীতের ছর্ব্বার আকর্ষণ ছুঁটি মনে!

আশ্চর্য! এই হচ্ছে নারী মন। দূরে সরিয়ে দেয়  
প্রয়োজন হলে—আবার প্রয়োজন হলে কাছেও টানে!  
এতকণে ভাল করে রেবাকে লক্ষ্য করে শ্রীমন্ত।

—রেবা! তোমার পরনে থান।

—আমি বিধবা শ্রীমন্ত! নির্মম নিয়তির চক্রের তলায়  
কে কখন পড়ে তা বোঝা যায় না।

—এই বুঝি তোমার স্বামীর ঘর?

—হ্যাঁ।

রেবা—রেবা বিখান! কি মিষ্টি চেহারা ছিল—আজ  
আর কিছুই নেই। যৌবন চলে গেছে। কি ছিল আর  
কি হয়েছে।

কথা হারা কয়েকটি মুহূর্ত কেটে যায়।

—আমার ঠিকানা.....

রেবার কথা শেষ হবার আগেই উত্তর দেয় শ্রীমন্ত—  
তোমার পিসিমার কাছ থেকে তোমার ঠিকানা পেয়েছি।

অনুশোচনার আঘাতে জর্জরিত রেবার মন। সাদা  
ধানের আবরণে ঢাকা একটি নারী মূর্তি। যৌবন যাবার  
সময় নয়, তবুও গেছে।

—বস।—আসন পেতে দেয় রেবা। প্রশান্তি ঘেরা  
এই ঠাই।

সবুজ স্বপ্ন ভরা পরিবেশ। একটু পরে রেবা নিজের  
কাজে চলে যায়। রেবার খুশিতে উজ্জল চোখ দু'টিতে কি  
আশ্বাসের আভাস। অতীতের স্মৃতি ছড়ানো ঠাই।

ঘরের ভেতর গিয়ে পড়ে শ্রীমন্তর দৃষ্টি। একটি

ফুলের আন্তরণ। ধন কামনার, স্বামী-পুত্রের মঙ্গল কামনায়  
চিরস্তন্য নারীর ভক্তি অর্ঘ্য। পূজ পবিত্র পরিবেশ  
ঘরটির। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে রেবা। মহাকালী বালিকা  
বিদ্যালয়ের মিষ্টেস সে। তাছাড়া টিউশনিও আছে।

ওঃ, এই সেই রেবা—যার একটু সান্নিধ্য পেলে ধন  
হয়ে যেত যে কোন যুবক! তাদের ঘরের আবহাওয়া ছিল  
আভিজাত্য ধর্মী। রেবার বাবা ছিল গণ্যমান্য ব্যক্তি—  
উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। রেবার জীবন ছিল সহজ-  
সুন্দর। উদ্গত অশ্রু গোপন করে শ্রীমন্ত। অদৃষ্ট!  
অদৃষ্টের রহস্য বোঝা বড় শক্ত—আসলে বোঝাই যায় না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বসে আছে শ্রীমন্ত। রেবাও।  
অতি সন্তর্পণে চাইল রেবা শ্রীমন্তর দিকে। রেবার সিঁধি  
সিঁহুর-রাঙা নয়—সিঁহুর মুছে গেছে। যে সিঁহুর নারী  
জীবনের চরম সার্থকতা।

—মা!—একটি ছেলে ছুটতে ছুটতে এলো বই খাতা  
নিয়ে।

—এস বাবা! মোহাগ-ভরা ডাক রেবার কণ্ঠে।  
একরাশ কালো চুল ছেলেটির মাথায়—সুখী মুখ তার।  
ডাগর দু'টি বুদ্ধিদীপ্ত চোখ।

—হাউ বিউটিফুল বয়!—শ্রীমন্ত বলে ফেলে।

—ও আমার ছেলে শ্রীমন্ত। ও হবার পরেই ওর  
বাবা মারা যান। গৌতম ওর নাম।

—গৌতম!

—হ্যাঁ, গৌতম—রেবার কণ্ঠস্বর একটু কঁপে গেল।

—মনে পড়ে রেবা—

রেবা চমকে ওঠে।

—পড়ে! তোমার দেওয়া নামই বেখেছি শ্রীমন্ত—  
অতীতের আশীর্বাদ।

—কথা ছিল, আমাদের ছেলে হলে তার নাম রাখব  
গৌতম, আর মেয়ে হলে গোপা।

—শ্রীমন্ত, যেচেই আমি তোমার প্রেমে পড়ি।  
বাঁধার স্বপ্নও দেখেছিলাম ছ'জনে, কিন্তু সে স্বপ্ন সার্থক  
হয়নি।

—রেবা তবুও আমি পেয়েছিলাম একটি নারী, আর  
তার ভালবাসা। সহজ-সুন্দর প্রেরণাময়ী একটি নারী।

নিঃস্ব মায়াবর পরিবার। সান্নিধ্য ছিল ঘর, কামনা

জাগানো, যৌবনের তৃষ্ণা জাগানো। আমার মরু-জীবনে তুমি ছিলে মরুস্থান। কিন্তু সব ভুল রেবা। এখন তোমার বাড়ীতে এসেছি অতিথিরূপে। তুমি এখন নিরপেক্ষ। আচ্ছা রেবা, এখন আর ঘর বাঁধা যায় না? বলে ফেলে শ্রীমন্ত নিজের অগোচরে!

শিউরে ওঠে রেবা। তার পরেই কঠিন কণ্ঠে বলে—না, তবে তোমার বক্তব্য আমি সোজা ভাষায় বুঝিয়ে দিচ্ছি।

—না-না রেবা, বক্তব্য আমার কিছু নেই। কোনদিন থাকেনি, আজও নেই। তাছাড়া আমি চলে যাব একটু পরে—একটু বসি এই আর কি। এমন বলিষ্ঠ ভালবাসার আশ্রয় কিছুকণের অতিথি। উষর মরুর মত আমার জীবন।

রেবার চোখের পাতা ছুঁটো ততক্ষণে জলে ভারি হয়ে গেছে।

—রেবা আমার অসহায় ভাব তোমার ভাল লেগেছিল—এই ভাল লাগা রূপান্তরিত হয়েছিল ভালবাসায়। ভালবাসা—ছোট করে হাসে শ্রীমন্ত।

—তোমার শিক্ষাদীক্ষার কাছে আমি ছিলাম সামান্য মৃন্ময় পাত্র, কাজেই আমার পক্ষে তোমাকে পাওয়ার আশা ছিল সূদূর পরাহত। তিলে তিলে শুকিয়ে মরেছি—তবুও তোমাকে দেখে হাসতাম। তুমিই বলেছিলে—আমাকে দেখে তুমি কেবল হাসবে শ্রীমন্ত—তোমার হাসি অদ্বুত মিষ্টি। তোমাকে হারানোর সম্ভাবনা বেদিন বুঝতে পারি সেই দিন-ই বেরিয়ে পড়ি পথে—একটানা বিনপিল পথ। ভেবেছিলাম, তোমাকে ভুলে যাব—কিন্তু ভাবা যত সহজ ভোলা তত সহজ ছিল না।

—দিনের পর দিন এমনি চলে যাচ্ছিল। মদ খেতে শিখি—মদ আর মদ। নেশায় চুর হয়ে থাকতাম। টাকা। টাকার বড্ডো দরকার হতে লাগল। শেষে চুরি করতে শুরু করি।

—তুমি চোর শ্রীমন্ত!—রেবার কণ্ঠে বিস্ময়—চোখে জল।

—চুরি সমানে করে চলেছি—এই আমার নিয়তির নির্দেশ। আমার নিয়তি। একদিন চুরি করতে গিয়ে

ধরা পড়ি হাতেনাতে—তারই ফলে ৬ মাস শ্রীঘরে বাস করতে হল। ৬ মাস পরে ছাড়া পেলাম। আবার সেই বিগত জীবন। মদ আর চুরি।

রেবার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চোখে তার জল। শ্রীমন্ত বলে চলেছে নিজের কাহিনী। দূরত্ব বাঁচিয়ে বসেছে রেবা।

—রেবা, আজও পুলিশে আমাকে তাড়া করছে ধরবে বলে। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলাম, কোনরকমে পালিয়ে এসেছি।

রেবা ভয়ে কাঁপতে থাকে।

—ভয় নেই রেবা, তোমার কোন বিপদ হবে না। আমি চলে যাব আঁধার নামলে।

—না, তোমার আর যাওয়া হবে না এই বিপদের মধ্যে—রেবার কণ্ঠস্বর দৃঢ় শোনার। রেবার উদাস-দীঘল চোখে শ্রাবণ-নদীর বস্ত্রা নামে।

—না রেবা, তা হয় না—স্মান মুখে হাসি টেনে বলে শ্রীমন্ত।

—এই দেখ, সন্ধ্যা হয়ে গেল। তোমার চা নিয়ে আসি—বলে রেবা উঠে পড়ে। উদ্গত দীর্ঘশ্বাস গোপন করে শ্রীমন্ত।

সন্ধ্যার আঁধার নেমেছে।

উঠে পড়ে শ্রীমন্ত। অতীতের স্মৃতির সুরের সুরমা মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুরণিত হতে থাকে।

রেবা চা নিয়ে এসে দেখে শ্রীমন্ত নেই।

—শ্রীমন্ত!

রেবার হাত থেকে ডিস সমেত কাপটা পড়ে যায়। সারা মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ে ভাঙ্গা কাপ-ডিসের টুকরোগুলো।

পাশের ঘর থেকে গৌতম ছুটে আসে।

—মা! মামা.....

—মামা চলে গেছে বাবা।

—কেন মা? সরল-সহজ প্রশ্ন আগে শিওকণ্ঠে।

এই কেনর কি উত্তর দেবে তাই ভাবছে রেবা—  
ভাবছে—শুধু ভাবছে।



আহারের পর  
দিনে দু'বার..

দু'ব প্রাত্তনে  
প্রাণ্য নাড়ের  
শ্রেষ্ঠ উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান



মহাদ্রাক্ষারিষ্ট  
(৬ বৎসরের পুরাতন)

মৃতসঞ্জীবনী

সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র  
ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদ-  
আচার্য, ৩৬, গোয়া ল পাড়া  
রোড, কলিকাতা-৩৭



অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,  
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লন্ডন),  
এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর  
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-  
দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার  
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-  
দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি,  
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ করিতে অত্যধিক  
ফলপ্রসূ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও  
বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্রে সেবনে  
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে  
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ  
স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।



# ইঠাং আলোর বলকানি

( গল্প )

সুদন্ত

বুড়িতে কাক-ভেজা হ'য়ে নিউ হোষ্টেলের দোতলায় উঠলাম। ছ'-নম্বর ঘরের দরজাটা বন্ধ ছিল। আন্তে একটু ধাক্কা দিতেই ভেজান দরজাটা কোনরকম আর্তনাদ না করেই সাদর আহ্বান জানাল আমার। আমি গিয়েছিলাম শুভেন্দুবিকাশের খোঁজে। শুভেন্দু ছিল না, কোথায় গিয়েছে কে জানে! ঘরের মধ্যে কেবল রবি ছিল। ইরাজীতে যাকে বলে ইন্টিমেট ফ্রেন্ড, রবি আমার সেই-রকম বন্ধু। তবে ওর সঙ্গে পরিচয়টা আমার অল্প দিনের। বিছানায় উপুড় হ'য়ে শুয়ে বকের তলায় বালিশ গুঁজে আকাশ ভাঙা বুড়ির দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল ও। বুড়ি দেখছিল। বুঝি না বর্ষাকালকে কবিতা কেন সুন্দর বলেছেন। আমার কাছে বর্ষাকালটা একটা অভিশাপ আর বিষাদাচ্ছন্ন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করার জন্তু শ্রীমাদিকাকে বর্ষাকালে সবচেয়ে বেশি কষ্ট করতে হয়েছিল। তবুও বৈষ্ণব কবিতা বার বার বর্ষাভিসারের ছবি এঁকেছেন বিনা বিধায়। তবে তাঁদের চোখে কল্পনার রঙিন চশমা ছিল। কেবলমাত্র বৈষ্ণব কবিদের কথাই বলছি কেন, বাংলাদেশের প্রায় সব কবিরাই তো বর্ষার নামে আহা-উহু করেন। তবে একথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, বর্ষার মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে। আমার পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে উঠলো রবি। বিছানার উপর উঠে বসলো আমার দেখে।

প্রশ্ন করলাম ওকে—আর সব কোথায়?

—রূপ কথায় 'গাইড' দেখতে গেছে।

—তুমি যাওনি কেন?

—হিন্দী বই আমার ভাল লাগে না। আরে, তুমি যে একেবারে ভিজে গিয়েছ।—আমার দিকে ভাল করে তাকাল ও।

—ভিজতে কিন্তু বেশ মজা লাগছিল।

ব্যঙ্গ করল ও।

—তুমিও তো বাবা বুড়ির প্রেমে মজে গিয়েছিলে।

—আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। তুমি প্যান্ট-জামাগুলো খুলে ফেলো। নাও, এই লুঙ্গিটা পড়ে নাও। আমার দিকে একটা লুঙ্গি এগিয়ে দিলো ও।

জামা-প্যান্ট খুলে ছাঙারে টাঙিয়ে দিলাম। লুঙ্গিটা পরে নিয়ে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লাম ওর বিছানায়।

রবি জিজ্ঞাসা করল, কি খাবে, চা না কফি?

নিম্পৃহ ভাবে উত্তর দিলাম, গরম কিছু একটা হলেই হ'লো।

রবি নেমে গেল একতলার। একতলার ওদের ডাইনিং হল। ডাইনিং হলেই একটা ক্যান্টিন খুলেছে ঠাকুর-চাকররা মিলে। আমি আন্তে আন্তে চৌকি থেকে নেমে পায়ের পায়ের ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে এলাম। রেলিং ধরে দাঁড়ালুম ঝুল বারান্দার এক কোণে। বুড়ির বেগ কমে এসেছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া বইছে। বুড়ির ছোট ছোট ফোঁটাগুলোকে মনে হচ্ছিল শরতের শিউলি। একটি একটি করে ঝরে যাচ্ছে। আশ্রয় নিচ্ছে মাটির কোলে। হারিয়ে ফেলেছে নিজদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বটুকু। নীচের উঠানে সাজানো দেশী বিদেশী ফুলের গাছ। হোষ্টেলের সুপারিন্টেনডেন্ট সুকুমার চৌধুরী বড় শখ করে বাগানটা তৈরী করেছেন। ভদ্রলোক নিঃসন্তান, স্ত্রীর সান্নিধ্যও পান না সব সময়। তাই তিনি খেয়ালী, বড় বেশী খেয়ালী। কাঁধে একটা বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শে স্থান-কাল সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠলাম। রবি কখন আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল টের পাইনি। রসিকতা করলো ও, এই না হলে লেখক! এই জন্তেই তো মেয়েরা তোমাকে পছন্দ করে।

কপট রাগে চোখ রাঙালাম আমি। রবি হাত জোড়

করে মাথা চাটিলো। এই ক্রমা চাটবার ভঙ্গি দেখে কখন

ফেললাম আমি। ও-ও হেসে উঠলো জোরে।

গলা জড়াজড়ি করে ঘরে ঢুকলাম দুজনে। দরজাটা ভেজিয়ে দিল ও। কফি খেলাম আমরা। সিগারেটে ছোট ছোট টান দিয়ে বাদলা বিকেলটাকে উপভোগ করতে লাগলাম। বিস্তীর্ণ ধান ক্ষেতের দিকে চোখের দৃষ্টিটাকে ছুঁড়ে দিয়ে রবি ধোঁয়ার রিং করতে লাগলো। আমি কোন কথা বলছিলাম না। পাছে নীরবতার মাধুর্যটুকু নষ্ট হয়ে যায়। রবিও চুপ করে বসেছিল। আমি ওর টেবিল থেকে রাজা ও রানী বইটা নিয়ে এলোমেলো ভাবে পাতা ওলটাতে লাগলাম।

ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে রবি বললো, একটা গল্প শুনবে শোভন? না, গল্প নয় জীবন কাহিনী, শুনবে?

ওর কথায় অবাক হলাম আমি। ওকে আজ সম্পূর্ণ অচেনা মনে হ'লো। আমি বললাম, বলো না। বৃষ্টি-ঝরা বিকেলটার একঘেয়েমি কিছুটা কাটবে।

—তোমাকে আমি বলব। তুমি লেখক, তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে আমার মনের ব্যথাটা। তুমি হয়তো একটা গল্পই লিখে ফেলবে এটা নিয়ে। গল্প লেখ, আপত্তি নেই; কিন্তু দেখ, রোম্যান্টিক প্রেম-কাহিনী লিখে ফেল না। তোমায় তো সব গল্পই রোম্যান্টিক কমেডি; আমার কাহিনীটা কিন্তু ট্রাজেডি। যদি শুনতে চাও তো বলতে পারি।

—বলোই না, বলছি তো শুনবো।

আবার একটা সিগারেট ধরালো রবি। শুরু ক'রলো ওর গল্প।

আমরা বড়লোক নই, আবার গরীবও নই। বাংলা দেশে মধ্যবিত্ত বলতে যা বোঝায় আমাদের স্থান ঠিক সেই পর্যায়ে। একান্তবর্তী পরিবারে নিতান্ত অবহেলায় মানুষ হয়েছি আমি। আগাছার মতো বেড়ে উঠেছি শৈশব আর কৈশোরের মধ্য দিয়ে। সংসারের কারো কাছ থেকে পাইনি স্নেহ। মা-মরা ছেলেরা কি কোনদিন স্নেহ পায়? মাকে আবছা মনে পড়ে আমার। আমার বড় ভালবাসতেন তিনি। তিনি মারা গেলেন, আমার একা ফেলে রেখে পালিয়ে গেলেন পৃথিবী থেকে। মা মারা যাওয়ার পর সবাই যেন কেমন হয়ে গেল। আমি সবার

মধ্যে নিতান্ত দীনহীন ভাবে জীবনের অনেকগুলো দিন পার করে দিয়ে স্কুল ফাইনাল দিলাম আমি। পাসও করলাম। এবার সংসারের গোমবা মুখে দেখা দিল হাদির আভাস। ধমধমে কালো মেঘের মাঝে যেমন ঝিলিক মারে বিদ্রোহের ছাতি। তবে হ্যাঁ, আমার বিজ্ঞ জীবনে একজন এগিয়ে এসেছিল সুধার পাত্র হাতে নিয়ে। ভরিয়ে দিয়েছিল আমার সকল শূণ্যতা।

আমার মরুময় জীবনের একমাত্র আকর্ষণ ছিল নীমা। আমি জীবন-মরুর বুকে পেয়েছিলাম মরুত্বানের সন্ধান। নইলে আমি বাঁচতে পারতাম না। অর্থাৎ সবার অবহেলা আর বিজ্ঞপের পসরা মাথায় নিয়ে বেঁচে থাকা আমার দ্বারা সম্ভব হ'ত না। আমাকে হয়ত আত্মহত্যা করতে হ'ত। বিশ্বাস করো শোভন, মা মারা যাওয়ার পর নীমা ছাড়া আর কারো কাছ থেকে ভালবাসা পাইনি আমি। পাইনি সান্ত্বনা। তাই ওকে পেয়ে বড় সুখে ছিলাম। মনের কোণে জমা হওয়া ব্যথাগুলোকে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

কিন্তু সুখ জীবনের কতটুকু অংশই বা জুড়ে থাকে। নীল গগনের বুকে সাত রঙা ইন্দ্রধনু বড় সুন্দর, কিন্তু সেটা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। শরতের সকালে ঘাসের বুকে জমা হওয়া শিশির কণাগুলো সূর্যের আলোয় হীরের মত জ্যোতি ছড়ায়। কিন্তু কতক্ষণ? সুখ যে ঐ সাত রঙা রামধনু আর ঘাসের কোলে জমা হওয়া শিশির কণার মতোই সুন্দর, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। জীবন-তৃষ্ণা উত্তপ্ত মরু-বালিতে পথ হারিয়ে ফেলে, আশার কোমল কুঁড়িটা এব-ধাকায় বৃন্তচ্যুত হ'য়ে লুটিয়ে পড়ে, স্বপ্নের মহিমান প্রাসাদটা দেখতে দেখতে মাটিতে মিশে যায়—এইতো মানুষের

কালিদাস রায়, কবিশেখর সম্পাদিত

## কুত্তিবাসী রামায়ণ

দ্রুত শব্দের পাদটীকা সম্বলিত সচিত্র সংস্করণ। ভাল কাগজে ছাপা। মূল্য ১০ টাকা মাত্র।

জীবন! আমারও সুখের দিন ফুরিয়ে গেল।

জানো শোভন, আমি সব ভুলতে পারব। কেবল পারব না সীমার কাছ থেকে বিদায় নেবার স্মৃতিটাকে।

এখানে চ'লে আসার আগের রাতে মাহুর বিছিয়ে শুয়েছিলাম দাওয়ায়। সবাই অকাতরে ঘুমচ্ছিল। কেবল ঘুমতে পারিনি আমি। কি করে ঘুমব? আমাকে যে মিত্তিরদের 'আদিরে তালনা' ঘাটে যেতে হবে সীমার সঙ্গে দেখা ক'রতে। ও আসবে ব'লেছে। বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ানাম আমি। খাপদ পদক্ষেপে হাঁটতে শুরু করলাম মিত্তির পাড়ার দিকে। তাড়াতাড়ি পৌছবার জন্তে আলোর পথ ধরলাম। বা অন্ধকার! চলতে গিয়ে বার বার হোঁচট খেতে লাগলাম।

আখিন মাস। কাঁচা পাকা আউস ধানের শিবগুলো মুহূর্তে হাওয়ায় লুটিয়ে পড়ছিল একে অগ্নের গায়ে। আমার গায়েও মাঝে মাঝে আছাড় খাচ্ছিল ধান গাছগুলো। চোরকাঁটার আঁচড়ে পাঁটা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল। তবুও আমার খেয়াল ছিল না। আমার অশান্ত হৃদয়-সমুদ্রে বার বার ভেসে উঠছিল সীমার অপূর্ব লাবণ্যমাখা মুখটি, আর দীঘির কাল জলের মত স্বচ্ছ টলটলে গভীর চোখ দু'টা। রাতজাগা পাখীগুলোকে সাক্ষী রেখে শান বাঁধান ঘাটের পাড়ে বুড়ো শিউলি গাছটার তলায় দাঁড়ানাম আমি। সীমা তখনো আসেনি। ওকি আসবে না? না না, তা কি করে হয়! ওতো বলেছে আসবে। দিনের আলোর আমাদের দেখা হওয়া সম্ভব নয়, তাই ও আসবে রাতের গভীর অন্ধকারে। আমাদের প্রণয় ছিল গুপ্ত। চোরা-বালির তলায় জলের মত। বেশীক্ষণ অপেক্ষা ক'রতে হ'ল না। সীমা এলো কাঁপতে কাঁপতে। বুঝলাম একা আসতে ভয় পেয়েছে ও। শিউলি গাছের তলায় বসলাম দু'জনে। দু'জনে অনেক কথা বললাম। যার নাম প্রেমালপ। একটা একটা ক'রে শিউলি ঝরছিল। আর মাঝে মাঝে পেঁচার ডাক শোনা যাচ্ছিল দূরের কোন তাল গাছের মাথা থেকে। ওকে আমি আস্তে আস্তে টেনে আনলাম আমার তৃষিত বুকের মাঝে। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম খেয়াল নেই। এক সময় সীমা ব'ললো, আর নয়। চলো। ওর কথায় সময় সবকিছু সচেতন হ'লাম আমি। দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে হাঁটতে শুরু করলাম। ওকে

বাড়ীর দেউড়িতে পৌছে দিয়ে, আমি বাড়ী ফিরে এলাম। দাওয়ায় শুয়ে পড়লাম ক্লান্ত হ'য়ে। ভরা মন নিয়ে আকাশের তারা গুনতে গুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম একসময়ে।

পরদিন সকালেই ট্রেন ধ'রলাম। সীমাদের বাড়ীর সামনে দিয়েই ষ্টেশনে যাওয়ার রাস্তা। ওদের বাড়ীর সামনে দিয়ে আসবার সময় দেখলাম বরের ডানলার ধারে বসে আছে সীমা। তাকিয়ে আছে রাস্তার পানে। আমাকে দেখেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল ও। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। আমি ওর সেই অশ্রুভেজা চোখ দু'টোকে আজও ভুলতে পারিনি। কত চেষ্টা ক'রেছি, কিন্তু মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি সীমাকে। হয়তো কোনদিনই পারব না। তাই তখন ভাবছিলাম ওকি আমার জন্য আজও অপেক্ষা করছে।

রবির শেষ কথাগুলো কান্নার মতো শোনালো। এক ঝলক বিদ্যুতের আলো ওর মুখে এসে পড়লো। দেখলাম, ও গভীর হয়ে উঠেছে।





# জীবনায়ন

( গল্প )

ভিলোন্তমা দেবী

অন্ধকারে ও হাঁটছে। রেল-লাইনের বুকের ওপর দিয়ে কাঠের সিপারে পা রেখে রেখে নির্ভয়ে হাঁটছে প্রণব। পৌষের এ শীতের রাতে অসংকোচ পদক্ষেপে চলতে চলতে রেল দপ্তরের বহু প্রচারিত সেই বিজ্ঞাপনটার কথা ওর এখন মনে পড়ে গেল। দৈনিক পত্রিকার প্রায় অর্ধ-পৃষ্ঠা জুড়ে যে বিজ্ঞাপনটা মাঝে মাঝে ছাপা হয়ে থাকে।

.....ছোট্ট একটা শহর। দুটো রেল-লাইন সে শহরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দূরান্তে কোন এক অদৃশ্য বিন্দুতে মিলে গেছে। হু'জন মাঝ বয়েসী ছেলে সে লাইন ধরে গল্প করতে করতে আপন মনে চলেছে। একটা গাড়ী ওদের অসম্মততাকে সজাগ করতে করতে এগিয়ে আসছে ওদের দিকেই। ছবিটার তলায় বড় বড় হরফে লেখা, 'মাত্র ক'টা মুহূর্ত বাঁচানোর জন্তে জীবন হারানোর ঝুঁকি নেবেন না।' আজ এ হিম-ঝরা রাতে ঐ বিজ্ঞাপনের সতর্কতার কথা ভেবে মনে মনে হাসি পেল প্রণবের। ঐ বিজ্ঞাপনটা আজ প্রণবের কাছে নিতান্তই অর্থহীন। শহরের কল-কোলাহল ছেড়ে ও যে এখন নির্জন এ লাইন ধরে হাঁটছে একা একা তাতে ওর সময় বাঁচানোর তাগিদ নেই কোন। এটা ওর গন্তব্যের সংক্ষিপ্ত কোন পথও নয়। জীবন বাঁচানোর সব দার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্তেই ও আজ ছুটে এসেছে এখানে।

হিমেল উত্তরে বাতাসটা হিমাক্ষের শৈত্যতা নিয়ে ছুটে চলেছে। ফাঁকা রেল-লাইনের ওপর দিয়ে ছুটেতে ছুটেতে থেকে থেকে একটা আওয়াজ তুলছে অক্ষুট। প্রণবের মনে হ'ল শীতের ভীততায় গলাটা এবার জমে কাঠ হয়ে আসছে। হয়তো আর কিছুক্ষণ পর অনেক চেষ্টা করলেও ও কথা বলতে পারবে না। মনের সব অব্যক্ত কথা কণ্ঠ-নালীর ছাড়পত্র না পেয়ে মনের মাঝেই মাথা কুটে গুমরে মরবে। প্রণব একটু দাঁড়ালো। পেছন ফিরে দেখতে চেষ্টা করলো রেল-স্টেশনটাকে। একটু আগে যেখান থেকে ও যাত্রা শুরু করেছিল। গাঢ় অন্ধকারের মৌন যবনিকার অন্তরালে স্টেশন বাড়ীটার অস্তিত্ব মিশেমিশে-

একাকার। শুধু প্ল্যাটফর্ম জলে থাকা ক'টা বিজ্ঞপী বাতি মিটিমিটি আলো ছুড়ছে। যেন ওরা স্টেশনের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। আর ক'টা রক্তচক্ষু সারারাত জেগে জেগে ওদের কর্তব্য করে যাবে নিঃশব্দে। ট্রেনটা আসতে এখনও অনেক দেরি। স্টেশন ছেড়ে আসার আগে প্ল্যাটফর্মের ঘড়িটার ও দেখে এসেছিল ঠিক ন'টা। এটুকু পথ আসতে কত সময়ই-বা লাগতে পারে। বড় জোর দশ মিনিট। ন'টা দশ। অথচ ট্রেনটা আসবে ন'টা চল্লিশে। এমনকি দেরি হতে পারে আরও। রাতের এ শেষ ট্রেনটা মাঝে মাঝে প্রায়ই নাকি দেরি করে। অন্ততঃ এখনও চল্লিশ মিনিট। কদর্যতা আর অবিধানে ভরা এ ছুনিয়ার বুক বসে এখনও তিরিশটা মিনিট পকিলতার দূষিত বাতাস শুঁকতে হবে।

প্রতীকার দৈর্ঘ্যতার কথা ভেবে প্রণব মনে মনে অধৈর্য হল। কারণ অবুখ মনটা এখনও মাঝে মাঝে সীতার কথা ভাবতে চাইছে। অথচ আজ সীতাকেই ভুলতে চায় প্রণব। সীতার বাস্তব সব স্মৃতিকে মুছে ফেলতেই প্রণব নিজেকে মুছে ফেলতে চাইছে ছুনিয়ার বুক থেকে। অথচ বিয়ের পর গত চারটে বছর সীতাই ছিল প্রণবের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার একমাত্র অংশীদার। জীবনের সব জটিলতার কথা, আশা আকাঙ্ক্ষা আর বিধা বন্দের কথা এতটুকুও গোপন করেনি প্রণব সীতার কাছে। অথচ সে সীতা আজ কোথায়!

সীতাকে প্রণব অবিধাস করেনি কোনদিন। এ ছুনিয়ার সব কিছুকেই প্রণব এতদিন বিধাসের চোখে দেখতো। তাই পাশের বাড়ীর সুনীতের সঙ্গে সীতার স্বাচ্ছন্দ্য মেলামেশাকে ও কোনদিন দৃষ্টির আবচ্ছতা দিয়ে বিচার করতে বসেনি। অথচ সে বিধাসের মর্য়াদা ওরা রাখলো কই! ভালবাসার কিইবা মূল্য পেল প্রণব সীতার কাছে থেকে!.....হঠাৎ খেয়াল হলো প্রণবের অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে সে এক জায়গায়। স্টেশনের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ও এতক্ষণ সীতার কথাই ভাবছে।....আবার সীতা।

সীতার কথা মনে হতে চকিতে ও ক্ষিপ্ত হল। আবার ও এগিয়ে চললো। চলার প্রতি পদক্ষেপে হত্যা করতে চাইলো সীতার সব ভাবনাগুলো। লাইনের দু'পাশে ঝোপে ঝোপে জলছে লক্ষ লক্ষ জোনাকি। সে আলোর রোশনাইতে নহবত ধরেছে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ঝিঁঝি পোকার দল, অন্ধকারে নির্দিষ্ট পথের নিশানা ধরে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল ক'টা নিশাচর। ওদের পাখার আওয়াজ অন্ধকারের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভেসে আসছে।

আসলে এ পৃথিবীতে কেউ কাউকে ভালবাসে না এক-মাত্র নিজেকে ছাড়া। অথবা নিজের প্রয়োজনের তাগিদে প্রবৃত্তির তাড়নায় অপরের কাছ থেকে শুধু সুবিধাটুকু আদায় করার চেষ্টায় একে অপরকে অপরিণীত ভালবাসার ভান করে। সীতা এতদিন অন্ধ করে রেখেছিল প্রণবকে ভালবাসার নিখুঁত অভিনয়ে। আজ সে অভিনয়ের পালা সাজ হল। সুনীত দিল্লীতে সরকারী দপ্তরে পদস্থ চাকরি পাওয়ার সীতা ওর অভিনয়ের একটা অঙ্কের যবনিকা নিজের হাতে টেনে দিয়ে গেল। কে জানে হয়তো দিল্লীর মাটিতে আবার নতুন করে আরম্ভ হবে জীবন-নাটকের আর এক অঙ্ক।

আজ অফিস থেকে ফিরতে একটু দেরি হয়েছিল প্রণবের। গলির মোড়ের গ্যাসের বাতিটা বাতিওয়ালা জেলে দিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সামনের বাড়ীর দেউড়ির হিন্দুস্থানীটা সুর করে তুলসীদাস পড়ছে মাথা নেড়ে নেড়ে। ক'জন স্বজাতীয় ওকে ঘিরে বসে আছে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে। থেকে থেকে ওর দীর্ঘশ্বাস পড়ছিল। অথচ আশ্চর্য, প্রণব দেখলো ওদের ফ্ল্যাটটা তখনও অন্ধকার। ও ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে বাতিটা জ্বালালো। তারপর শব্দ করে জুতো জোড়া খুলে ফেললো। তবুও সাড়া পাওয়া গেল না সীতার। ক্লান্ত দেহে ক্রমে মনের উত্তাপটা সংক্রামিত হতে লাগলো। হঠাৎ নজরে পড়লো টেবিলের ওপর পড়ে আছে এক টুকরো সাদা কাগজ। কাচের রঙিন পেপার ওয়েটের তলায়। প্রণব কাগজটা তুলে আলোর সামনে মেলে ধরলো। তাতে লেখা,—‘আমি সুনীতের সঙ্গে চললাম। মিথ্যে আমার খোঁজ করো না। আমার পাবে না।’ মুহূর্তে একটা শিহরন খেলে গেলো প্রণবের সমস্ত দেহে। সীতা, এটা কি সীতার হাতের লেখা! তা হ'লে....? হঠাৎ প্রণবের মনে হল,

ঘরের বিজলী বাতিটা যেন ওর ঔজ্জ্বল্য হারাতে শুরু করেছে। প্রণব যেন আর এখন দেখতে পাচ্ছে না কিছু। এই ঘর, ঐ আলনা, ঐ আলমারি সব ঝাপসা অন্ধকার! চেয়ারটা ধরে কোনরকমে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করলো প্রণব।

এ ছনিয়ার প্রতিটি সংসারই দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। শৈশবে শত সহস্র ভয় ভাবনাকে এড়িয়ে চলতে আমরা মাতা-পিতার কোলে মুখ লুকোই পরম বিশ্বাসে। যৌবনে সংসারের সব দায়-দায়িত্ব আর মনের সব গোপনীয়তা জীব হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিত হই। বার্ষিক্যে পুত্র-কন্যার কাছে নিজেকে একান্তে সঁপে দিয়ে শান্তি খুঁজি। এ বিশ্বাসের মাঝে কোথাও যদি প্রবঞ্চনা ঢোকে এতটুকু, তাহলে সংসারে শান্তি থাকে না।

হঠাৎ এক টুকরো হাসির শব্দ কানে আসতে প্রণব উঠে দাঁড়ালো। দেখলো লাইনের পশ্চিম দিকে অনেকগুলো বাতি জলছে ইতস্ততঃ। আর ডাঙা অমুচ্চ দেওয়ালের গায়ে পিঠ দিয়ে এক পাল মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রণব ওদের চিনলো। দিনের সব হাট-বাজারের বিকিকিনি শেষ হয় যখন, তখন এ বাজারের দরাদরির প্রথম কিস্তি শুরু হয়। প্রণব ওদের ঘৃণা করতো মনে মনে। হয়তো বা ভয়ও পেত। ওরা সংসারের অনেক সর্বনাশের মূল। পৃথিবীর অনেক দুঃস্বপ্নের ব্যাধির প্রচারক। অথচ প্রণব আজ এতটুকুও শঙ্কিত হ'ল না। বরং কি এক কোতুহল ওকে গ্রাস করলো তৎক্ষণাৎ।

প্রণব রেল-লাইন ছেড়ে নেমে এলো নিচে। অভিজ্ঞ ক্রেতার মত একটা মেয়ের হাতে ধরা আলোটার একান্তে এসে দাঁড়ালো। তারপর নিজের হাতেই আলোটা মেয়েটার মুখের কাছে এগিয়ে নিয়ে কি যেন দেখলো একপলক। কি ভেবে হাতটা বোধহয় একবার কেঁপে উঠেছিল। হাতের আলোটা মাটিতে পড়ে যেতে প্রণব কোনরকমে ধরে ফেললো। হারিকেনের কাচটা ভীষণ উত্তপ্ত। তবুও সে উত্তাপে হাত ছুটো ওর পুড়লো না এতটুকুও। বরং মনে হল কোন এক শীতের রাতে ওর বরফ ঠাণ্ডা হাত ছুটো উষ্ণ করে নিজে ও যেন সীতার কবোঞ্চ বৃকের গভীরতার হাত রেখেছে। মেয়েটি এবার প্রণবের মুখের পানে তাকালো। প্রণব মুখে কোন কথা



বললো না। শুধু চোখের ইঙ্গিতে এগিয়ে যেতে বললো। সরু দেড় হাত চওড়া একটা গলি ধরে ওরা এগিয়ে চললো। ডান দিকে ছোট ছোট অনেকগুলো ঘর। কোন কোন ঘর থেকে এক টুকরো অতি স্নান আলো এসে লুটিয়েছিল সেই সরু পথের ওপর। কোন কোন ঘর একান্ত অন্ধকার। মেয়েটি অমনি একটা ঘরে ঢুকলো। এক দরজাওয়ালা ছোট একটা ঘর। ঘরের মাঝখানে একটা চৌকি পাতা। ছ' বালিশওয়ালা নির্ভাজ বিছানাটা দেখে মনে হয় ওটা এখনও অকলঙ্কিত। বিছানাটার মাথার দিকে একটা জানলা। আর দেওয়াল জুড়ে ক'জন মহাপুরুষের কাচের ফ্রেমে বাঁধানো ছবি।

প্রণব নিজেকে হঠাৎ এ পরিবেশে চিন্তা করে শঙ্কিত হল। এ আজ করছে কি প্রণব! জীবনের সত্যতা আর সকল সংঘম আজ বিকোতে বসেছে ও কিসের মূল্যে? যাদের ও মনে করতো সমাজের কলঙ্ক বলে, যাদের ও সামান্যতম দয়া দেখাতেও ঘৃণা বোধ করতো—ও আজ তাদেরই ঘরে! প্রণব ভয় ভয় চোখে একবার মেয়েটির দিকে তাকালো। ও তখন ছ'হাত মাথার ওপর তুলে কুস্তল পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিল। আর অপান্দে প্রণবের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছিল মুহু মুহু। চুল বাঁধার এ বিশেষ ভঙ্গিটা দেখে প্রণবের আবার সীতাকে মনে পড়ে গেল। প্রণব দেখেছিল সীতাকে ঠিক এমনি ভাবে কতদিন চুল বাঁধতে। নিজের অজ্ঞাতে আবার সীতার কথা মনে আসায় ও উত্তেজিত হল। হঠাৎ কি করবে ভেবে না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে ও টেনে নিয়ে এলো নিজের কাছে। সীতা দেখুক, সীতা জামুক। যে সীতার অশরীরী উপস্থিতি প্রণবের চেতনাকে আচ্ছন্ন করতে চাইছে, সে দেখুক প্রণবও নষ্ট হতে পারে। জীবনে অন্ততঃ একবার ও সীতার বিশ্বাসঘাতকতার প্রশিোধ নিতে পেরেছে।

—বাতিটা কি নিভিয়ে দেব?—মেয়েটি জামার বোতাম কটা খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলো।

—থাক না। কি দরকার নেবাবার?

সে কথা শুনে মেয়েটি একটু হাসলো।

প্রণব বুঝলো কথাটা বলা বোধহয় ঠিক হয়নি। তাই ও চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। কোণে পায়া ভাঙা

টেবিলের ওপর রাখা বাতিটা ও নিজের হাতে নিভিয়ে দিল। অন্ধকার। জমাট অন্ধকার। সৃষ্টির সেই আদিম অন্ধকার এসে গ্রাস করলো দু'জনকে। প্রণব মেয়েটিকে আলতো করে স্পর্শ করতে চাইলো। মেয়েটি ওর আরও একান্তে সরে এলো। প্রণব ওর বুকের কোমলতায় কান পাতলো। আর ওর বুকের স্পন্দনের দ্রুততা শুনে শুনে নিজেকে একান্ত অসহায় বোধ করতে লাগলো। পাশের কোন একটা ঘরে একটা বেসুরো হারমোনিয়ম বাজছিল। সে সুরে গলা মেলাতে একটা মেয়ের অক্লান্ত ব্যর্থ প্রচেষ্টা চলছিল। প্রণব গান-বাজনা ভাল বোঝে না। তবুও ওর মনে হল হয়তো চেষ্ঠা করলে ও ঐ মেয়েটির চেয়ে ভাল গান গাইতে পারবে। দূর থেকে একটা আওয়াজ আসছিল নুপুরের। হয়তো অতিথির মন রাখতে কোন মেয়ে নেচে চলেছে। উঃ ঘরটা কি গরম! প্রণবের মনে হল। অথবা প্রণবেরই শুধু গরম লাগছে এখন। বিন্দু বিন্দু শ্বেদ জমেছে কপালে। পাঞ্জাবিটা গায়ে লেপটে আছে ভেজা কাপড়ের মত। প্রণব এখন খুব পিপাসার্ত বোধ করলো। মনে হল ওর গলা যেন শুকিয়ে আসছে। এখনই একটু জল না পেলে ও হয়তো মারা যাবে তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে। আশ্চর্য! এখনও মৃত্যু ভয়? যে মৃত্যুকে ও খুঁজতে বেরিয়েছে, আজ তার মুখোমুখি দাঁড়াতে তবে ভয় পাচ্ছে কেন! দূরের লোকো সেডে একটা ইঞ্জিন হঠাৎ ক'বার চিংকার করে উঠলো। সে আওয়াজে প্রণব সচেতন হল। মনে পড়লো আজ রাতের শেষ ট্রেনটা আসবে মিক ন'টা চল্লিশে।

ন'টা চল্লিশ! কটা বাজছে এখন? সময় কি পার হয়ে গেছে? গাড়ীটা কি তবে চলে গেছে? প্রণব মেয়েটির বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে উঠে দাঁড়ালো। এখন কটা বাজে একবার জানা দরকার।

—তোমার ঘরে কি ঘড়ি আছে?—প্রণব মেয়েটিকে প্রশ্ন করলো। যদিও ও জানে ঘড়ি রাখার মত ক্ষমতা এদের থাকা সম্ভব নয়।

—হ্যাঁ আছে বাবু।

—আছে! প্রণব একটু আশ্চর্য হ'ল।—দেখো তো ক'টা বাজে।

মেয়েটি উঠে আলোটা জ্বাললো। আলো জ্বলতেই



প্রণব ঘরের চারিদিকে তাকালো। এবার ও ঘড়িটাকে দেখতে পেল। চৌকোনো দেওয়াল গহ্বরে রাখা আছে একটা টেবিল ঘড়ি। প্রণব ঘরে ঢোকার সময় ঘড়িটাকে দেখতে পায়নি। ঘড়ির কাঁটা ছোটো লক্ষ্য করতে পেরে প্রণব ব্যস্ত হল। ন'টা পঁয়ত্রিশ। আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে। এখানে আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা সংগত হবে না। প্রণব ভাবলো মনে মনে।

—আমি এবার বাব। প্রণব মেয়েটিকে বললো।

—সে কি বাবু! এইতো সবে এলেন। এরই মধ্যে? আপকো মজি।

—হ্যাঁ এখুনি আমি যাব। যাওয়া আমার দরকার।

প্রণব পকেট থেকে মনিব্যাগটা বার করলো। ব্যাগটা হাতে নিয়ে কি যেন ভাবলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর ব্যাগটা মেয়েটির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

বাইরেটা কি বিলম্বী অন্ধকার। প্রণব প্রথমে স্পষ্ট কিছুই দেখতে পেল না। একটু পরে আঁধারটা চোখে সয়ে যেতে প্রণব পায়ের তলার রাস্তাটাকে লক্ষ্য করতে পারলো। ওদের ঘরগুলোকে পেছনে ফেলে ও ততক্ষণে লাইনের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রণব দেখলো ক'টা মেয়ে এখনও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের ভাগ্যে এখনও কোন ক্রেতার দাক্ষিণ্য জোটে নি। প্রণব অন্ধকারেও ওদের মুখাবয়বের হতাশ ভাব আন্দাজ করতে পারলো।

মেয়ে কটাকে পেছনে ফেলে প্রণব আরও একটু উত্তরে এগিয়ে গেল। তারপর মাথার ওপরের স্তর আকাশের গায়ে চোখ রাখলো। শীতের দানটে তারা-গুলো কাঁপছিল যেন। তবু ওরা কি সুন্দর! মনে হ'ল আকাশের অগণিত তারারা যেন প্রণবের দিকে তাকিয়ে আছে অপলকে। যেন ওরা ডাকছে প্রণবকে। ছোটবেলার মা বলতেন, মারা গেলে সবাই নাকি আকাশের গায়ে এক একটি তারা হয়ে ফোটে। ছোট বয়সে সে কথাটাকে প্রণব সত্যি বলে মনে নিয়েছিল। তারপর স্কুলে ঢুকে প্রণব জেনেছিল কথাটা মায়ের নেহাতই মনগড়া। কিন্তু আজ এই প্রশান্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে

অন্ততঃ সে কথাটাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করতে লাগলো। মনে হতে লাগলো প্রতিটি তারা যেন এক একটি মৃত মানুষের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে। প্রতিটি মানুষের মৃত্যুতে জন্ম হয়েছে এক একটি তারার।

তাই যদি সত্যি হয়, তবে নিশ্চয়ই কোন তারার মধ্যে লুকিয়ে আছে তার মায়ের আত্মা। বাবাও হয়ত আছে এইরকম ভাবে। প্রণব এত নক্ষত্রের ভিড়ে আলাদার করে কাউকে যেন চিনতে পারছে না। এখন না পারুক, আর মাত্র ক' মিনিট পরে ও নিশ্চয়ই সবাইকে খুঁজে খুঁজে বার করতে পারবে। মা, বাবা, বড়দি, সবাইকে। ট্রেনটা ঐ স্টেশনে এসে দাঁড়ালো। আঁধারের বুক চিরে ইঞ্জিনের হেড লাইটের আলোটা লাইনের বুকে আছড়ে পড়েছে। ইঞ্জিনের নিঃশ্বাস ছাড়ার শব্দ প্রণব এখান থেকে স্পষ্ট শুনতে পেল।

লাইনের পাশের সরু পথটা ধরে কে যেন আসছে এদিকে। টার্চের আলো ফেগে ফেলে দ্রুত পায়ের। প্রণব পথ থেকে একটু সরে দাঁড়ালো। লোকটাকে পথ করে দিতে চাইলো। কাছাকাছি এসে লোকটা দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ। তারপর অতি অসম্ভবর মত আলোটা প্রণবের মুখের পরে ধরলো। আলোর জোয়ারে চমকে গিয়ে প্রণব তাড়াতাড়ি হুঁচোখ বুঁজলো। লোকটা কি জানোয়ার! প্রণব মনে মনে রেগে উঠেছে ততক্ষণে।

—আপনাকে খুঁজতেই ছুটে আসছি বাবু। একটা নারীকণ্ঠ প্রণবকে লক্ষ্য করে কথা ক'টা বললো।

—আমাকে? আমাকে কি দরকার! ট্রেনটা বোধহয় আগের স্টেশন ছেড়েছে। 'ডিস্ট্যান্ট সিগনালের' লাল আলোটা রঙ পালটে নীল হয়ে গেছে। ট্রেনটা আসছে। অন্ধকারকে হুঁভাগ করে হেড লাইটটা পথ দেখাচ্ছে।

—আমি রুকমী, বাবু।

—রুকমী! সে কে? আমি তো মারা জীবন সীতা ছাড়া অন্য কাউকে চিনতাম না। সমস্ত জীবন শুধু সীতাকেই ভালবাসতে চেয়েছিলাম।

—বারে! একটু আগে যে আপনি আমার ঘরে গিয়েছিলেন। মনে পড়ে না?

—ও হ্যাঁ। তুমি সে! কিন্তু তুমি এখানে কেন?

—আপনি আমায় ক' টাকা দিয়েছেন বাবু?

—ক' টাকা!—মনে মনে হিসেব করলো প্রণব। আজ মাইনে পেয়েছে তিনশো টাকা। তা' থেকে বড় জোর খরচ করেছিল মাত্র গোটা দশেক টাকা। তা হ'লে....?—কেন, তোমার কি টাকা কম হয়েছে? হয়ে থাকলেও আমার কাছে আর টাকা নেই। আর তো আমি দিতে পারবো না।

—না, না। কম কেন হবে বাবু। এতো আমার সমস্ত মাসের রোজগার। অত টাকা আমায় দিলেন কেন বাবু?

—তা' হোক, তুমি নাও। আমি খুশী হয়ে দিলাম। ট্রেনটা আসছে। প্ল্যাটফর্মকে পেছনে ফেলে ট্রেনটা এগিয়ে আসছে। একটু চেষ্টা করলেই প্রণব ইঞ্জিনটার আবছা অবয়বকে নজর করতে পারলো।

—না বাবু, এত টাকা আমি নিতে পারবো না। আজ সারা রাত থাকলে আমার পাওনা হত দশ টাকা। সে টাকাটাই আমি নিচ্ছি। বাকী টাকা আপনি ফিবিয়ে নিন।

ট্রেনটা এসে গেছে। বগির জানলা দিয়ে বিচ্ছুরিত আলোতে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ে কটা স্নান করছে। প্রণব ব্যস্ত হল। রুকমীর দিকে শেষ বার ফিরে তাকালো।

—রুকমী তুমি টাকা কটা নাও। আমি তোমাকে ভালবেসে ওগুলো দিলাম। আর এখুনি চলে যাও এখান থেকে।

—তা হয় না বাবু। মেয়েটি এগিয়ে এসে প্রণবের হাত ধরলো। আজ আপনার মন নিশ্চয়ই ঠিক নেই বাবু। তাই এ কথা বলছেন। কাল ভোরে মন ঠিক হলে টাকার

জন্তে আমায় হয়তো অভিশাপ দেবেন। বলবেন মেয়েদের ভালবাসলে কেবল ঠকতে হয়। ধরুন আপনার ব্যাগটা।—রুকমী প্রণবের দেওয়া ব্যাগটা তুলে দিল প্রণবের ডান হাতে। এবার আমি যাই বাবু। আর মেরে কপ্তর মাপ কিজিয়ে। আমার নাম রুকমী। নাম করলে সবাই আমার ঘর দেখিয়ে দেবে। মজি হলে আবার আসবেন। নমস্কে।

ট্রেনটা চলে গেল। প্রণবকে পেছনে ফেলে আর রাতের নিস্তব্ধতাকে ধমক দিতে দিতে ট্রেনটা ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। ট্রেনের পেছনের লাল আলোটা অন্ধকারের বুকে তখনও জ্বলছে দপ্‌দপ করে। প্রণব হেরে গেছে। ঐ আলোটার চোখ রাঙানির কাছে হেরে গেছে প্রণব। ও আবার আকাশের দিকে চোখ তুললো।

নিশীথের মৌনভায়ে নিশ্চূপ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আকাশের তারাগুলো জেগে আছে। একটা তারাকে প্রণবের হঠাৎ বড় পরিচিত বলে মনে হল। মায়ের মূখের আদলের সঙ্গে ওটার বড় মিল। সে তারাটা যেন হাসছে মিটিমিটি প্রণবের দিকে তাকিয়ে। প্রণব হাতে ধরা ব্যাগটা আকাশের দিকে তুলে ধরলো। যেন সে ব্যাগটা মাকে দেখাতে চাইলো। তারপর প্রণব ফিরে চললো। লাইনের পাশের সেই সরু পথে হাঁটা পথ ধরে প্রণব এগিয়ে চললো। এখনও প্রণবকে ক'দিন বেঁচে থাকতে হবে। ক'দিন কে জানে! অন্ততঃ হাতের টাকা ক'টা খরচ করা পর্যন্ত তো বাটেই। একটা নিঃশ্বাস বাইরের বাতাসে এসে মুক্তি পেল।

## নিঃশ্বাস

শ্রীকিরণর গঙ্গোপাধ্যায়

আকাশের অকণিমা ডাকে না আমাকে  
ঝড় জল বৃষ্টি সব আদর জানায়—  
অমৃতের কলসী আজ ভরে গেছে পাকে  
জীবন সমুদ্র আজ পূর্ণ যে পানায়।  
বাগানেতে ফোটে ফুল, উড়ে যায় চিল  
সন্মুখের বাড়ী দুটো আকাশেতে বেঁধে :

জীবন আরম্ভ কবে শেষ বা কোথায়  
পঞ্জিকাকে ঘেঁটে ঘেঁটে মেলে না সন্ধান,  
নিয়তির আহ্বান শোনা নাহি যায়  
কোথা হ'তে অতর্কিতে ছুঁড়ে দেয় বাণ।  
মনোবীণা বেজে চলে সংগত-বিহীন  
যে সুর উধালি ওঠে কান পেতে শুনি,

পায় পায় বাঁধা পোষে কাম আসে কলী





৪৬শ বর্ষ

মাঘ, ১৩৭৩

৮ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

ভারতে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন

ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন অসুষ্ঠিত হতে চলেছে। কিন্তু এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হ'ল যে ভোটদাতাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার একান্ত অভাব। পর পর তিনটি নির্বাচন হয়ে গেছে— চতুর্থ নির্বাচনও হতে চলেছে। ভোটের খুঁটিনাটি বিষয় মোটামুটি কারও কাছেই অজ্ঞাত নেই। ভোটের ফলাফল কি হওয়া উচিত, কি হতে পারে আর কি হবে, দৈবজ্ঞ না হলেও মনে মনে অনেকেই সেটা আন্দাজ করতে পারছেন। সেই অসুমান ভিত্তিক করণায় সকলের মনেই একটা গভীর হতাশার ছাপ পড়েছে। তাই এবারের নির্বাচন আর নতুন কোন আশা বা উৎসাহের বাণী নিয়ে

বিগত তৃতীয় নির্বাচনের পর আমাদের দেশে বহু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়ে গেছে। রাজনীতির আব-হাওয়াও ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করেছে। দুজন প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী ও শাস্ত্রীজী পরলোকে গেছেন। চীনের ভারত আক্রমণ ও কাশ্মীরে পাকিস্থানের হানা ইত্যাদি নানা উৎপাতের ঝড় ভারতের মাটির উপর দিয়ে বয়ে গেছে। শাসক গোষ্ঠীর দল হিসাবে কংগ্রেসের মধ্যে বহু ভাঙ্গন ও কোন্দলের ফলে দলীয় ঐক্য অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে। সরকার-বিরোধী কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে দলীয় ও উপদলীয় কোন্দলের ভীষণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অপাজ্ঞানের গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। ডান ও বাম এই দু'দলে পার্টি



নীতি পছন্দ করে এবং বামপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টি চীনাদের সমর্থন করে। আবার বামপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে সম্প্রতি মাও-পন্থী ও লিউ শাও চি-পন্থীর মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়েছে।

বিরোধী দল সমূহের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আভ্যন্তর কোলাহল কংগ্রেসের নির্বাচনে জয়লাভের পক্ষে অত্যন্ত অনুরূপ হয়েছে। সরকার-বিরোধী দল হিসাবে বামপন্থীদের জোট বাঁধার পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করতে পারেনি। স্বভাবতঃই সরকার-বিরোধী একাধিক নির্বাচন প্রার্থী দাঁড়ানোর জন্ত ভোটগুলি ভাগ হয়ে যাবার সমূহ আশঙ্কা।

জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষের অন্ত নেই। তার ওপর আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অভাব-অভিযোগ বহুগুণ বেড়ে গেছে। বলা বাহুল্য সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। নির্বাচনী-যুদ্ধে ঐ অসন্তোষকে সুগুণন করতে চেষ্টা করলেও বিরোধী-পক্ষ তাতে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধীদের কার্যকলাপ জনসাধারণের মনে বিকল্প প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এদিক দিয়েও তাদের ব্যর্থতা বরণ করতে হয়েছে।

গুণ্ডামি ও বলপ্রয়োগের নীতি এবারের নির্বাচনী যুদ্ধে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভুবনেশ্বরে এক জনসভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজও গুণ্ডামির হাত থেকে রেহাই পান নি। তবে কোন কোন বিরোধী পক্ষীয় নেতাদেরও বিভিন্ন গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা শুনা গেছে। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, সময় ও সুযোগ অনুযায়ী সকল দলই এই গায়ের জোরের নীতি অনুসরণ করে চলেছে।

এবারকার সাধারণ নির্বাচনে প্রাক্তন করদ রাজ্যের

নৃপতি ও জায়গীরদারদের ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া গেছে। রাজা-মহারাজাদের দিন ফুরালেও তাঁরা রাজনীতি থেকে একেবারে অবসর গ্রহণ করতে চাইছেন না। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কিছু কম হু' ডজন প্রাক্তন শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬২তে সেই সংখ্যা আরো কিছু বেড়ে গিয়েছিল। এবার সেই সংখ্যা অর্ধ শতে গিয়ে পৌঁছুবার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রাক্তন সৈনিকেরাও এবার বহু সংখ্যায় নির্বাচন-প্রার্থী হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৪জন জেনারেল এবং কিছু সংখ্যক ব্রিগেডিয়ার ও কর্ণেল শ্রেণীর অফিসারও আছেন। বিদেশে সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন অফিসারদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অনেক এবং বিশিষ্ট নজীর থাকলেও আমাদের দেশে এটা নতুন ঘটনা। অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ এইসব অফিসাররা যদি নির্বাচিত হয়ে আসেন, তাহলে আগামী সংসদে বুজির মাত্রা অনেকখানি বেড়ে যাবে, সন্দেহ নেই।

এবারের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে যে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, সেটা সুস্থ গণতন্ত্রের পক্ষে মোটেই আশাশ্রিত নয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে নির্বাচনী হাঙ্গামাগুলি ঘটে চলেছে, এর শেষ কোথায়? বিহারে সংঘর্ষের ঘটনা সর্বাধিক। কলকাতা ও শহরতলির বেলঘরিয়া সহ বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে বেশ কয়েকটি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞান সত্বে সচেতনতার অভাব ও শুভবুদ্ধি জাগ্রত না হওয়ার ফলে বিভিন্ন দল ও তাদের সমর্থকেরা অনর্থক হানাহানি ও ক্ষয়ক্ষতি লিপ্ত হচ্ছে।

এবারের নির্বাচনে বিরোধী দলের নিকট একটি সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। দলাদলি ও কলহের মধ্যে না গিয়ে বিকল্প সরকার-গঠনের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে যেতে পারলে জনসাধারণ নিশ্চয়ই তাকে স্বাগত জানাবেন।

# মুহূর্তের জন্তে

## সংশ্লিষ্টতা

শান্তি-চুক্তি কখনও একতরফা ভাবে কার্যকরী হতে পারে না। অপর পক্ষ যদি ক্রমাগত চুক্তি-বিরোধী কার্য-কলাপে লিপ্ত থাকে, তাহলে সে চুক্তি নিতান্তই অর্থহীন একখণ্ড সাদা কাগজে পরিণত হতে বাধ্য।

পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের ঠিক এই অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে এ বাবৎ বহু চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, কিন্তু চুক্তি ভঙ্গের ঘটনা ঘটেছে তার চেয়েও বেশী সংখ্যক। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, পাকিস্তান আন্তর্জাতিক চুক্তির মর্যাদা রক্ষায় একেবারেই অনিচ্ছুক। পিণ্ডি এক হাতে গুলু চুরিকা এবং অপর হাতে কলম নিয়ে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে থাকেন। তাই কচ্ছ চুক্তির কয়েক মাসের মধ্যেই শুরু হয়েছিল কাশ্মীরের উপর নগ্ন আক্রমণ। তাসখন্দ চুক্তিপত্রে কালির দাগ শুকোবার আগেই আরম্ভ হয়েছিল শর্ত ভঙ্গের পালা। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই পাক রাষ্ট্র নামকেরা বিধেযসজ্ঞাত বিশ্বাসঘাতকতার যে রূপটি আত্মস্থ করেছেন, সে রূপ পালটান তাঁদের পক্ষে সহজসাধ্য নয়।

অবশ্য একথাও ঠিক যে, ভারতের দিক থেকে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর না পেয়ে পাকিস্তানের আফগানদের স্পর্ধা ক্রমশঃ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে চলেছিল। লাহোর রণক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে মোকাবিলায় পাকিস্তান কিছুটা শক্তির পরিচয় পেয়েছে। আয়ুব খাঁ বিগত সত্ত্বর্ষে নিদারুণ পরাজয়ের গ্লানি এখনও ভুলতে পারেন নি। ভারতকে আর একবার শিক্ষা দেওয়ার জন্তে উপযুক্ত সমরোপকরণ যোগাড়ে তিনি সারা বিশ্ব চেষ্টা বেড়াচ্ছেন। এবং দেশে-বিদেশে ভারত-বিরোধী পাক প্রচারকার্য ক্রমেই শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক পাঞ্জাবের ফিরোজপুর এলাকায় যে পাক গোয়েন্দা বিমানটি পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছিল, সেটিও আয়ুব খাঁর ভারত-বিষেযের আর একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ। ভারতীয় বিমান বহরের একটি বিমান এই পাক গোয়েন্দা বিমান-টিকে ভূপাতিত করেছে। ভারতের এই দৃঢ় নীতি পাকিস্তানকে কিছুটা চিন্তাবিহীন করে তুলেছে। কিন্তু

পিণ্ডির জঙ্গী-শাসক এ-কথা জেনে রাখুন যে, তাসখন্দ চুক্তিতে ভারতের আস্থা থাকলেও, প্রয়োজন হলে শক্তির পরিচয় দিতে ভারতবর্ষ কখনওই পশ্চাৎপদ হবে না। আর তিনি যদি বিগত সংগ্রামের পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার জন্তে ভবিষ্যৎ লড়াইয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে থাকেন, তবে তাঁর মানসিক বৈধর্য ফিরিয়ে আনার উপযুক্ত ঔষধি অবশ্য ভারতের জানা আছে।

\* \* \*

দেড় বছর পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শর্ত সাপেক্ষে ছানায় তৈরি সন্দেশ-রসগোল্লায় নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এক নতুন নির্দেশে বলা হয়েছে যে শতকরা ৪৫ ভাগ মাত্র ছানা ব্যবহার করতে হবে সন্দেশ-রসগোল্লায়। বাকীটা কি ব্যবহার করতে হবে তা কিছু বলা হয়নি, তবে এ-বিষয়ে দোকানদারদের কিছুটা বিশেষ অর্থে। ‘বাধীনতা’ দেওয়া হয়েছে বলা যেতে পারে।

ছানা প্রস্তুত কারক, মিঠাই ব্যবসায়ী ও মিষ্টান্ন শিল্পীরা এখন থেকে প্রকাশে মিষ্টান্ন প্রস্তুত ও বিক্রয়ের টালোয়া অনুমতি পেয়ে যাবারপরমাই গুণি হলেন এবং এই উদার ব্যবস্থাপনা যাদের অনুগ্রহে সম্ভব হ’ল তাঁদের প্রতি যথা-সময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কোন ক্রটি তাঁরা করবেন না—এটা নিশ্চয়ই আশা করা যায়।

১৯৬৫ সালের আগষ্ট মাসে যখন ছানার উপর নিষেধের ধামা চাপা দেওয়া হয়, তখন তার কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল যে, বাংলার মত তৃষ্ণাভাব-পীড়িত মূল্যকে রসগোল্লা-সন্দেশ খাওয়ার বিলাসিতা চলবে না। রোগী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রসূতিদের জন্তে হৃদয়ের যোগান দেওয়া আগে দরকার। এবং খাঁটি মাখন ও ঘিয়ের পর্যাপ্ত সরবরাহ করাও এর অন্ততম লক্ষ্য ছিল।

এ-প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই সকলের মনে একটি প্রশ্ন জাগছে—ইতিমধ্যেই কলকাতা ও সংশ্লিষ্ট শহরগুলিতে হৃদয়ের প্রয়োজন কি বিলকুল মিটে গেছে, তাই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহত হ’ল!—এ প্রশ্নের জবাব জানা নেই সাধারণ

(শেষাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# সাতপাঁচ

## শ্রীনাথ

ভিয়েতনামে অবস্থিত মার্কিনী সৈন্যদের সৈন্যধ্যক্ষ জেনারেল উইলিয়ম ওয়েষ্ট মোর ল্যাণ্ড ২৮।১২।৬৬ তাং এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এই যুদ্ধ কয়েক বছর ধরে চলবে।

—ওয়েষ্ট মোর ল্যাণ্ড,—উল্লেখ করা কি করবে তার কোন উল্লেখ করেন নি।

ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক মুখপাত্র বলেছেন, তাসখান্দার দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও পাকিস্তানের দিক থেকে তেমন লাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

—চীনা গুরু মুখ তাকিয়ে নয় ত ?

চক্র রেল স্থাপনের প্রারম্ভিক কাজ অবিলম্বে শুরু করার সিদ্ধান্তকে রাজ্য সরকার “কাজ গুরু সবুজ সংকেত” বলে মনে করছেন।

—আমরা কিন্তু গার্ডের হাতে সবুজ নিশান দেখবার আশায় রইলাম।

কতিপয় বাম কমিউনিষ্ট কাউন্সিলরের হই-হট্টগোলের ফলে ৬।১।৬৭ তাং কলকাতা কর্পোরেশনের সাপ্তাহিক অধিবেশন বিশ মিনিটেই শেষ হয়ে গিয়েছে।

—চীনা হই-হল্লার নমুনা বোধ হয়।

সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রয়োজন।

জনাব ভুট্টো শীঘ্রই মোলানা ভাসানীর চীনপন্থী স্থানাল আওয়ামী পার্টিতে যোগদান করছেন।

—ভুট্টো সাহেবকে আমরা বলি, ‘শুভশ্রু শীঘ্রম্’।

জানা গেল, চীনের পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের ফলে জাপানের উপকূলে তেজস্ক্রিয় বৃষ্টিপাত হচ্ছে।

—চীনেও কি কম তেজস্ক্রিয় বৃষ্টিপাত হচ্ছে ?

বিখ্যাত ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবান’ অবশেষে সমুদ্রের উদীয়মান ভারতীয় অভিনেত্রী অঞ্জুর সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা করেছেন।

—পাকা খেলোয়াড়ের হাতে বল পড়লে সেটা লক্ষ্যে গিয়ে ঠিকই পৌছায়।

চীনপন্থী কমিউনিষ্ট নেতা শ্রীহরেকৃষ্ণ কোণ্ডার ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, চীনের সঙ্গে সীমানা বিরোধের জন্ত ভারত সরকারই দায়ী ও চীন মোটেই ভারত আক্রমণ করেনি।

—এ-রকম উদ্ভট উক্তি না করলে কি নেতাকিরি টিকিয়ে রাখা যায় ?

পাকিস্তান হকি দলের মানেজার ভূতপূর্ব পাক ইস্টোপার মেজর হামিদিও বলেছেন, ‘পাক হকি দলে সম্পূর্ণ পুনর্গঠন চাই।’

—আমাদের ধারণা পাকিস্তানের সর্বস্তরেই পুনর্গঠন

( পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেষাংশ )

মানুষের। পরিসংখ্যানের ভেলকি বাজি দেখে জনসাধারণ ক্রমেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে আর মূল্যবৃদ্ধির সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠে চলেছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় যে, মুঘল যুগে খেয়ালী

রাজার উৎকট আচরণে ও খামখেয়ালীপনায় তখনকার প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে সেই অতীত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না ঘটাই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়।



## রঙ্গ জগৎ



ভোটের বাজারে এদের চাহিদা এখন অনেক বেড়ে গেছে।

# অঞ্জলি-নায়ক

( গল্প )

সুদর্শন চক্রবর্তী

—দয়া ক'রে আমায় একটু স্থান করে দেবেন।

হঠাৎ এইরকম একটা প্রস্তাবে প্রিয়তম চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সরে বসতেই ভদ্রমহিলাও বাঁ পাশে ব'সে পড়ে। কিন্তু হুজনে এভাবে পাশাপাশি অথচ কথা নেই, এমন আর কতক্ষণ চলে! এত কাছেও আর কেউ নেই। তাই অঞ্জলিই আবার বলে, কতদূর যাবেন আপনি?

অঞ্জলি চটুরাজ আর প্রিয়তম নায়ক। এইভাবেই তাদের প্রথম আলাপ। ব্যাগ থেকে একখানা বই বার ক'রে অঞ্জলির হাতে দিয়ে বলে, সাহিত্য আপনার ভাল লাগে?

—অত্যন্ত সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে আমি তার কতটুকু বুঝি?

—ঠিকই ত—বলেই প্রিয়তম ভাবে, এই বিনয়েই নিউটন বলেছিলেন যে, জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে উপল খণ্ড কুড়োতেই তার জীবন কেটে গেছে, জ্ঞান লাভ কিছু হল না। যাই হ'ক নতুন পরিচয়ে বেশী কিছু না গুনিয়ে তাই প্রিয়তম শুধু বলল তার উত্তরে—আপনার মুখে দেখছি সুনিপুণ শিল্পীর হাসি। অভিনয় করেন আপনি নিশ্চয়ই।

—করি না বললে মিথ্যে হবে, কয়েকবার নেমেছি বটে।

—তা'হলে একটা গান অন্তত....

—মাপ করবেন গান আমি আদৌ জানি না, তবে গীটার শিখছি কিছুদিন হ'ল।

—অপূর্ব সুন্দর আপনার ব্যবহার বেখানে, ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেই—বলেই প্রিয়তম তাকিয়ে দেখল অঞ্জলির মুখখানা সহসা আবীর রঙে একেবারে রাঙা হ'য়ে উঠেছে। তার নীল আকাশের ছোটো তারা বিজলীর মত চমক দিতেই সলজ্জ চাহনি দিয়ে সে শরমে নামিয়ে নিল।

গাড়ি চলেছে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘোঁরা ছেড়ে। আবেগ-মুগ্ধ প্রিয়তম অনুভূতিতে পাক খেয়ে চলেছে। জানালা দিয়ে বাহিরে নজর পড়তেই দেখল আকাশটা যেন সিঁদুর পরতে উদ্গ্রীব। আমেজ আর বিশ্বাসের যুগপৎ শিহরন তার সর্বান্তে।

বেয়ারা একপট চা এনে দুজনের মধ্যে ধরে দিয়ে নিস্তক্কা ভঙ্গ করল। আনাড়ী হাতে প্রিয়তম নাড়াচাড়া করতে অঞ্জলি ভাতাতাড়ি তাকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এসে বলল, আমি ক'রে দিচ্ছি।

দুধ আর চিনি ঢেলে চামচ নাড়তে নাড়তে ডিম সমেত পেয়ালটা তুলে দেয় অঞ্জলি প্রিয়তমের হাতে। চুমুক দিয়ে চলেছে প্রিয়তম একটার পর একটা। আর মনটা উড়ে চলেছে মুক্ত আকাশের বুকে উড়ে চলা বিহঙ্গের মত। এদিকে অঞ্জলিও ভাবনার সমুদ্রে ডুব দিয়ে ঢেউ কাটিয়ে এগিয়ে চলেছে ক্রমাগত।

জীবনের ছত্রিশটা বছর প্রিয়তম কাটিয়ে এল নানান কাজের চাপে। পড়াশোনা, চাকরী, দেশের কাজ, ডাক্তার, সাহিত্য এই সব মশগুল হ'য়ে যে দিকটা এতদিন তার কাছে অনাবিস্কৃত ছিল, আজ যেন হঠাৎ প্রজ্জ্বলিত টার্চের মত অঞ্জলিই তার অন্ধকার দিকটায় আলো ধ'রে বড় ক'রে তুলল। কল্পনার সীতারু প্রিয়তম আজ তাই বাস্তবের সাগরে পাড়ি জমিয়েছে।

প্রিয়তমের দর্পণে অঞ্জলি নিজের ছবিকে দেখতে দেখতে যতই নিবিষ্টচিত্ত হয়, ততই রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তার প্রতিটি শিহরন। সৌন্দর্যের আবেশে নিজেকে এত সুন্দর এই সে প্রথম অনুভব করল।

কাপটা নামিয়ে রেখে অঞ্জলি বলল, কেন জানিনা, তবে আমাকে কিন্তু সবাই ভালবাসে।

—ভাল না বাসাই অসম্ভব অঞ্জলি দেবী, শুধু মনে লাগার মানুষই ন'ন আপনি, এমন হৃদয়ের স্পর্শে পরকে এত সহজেই একান্ত আপন ক'রে নিতে আপনি সত্যিই অনন্ত।

কথাগুলি বলেই প্রিয়তম ভয়ে একেবারে জড়োসড়ো হ'য়ে গেল, যেন সহসা সাপের গর্তে হাত দিয়ে ফেলেছে।

আবার এই ভয়ই তার আরও বেশী বেড়ে গেল যখন ঠিক বিদায় নেবার মুহূর্তে প্রিয়তমকে অভিনন্দন জানিয়ে

( শেষাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

# তুমি এসো

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায়

তুমি এসো মেঘ হ'য়ে এ-মরু আকাশে  
বারি সিকনেন্তে করো এ-ভূমি নীতল  
তুমি এসো বায়ু হ'য়ে এ-রুদ্ধ ঘরে  
এ-অন্ধকার তুমি করো আলো বঙ্গমল।

তুমি এসো আশা হ'য়ে গুণো প্রিয়তমা  
তুমি এসো উজ্জল নক্ষত্র হ'য়ে  
চাঁদ হ'য়ে মধুময়, আচ্ছন্ন রাখো,  
এ-হৃদয় ধৃত্ত করো তুমি পরশিয়ে।

তুমি এসো রূপে রূপে অপরূপে তুমি  
তুমি এসো স্বপ্ন হ'য়ে ঘুমের আকাশে  
তুমি এসো কল্পনায়, পাশে এসো তুমি—  
মধু-মায়াজাল রচো কুসুম-বাতাসে।

দেহ দাও বুক ভ'রে নদী হ'য়ে তুমি  
তোমার পরশে করো এ-হৃদয় সোনা,  
ভাষা আনো তুমি আজ এ-মূক হৃদয়ে  
সঞ্জীবনী সূধা নিয়ে এসো প্রিয়তমা।

# শুভ-লগ্ন

শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ

বাজারে বাজনা বাজা  
এল যে প্রাণের রাজা  
ঘরের ছায়ায়,

ছুটে গেল ছুটে  
প্রেম-পারিজাত উঠল ফুটে  
হৃদয়-সায়রে  
সাজারে আজকে সাজা  
মন-আগ্নিনা, বাপ্তি বাজা  
উচ্চ নিনাদে,

দেখ চেয়ে দেখরে পথে  
এল কে আলোর রথে  
ভুলিয়ে বিবাদে।

এসেছে প্রাণের রাজা  
বাজারে বাজনা বাজা  
হলুধ্বনি দে,  
আগমন আভাসে তার  
থুলেছে অন্তর-দ্বার  
বাজা' শাখ মনের আনন্দে।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অঞ্জলি বলল, আপনার ব্যবহার আমি ভুলব না কিন্তু।

সর্বনাশ! এ আবার কি হবে? সত্যিই কি  
ব্যবহারটা তার এমনই নির্লজ্জ হয়েছে? আজ তাই যতই  
সে স্মৃতির রোমন্থন করে ততই বার বার তার একটা কথাই  
মূর্ত হ'য়ে ওঠে, এ বেয়াদপির জন্তে অন্তত একটা ক্ষমা  
প্রার্থনা করার সুযোগ সে আর কি কখনও পাবে না?  
সে যে বিদায়-মুহূর্তে বিহ্বল-নির্বাক হ'য়ে পড়েছিল।

তাইত তার চোখে আজও বিষ্ময় আর প্রশ্ন—এ কি  
হ'ল তবে!

প্রিয়তম এর জবাব আজও পায়নি অঞ্জলির কাছ  
থেকে। অঞ্জলি কি ভাবছে সেই জানে। আকাশ আর  
সাগর—পরস্পরে একে অপরের বুক ছায়া ফেলে ছাঁছ  
দৌহার প্রতীক্ষায় শুধু চেয়ে থাকাই হ'য়ে থাকবে  
চিরন্তন?



আহারের পর  
দিনে দু'বার..

# দ্রব খাতুতে প্রাকৃতিক শ্রীমতী লাক্ষ্মী শ্রীমতী উপাধি

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনী সঙ্গে চার চামচ সহ-  
ড্রাক্সারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার  
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-  
ড্রাক্সারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি,  
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ করিতে অত্যধিক  
ফলপ্রসূ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও  
বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে  
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে  
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ  
স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।



সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র  
ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদ-  
আচার্য, ৩৬, গো রা ল পা ডা  
রোড, কলিকাতা-৩৭



অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,  
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লন্ডন),  
এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর  
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

বালীগঞ্জ, হঠাৎ এ-পাড়ায় বাসা বদলের কারণ নাকি, তিনি এখানে কাঠা পাঁচেক জমি কিনেছেন—শীগ্রি বাড়ী আরম্ভ হবে, তাই দেখাশোনার সুবিধার জন্তে এখানে এসেছেন।

যাই হোক, ঐ কাল কুচকুচে বেঁটে মানুষটি লক্ষ্মীলাভ করে যে নিজেকে একেবারে মনুষ্যত্বের অভঙ্গ গল্পের টেনে এনেছেন, আমরা জানতাম না। গুনলাম, জ্বরী মুখে, চায়ের দোকানে এবং পড়শীদের মুখে। এবং আজ রাতে দেখলাম নিজের চোখে।

কেরানীগিরি করে আমার সংসার চলে না। তাই বাধ্য হয়ে সন্ধ্যায় প্রাইভেট টুইশানি করি। রবিবারের সন্ধ্যাটা কাটে সিনেমা হাউসে। তা'ছাড়া পরের বাড়ীর জানালার দিকে তাকাবার মত ইচ্ছে এবং অবসর দুয়েরই যথেষ্ট অভাব।

হরিহরবাবু নাকি অবিবাহিত। যাই হোক প্রতিদিন সন্ধ্যায় কল্যাণী নামে একটি সুন্দরী যুবতী তাঁর কাছে আসে। জী একদিন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, তার এখানে বেড়াতে আসার কারণ কি?

কল্যাণী বলেছে, 'হরিহরবাবু একজন 'লেডি-টাইপিষ্ট' চান। বড় গরীবের মেয়ে সে, তাই তাঁর কাছে চাকরি পাবার জন্তে তোষামোদ করতে আসে।'

হরিহরবাবুর 'টাইপ-মেসিন' ছিল কিনা এবং 'লেডি টাইপিষ্ট' সত্যকার প্রয়োজন কিনা এবং চাকরির জন্ত এমন করে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কেউ আসে কিনা জানিনা তবে কল্যাণী প্রায় সন্ধ্যায় হরিহরবাবুর ঘরে আড্ডা মেতে যায়। তাদের প্রচণ্ড হাসি তামাসা শুনে অবশ্য কারও মনে হয় না, কল্যাণী গরীবের মেয়ে বা সে চাকরির জন্তে উমেদারি করতে আসে।

প্রতিদিন সকালে চায়ের দোকানে হরিহরবাবু এবং কল্যাণীর নামে নানা গুজব কানে আসে। তাদের শেষ পর্যন্ত যে বিবাহ অবধারিত, সে ভবিষ্যৎ বানীও অনেকে করতো—টাকা থাকলে নাকি বয়েস হলেও পাত্রীর অভাব নেই।

অশোক একদিন আমার বাড়ীতে চা খেতে খেতে বলে, 'শুনেছিস শ্রীনাথ, হি হি, প্রমথেশবাবু এমন

ডেকে আনলেন? পাড়ার ছেলেমেয়েগুলো দিনের দিন ফচকে হয়ে যাচ্ছে—আগে ছিল সিনেমা-থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কথা, এখন হয়েছে কল্যাণী-হরিহর জপমালা। নাঃ, হরিহরবাবুকে আমি মানুব বলি না, গরীব বলে কি একটা ভদ্রঘরের মেয়েকে ওভাবে 'ব্লাভ' দেওয়া ঠিক হচ্ছে? বিষে যদি করবে, মনের মিল যদি হয়েছে—দেখি করে পাঁচজনের কাছে কেলেকারীর ভাগী হওয়া কেন? আঃ? এতে কি মেয়েটার আখের নষ্ট হচ্ছে না?'

জী অশোকের কথার সার দিয়ে বলে, 'তুমিই বলতো ঠাকুরপো, কতদিন ওঁকে বলেছি, ওগো এ-পাড়া থেকে বাসা তুলে দাও। মেয়েটা বড় হচ্ছে, চোখের সামনে ওদের সেন্স কাণ্ড কারখানা দেখে শেষে না—' এবার আমার দিকে চেয়ে বলে, 'না—না, তুমি যদি বাসা না বদলাও, আমাকে দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও! হি হি, মাগো কি ঘেন্না, ঐ 'উড়ে' মানুষটার টাকা আছে বলে কি কল্যাণী তাঁর গলায় মালা দেবে? কচির বলিহারি যাই!'

অশোক বলে, 'আচ্ছা শ্রীনাথ, ওদের ঢালচলন দেখে তোর কি মনে হয়?'

'আমি কোনদিন দেখিনি সুতরাং মনেও কিছু হয় না।' 'শ্রাকামি রাখ—সামনাসামনি জানালা, তুই দেখিস নি?'

'সত্য কথা কিন্তু রাত দশটার এধারে ত আমি কোনদিন বাসায় ফিরি না, সুতরাং—'

'বউদি—' জীর দিকে তাকায় অশোক।

'মিথ্যে নয় তবে কতদিন বলেছি, একটা রাত দেখো না, তা' সেন্স কি লক্ষ্য আছে? আর আমার দেখে দেখে ঘেন্না মাথা মুইয়ে আসে—কি বলবো ঠাকুরপো; আমি যদি পুরুষ হতাম, কানে শোনবামাত্র বাসা বদলাতাম।'

অশোক বলে, 'একদিন দেখ না মজাটা—তোর কোন কৌতুহল নেইরে?'

শ্রামলী বলে, 'ওদের 'ইলচেমি' দেখে পাশের বাড়ীর লোকে কানে আঙুল দিতে বাধ্য হয়!'

'ভাড়াটেরা কিছু বলে না?'

শ্রামলী বলে, 'প্রমথেশবাবুর সব বাড়ীগুলো ভাড়া নিয়ে হরিহরবাবু বিলি করেছেন, বলবেন কে কি? তা' ছাড়া



হরিহরবাবু নাকি বলেছেন, যদি ভাড়াটেদের কোন অসুবিধা হয় তারা উঠে যেতে পারে—তিনি গোটা বাড়ী-খানার ভাড়া দেবেন !’

অশোক বলে, ‘সব ছাপোষা কেরানীর দল, বলা মানাই ত “জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাদ” !’

‘ঠিক বলেছো ঠাকুরপো—’ বলে গ্রামলী নিজ কাজে চলে যায়।

মুহূর্তে আমি আমার সঙ্কল্প ঠিক করে ফেলি। ‘আগামী রবিবার সিনেমা যাব না, ‘কল্যাণী-হরিহর’ লীলা দেখবো। সবাই কি মিথ্যা বলে? একদিন না হয় পর্দার অভিনয় না দেখে সত্যকার অভিনয় দেখি! প্রয়োজন বোধ করলে, নিশ্চয় বাসা বদল করতে হবে!’

আজ রবিবার ছিল।

গ্রামলী বিকালে বলে, ‘আজ কোনটার ‘শো’ দেখবে?’

‘শরীর ভাল নেই, আজ থাক!’ আমার সিনেমা না যাবার আসল কারণটা চেপে গেলাম, পাছে জী-সহ দোতলায় একটা জী-মূলভ টেচামেচি হয় রাতে।

সন্ধ্যা থেকে উৎকর্ণ হয়ে জানালার সামনে উৎকৃষ্ট দৃষ্টিতে চেয়ে আছি। হ্যাঁ, সব সত্য—অশোক এবং গ্রামলী যা’ যা’ বলেছে—একতিল মিথ্যা নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে না পেরে সশব্দে জানালাটা বন্ধ করে দিলাম। যাতে তাদের অবৈধ প্রণয়ের কোন নোংরা দৃষ্ট আমার চোখে না পড়ে।

তখন রাত দশটা।

গ্রামলী আমায় দুধ-পাউরুটি দিতে এসে জিজ্ঞেস করে, ‘দেখলে ত কাণ্ড?’

উদাস কণ্ঠে বললাম, ‘মাথার ব্যথায় স্থগিত হয়ে যাচ্ছি—আমাকে কে দেখে ঠিক নেই, আমি ওদের—’

‘ও-মা তাইতো জানালাটাই যে বন্ধ!’

গ্রামলী নীচে নেমে যায়।

দুধ-পাউরুটি খেয়ে মনে মনে ঠিক করি, কল্যাণীর সঙ্গে দেখা করে সাবধান করে দিতে হবে। স্পষ্ট কথা বলবো, তাতে ভয় কি? না—হ্যাঁ মাস ধরে ঐ এক কথা শুনিছি, আর নয়।

দিন পাঁচেক পর।

অফিস থেকে ফেরবার পথে হঠাৎ সেদিন বিকালে

কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কিভাবে কথাটা তুলি, চিন্তা করতে করতে কল্যাণীর পিছু পিছু আসি। কল্যাণী হাত জোড় করে কপালে ঠেকায়, ‘নমস্কার শ্রীনাথবাবু?’

বিস্মিত হলাম। কল্যাণী আমাকে কেমন করে চিনলে? প্রত্যানুসন্ধান করে মুখে এক ঝিলিক হাসি টেমে আনলাম, না, এ কল্যাণী ত সে উড়ে ঠিকাদায়ের প্রেমসী নয়—বাইরে সম্পূর্ণ আলাদা যে! এসব মেয়েদের কি এরকম প্রবৃত্তি? বললাম, ‘আমাকে চিনলেন কেমন করে?’

‘সে আপনি ভালভাবেই জানেন!’

জোর করে মুখে আবার এক ঝিলিক হাসি টেনে আনি। ‘হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে, যদি অবসর থাকে—চলুন না ঐ পার্কটার গিয়ে বসিগে?’

‘ওটা কি পার্ক?’ খিলখিল করে হেসে ওঠে কল্যাণী। ‘বাই হোক, “নাই মামার চেয়ে কানা মামা অনেক জুগে ভাল”।’

‘ঠিক আছে—আসুন, তবে আধ ঘণ্টার বেশী সময় পাবেন না!’

‘কেন বলুন ত?’

‘সবই ত জানেন শ্রীনাথবাবু, সন্ধ্যা হয়ে আসছে, যেতে দেরি করলে হরিহরবাবু গালাগালি করবেন!’

কল্যাণীর কথা ঠিক। ওটা পার্ক নয়। একটা অসমতল ফাঁকা ডাঙা। তবে আমরা পার্ক বলে থাকি। হুজুনে পার্কে এসে একটা নিরিবিলি জায়গায় বসলাম।

কল্যাণী প্রথমে বলে, ‘বড় জ্বালাতন করছি আপনাদের—নয় শ্রীনাথবাবু?’

সত্য স্বীকার করতে গিয়ে কথাটা মুখে আটকে গেল, ‘না—তা’ ঠিক নয়, তবে—’

আমার কথা শেষ না হতেই কল্যাণী বলে, সেজন্য আপনি পাড়ার মুখপাত্র হয়ে আমার কাছে সে অভিযোগ দায়ের করতে চাচ্ছেন, ঠিক নয়?’

মনের কথা কেমন করে টের পেলে কল্যাণী? বলি, ‘হ্যাঁ, আপনার অনুমান মিথ্যা নয়।’

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কল্যাণী, ‘শ্রীনাথবাবু, সত্যই



জিতেন্দ্রনাথ লেনের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আমাকে দেখলেই হাসির খোরাক পায়, কেউ কেউ জানতে চায়, আমার এ অভিনয়ের কারণ কি? কিছুদিন আগে আপনার জী-ও সেকথা জানতে চেয়েছিলেন।’

বাধা দিই কল্যাণীকে, ‘আপনি কি সত্যি অভিনয় করেন?’

ধন্যমত খেয়ে কল্যাণী বলে, ‘হ্যাঁ—না, তা’ ঠিক নয়—তবে—’

‘তবে কি?’

রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে কল্যাণী বলে, ‘আপনি শুধু জানেন অর্থাৎ সেদিন রাতে জানালার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন আমাদের—’

মুখটা অতুদিকে ফেরাই আমি। ‘না—সেদিন শরীর অসুস্থ থাকায় ‘টুইশানি’ যেতে পারিনি, তাই—’

‘সে যাই হোক—কিন্তু জানালাটা বন্ধ করে দিলেন কেন হঠাৎ?’

‘আমি চুপ করে থাকি।’

কল্যাণী বলে, ‘হয়ত ভেবেছিলেন, তারপর এমন ঘটনা ঘটবে, যা পাড়াকে পাড়া সকালের খবরের কাগজের মত চায়ের দোকান মাতিয়ে তুলবে!’

‘তা’ নয় কল্যাণী দেবী! তবে এতদিন ধরে পরের মুখে ঝাল খেয়ে খেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম, তাই—’

আমার কথা বুঝি কল্যাণীর কানে যায় না। মিনতি-পূর্ণ কণ্ঠে বলে, ‘শ্রীনাথবাবু আমার একটা উপকার করবেন?’

ভীষণ চোখে কল্যাণীর দিকে চেয়ে থাকি। কি বলছে কল্যাণী? হরিহর বাবুর মত লোক থাকতে আমি তার কোন উপকারে লাগতে পারি? তবু বলি, ‘বলুন—’

আজ সন্ধ্যায় আপনি প্রাইভেট টুইশানি যেতে পারবেন না। ঠিক সে রাতের মত আজও জানালার ধারে বসে থাকবেন। কেন তা’ তখনই টের পাবেন। আর যদি কোন বিপদে পড়ি, উদ্ধার করতে হবে। প্রতিশ্রুতি দিন!’

সন্দেহ কণ্ঠে বলি, ‘দেখুন, কল্যাণী দেবী, পাড়ার মাধ্যম বসে পাড়াসুদ্ধ মানুষকে অতিষ্ঠ করে যে সর্বনাশ ডেকে আনছেন স্বীয় স্বৈচ্ছাচারিতার, তার বিনিময়ে মানুষ

অভিনয় দেখা ছাড়া কিছু ভাববে না।—বেহেতু আপনার মত মেয়েরা সমাজের শত্রু!’

করুণ কণ্ঠে কল্যাণী বলে, ‘বিশ্বাস করুন শ্রীনাথবাবু, সত্যি আমি বিপন্ন। আমার মত হতভাগ্য মেয়ে বোধ-  
■ খুব কমই আছে দুনিয়ায়।’—একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার।

‘আপনার হেয়ালির অর্থ?’

‘আছে শ্রীনাথবাবু, অর্থ আছে বই কি! তাইতো আপনাকে এত অমুনয় করছি। কোনদিন এত আগে এখানে আসি না, আজ এসেছি কেবলমাত্র আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্তে। আপনার প্রয়োজন না থাকলেও আপনাকে আজ আমার প্রয়োজন আছে!’

‘আগে থেকে কোন কথা বলা যায় না?’

‘না—’ উঠে দাঁড়ায় কল্যাণী। ‘দয়া করে বোনের এ অমুরোধটুকু রাখবেন আশাকরি—’ বলে সে গটগট করে চলে যায়।

চিন্তিত মনে কিছুক্ষণ বসে থাকি পার্কে। তারপর সন্ধ্যা হতেই উঠে চলে আসি বাসায়।

চা খেয়ে জীকে বলি, ‘অফিসের কতকগুলো জরুরী কাগজপত্র আছে, রাতের মধ্যে ঠিক করতে হবে। হ্যাঁ, আজ আর টুইশানি যাব না।’ বলে দ্বিতলে উঠে যাই।

আলোটা কমিয়ে দিয়ে খাটের ওপরে বসি। সে রাতের চেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে জানালার দিকে চেয়ে থাকি।

প্রায় আট ঘণ্টা পর।

হরিহর বাবু চা-কেক খেয়ে যাচ্ছেন অথচ কল্যাণী চুপ-চাপ বসে আছে কেন?

একসময় হরিহর বলেন, ‘তুমি আজ কিছু খাচ্ছে না যে, কল্যাণী?’

কালিদাস রায়, কবিশেখর সম্পাদিত

## কৃষ্ণবাসী রামায়ণ

দ্রুত শব্দের পাদটীকা সম্বলিত সচিত্র সংস্করণ। ভাল কাগজে ছাপা। মূল্য ১০ টাকা মাত্র।

শিশির পাবলিশিং হাউস কলিকাতা-৬।

‘শরীর ভাল নেই—’

ব্যগ্রকণ্ঠে হরিহর বলেন, ‘ডাক্তার ডাকব?’

‘না—ভেমন কিছু নয়, মাথাটা যন্ত্রণা হচ্ছে, এই যা।’

‘তা’ হলে আজ নাচ-গান বন্ধ থাক্!’

‘হু—’

চা খেয়ে সবজি রঙের পাইপ লাইটটা জ্বলে দেন হরিহর। তারপর কল্যাণীকে বলে, ‘তুয়ে পড় আজ বাড়ী যেতে দিচ্ছি না।’

কল্যাণী টেবিলে মাথা রেখে উপুড় হয়ে বসেছিলো। এবার মাথাটা তুলে বলে, ‘আজ তোমার কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ভাবলাম, ক্ষমা চেয়ে না নিয়ে গেলে, চিরদিন তোমার কাছে অকৃতজ্ঞ থাকতে হবে।’

‘ক্ষমা? সে কি কল্যাণী?’

‘বলো, ক্ষমা করবে আমার?’

ব্যস্ত হয়ে ওঠেন হরিহর, ‘নিশ্চয় তোমার অসুখ বেশী— আমি ডাক্তার ডাকি!’

‘না—ডাক্তারের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন তোমার ছাড়পত্র। এতদিন ধরে যে অভিনয় করেছি তোমার কাছে—তার বদলে দয়া করে মুক্তি দাও।’

জু-জুটো কুণ্ঠিত হয়ে ওঠে হরিহরের। ‘আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না কল্যাণী?’

‘তোমার বালীগঞ্জের বাড়ীতে দেড় বছর আর এখানে ছ-মাস অর্থাৎ দু’টি বছর ধরে তোমার কণামত নাচ-গান করে তোমায় খুশি করেছি কেন জান?’

একটা সিগারেট ধরিয়ে হরিহর বলেন, ‘জানি বই কি। তুমি যে আনায় কতখানি ভালবাস, তা’ কি আমি বুঝতে পারি না? কিছু ভেবো না তুমি, নতুন বাড়ীটা শেষ হলেই আমাদের বিয়ে হবে, কেমন?’

নিজের অজ্ঞাতেই কল্যাণী সজোরে বলে, ‘না—না, হতে পারে না।’

ভ্যাবাচাকা খেয়ে কল্যাণীর মুখের দিকে চেয়ে হরিহর বলেন, ‘সে কি? দু’বছর ধরে তোমার জন্তে গানের মাষ্টার, নাচের মাষ্টার—মাস মাস ছশো টাকা করে হাত খরচ যুগিয়েছি কি আমি তোমায় ছেড়ে থাকবো বলে?’

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, হরিহর বলেন, ‘আমি ডাক্তার ডাকি—তুমি ভুল বকছো।’

মাথা ঝাঁকড়ে কল্যাণী বলে, ‘না—ভুল আমি বলিনি তবে আজ যে কথা বলবো, তোমার ভুল বলেই মনে হবে। তবে মন দিয়ে আমার সব কথা শোন—আমি বিবাহিত।’

চমকে ওঠেন হরিহর। ‘বিবাহিত? তোমার পাঁখা সিন্দুর কই? এতদিন সে কথা বলোনি কেন?’

‘সবই আছে, সে সব পড়িনি—পাছে হামী আমার দিনা চিকিৎসায় মারা যান।’

‘তোমার হামী? কোথায়? কি হয়েছে তাঁর?’

‘টি. বি. স্তানাটরিয়মে! আড়াই বছর টি. বি.তে ভুগে কাল তাঁর ডিসচার্জ নোটিশ বেড়িয়েছে। এখন তিনি সুস্থ।’—এবার হরিহরের মুখের দিকে তাকায় কল্যাণী, ‘অনুমতি দাও, কাল তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে যাই।’

‘তাঁকে বঁচাবার জন্তে তোমার এ অভিনয় কেন? একটা মারাত্মক অসুখ থেকে বেঁচে উঠেছেন তিনি, তাঁর সংস্রবে থাকার উচিত নয় তোমার। কেন, আমার কাছে থাকলে কি তুমি অসুখী হবে?’

‘ভুলে যেও না আমি হিন্দুনারী!’

‘ডিভোদ’ কেনের সুযোগ নাও।’

‘না—না, সে আমি পারব না।’

ক্ষুব্ধ শার্ভলের মত গর্জন করে ওঠেন হরিহর। ‘না—মুক্তি নেই তোমার, আমি তোমায় ছেড়ে দেবো না—কিছুতেই না।’ বলে উন্মত্তের মত কল্যাণীর পিঠের কাছে এসে দাঁড়ায় সে।

কল্যাণী ক্রন্দমূর্ত্তিনী হয়, ‘সাবধান, কোনদিন দেহ স্পর্শ করতে দিই নি—আজও দেবো না।’

চোঁচিয়ে ওঠেন হরিহর, ‘আলবত দেবে, দেবে না মানে? চাপাকি? যদি ফাঁসি যেতে হয়, তা’ও যাবো, তবু—’

বিকট শব্দ করে চোঁচিয়ে ওঠে কল্যাণী, ‘ডাক্তার—ডাক্তার—ডাক্তার ডাকো, ওগো কি সব ভুল বকছি আমি! তুমি ছাড়া কে আছে আমার—হ্যাঁ সত্যি আমি ভুল বকছি—বিয়ে ত আমার হয় নি।’

কল্যাণীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েন হরিহর। ‘সত্যি বলছো?’

পাড়ার লোকে আমার পাগল করে তুলেছে—ওগো তোমার  
পায়ে পড়ি, শীঘ্রি ডাক্তার ডাক—’

‘ইস—এসখয় ফোন থাকলে কত সুবিধা হত! যাকগে  
তুমি স্থির হও, আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি।’ এবার  
দরজা খুলে দ্রুতবেগে নেমে যান হরিহর।

কল্যাণী উঠে দাঁড়িয়ে শক্ত করে কাপড়খানা পড়ে নেয়  
তারপর অতি দ্রুত নেমে এসে রাস্তায় দাঁড়ায়।

আমিও তখন রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি।

মুখোমুখি হই ছুজনে।

হাঁপাতে হাঁপাতে কল্যাণী বলে, ‘এ ছাড়া উপায় নেই

শ্রীনাথবাবু, ও কিছুতেই আমাকে ছেড়ে দেবে না। আমার  
আসল নাম রমা, কল্যাণী নয়! পাড়ার সকলকে বুঝিয়ে  
বলবেন আমার কথা—সকলের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী!’  
বলে সে একটা বাই লেন ধরে ছুটে চলে যায়।

আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকি যতক্ষণ না সে আমার  
দৃষ্টি-পথের বাইরে চলে যায়।

\* \* \*

প্রমথেশবাবুর কাছে আত্ম-পরিচয় দেবার এইডো  
সুযোগ। এমন সুন্দর একটা বাস্তব গল্পের ‘প্লট’ হাত ছাড়া  
করি কি করে?—কাল সকালেই দু-দিন্তা কাগজ কিনবো।

## সচিত্র শিশির

মাসিক পত্রিকা আষাঢ়, ১৩৭৩ হইতে  
৪৬শ বর্ষ, আরম্ভ হইয়াছে। সডাক বার্ষিক  
মূল্য ৪/- সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য ২।০। পূজা  
সংখ্যা বর্ধিতাকারে প্রকাশিত হয় কিন্তু গ্রাহক-  
দের বর্ধিত মূল্য দিতে হয় না। আষাঢ় হইতে  
গ্রাহক হইতে পারেন। গ্রাহক-মূল্য গনি-  
অর্ডারে পাঠানই শ্রেয়, কারণ, ভি-পিতে  
লইতে হইলে ৬০ পয়সা অতিরিক্ত খরচ পড়ে।  
নমুনা-সংখ্যা পাইতে হইলে ৩০ পয়সা  
মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইবেন।

শিশিরে গল্প রচনাদি যে কেহ পাঠাইতে  
পারেন, ছাপাইবার যোগ্য হইলে ছাপা হয়।  
অনেক সময়ে মনোনীত রচনাও স্থানাভাবের  
জন্ত বিলম্বে ছাপা হয়। শিশিরের জন্ত প্রেরিত  
রচনাগুলির নকল রাখিয়া পাঠাইবেন।

শিশির কার্যালয়

# বেবী মলম



দাদ, হাজা, খোস,  
পাঁচড়া, চুলকানি,  
ফোড়া, ঘামাচি,  
পোকাকামড়,  
ও একজিমার  
অব্যর্থ, মলম।

কাপড়ে দাগ লাগেনা,  
বেদনা নাশক ও সিস্ককর

ফোন-৩৪-৫১০১

গোলার্জেন্ট মাধব এণ্ড কোং জোড়াসাঁকো, কলি-৭



# হারিয়ে যাওয়া রঙ বেরাঙের দিনগুলো

( গল্প )

শ্রীসুশোভন দত্ত

খালার মতো সূর্যটা একরাশ গোলাপী আভা ছড়িয়ে চ'লে পড়েছে পশ্চিমে। রক্তিম আকাশের গা ঘেঁষে এক ঝাঁক সাদা বক উড়ে গেল। বাগানে গোলাপ, রজনীগন্ধা আর ডালিয়া ফুটেছে মুঠো মুঠো। অকাতরে গন্ধ ঢালছিল ওরা। জানালার হালকা পর্দাগুলো ঢলছিল হিমেল হাওয়ার তালে তালে।

একটা ইঞ্জিচেরার পেতে ব'সেছিলাম জানালার সামনে। স্মৃতির অধীনে সাগরে অনেক কথার গুঞ্জন— হারিয়ে যাওয়া অতীতের এলোমেলো তোলপাড়। 'মালিনী'টা খুলে পড়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু মনের পটে ভেসে উঠছিল মানসীর কথা। না, 'মেবার-পতনে'র মানসী নয়, আমার 'মানসী'। আমার কল্পনার মানসী। অনেকের কথাই ভাবছিলাম। মায়, অপরাধ, তন্দ্রা। আমার জীবনের চলার পথে অনেকেই এসেছে হাসি-কান্নার ডালি সাজিয়ে। কিন্তু মন কেড়ে নিতে পেরেছে কেউ? হ্যাঁ, একজন পেরেছিল। পপী। ওটা ওর ডাক নাম। ভালো নামটা মনে পড়ছে না। কারণ ওর পোশাকী নাম ধ'রে ডাকিনি কোনদিন। তাই মনে রাখিনি ওর পোশাকী নামটা। ইচ্ছা করেই রাখিনি।

বাড়িতে কেউ নেই। বাবা কলেজ অধ্যাপনা করেন। ফেরেন নি এখনো। মা সিনেমায়। ভাই-বোনগুলো বেড়াতে গিয়েছে। অফিস থেকে একটু আগে ফিরে এসেছি আমি। অতদিনের চাইতে বেশ খানিকটা আগে ফিরেছি। নিঃসঙ্গ আমি তাই বিরহী মনটাকে নিয়ে খেলায় মেতেছি। আমার জীবন-নদীর স্রোত থমকে দাঁড়িয়েছে যেন।

আমি পেছিয়ে গেছি আধযুগ আগে। আমার কলেজ জীবনে। কলেজ জীবনটাই আমার রিক্ত জীবনের সবচেয়ে সুখের অধ্যায়। আবার চুপে থেও বটে। বিভ্রাটের ছকে বাধা জীবনের গতি মুক্ত হ'য়ে বাঙলার অনাস' নিয়ে বি.এ.তে ভর্তি হলাম আমি। লেখাপড়ায় কোনদিনই

সাধারণের বেশ খানিকটা ওপরে। আর আমার মেহ পাওয়ার ভাগ্যটাও ছিল ভালো। স্কুলে শিক্ষকরা মেহ করতেন, কলেজে অধ্যাপকরাও।

মাস খানেক কলেজ করেছি। এরই মধ্যে আমি সহপাঠী-সহপাঠিনীদের কাছে সুপরিচিত হ'য়ে গিয়েছিলাম। তবে কোন মেয়ের সঙ্গে আমি পরিচয় করার চেষ্টা করিনি। ওরাও কেউ এগিয়ে আসেনি আমার সঙ্গে পরিচয় করতে।

সেদিন ক্লাস শেষ হ'য়েছিল সাড়ে চারটার। বাড়ির পথ ধরছিলাম আমি। পিছন থেকে একটা মেয়ে ডাকলো আমায়। দাঁড়িয়ে পড়লাম। মেয়েটা আমাদের ক্লাসেই পড়ে। বেঁটে, খাটো, আঁটসাঁট চেহারা। রঙটা ময়লা। ভরা ঘোবনের ছোঁয়াচ ওর সমস্ত হজ জুড়ে। মেয়েটা মূহু পদক্ষেপে এগিয়ে এলো আমার কাছাকাছি। জিজ্ঞাসা করল—প্রিয়বাবু বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের ওপর একটা পরীক্ষা নেবেন বললেন, আচ্ছা, পরীক্ষায় 'কিটা চ্যাপ্টার থাকবে জানেন?

—না। ছোট্ট বিস্তৃতি-মেশানো উত্তর দিলাম আমি।

—আপনি ওর কাছ থেকে জেনে নিন না। আদেশের মতো মনে হ'ল ওর কথাগুলো।

—কেন, আপনিও তো জেনে নিতে পারেন। ক্রু'গে কুঁচকে গেল আমার।

—আচ্ছা তাই নেব। অপ্রস্তুত হ'য়ে উত্তর দিলো ও।

অপমানে ওর শ্রামলা হৃথ থেকে ঠিকরে পড়লো এক ঝলক বেগুনী দ্রুতি। আমার কালো ঠোঁটে ফুটে উঠলো এক টুকরো ক্রুর হাসি। আদম আর ইভকে জ্ঞান-রুদ্ধের ফস খাইয়ে শয়তান হেসেছিল যেমন ক'রে, ঠিক তেমনি করেই সেদিন আমি হেসেছিলাম।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, একটা মেয়ের সঙ্গে আমি এ-রকম অহঙ্কারীর মতো ব্যবহার করলাম কেন?—আমি কৈশোরের শেষ প্রান্তে পাড়ার

মেয়েটির। সূঠাম তরুর ভাঁজে ভাঁজে মাখানো ছিল কামনার হাতছানি। ওর একটি মিষ্টি কথায়, পাতলা অধরের একফালি শানিত হাসিতে, হরিণী-নয়নের সর্পিল কটাক্ষে ধন্ত হতাম আমি। মনের পটে নানা রঙের ছবি আঁকতাম বল্লনার তুলি দিয়ে। আকর্ষণ পান করতাম রূপের মদিরা। আমি বুঝতে পারিনি ও আমার সঙ্গে প্রেমের খেলায় মত্ত। যেদিন বুঝলাম সেদিন থেকেই আমার মনটা বিধিয়ে উঠলো ওর ওপর। আমি অহঙ্কারী হ'য়ে উঠলাম। হ'য়ে উঠলাম নারী-বিদ্রোহী।

বাড়ি ফিরে অনেক কিছু ভাবলাম। মন বলল ওর সঙ্গে এ-রকম দান্তিক ব্যবহার না করলেও চলতো সবাই তো আর তজ্জা নয়। রাতে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে ভাবলাম। ঠিক করলাম পরের দিন আলাপ ক'রবো ওর সঙ্গে। ওর ভুল ভেঙে দেব। ওকে বুঝিয়ে দেবো আমাকে ও যতটা অভদ্র মনে করেছে ততটা অভদ্র আমি নই।

পরের দিন কলেজে গিয়ে ডাকলাম ওকে। ওর নাম ধ'রেই ডাকলাম। ক্লাসের সব মেয়ের নামই আমি জানতাম। ওর তুলে রাখা নামটা ছিল মিতা—মিতা বিখাস। ডাকলাম—মিতা শোন। ধমকে দাঁড়ালো ও। আশ্চর্য হয়ে গেল ও। ভেবে পেল না আমার এই আকস্মিক পরিবর্তনের কি কারণ থাকতে পারে। আমি বললাম—গতকাল সূকুমারবাবু ড্রামার ওপর যে নোটটা ডিকটেট ক'রেছিলেন সেটা দিও তো।

—কেন, আপনিও তো কাল নোটটা টুকেছেন। আমার গতদিনের কথার প্রতিধ্বনি শুনলাম ওর কথায়।

—হ্যাঁ। তবে মাঝে মাঝে বাদ গিয়েছে।

—আচ্ছা কাল এনে দেব। আমার দিকে কটাক্ষ হেনে বললো ও।

পল্লী নোটটা দিয়েছিল আমায়। যদিও নোটটা আমার তোকা ছিল। সম্পূর্ণই টোকা ছিল। তবু চেয়েছিলাম, কারণ ওর সঙ্গে কথা বলবার আর কোন সূত্র খুঁজে পাইনি বলে।

এইভাবেই পল্লীর সঙ্গে আমার পরিচয়। পরিচয় থেকে ভালবাসা। হ্যাঁ, ভালবাসা—প্রেম নয়। প্রেম

হয় দেহকে বিরে। মানুষ প্রথমে দেহকে ভালবাসে। দেহকে কেন্দ্র করেই প্রেমের জন্ম। আর ভালবাসা ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপেই মানসিক। একটা হৃদয়ের আনন্দ-বেদনা যখন অপর একটা অন্তরে সংবেদন জাগায়, আলোড়ন তোলে, তখনই জন্ম হয় ভালবাসার। প্রেমের মধ্যে অনেক সময় আবিলতা থেকে যায়। নিছক ইন্দ্রিয় লালসার মধ্যে প্রেমের পরিণতি ঘটে। কিন্তু ভালবাসা অনাবিল। তার মধ্যে এককোঁটা কামনা থাকে না। থাকে শুধু গুভ্রতা। মিতা বিখাসকে আমি প্রকৃত অর্থে ভালবাসতাম।

পাশাপাশি হেঁটে কলেজ থেকে ফিরতাম আমরা দু'জনে। অনেক কথা হ'ত। বেশি কথা মানেই অনাবশ্যক কথা। অতি অল্প দিনের মধ্যেই শেষ হ'য়ে গিয়েছিল আমাদের মন জানাজানির পর্ব। আমি জেনেছিলাম ওর ব্যথার কথা, ওর আনন্দের কথা। ও-ও জেনেছিল আমার। তবে পল্লী আমার অখণ্ড ব্যক্তিত্বের উদ্যোগ মাত্র জেনেছিল। জেনেছিল আমার আনন্দোচ্ছল সন্তাটাকে। আমার মধ্যে যে একটা ব্যথাহত নিঃসঙ্গ হৃদয় চুপি চুপি কাঁদছে, তা ও বুঝতে পারেনি। মানে আমিই বুঝতে দিই নি। কি লাভ হবে ওকে দুঃখ দিয়ে। ও অল্পতেই আঘাত পায়। ভীষণ সেন্টিমেন্টাল ও। আমি না বুঝে অনেক আঘাত দিয়েছি ওকে। অকারণে ওর চোখের জলের অপব্যয় করিয়েছি আমি। তবু ও আমাকে আক্রমণ করেনি কোনদিন। কোনদিন অবজ্ঞা ভরে মুখ ফিরিয়ে নেননি আমার দিক থেকে। 'প্রতিটি আঘাতের একটা প্রতিঘাত আছে'—বিজ্ঞানের এই বহু পরীক্ষিত সত্যটা দ্রাস্ত প্রমাণিত হ'য়েছিল আমাদের ক্ষেত্রে। হয়তো ও আমাকে দেহের প্রতিটি রক্ত বিন্দু দিয়ে ভালবাসতো ব'লেই।

আমি কারণে-অকারণে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ছুটতাম ওর বাড়িতে। ওর পড়ার ঘরে মুখোমুখি ব'সে কতদিন গল্প করেছি। আমাদের দু'জনের গল্পের আসরে অধিকাংশ সময়েই ও ছিল বক্তা, আমি থাকতাম নীরব শ্রোতা হ'য়ে। নারী-পুরুষের স্বাভাবিক ব্যবধানটাও ঘুচে গিয়েছিল কালক্রমে। আমরা উভয়ে উভয়ের কাছে অত্যন্ত সহজ

চোখে দেখেনি। আমাদের ছ'জনের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক খাড়া ক'রে তুলে সমাজের মানুষগুলো অনেক আক্ষেবাজে কথা ছড়াতে লাগলো।

আমার বাবা-মায়ের কানেও গিয়েছিল আমাদের মেশামেশার কথা। মায়ের কাছ থেকে অনেক উপদেশ শুনতে হয়েছিল। পপীকে জানিয়েছিলাম সব কথা। তারা ঢাকা আকাশের তলে দাঁড়িয়ে ও বলে—আমার ভাগ্যটাই থাকাপ।

—দোষ তোমার ভাগ্যের নয়, দোষ সমাজের।

—আমি তোমার সঙ্গে একেবারে আড়ি ক'রে দেব ভাবছি।

—পারবে? গভীর ব্যথা দিয়ে বললাম আমি।

—মিতা বিশ্বাস সবই পারে।

—তুমি পারলেও আমি পারবো না।

—আমাকে তাহ'লে কি করতে বলা?

—তুমি আগের মতোই আমার সঙ্গে মিশবে। আমার

বাড়ির সামনে দিয়ে মুখ উচু ক'রে হাঁটবে।

—মিতা বিশ্বাস সব সময় মুখ উচু করেই হাঁটে।

আমি ত্যাগ করতে পারিনি পপীকে। কিন্তু পপীই ছেড়ে গেল আমার। বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে ও চ'লে গেল রাউরকেল্লার। ওখানে ওর মামা কাজ করতেন। যাবার বেলায় ও কেঁদেছিল। ওর ছ' চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল মুঠো মুঠো অশ্রু। ওর হৃদয় নিউড়ানো সুখ। আমি কাঁদতে পারিনি, কারণ ছেলেরা সহজে কাঁদে না। কাঁদলে ব্যথা অনেকটা লাঘব হয়। কিন্তু একবার ব্যথা পেলে সে ব্যথা চিরকালের মতো হৃদয়ের কোণে বাস বেঁধে থাকে।

তারপর সুদীর্ঘ পাঁচ-ছ' বছরের মধ্যে আর দেখা হয়নি পপীর সঙ্গে। হয়তো আর কোনদিনই দেখা হবে না। শুনেছি ওর বিয়ে হ'য়ে গেছে। ওর স্বামী একজন বিলেত ফেরত এঞ্জিনিয়ার। পপী সুখী হ'য়েছে। ওর সুখে আমি ওর চেয়েও বেশি সুখী।

## সহযাত্রী

অমিয় চট্টোপাধ্যায়

বাঁশি কাঁদে  
অনিঃশেষ যন্ত্রণায়  
অনিরুদ্ধ মূর্ছনায়  
মোক্তার জীবনের বাঁশি।  
স্তব্ধ হাসি  
পৃথিবীর জীবন্ত অশানে  
লাঞ্ছিত সম্মানে  
বিনায়ক গণ-দেবতার।

মৃত্যু হাসে  
শাসনের রঙ্গক্ষেত্রে—নেপথ্য হাসি,  
সম্মুখে পশ্চাতে  
নিশীথে প্রভাতে  
নির্লজ্জ উলঙ্গ মৃত্যু,  
উদ্ধত উদগ্র স্পর্ধায়।

ছন্নবেশী লালসার  
চতুরঙ্গ সেনা তার  
ছঃশাসনের কুরুক্ষেত্র পথে।

ঢেউ ওঠে  
চূর্ণ করি নিষেধের বাঁধ,  
ছরস্ত বাঁচার সাধ  
বহে আনে জনসমুদ্রের  
উত্তাল ছব্বার ঢেউ।  
জাগে সবাসাচী,  
প্রস্তুত সারথী অনিবার্য রণে।  
সহযাত্রী হই মনে মনে,  
কালো রাত্রি দিশারী আমার।

কোথা কোন্ পথে যাত্রা শেষ  
নাহি জানি!

ঐতিহাস দেবে সে উত্তর।



# অঁধারে আলো

( গল্প )

## সুচিত্রা দাশগুপ্তা

মোরাদাবাদ জেনারেল হাসপাতালের হেড ক্লার্কের কোয়ার্টারের সামনে একখানা টাঙ্গা এসে দাঁড়াল। টাঙ্গা থেকে হেড ক্লার্ক অনুপ সেন প্রথম নামল, তারপর মা অমিয়া দেবী ও স্ত্রী সুনন্দাকে নামতে সাহায্য করল। টাঙ্গা থেকে নেমে অমিয়া দেবী পুত্রবধূ সুনন্দাকে বাঁ হাতের বেষ্টনীতে বন্দী করে সদর দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন। ততক্ষণে অনুপ টাঙ্গাওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ছ' একটা জিনিসপত্র নামাতে লাগল টাঙ্গা থেকে।

সদর দরজায় কড়া নাড়তেই চাকর রঘু দরজা খুলে দিল। একগাল হেসে বলে উঠলো, ওমা আপনারা এসেছেন।

অমিয়া দেবী বললেন, হ্যাঁ, শীগ্গীর যা জিনিসপত্র নামিয়ে আন। আমরা আর দাঁড়াতে পারছি না। পুরো তিনটি দিন গাড়ীতে কেটে গেছে, উঃ!—বলে সুনন্দাকে ছ' হাতের বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ করে দরজার মধ্যে ঢুকে গেলেন।

রঘু ছুটে গিয়ে অনুপের হাত থেকে সব জিনিস কেড়ে নিয়ে বলল, বাবু, আপনি যান, আমি-ই সব নিতে পারব।

অনুপ ধমকের সুরে বলল, এত জিনিস একা নামাতে তোমার অনেক সময় লাগবে—টাঙ্গাওয়ালা কতক্ষণ দাঁড়াবে? আর কেউ নেই বাসাতে?

রঘু বলল, আজ্ঞে না—ওরা সব বায়োকোপ দেখতে গেছে। আজ তিন দিন ধরে আমরা সবাই অপেক্ষা ক'রে আছি আপনাদের জন্য। সিন্ধা বাবু ছ' দিন গাড়ী নিয়ে ইষ্টিশানে গিয়ে ফিরে এসেছেন। আজ বাড়ীর সবাইকে নিয়ে বেরলীতে চলে গেছেন।

অনুপ ওর কথাগুলো শুনে বিরক্ত হয়ে বলল, বেশ হয়েছে, খুব সুখবরই দিচ্ছ, এখন তুমি যত পার বোঝা টান।—বলে চামড়ার স্টকেসটা তুলে নিয়ে চলতে আরম্ভ করে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো, হ্যাঁরে ফানি-চারগুলো ঠিকমত এসেছে তোরে?

টাঙ্গাওয়ালা সাহায্যে সুনন্দার বড় ট্রাকটা নামাতে

নামাতে রঘু উত্তর দিলো, আজ্ঞে হ্যাঁ।

সদর দরজা পার হ'য়ে অনুপ তার নিজের হাতে গড়া ফুল বাগানের মধ্যে দিয়ে সুরকি বিছানো সরু রাস্তাটা দিয়ে যেতে যেতে বাংলোর বারান্দার দিকে তাকাল। দেখলো বারান্দার বড় সোফাটার মধ্যে মা বসে আছেন আর তাঁর কোলের মধ্যে ক্রান্ত সুনন্দা ঢলে পড়েছে। তাড়া-তাড়ি পা চালিয়ে রাস্তাটুকু পার হয়ে বারান্দার উঠে শোবার ঘরের তাল খুলে ফেললো। তাল খোলার শব্দে অমিয়া দেবীর তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। তিনি সোফার উপর সোজা হয়ে বসলেন।

অনুপ ঘরের ভিতর গিয়ে আলো জালিয়ে পাখা চালিয়ে দিয়ে মাকে বলল, মা, ওকে ঘরে নিয়ে এসে পাখার নীচে বস, ভাল লাগবে।

শাশুড়ীর ডাকে সুনন্দা যেন চমকে জেগে উঠলো। ঘুমে জড়ানো চোখ দুটোকে হাত দিয়ে ভাল করে মুছে নিয়ে সামনের দিকে তাকাতেই খুব লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। দেখল অনুপ একাই ঘরদোর পরিষ্কার করতে আরম্ভ করেছে। এতে সে খুবই বিব্রত বোধ করতে লাগল।

ততক্ষণে শাশুড়ী আবার ঘুমে ঢুলতে শুরু করেছেন।

সকল সমস্তার সমাধান করল রঘু এসে। সুনন্দা দেখলো, রঘু আরো তিন চারজন লোককে সঙ্গে নিয়ে সব মালপত্র এনে ফেলেছে। সে ঘরের ভেতর ছুটে গিয়ে অনুপের হাত থেকে ঝাঁটা কেড়ে নিয়ে বলল, বাবু, আপনি এসব কি করছেন? আমরা এতগুলো লোক আছি কি করতে? চেয়ে দেখুন, ওরা সবাই এসে গেছে। আপনারা এখন হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়-জামা বদলিয়ে বিশ্রাম করুন, আর বলে দিন এখন আপনাদের খাওয়ার কি ব্যবস্থা করব।

অমিয়া দেবী রঘুর কথায় সায় দিয়ে বললেন, তাইত, তুই কেন এসব করতে গেছিস বাবা! আয়, এইখানে একটু শোস, বেশ ফুরকুরে হাওয়া দিচ্ছে। আমার তো ঘুমই এসে

গিয়েছিল। ওরা ঘরদোরগুলো গোছগাছ করে দিক, ততক্ষণে আমরা হাত মুখে জল দিয়ে কাপড় ছেড়ে সুস্থ হয়ে নি। তারপর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হবে। এস বউমা, তোমাকে বাথরুম দেখিয়ে দি। আহা রে, মায়ের আমার মুখখানা শুকিয়ে গেছে।

মায়ের কথা শুনে অনুপ কৃত্রিম হৃৎথের সঙ্গে বলল, মা তোমার মায়ের মুখ-ই শুধু শুকনো দেখলে, বাবার কিছু হয়নি?

মা ফিরে দাঁড়িয়ে স্নেহের হাসি হেসে বললেন, ওরে আমার সোনারে, তা আবার হয়নি! খুব হ'য়েছে। তবে তোমার তো এই ধকল বইবার অভ্যাস আছে, বউমার তো এই প্রথম। তাই ওই বেনী ক্লান্ত হ'য়েছে। ব'লে তিনি এক হাতের মধ্যে বউ আর এক হাতের মধ্যে ছেলেকে নিয়ে বললেন, এসো তোমরা। এবার আর দেরি নয়, হাত মুখ ধোবে এস।

ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে সমস্ত বাংলাটা একেবারে ঝকঝকে তকতকে হয়ে উঠলো। তারপর খাওয়া-দাওয়া মিটে গেল রঘুর ব্যবস্থাপত্রে। খাবার টেবিলে অমিয়া দেবী অনুপকে জিজ্ঞেস করলেন, ইঁয়ারে অনু, আমরা এলাম অথচ নটা রকের একজন মানুষও এলো না নতুন বউ দেখতে? কি আশ্চর্য।

উত্তরে অনুপ বললো, কেউ কি জানে আমরা এসেছি? আমি আগেই রঘুকে বারণ করে দিয়েছি মা। তিন দিনের জার্নির পর এই এত রাতে আর লোকের খামেলা সহ হবে না। কালই সবাই তোমার বউ দেখবে। যাক এবার তোমার বউমাকে এই বাড়ীটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও। কোথায় কি আছে না আছে। কোথায় কি থাকে না থাকে এই সব আর কি।

মা সুনন্দার দিকে চেয়ে বললেন, পরিচয় মোটামুটি কিছু করিয়েছি, যা বাকী আছে তা কাল হবে। রাত অনেক হোল, এবার ঘুমাতে যাও। আমি গেলাম, খুব ঘুম পেয়েছে আমার, বলে অমিয়া দেবী তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

খাওয়া ওদের অনেকক্ষণ আগেই হয়ে গিয়েছিল। টেবিলে বসে বসে এতক্ষণ নানা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। মা চলে যেতে অনুপ রঘুকে ডাকলো। রঘু বারান্দায় বসেছিল, ডাক শুনেই এসে হাজির হোল। অনুপ

তাকে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে বলল আর সব ঘরগুলো ভাল করে দেখে তালা বন্ধ করে গুতে যেতে বলল। রঘু চলে গেল।

অনুপ সুনন্দার হাত ধরে ওদের ঘরে গিয়ে ঢুকলো এবং দরজা বন্ধ করল। সুনন্দা ঘরে গিয়ে একটা জিনিস আবিষ্কার করল। দেখল এই ঘরের উত্তর দিকে একটা দরজা আছে, দরজাটা আধ খোলা এবং তার উপর একটা পর্দা ঝুলছে। এর আগে তো কতবার এববে এসেছে, কই একবারও তো দরজাটা চোখে পড়েনি।

সে একটু অবাক হয়ে অনুপের মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, ওদিকে একটা দরজা দেখছি ওদিকেও আবার আর একটা ঘর আছে নাকি?

অনুপও একটু অবাক হ'য়ে বলল, ইঁ্যা আছেই তো, তুমি দেখনি আগে?

সুনন্দা ঘাড় নেড়ে বলল আছে যে তাই জানিনা।

অনুপ বললো, যাও দেখে এসো।

সুনন্দা অনুপের দিকে একটু স'রে গিয়ে বলল, ওরে বাবা, ওই অন্ধকার ঘরে আমি যেতে পারব না একা। অনুপ একটা সিগারেট ধরিয়ে সুনন্দাকে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে আলো জাললো।

আলো জালতেই সুনন্দা ঘরের প্রতিটি জিনিস দেখে একেবারে আশ্চর্য হ'য়ে গেলো। একটা ড্রেসিং টেবিল, তার উপর মেয়েদের সব প্রসাধনের জিনিসপত্র। আলনায় ব্যবহার করা কয়েকখানা শাড়ী, সাদা, ব্লাউজ। বাচ্চাদের জামা-প্যাণ্ট। নানারকম খেলনা, ফিফিং বোতল, ঝিনুক বাটি ইত্যাদি। একদম ছোট বাচ্চার কাঁধা, তোশক, বালিশ, চুষিকাঠি, ঝুমঝুমি এইসব আরও কত কি।

সুনন্দার চোখ দু'টো ঘরের সমস্ত জিনিসের উপর গভীর দৃষ্টি নিয়ে ঘুরলো,—তারপর একরাশ প্রশ্ন নিয়ে সে চোখ অনুপের মুখের উপর স্থির হ'ল।

অনুপ সে দৃষ্টির অর্থ বুঝলো। বুঝেও না বোঝার ভান কার বলল, কিছু বলবে আমাকে?

একটু চুপ ক'রে থেকে সুনন্দা বলল, তোমার কাছে শুনেছিলাম, এ বাড়ীতে আর কেউ থাকে না মানে, কোন মেয়েছেলে থাকে না, তবে এগুলো কারা?

বিদ্যুতের ঝিলিকের মত অনুপের মাথার মধ্যে এক



ছুটবুদ্ধি খেলে গেল। সে আশ্চর্য হওয়ার ভান ক'রে বলল, কেন তুমি কিছু শোননি, তোমার মা-বাবা তোমাকে কিছু বলেন নি?

কৌতূহল আর আশ্চর্যে সুনন্দা যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। তার একবারও মনে পড়লো না যে, মাত্র পনের দিন হোল তার বিয়ে হয়েছে। এখনও লজ্জা কাটিয়ে সে ভাল ভাবে স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে পারে না। অথচ অদ্ভুত এক উত্তেজনায় সে একেবারে অস্থির হয়ে স্বামীর কাছে এগিয়ে গিয়ে তার একটা হাত ধরে বাঁকি দিয়ে বলে উঠলো,—কই না তো, আমাকে তো মা-বাবা কিছু বলেন নি কোন বিষয়ে। আমি তো কিছু শুনিনি, তুমি বল কি বাপার, বল এসব কাদের?

অনুপ কপট গাভীর অবলম্বন ক'রে বলল, যখন কিছু শোননি, তখন আর শুনে কাজ নেই। এস এখন ঘুমাবে।

সুনন্দা ব্যাকুল ভাবে বিছানা গুটিয়ে রাখা খাটটা অধিকার ক'রে বসে বলল, না আমি ঘুমাবো না, ও ঘরেও যাব না, যতক্ষণ তুমি আমাকে এ ঘরের ইতিহাস না বলবে।

অনুপ যেন নিরুপায় এই ভাবেই বলল, কিন্তু শুনলে যে ভীষণ মন খারাপ হয়ে যাবে তোমার। আজই মাত্র এই নতুন বাড়ীতে নতুন সংসারে পা দিয়েছ, তারপর রাস্তার কষ্টে তুমি ভীষণ ক্লান্ত। আজ থাক, আর একদিন শুন। তোমাকে তো একথা বলতেই হবে এখন এসো—ব'লে অনুপ সুনন্দার একটা হাত ধরে আকর্ষণ করল।

সুনন্দার মাথার কাপড় খুলে গেছে। সেদিকে তার খেয়াল নেই। সে শক্ত হয়ে চেপে বসল। অনুপের কাছ থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে খাটের বাজুটা চেপে ধরলো, মুখে কিছু বললো না।

ওর এই ভাব দেখে অনুপ মনে মনে হাসলো। মুখে বলল, আজকের এই নতুন দিনের রাতটাকে যখন তোমার মাটি করার ইচ্ছা, তখন শোন। বলে, একটা চেয়ার নিয়ে সুনন্দার মুখের সামনে বসলো।

নিস্তরক গভীর রাত। সমস্ত পৃথিবী ঘোর ঘুমে অচেতন। অন্ধকার ঘরের মধ্যে বিছানার উপর গালে হাত দিয়ে জেগে বসে আছে সুনন্দা। পাশে স্বামী অনুপ অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

তার খাস প্রশ্বাসের শব্দ, টাইম পিস ঘড়িটার টিকটিক শব্দ হ'কান ভরে সে শুনছে। প্রাণ ভরে সে এতক্ষণ কেঁদেছে। কেঁদে কেঁদে সে শান্ত হয়েছে। চোখে আর এখন জল নেই। সে শুধু ভাবছে, আকাশ-পাতাল ভাবছে, যে ভাবনার কোন শেষ নেই। কিছুক্ষণ আগে সে স্বামীর মুখ থেকে যে কথা শুনে এলো, তাতে সে একেবারে পাগল হয়ে গেছে যেন। কী শুনলো? নিজের কানকেই যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

এও কি সম্ভব? স্বামী আগে একটা বিয়ে করেছিল। ছ'টো ছেলেও হয়েছে। ও-ঘরের ওই জিনিসপত্রগুলো নাকি তাদের। যাকে বিয়ে ক'রেছিল সে নাকি নীচু জাতের মেয়ে। মাত্র নাকি দু'মাস আগে একথা জানাজানি হয়ে গেছে। আর তাই নাকি শাওড়ী তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আচ্ছা একেবারেই যদি তাড়িয়ে দিয়ে থাকেন তবে জিনিসপত্রগুলো সঙ্গে দিয়ে দেননি কেন? ফেলেই বা দেননি কেন? আমি এসে দেখব, এ ভয় তো থাকা উচিত ছিল? না না, আমার ভয় থাকবে কেন? আমার বাবা-

**উৎসর্ঘ**  
**বেনারসী রেশম বস্ত্র**

**সিঙ্ক সেন্টার**

বহুবাজার মার্কেট  
কলিকাতা-১২  
ফোন: ৩৪-৪৮১০



মাকে তো সব বলেই নিয়েছে আগে থেকে। বাবা-মার কথা মনে হতেই বুক ঠেলে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

আশ্চর্য হ'য়ে সুনন্দা ভাবে, আচ্ছা, আমি না বাবার এত আদরের সোনা? এদের এত গলদ জেনেও আমাকে এদের হাতে দিতে বাবার একটুও কষ্ট হোল না? আমি এতই বোঝা হয়েছিলাম? না না, বাবা-মা কিছুতেই এসব জানেন না। ও মিথ্যা কথা বলছে নিশ্চয়ই। জানলে কখনওই এ বিয়ে বাবা দিতেন না। বাবা কি এতই বোকা বা কাঁচা লোক যে, ওরা তাড়িয়ে দিয়েছি বললেই তা বাবা মেনে নেবেন। বাবা জানেন না? মস্ত পড়ে বিয়ে করলে অত সহজেই নীচু জাত বলে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না? বিশেষ করে ছ'টো ছেলে আছে যখন,—এর পিছনে আইন আছে না? আবার সুনন্দার মনে প'ড়ে গেল। অল্প একথাও তো বলল—সে আইনের সাহায্য নিয়ে ওই মেয়েটার সব ব্যবস্থা করেই তারপর নাকি সে এই বিয়ে করল। আর নাকি কিছু গোলমাল হবে না। আর এইসব জেনেই নাকি তার বাবা রাজী হয়েছেন।

বাবার কথা মনে হ'তেই আবার সুনন্দা ছটফট করে উঠল। কেন, কেন বাবা তাকে একথা জানালেন না? আমি কি বড় হইনি? আমার কি একটা মগামত থাকতে নেই। আবার সে ঝরঝর করে কঁদে উঠলো। দূরে পেটা বাড়িতে ঢং ঢং করে রাত তিনটে বাজল।

অল্প পাশ ফিরে গুতেই তার একটা হাত এসে সুনন্দার হাঁটুর উপর পড়ল। সুনন্দা ঘুণায় হাতখানা ন'রিয়ে দিয়ে পাশ বাঁশিটা দিয়ে মাঝখানে একটা পাটিশান দিয়ে দিল।

মাথার দিকের জানালাটা খোলা ছিল। শেষ রাতের একটা ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লুটিয়ে প'ড়লো মশারির উপর। ঠাণ্ডা হাওয়ার সাথে সাথে আর একজন যে এসে ঘরে ঢুকলো সে একেবারেই নবাগতা এই সুনন্দার মত। সে হ'ল শিউলি রানী।

বর্ষা বিদায় নিয়েছে। বৃষ্টির নুপুর পরা পদধ্বনি তার দূরে মিলিয়ে গেছে। নেপথ্যে শরতের কণ্ঠস্বর শুনে শিউলি রানী ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে। তার সৌরভ এসে নবাগতা সুনন্দাকে যেন স্বাগতা জানাচ্ছে। ক্ষণেকের জন্য সুনন্দার মন পোশ একেবারে জড়িয়ে গেল। সে মন

থেকে সবকিছু ঝেড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করল; কিন্তু না, কিছুতেই ঝেড়ে ফেলা যায় না। আবার সেই চিন্তাই তাকে চেপে ধরল। একবার অনুপের দিকে তাকাল, দেখল সে বেশ ঘুমাচ্ছে একেবারে পরম নিশ্চিন্তে। তার আর চিন্তা কি? বিয়ে তো তারা একটা ছাড়া দশটা করতে পারে। জানা তো শুধু এই মেয়েগুলোর।

সুনন্দা ভাবে, কি করতে পারি আমি! এখান থেকে পালিয়েও যেতে পারব না। বাবা-মাকে চিঠি লিখে চলে যাব, তাও হয়ত হবে না। এদের নিয়েই হয়ত থাকতে হবে। কি করে থাকব? মনটা অশ্রদ্ধা আর ঘুণায় ভ'রে গেছে, এদের উপর ব্যবহারে তা প্রকাশ পাবে। তারপর অশান্তি হবে। স্বামীর তো কোন দোষ নেই। সে তো নিজে ইচ্ছা করে ওই মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করেনি। তার মাই তো এই সম্বন্ধ করে বিয়ে দিয়েছেন। কেন ভাল করে খোঁজ খবর না নিয়ে তিনি বিয়ে দিলেন? বড় রাগ তার প'ড়লো গিয়ে শান্তুড়ীর উপর।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসে ছুশ্চিন্তার সাগরে সে হাবু-ডুবু খেতে লাগল। কোথাও কুণ কিনারা নেই। সারাটা রাত কেটে গেল অনিদ্রায়। ঘুম তার ধারে কাছেও এল না। আজ নিশে চার রাত সে ঘুমায় না। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। উঃ, কি অন্ধকার কোথাও একটু আলোর চিহ্নও নেই। তার মনটাও যে এমনি গভীর অন্ধকারে ভ'রে গেছে। এ অন্ধকার কি কোনদিন দূর হবে? এতটুকু আলোও মনের মধ্যে কোথাও নেই। তার সকল আশার আলো, স্বামীর মুখে ওই কথা শোনার পর থেকে চিরকালের মত নিবে গেছে।

আরো কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে গেল সুনন্দার আবোল-তাবোল চিন্তা করতে করতে। সে লক্ষ্য করেনি যে আস্তে আস্তে রাত্রির গুমট অন্ধকার পাওলা হ'য়ে এসেছে। ভোরের ঝিরঝিরে হাওয়াতে তার মনটাও যেন হালকা হ'য়ে এসেছে। সে খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজলো।

হঠাৎ দরজায় হুমহুম শব্দ হওয়াতে সুনন্দা চমকে উঠে সোজা হ'য়ে ব'সলো। জেগে উঠে তাকাতাই চোখ প'ড়লো স্বামীর দিকে, দেখলো স্বামী তার দিকে চেয়ে হাসছে। এদিকে ভোর হ'য়ে গেছে।

অনুপ বলল, যাও দরজা খুলে দাও। সব অন্ধকার দূর হ'য়ে যাবে।

সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও খাট থেকে নামল। আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। অনুপও বিছানা থেকে নামল এবং তার পিছনে এসে দাঁড়াল।

সুনন্দা একটু স'রে দাঁড়িয়ে ব'লল, তুমি দরজা খোল।

অনুপ ওর হাত ধ'রে টেনে এনে দরজার সামনে ঠেলে দিয়ে বলল, খোল ভয় নেই, আমি আছি।

সুনন্দা স্বামীর কোতুক হাসিতে ভরা মুখের দিকে চেয়ে একটু অবাকই হোল। তারপর আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে দিল।

অনুপ দরজার পাশা ছ'টোকে ছ'হাত দিয়ে একেবারে খুলে দিল। আর তখনি এক ঝলক আলো এসে প'ড়ল ঘরের মধ্যে। সেই সঙ্গে আর এক ঝলক আলোর মতই একটা সুন্দর ফুটফুটে পাঁচ ছয় বছরের ছেলে এসে সুনন্দার কোলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর তার পেছনে পেছনে আরো দুজন এসে ঘরে ঢুকলো। একজন ওই স্বর্গীয় আলোর মত সুন্দর ছেলেটির বাবা। আর একজন মা, মায়ের কোলেও আর একটা সুন্দর শিশু।

ওরা দু'জনে এগিয়ে এসে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা সুনন্দা ও অনুপকে সুপ্রভাত জানাল। এক ঘূর্তের মধ্যে ঘরখানা একেবারে কলরবে কোলাহলে মুখরিত হ'য়ে উঠল। ঘুমন্ত বাড়ীখানা যেন জেগে উঠলো গভীর নিদ্রা থেকে।

অমিয়া দেবীও ছুটে এলেন। তাঁর স্বান হ'য়ে গেছে। ঠাকুর ঘরের দিকে চলে গেল বিশ্বদেবতাকে প্রণাম চাকর-ঠাকুর সব যার যার কাজে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। জানাতে।

অনেক অনুযোগ অভিযোগের পাশা শেষ হোল ছ'পক্ষের থেকেই।

মিসেস সিন্হা কোলের শিশুটিকে এনে সুনন্দার কাছে দিয়ে ব'ললেন, মেমসাহেবার মুখে কথা নেই কেন? দু'জনে ঝগড়া হ'য়েছে নাকি?

একথা শুনে মিষ্টার সিন্হা বললেন, বাঃ বেশ তো তুমি, ১৫ দিন হ'ল বিয়ে হ'য়েছে, এর মধ্যেই ঝগড়া? সবাই বুঝি তোমার মত!

মিসেস ঝাড়ার দিয়ে ব'লে উঠলেন, দেখ না, কেঁদে কেঁদে মুখ ফুলিয়ে ফেলছেন শ্রীমতী। ঝগড়া শুধু আমিই করি না? তারপর অনুপের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, আচ্ছা বলুন তো, সত্যি ঝগড়া হ'য়েছে নাকি?

অনুপ সুনন্দার মুখের দিকে চেয়ে বলল, না বউদি ঝগড়া নয়, কিন্তু দারুণ একটা ইন্টারেস্টিং কথা আছে, ও কারা তারই জন্ত। আপনারা ফ্রেন্স হ'য়ে আসুন, চায়ের টেবিলে মজার ঢেউ বইয়ে দেব। আমি বাথরুমে গেলাম—বলে অনুপ চলে গেল। মিষ্টার এবং মিসেস সিন্হাও প্রাতঃকৃত্য সমাধা করতে চলে গেলেন হাসতে হাসতে। রইলো শুধু সুনন্দা।

সুনন্দার কাছে সব ব্যাপার জলের মত পরিষ্কার হ'য়ে গেল। সূর্যদেবের আগমনে যেমন রাতের গুমট অন্ধকার দূর হ'য়ে যায়, তেমনি সুনন্দার মনের অন্ধকারও দূর হ'য়ে গেল প্রভাতের প্রথম অতিথি যারা এল তাদের আগমনে।

সে কোলের শিশুটিকে আদরে ভ'রিয়ে দিতে দিতে

ঠাকুর ঘরের দিকে চলে গেল বিশ্বদেবতাকে প্রণাম

জানাতে।

## খেলা ভাঙার খেলা

(গান

সু—মো—দে

আজ খেলা ভাঙার খেলা খেলবি আয়—

ক্রিকেট খেলা ভেঙে ফেলবি আয়!

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বিদেশের টিম্ বুঝবে

নিরস্ত জনতার সঙ্গে পুলিশ বাহিনী যুঝবে,

টিয়ার গ্যাসে জনতাকে কাঁদাবি আয়।

লাঠিপেটা কর্ নিরীহ দশককে

দশজনে ঠেঙা একজন লোককে,

ঠেঙিয়ে যাবি একমাথা থেকে শিশু-নারী

তোরা না পারলে ডাকব শেষে মিলিটারী

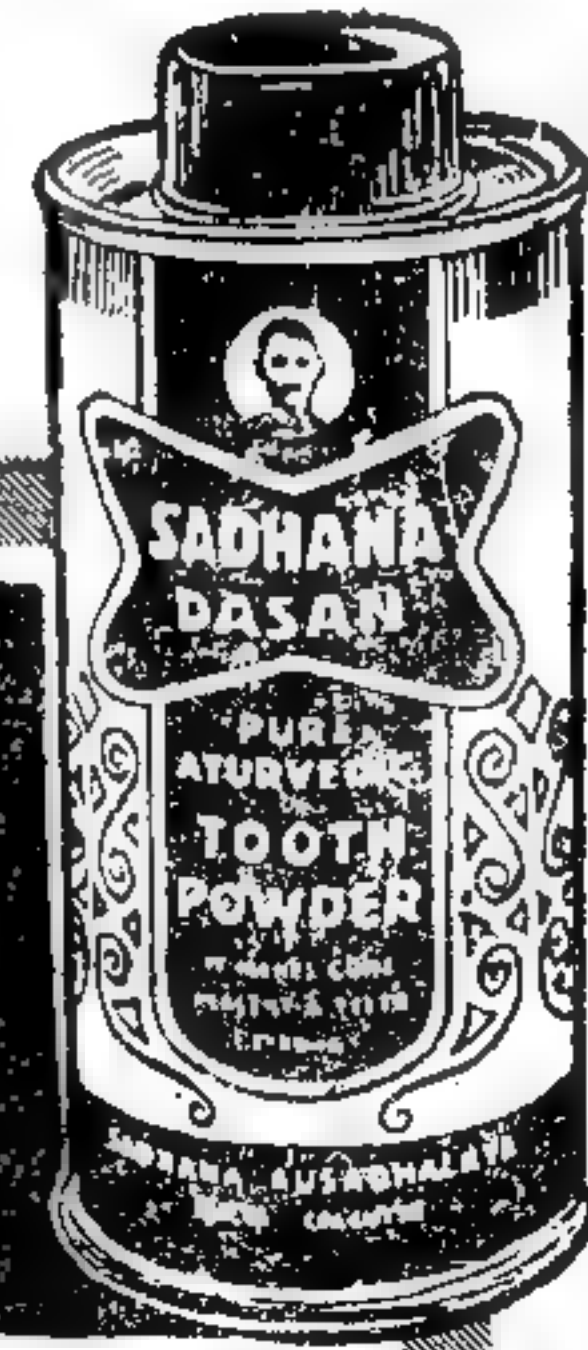
বাংলার মান পাবে ঠেলবি আয়!



# মুখের দুর্গন্ধ অতি অপ্রীতিকর!



মুখে দুর্গন্ধ থাকিলে সমাজে  
অবাধ মেলামেশা করা যায় না।  
কাজেই ইহা অনেকের জীবন  
দুঃখময় করে। প্রতিদিন সাধনা  
দশন ব্যবহার করিলে মুখের  
দুর্গন্ধ দূর হয়, মুখ জীবাণুমুক্ত  
হয়, ও দন্তরাজি সুস্থ, সবল  
ও সুন্দর হয়।



স্বাস্থ্যের  
সুখের  
সুখের  
সুখের

সাধনা ঔষধালয় - ঢাকা

১০৬নং কর্ণওয়ালিস ট্রাট, কলিকাতা - ৬

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর

কলিকাতা-৪৮



অধিক - জীবোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.  
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এক. সি. এস. (লওন)  
এম. সি. এস. (আমেরিকা) ভাগনপুর  
কলিকাতার রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,  
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী।



# ছাড়পত্র

( গল্প )

## শ্রীআদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়

এখনও অবিশ্বাস ?

আমি মনে মনে মনটাকে কুথিয়ে উঠি। চোখ দুটো স্ফীত করে ছেড়ে দিই সামনাসামনি জানালার দিকে।

‘কারও কথা বিশ্বাস হয় না, এবার হল ত ?’

কে যেন অন্তর থেকে একটি মাত্র উত্তর দিলে, ‘না—’

‘না ? না ? চোখ দুটো কি আমার নয় ?’ অর্ধৈর্ষ্য হয়ে খাটের ওপর বসে পড়ি, হু-হাতের মুঠি দিয়ে মাথার চুলগুলো খামচে ধরে। সন্দেহ সঙ্কুল মন নানা সন্দেহে জাপটে ধরল মনটাকে। তবে ?

কতদিন জী বলেছে, ‘ওগো এ-পাড়া থেকে বাসাটা তুলে নাও, চোখের সামনে কি ওদের বেহারাপনা দেখা যায় ? মেয়েটা বড় হচ্ছে, পাড়ার গুণে শেষে না—’

‘আঃ, কি যা’ তা’ বাজে বকছো ?’

‘তুমি ত কারও কথা বিশ্বাস কর না, কিন্তু আমি না হয় বাজে বকছি, পাড়াসুদ্ধ সবাই কি—’

‘আমি নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত কারও কথা বিশ্বাস করি না—’

বুঝা এদিকে আসে জী চুপ ঘেঁরে যায়।

এ-পাড়ায় প্রায় পাঁচ বছর বাস করছি। অশোক আমার সহকর্মী, সে এ বাসাটা ঠিক করে দিয়েছে। বাড়ীখানা যদিও আমাদের বসবাসের উপযোগী নয়, তবু ভাড়া সস্তা—তাই জীর শত অনুরোধেও ভাল বাসার খোঁজ করিনি। কেরানী মানুষ, ক’ টাকাই-বা মাইনে পাই ?

পাড়াটার নাম জিতেন্দ্রনাথ লেন। আমারই মত কেরানী বা স্বল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এ পাড়ায় বাস করে। পাড়ার মধ্যে না আছে পার্ক, না আছে একটা স্কুল, না আছে নামকরা ডাক্তার। তবু আমি পাড়াটাকে মন্দের ভাল বলি। হিংসা নেই, ঝগড়া বাঁটি নেই, পাড়ারগায়ের মত পরস্পর পরস্পরের বিপদাপদে ছুটে আসে রাত জপরেও। চোর ডাকাতির আশঙ্কা এ পাড়ায় আসতে

ভয় পায়, ফিরিওয়ালারা নাক সিঁটকায়, বন্ধু-বান্ধবেরা গলির মোড় পর্যন্ত এসে, যাক্—লেনটা ত চিনে রাখলাম, পরে একদিন অবসর করে আসব বরং—’ বলে ক্ষুন্ন মনে ফিরে যায়।

তবু আমরা ছিলাম ভাল বলতে হবে। কিন্তু যত কাল হল যেদিন প্রমথেশবাবু এ পাড়ায় তাঁর পুরানো দুখানা বাড়ী ভেঙে একখানা সুদৃশ্য বাড়ী তৈরী করালেন।

কেউ বলে, প্রমথেশবাবু ভবানীপুরের বাড়ী বেচে দিয়ে এবার এ পাড়ায় উঠে আগবেন, কেউ বলে তিনি ব্ল্যাক মার্কেটিং করে লাখ লাখ টাকা মুনাফা করেছেন এখন কলকাতায় তাঁর যত পুরানো বাড়ী আছে ভেঙে নতুন করে গড়ে ভাড়া দেবেন।

অশোক একদিন বললে, ‘প্রমথেশবাবুর সঙ্গে আলাপ করে এলামেরে শ্রীনাথ, চমৎকার লোক মাইরি, কে বলবে লক্ষপতি ? এতটুকু অহঙ্কার বলতে নেই, তাঁর কথাও বলেছি।’

আমি বিরক্ত হয়ে উঠি। ‘আমার এমন কি কথা তাঁকে বলবার ছিল শুনি ? মেয়েটা গলার লেগেছে তাই বলে এলি বুঝি ?’

‘নারে—তা’ নয়, ভদ্রলোককে চার্মড করে দিয়ে এলাম। শোনু—আমার কানের কাছে মুখটা এনে ফিসফিস করে বলে, ‘একটা চাল মেয়ে দিয়ে এলাম—দেখবি,—নিখাত বাজিমাত।’

‘অর্থাৎ ?’ অশোকের মুখের দিকে তাকাই আমি।

প্রমথেশবাবু বললেন, ‘ছ মাসের মধ্যে বাড়ী ‘কমপ্লিট’ হচ্ছে। নীচে পাঁচখানা রুম, দোতলায় পাঁচখানা—লাইট, জল-পায়খানা সব নিয়ম মারফি।’ তাই আমিও না বলে থাকতে পারলাম না, ‘শুঁর পয়সাই সব নয়, একথা যদি মনে করেন, একটা অনুরোধ করে রাখি আগেভাগে।’

‘বলুন—বলুন—’

‘আমার এক বন্ধু আছেন। আপনার বাড়ীর সামনা-সামনি এই যে বাড়ীখানা দেখছেন এখানে থাকেন। কিন্তু বলুন ত স্তর, ও বাড়ীতে কোন ভদ্রলোক—বিশেষ করে কোন ‘রাইটার’—অর্থাৎ লেখক বাস করতে পারেন?’

মাথা নাড়েন প্রমথেশবাবু, ‘নিশ্চয় না, তাঁর লেখবার ভাবসাব, প্রেরণা—মানে সাহিত্যের উপাদান পাবেন কোথেকে?’

‘তাই বলছিলেন স্তর, বাড়ী ‘কমপ্লিট’ হলেই ত ভাড়া দিচ্ছেন, হেঁ—হেঁ—’

‘বলুন—’

‘যদি ঠুকে মানে কেরানী মানুষ ত ভাড়াটা একটু কনসিডার করে—’

‘বুঝেছি, নিশ্চয় ‘হেলপ’ করব ঠুকে। সাহিত্যিক মানুষ—আমাদের উচিত, ও হ্যাঁ,—লেখাজোগা কিছু বেড়িয়েছে, কোন কাগজে?’

থতমত খেয়ে যায় অশোক। যুহুর্তে সামলে নিয়ে বলে, ‘না—বেড়ায় নি, আর উনি নাকি লেখাজোগা ছাপাবারও তেমন পক্ষপাতী নন। তবে হালে যা একখানা উপভাস লিখেছেন না—যাকে বলে মরণজয়ী উপভাস! পড়লে অবাক হয়ে যাবেন স্তর, রুদ্রমূর্তি কাগজের নাম শুনেছেন নিশ্চয়?’

বাড় কাত করেন প্রমথেশবাবু, ‘হ—’

এডিটরকে ধরেছি, ঠুর সত্ত্ব লেখা উপভাসখানা ছাপতেই হবে। পড়েও দেখেছেন উনি, আশ্বাস দিয়েছেন, আসছে শারদীয়া সংখ্যায় নিশ্চয় ছাপবেন।’

‘ঠিক আছে, দোতলার দুটো রুম ঠুকে খুব কম রেটেই ভাড়া দেবো। আর আপনি ত আগেই বলে রেখেছেন,—নীচের একখানা।’

‘অসংখ্য ধন্যবাদ—’ বলে অশোক উঠে পড়ে।

আমি চীৎকার করে উঠি, ‘এ তুই কি করলি অশোক? কোনদিন একটা গল্পের দুটো লাইনও একসঙ্গে লিখিনি, কেন ভদ্রলোককে মিথ্যে ভীততা দিয়ে—’

‘আরে এ কলকাতা শহর,—একবার ঘরে ঢুকতে পারলে কি প্রমথেশবাবু ভোর সাহিত্যের খবর রাখবেন? ঘাবড়াস না দিব্যি আরামে থাকবি! হ্যাঁ, ভদ্রলোক যদি

কোনদিন জিজ্ঞেস করেন—আমি যা’ বললাম, তাই বলবি, বুঝলি?’

অশোক যত গগুগোল বাধিয়ে দিলে। রুদ্রমূর্তি কাগজের অফিসের পাশেই আমাদের অফিস। হঠাৎ একদিন বিকেলে প্রমথেশবাবু গিয়ে হাজির।

পিওন ডেকে দিন আমার।

‘এইষে শ্রীনাথবাবু, ওনুন ত? রুদ্রমূর্তির সম্পাদক আমার বন্ধু, আসুন আপনার উপভাসখানার কথা একটু বলে দিই।’

‘কিন্তু—’

‘আরে আসুন না মশাই, কাগজের সম্পাদকরাও ত মানুষ।’

‘আজ থাক প্রমথেশবাবু!’

‘নাঃ সাহিত্যিক হলেও আপনার সময় বা সুযোগ জ্ঞান নেই।’

লজ্জায় ঘুণায় মাথাটা নত হয়ে আসে। একবার ভাবি, সত্য কথাটাই বলি, আবার তখনই ভাবি, তা’হলে অশোকের সম্মান থাকে না। অত্যন্ত নিরুপায় হয়ে প্রমথেশবাবুকে বলি, ‘সামনে ‘ইয়ারেজিৎ’—কাগজের বড় ভাড়া।’

প্রমথেশবাবু মুখ ভার করে রুদ্রমূর্তির অফিসে ঢোকে।

তারপর বাড়ী কমপ্লিট হল প্রমথেশবাবুর। কিন্তু তিনি আমাকে বা অশোককে সে ঘর ভাড়া নেবার জন্তে একটি কথাও বললেন না। এমনকি সামনাসামনি দেখা হলে পাশ কাটিয়ে যেতে লাগলেন।

বুঝলাম, আমাদের চালাকী ধরা পড়ে গেছে।

মাস খানেকের মধ্যে প্রমথেশবাবুর বাড়ীখানা ভাড়াটেতে ভরে উঠলো। এ নোংরা পল্লীতে এমন লোভনীয় বাড়ী বেশ চড়া রেটেই বিলি হয়ে গেল।

আমার বাসার দোতলার জানালার সামনে প্রমথেশবাবুর বাড়ীর দোতলার একটা কুঠরীর জানালা সামনাসামনি পড়ে। সে ঘরখানায় থাকেন হরিহরবাবু। হরিহরবাবু কলকাতায় একদা এক ঠিকাদারের অধীনে কাজ করে আজ নিজেই ঠিকাদারী করেন। প্রায় একশো কুলি মিস্ত্রী তাঁর অধীনে কাজ করে। আগে তাঁর বাসা ছিল





৪৬শ বর্ষ

ফাল্গুন, ১৩৭৩

১ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

## গণতান্ত্রিক ভারতে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের প্রতিক্রিয়া

ভারতে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন এক যুগান্তকারী রক্ত-কণ্ঠস্বর বিপ্লব এনে উপস্থিত করেছে। জগতের অবিখ্যাতীদের সামনে এই কথাটাই আজ উচ্চারণে উচ্চারণ করছে যে, ভোটের দ্বারাই বিরাট পরিবর্তন সাধন করা যায়। নিঃসন্দেহে এটা ভারতীয় গণতন্ত্রের বিরাট সাফল্য—আর ভারতীয় সংবিধানের সার্বিক রূপায়ণেই সেটা সম্ভব হয়েছে।

এবারের সাধারণ নির্বাচনে ভারতের আটটি রাজ্যের বিধান সভায় কংগ্রেসের বিপর্যয় ঘটেছে; এবং বলা বাহুল্য ঐসব রাজ্যে অ-কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনসাধারণ গত কুড়ি বৎসর কংগ্রেসের শাসন ব্যবস্থায় বীতশ্রদ্ধ হয়েই বিরোধী দলগুলিকে ক্ষমতার আসনে

বসিয়েছে। জনসাধারণ চায় একটি নতুন ও সুদৃঢ় শাসন ব্যবস্থা।

রাষ্ট্রনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে অনেকে বলতেন যে, দেশবাসীর উপর কংগ্রেসের প্রভাব এতই বেশী যে একটা ল্যাম্প পোষ্টকেও প্রার্থী মনোনীত করলে ভোদাতারা তাকে নির্বাচিত করবে। একদিন সত্যিই কংগ্রেসের প্রতিপত্তি ছিল অপ্রতিহত। কিন্তু যুগ-প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে নি। জাতির চরম পরীক্ষার দিনে নেতৃবৃন্দ কেবল সুউচ্চ বক্তৃতা মঞ্চের উচ্চতম ধাপ থেকে জনসাধারণকে কঠোর আত্মসংযমের বাণী বিতরণ করেছেন, অথচ নিজেরা আরামে বাস করেছেন, বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়েছেন—এরচেয়ে



হীনতম ও প্রতিক্রিয়াশীল কাজ আর কিছু হতে পারে না। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন সেনা পরাজিত হয়েছেন ও কংগ্রেস প্রথার বিধান সভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে না, একথা জানার পর শুধু কলকাতার নয়, সমগ্র পশ্চিম বাংলার সর্বত্র আনন্দোচ্ছ্বাসের এক অভূতপূর্ব বজ্রা বয়ে যায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সেদিন বাংলা দেশের মানুষ প্রাক্তন-বিজয়ী অজয়বাবু'কে তাদের অবিসংবাদী নেতৃত্বদে বরণ করে নিয়েছিলেন। জনসাধারণের সেই মুক্তি-আনন্দের উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যখন বাংলা দেশের সাধারণ মানুষ অজয়বাবু'কে নিয়ে ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ডালহৌসী কোয়ার্টার পরিক্রমা করেছিল অথবা রাইটাস' বিল্ডিংয়ের বারান্দা থেকে হাত নেড়ে সেই মিছিলকে স্বাগত জানিয়েছিল। জনতার ঐকান্তিক আগ্রহেই আজ অজয়বাবু পশ্চিম বাংলার অবিসংবাদী নেতৃত্বদে আসীন হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে আজ অন্নের অভাব, জীবিকার অভাব এবং সর্বোপরি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আত্মীয় অভাব। ভারতের অন্যান্য রাজ্য যখন ছোটখাটো শিল্পে অগ্রসর হয়ে গেছে, তখন পশ্চিমবঙ্গে শিল্প প্রণালীর গতি প্রায় শুষ্ক হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে অব্যাহত ধনপতিদের মুষ্টি দৃঢ়তর হয়েছে। দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অবহেলার কলকাতার পৌর জীবনের সমস্ত অসহনীয় হয়ে উঠেছে। আর একদিকে অবাধে ঘুঘুর রাজত্ব চলেছে, আমলাতান্ত্রিক হৃদয়হীনতা প্রতিকারহীন হয়ে উঠেছে। অসন্তের প্রতিপত্তি বেড়েছে, সভ্যতার কর্তৃত্ব শুষ্ক হয়ে গেছে। সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা অস্থিহীন হয়েছে। আইনের প্রতি, প্রতিষ্ঠিত শাসনের প্রতি সমস্ত শ্রুতি মিলিয়ে গেছে, সর্বত্রই অসচ্ছন্দতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্ছ্বাসভার ওষ্ঠে ব্যাধি সংক্রামিত হয়েছে। খাস রাইটাস' বিল্ডিংয়ের ভিতরে পর্যন্ত অবাধ্যতার ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে দিয়েছিল।

বাংলা দেশের এই ভঃসহ অবস্থা থেকে জাতি ও মানুষকে রক্ষা করার জন্য যে সং-শুদ্ধ চরিত্র, ত্রুতধারী মানুষ এসেছেন, কোটি কোটি বঞ্চিত, ক্ষুধা সাধারণ মানুষ তাঁর মধ্যে নিজেদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখতে পেয়েছেন। জনসাধারণ অন্ততঃ এটুকু আশা

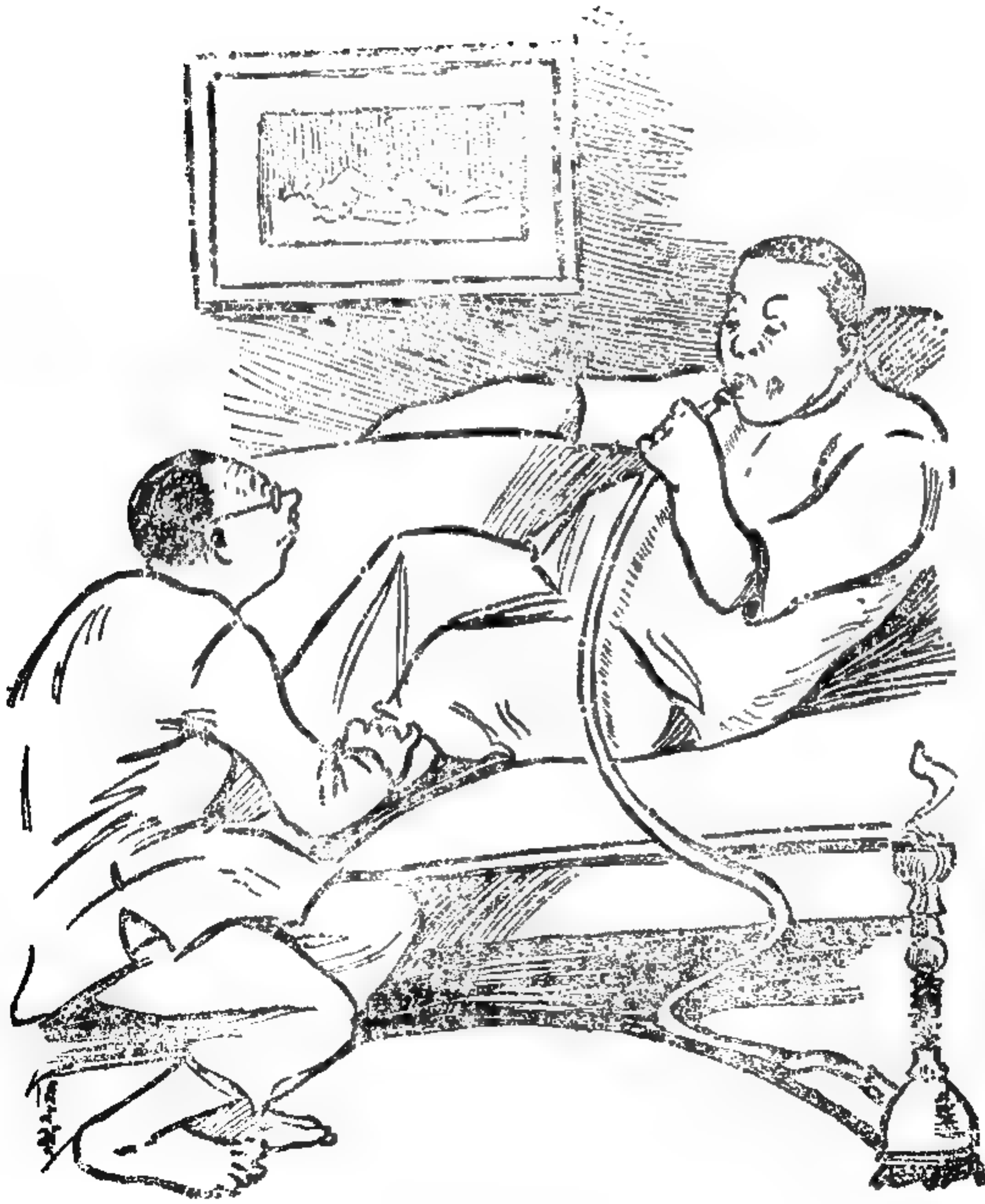
করতে পারবেন যে, নূতন মন্ত্রিসভা তাঁদের অভাব-অভিযোগের প্রতি স্বভাবতঃই সহানুভূতি-সম্পন্ন হবেন। তাই পশ্চিম বাংলার প্রথম অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণের পর নূতন বিধান সভার উদ্বোধন উপলক্ষে যে উচ্ছ্বাস উঠেছিল তার কাছে নির্বাচনোত্তর উৎসাহের স্বতঃস্ফূর্ত জোয়ারও যেন নিম্প্রভ হয়ে গেছিল। বিধান সভা ভবনের চারি পার্শ্বার্শী স্থান সমূহ গুণগ্রাহী জনতার হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। প্রতিটি লোকের মুখে চোখে কুট উঠেছিল স্বস্তি ও তৃপ্তির ভাব।

আমাদের বহুবিধ সমস্যার মধ্যে সর্বোপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হ'ল খাদ্য। প্রাক্তন কংগ্রেসী সরকার দেই বহু পরিচিত সমস্যার মোকাবিলা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বিরাট ফাটল ছিল, যে ফাটলের বন্ধ পথে ভাল কিছু করার সম্ভব প্রেরণা নষ্ট হয়ে যেত।

পশ্চিম বাংলার নূতন অ-কংগ্রেসী সরকার সর্ব প্রণীর জনসাধারণের নিকট হ'তে সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন। দেশ ও জাতির সমুখে সমস্যার সমুদ্র দিগন্ত-বিস্তৃত হয়ে আছে। তাঁরা বলেছেন : সরকারের অর্থ নিত্যন্তই সীমাবদ্ধ, তৎসঙ্গেও বিশেষ করে শিক্ষক, চাষী, ক্ষেতের ও কারখানার শ্রমিক এবং শ্রমবিত্ত সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্য নিম্নবিত্তের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করাই তাঁদের সঙ্কল্প।

আজ পশ্চিম বাংলার অ-কংগ্রেসী সরকারের নেতৃবৃন্দের উপর কঠিন দায়িত্বের বোঝা এসে পড়েছে। অভাবের বিরুদ্ধে লড়াই, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, অবসন্নতা ও উচ্ছ্বাসভার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁদের জনসাধারণের মধ্যে প্রেরণার সঞ্চার করতে হবে, উন্নততর জীবনের যে সব দাবি পুঞ্জীভূত হয়েছে সীমাবদ্ধ সঙ্গতির মধ্যে সে সব দাবি পূরণের জন্য উত্তেজিত হতে হবে। আমাদের নূতন সরকার যদি আন্তরিকতার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেন, তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই সকলের সহযোগিতা লাভ করবেন, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের নিকট তাঁরা অনুসরণীয় একটি আদর্শ স্থাপন করবেন; আর সর্বোপরি হতাশা-ক্ষুধা সাধারণ মানুষের নিকট তাঁরা অশেষ কৃতজ্ঞতাজ্ঞান হয়ে থাকবেন।

## রঙ্গ চিত্র



—আজ্ঞে কতী, দুটোলোকে যে যাই বাল বলুক, এ অ-কংগ্রেসী সরকার কি  
কখনও টিকতে পারে? কংগ্রেসের ২০ বছরের অভিজ্ঞতার  
কি কোন মূল্য নেই।

# নেমনতর

সু-মো-দে

মিষ্টুর বে'তে খেয়েছি প্রচুর  
সেই কথা বলি আজ,  
মাইলো এবং কাঁচকলা যুগে  
হাতে পাই 'রাম-রাজ'।  
খেয়েছি পোলাও মাছ সন্দেশ  
রসগোল্লাও গুয়াচ বেশ,  
কপি আলু ডাল চপ লুচি দই  
পাঁপড় বেগুন ভাজা ;  
ছাঁচড়া চাটনি দরবেশ পান  
সু-মো-দে সেজেছে রাজা।  
সমাজতন্ত্রী ভারতবর্ষ  
জনতা বাদিকে শ্রমানে হগ,  
ক্ষুধার জ্বালায় জনতা জঠরে  
ছুঁচো দেয় ডন দাদা ;

পশু বলদ রাষ্ট্র শাসনে  
ঘোড়াক্রমে চালু গাধা।  
খুশি আনন্দ নেমনতর  
হা-হাভাতের জুটনো অন,  
ভাগ্যে বিবাহে এসেছি যুগলে  
হাসিখুশি দুইজনে ;  
চিরদিন যদি এরূপ খেতাম  
দুঃখ দ'ত না মন।  
মিষ্টুর বে'তে খেয়েছিই ভালো  
উপোসী সু-মো-দে মুখ দলালো,  
মাইলো খাচ্ছি বেদম ছুটাছ  
গাডু নিয়ে কাছা খুপে ;  
ভাওতাবাতির সমাজতন্ত্র  
ডিষ্টেটারের শূলে।

## মিতালি

শ্রীআশিসকুমার বানার্জী

ফাগুনের খরতর তাপে  
কিঞ্চিৎ আমেজ লাগা, কিঞ্চিৎ  
ক্রোধের আভাসে, অথবা হঠাৎ এক  
প্রকৃতির বিরোধিতা করা  
বিষম বিকেলে যেন  
কলেজী ছেলের মতো  
কেবল বিজ্ঞপে হাসাহাসি।

এ বনবনানী হায়, শুধু এই  
একমাত্র ভাষাতেই কথা বলে  
ওপাশে সমুদ্র যেন  
ঘন ঘন ছাড়ে চিঠি  
ঝিনুককে পাঠিয়ে পিয়ন।

কখনও এগিয়ে এসে  
ছুঁড়ে দিয়ে ছোটখাট সত্তাবণ দূত  
আবার মিলিয়ে যায়  
দিগন্তে পড়ে থাকা আকাশের বুকে।

ওপরে আকাশ যেন  
নির্নিমেষ দর্শকের মতো  
চেয়ে থাকে যুগ-যুগ, তবুও  
সে তরুন্তু নয়নে,  
আবার দেখতে যেন  
খুঁটার খেলার মাতামাতি  
দিন হলে অস্ত বায়  
সূর্যের প্রবল প্রতাপে।



# মুহূর্তের জ্যো

## সংশ্লিষ্টতা

পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসী শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের বুকের উপর থেকে যেন পাখা-চাপ অস্তিত্ব হয়ে গেছে। সকলের মুখে-চোখে এক স্মিত উৎফুল্লের ভাব। সাধারণ মানুষ মহাবাদের কচকচি বোঝে না। তারা চায় শান্তিপূর্ণ ও সহজ জীবন-যাত্রা পথে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সরবরাহের গারান্টি ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা। সেদিক থেকে কংগ্রেস সরকার সাধারণ মানুষকে হতাশ করেছে।

ব্রিটিশের ঐতিহ্য অনুসরণ করে জাঁকজমকপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার ফলে কংগ্রেসী সরকার জনসাধারণের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংযোগহীন হয়ে পড়েছিল। তারা ভুলে গিয়েছিল যে, সিংহাসনের তখু-এ-তাউস থেকে সাত্রা প্য পরিচালনা করা যায় বটে, কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় না। নেতৃত্বের সেই ভুল উপলব্ধি করার আগেই জনসাধারণ ব্যালট-বুকে কংগ্রেসী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের অভিমত (Verdict of the people) ঘোষণা করে দিয়েছে।

জনগণের শুভেচ্ছা ও সমর্থন সঞ্চল করে পশ্চিম বাংলায় জনপ্রিয় যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক, বর্তমান বাংলা কংগ্রেসের নেতা শ্রী অজয় মুখোপাধ্যায় জনসাধারণের ঐকান্তিক আগ্রহে যুক্তফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিম বাংলার নূতন সরকার জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা দুর্নীতিমুক্ত ও সুদক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনার দ্বারা বহুবিধ সমস্যার মধ্য দিয়েও দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে

যাবেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের এ সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে অভিনন্দন যোগ্য ও সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য।

আজকের এই যুগ সক্রিয়তার মুহূর্তে একটি কথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে, দেশের মধ্যে প্রতিক্রিয়ামূলক অল্প গোট্টা অল্প সক্রিয় কর্ম-উৎপত্তির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের এই দাবিত নাতি অনেকেরই স্বার্থে অস্বস্তি হানবে। তাই ঐদব কায়মী চক্র থেকে পালটা আঘাত হানার ঘটনা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সেইজন্য আজকের দিনে অত্যন্ত সাবধানতা ও সতর্কতার মধ্য দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

রাজ্যের প্রশমনাশ নিয়ে কিছুটা সমালোচনার বড় উঠছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের কোন কোন সদস্য শ্রমিকগণ কর্তৃক ঘেরাও, অবরোধ ইত্যাদি সমর্থন করার স্বভাবতঃই শিল্পাতির কিছুটা বিপর্যয় বোধ করছেন। আবার যুক্তফ্রন্ট সরকারের অধিকাংশ সদস্য পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার পক্ষপাতী। এই সব ব্যবহার ফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। আজকের এই পারবতনের দিনে আকাশ্য ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন কিছুটা বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করতে পারে। আইন ও শৃঙ্খলা এর ফলে বিপর্যয় হওয়াও কিছু আশ্চর্যের নয়। এবং রাজ্যের প্রতিক্রিয়ামূলক চক্র ও সমাজ বিরোধীরা যাতে কোন সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে সে বিষয়ে পূর্ণ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। সেদিক থেকে বিবেচনা করে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে আরও সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে।

জনসাধারণের ঐকান্তিক আগ্রহে যে জনপ্রিয় সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আতিশয্যের প্রাবল্যে সেটা যাতে না নষ্ট হয়ে যায়, তার জন্য সকলকে সচেতন থাকতে হবে।

# শোক

নন্দ সেন

ডিমাপুর টি এঠেটে কাজ করি। কুলি তদারকী। মার্জিত ভাষায় 'কুলিবাবু'। স্মৃতরাং চিরাচরিত লক্ষণ-গুলি যথেষ্টই বিদ্যমান। শরীর ক্ষীণ, পকেট আরও ক্ষীণ, ভগবানের উপর দোষারোপ করা ছাড়া আর কোন সাস্থ্যনাই খুঁজে পাই না। তবে একদিক থেকে আমি কৃত্তী, সার্থক পুরুষ,—সেটি আর কিছুই নয়, খিটখিটে মেজাজ। সেই সুবাদে আনন্দ-নিরানন্দ সব সংবাদই সম পর্যায়ের। কোন কুলি মজুতী বাড়াবার কথা তুললে অথবা বাড়ীতে মেয়ের অসুখ, ছুটি চাই হলে যেমন দাঁত-মুখ খিঁচুতে আরম্ভ করি, করেও মেয়ের অতি-সুখ অর্থাৎ বিয়ে—এও আমার দাঁত-মুখ গিঁচুনির উদ্রেক করে। স্মৃতরাং এই সব কারণে কেউ আমাকে দেখতে পারে না।

হুঁ একজন দুর্ভিক্ষাধী আবার ভবিষ্যৎ অন্ন-সংস্থানের ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত সচেতন। সকলে সভয়ে এড়িয়ে চলে, বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকে যাতে আমার মুখ দর্শন না হয়। তা' নাহলে সেদিন উম্মুনে হাঁড়ি চড়বে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। বুঝি না আমার মুখ-দর্শন আর উম্মুনে হাঁড়ি চড়ার ব্যাপারে কি কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকতে পারে, অথবা এর মধ্যে কোন লজিক আছে কিনা। যাকগে ওরা যা ভাবে ভাবুক।

সেদিন ডিমাপুর টি এঠেট থেকে কোহিমুর টি এঠেটে চলেছি, কোম্পানির জরুরী কাজে। মাঝে পাহাড়ী নদী। গরমে শুকিয়ে গেছে বালির চড়া। স্মৃতরাং রিক্সা সহজেই পেরোতে পারছে। এক মনে ভাবছি কুলিদের নূতন উপদ্রব বন্ধ করা যায় কি করে। ভাবতে অসহ্য লাগছে যে ওরা আবার চার গুণা পরসাম মজুতী বাড়াতে বলছে। চিন্তায় বিভোর হয়ে আছি।

আচমকা গাড়ী থামাতে সংবিল ফিরে পেলাম। লক্ষ বয়স্কাম, বার-তের বছরের একটি ছেলে সমস্ত রাস্তা জুড়ে পড়ে আছে, গায়ে শতচ্ছিন্ন একটা গোল, সমস্ত শরীর নোংরা আর ধুলোতে মাখামাখি হয়ে আছে। বিড়বিড়

করে এক মনে বকে চলেছে ছেলেটি। ওর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সেই মুহূর্তে সন্দেহের উদ্রেক হ'ল। মুহূর্তে এক নূতন উপদ্রব আমাকে বিভ্রান্ত করে তুলল। ছেলেটি উঠে পড়ল রিক্সায়। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে আবেগ মাখত বক্রণ করে চিৎকার করতে লাগল—বাবা! বাবা!!

বিদ্রক্ত বোধ করলাম আমি। যুগপৎ বিস্মিত ও বিচ্যুত হ'লাম। মনে পড়ে গেল বছর দু'য়েক আগের একটি দুঃখের স্মৃতি। আমার একমাত্র ছেলেকে হারিয়েছিলাম দু'বছর আগে টাইফয়েডে। আমাদের ঘরে টাইফয়েড হলে তার কী হিসাবে ছেলে হারানো ছাড়া আর কি-বা থাকতে পারে! সেই থেকে মন্দাকিনী পাগল,—ও যেন বোকা হয়ে গেছে। সারাদিন একরাস বিব্রলতার খোঁ মেখে বসে থাকে। বাড়ীতে আমার একটুও ভ্রম লাগে না। ছেলেটির মুখটা মনে পড়লে নিজেকে ভীষণ দুঃখ আর অপরাধা মনে হয়। সমস্ত সংসার জুড়ে শ্মশানের শূণ্যতা নেমে এসেছে। মন্দাকিনীর বন্ধনুল ধারণা হ'ল, আমার সাথে ওর জীবনটা না জড়ালে তার এমন দুর্দশা হত কিনা সন্দেহ! সময়ের প্রলেপে ক্ষতটা বেশ শুকিয়ে এসেছিল, ক্ষতের মুখে কাল চামড়া পড়বার মুহূর্তে সেই অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনলাম, বাবা! বাবা!!

পাগলের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করি। কি উৎপাত! স্থানীয় দু-চারজন আমাকে নিরাপদ দূরত্বে টেনে এনে শুকে ফেলে দিল রাস্তায়। শুয়ে পড়েই সেই ছেলেটি শুরু করল আদিম চিৎকার—বাবা! বাবা!!

মুহূর্তে একখানা 'ফিফটি' গাড়ী এসে চাপা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল। বার কয়েক কঁপে উঠে চিরদিনের মত নিষ্পন্দ হয়ে গেল ছেলেটির প্রাণহীন দেহখানি। ঘটনার আকস্মিকতায় বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে গেলাম। প্রথম বার পুত্র হারিয়েছিলাম টাইফয়েডে, দ্বিতীয় বার পুত্র-হার। হলাম ফিফটি।

# সাতপাঁচ

শ্রীনাথ

সোভিয়েট সরকার এক সরকারী বিবৃতিতে বলেছে যে, পিকিং-এ আজ যা ঘটেছে, সেটা ঘৃণা ও রক্তহার দিক দিয়ে চিয়াং-কাইশেক কর্তৃপক্ষকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।

—সোভিয়েট সরকারের বোধহয় জানা নেই যে, যে দেশের ছেলে বাপের এবং জী স্বামীর বিরুদ্ধে গুপ্তচরের কাজ করে, সে দেশে ঘৃণা বা লজ্জার বালাই নেই।

সংবাদে প্রকাশ, উত্তরপ্রদেশে সরকারী কর্মচারীদের দুই মাসব্যাপী ধর্মঘটের সময়ে উই আর ইঁদুর এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারকদের লাইব্রেরীর সমস্ত বইপত্র খেয়ে শেষ করেছে।

—ভেতরে ভেতরে তারাও বে-আইনের বহু প্রচলন চাইছে কিনা কে জানে?

কমিউনিষ্ট নেতা এ. কে. গোপালন একই কেন্দ্রে তাঁর “রাজনৈতিক গুরু” কংগ্রেস প্রাণী টি. ভি. চাথকুট নায়ারের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

—নিশ্চয় গুরুমারা বিস্তে আয়ত্ত করেছেন তাহ’লে।

সংবাদে প্রকাশ, সিংহলের মেয়েরা জালিচাতির নিখুঁত পদ্ধতি আর অপূর্ব নোশলে নাকি পুরুষদের ওপর টেকা দিয়েছে।

—তবে ধরা পড়ে কারও সূর্যনখার মত নাক-কান খোঁরা গিয়েছে কিনা জানা যায়নি।

আমেদাবাদের ছ’টি সাংবাদিক সম্মেলনে “স্বতন্ত্র দল” আগামী সাধারণ নির্বাচনে রাজ্যের শাসন ক্ষমতা দখল

করবে বলে দাবি করেছে।

—স্বতন্ত্র দলের স্বতন্ত্র কথা!

অতি-ভালবাসার জন্ত দেশের যুবক যুবতীদের মধ্যে যে কর্ম শৈথিল্য দেখা যাচ্ছে সেজন্ত সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র সরকার যুবক যুবতীদের জন্ত এক “ভালবাসা কমান্ড” আন্দোলন শুরু করেছেন।

—এতে বিবিরা গোসা ঘরে খিল দিয়েছে কিনা এখনও জানা যায়নি।

উত্তরপ্রদেশে এবারের সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ২২ জন ধর্মীয় নেতা, সাধু, মোহান্ত, সন্ন্যাসী প্রভৃতি অবতীর্ণ হয়েছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

—দিল্লীকী লালদুর আশ্বাদ পাবার জন্তে বোধহয়।

শেষ পর্যন্ত সৈন্ত বাহিনীর চাপে নতি স্বীকার করে সূর্য নির্বাসিত জীবন বাণানে প্রস্তুত হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

—গুঁতোয় চোটে বাবা বলেছে আর কি।

আগ্রা শিটি লোকসভা কেন্দ্রে একজন নির্দলীয় প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণার জন্ত মাথা পিছু দৈনিক ৫ পয়সা পারিশ্রমিক ব্যয় করে নির্বাচনী প্রচার ব্যয়ের ইতিহাসে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন।

—ভদ্রলোক বোধহয় নির্বাচনের ফলাফল পূর্বাঙ্কুই টের পেয়েছেন!



**আহাৰৰ পৰ  
দিনে দু'বাৰ..**

**দুৰ আত্মত  
খাদ্য লাভেৰ  
শ্রেষ্ঠ উপায়**

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনৰ জন্তু সাধনাৰ অবদান



**সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা**

কলিকাতা কেন্দ্ৰ ডাঃ নৱেশ চন্দ্ৰ  
ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুৰ্বেদ-  
আচাৰ্য, ৩৬, গোয়াল পাড়া  
হোভ, কলিকাতা-৩৭



অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্ৰ ঘোষ, এম-এ,  
আয়ুৰ্বেদশাস্ত্ৰী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন),  
এম,সি,এস, (আমেৰিকা), ভাগলপুৰ  
কলেজৰ ৱসায়ন শাস্ত্ৰেৰ ভূতপূৰ্ব অধ্যাপক।

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীৰ সঙ্গে চাৰ চামচ ঘন-  
ড্রাক্কাৰিষ্ট (৬ বৎসৰেৰ পুৰাতন) সেবনে আপনাৰ  
স্বাস্থ্যেৰ ক্ষত উন্নতি হবে। পুৰাতন মশা-  
ড্রাক্কাৰিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সৰ্দি, কাসি,  
শ্বাস প্ৰভৃতি ৰোগ নিবাৰণ কৰিতে অত্যধিক  
ফলপ্ৰসূত। মৃতসঞ্জীবনী দুধা ও হৃদয়শক্তি বৰ্ধক ও  
বলকাৰক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্ৰ সেবনে  
আপনাৰ দেহেৰ ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে  
উৎসাহ ও উদীপনাৰ সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ  
স্বাস্থ্য ও কৰ্মশক্তি দীৰ্ঘকাল অটুট থাকবে।

# অশ্রম

( গল্প )

কৃষ্ণদাস মণ্ডল

সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে অফিস থেকে বাড়ী ফিরছি। দেহটা অবসাদে আচ্ছন্ন। আমার বাসা থেকে অফিস বেশী দূরে নয় তাই হেঁটেই সাধারণতঃ যাতায়াত করি। বাসের ঐ ভিড় আমার মোটেই ভাল লাগে না। হুড়োহুড়ি করার চাইতে হেঁটে যাওয়াই ভাল বলে মনে করি। কি যেন একটা চিন্তা করতে করতে ঠনঠনিয়া কালীবাড়ী পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি। হঠাৎ একটা ভিক্ষুক কাতরস্বরে বলল—বাবু একটা পয়সা দিন।

চিন্তার বেশ কেটে গেল। মনে মনে কিছুটা ক্ষণ হলাম। উপেক্ষা করেই চলে যাচ্ছিলাম। আর কত জনকেই বা দিয়ে পারা যায়! ভিক্ষুকের সংখ্যা দিনে দিনে যা বাড়ছে, তাতে উপেক্ষা না করে আর উপায় নেই। ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত আমাদেরই হয়ত ভিক্ষা করতে বেরতে হবে।

যা'হোক আবার ভিক্ষুকটা করুণ স্বরে বলল—বাবু একটা পয়সা দিন, আজ দু'দিন খাইনি।

গলার স্বরটা যেন একটু পরিচিত বলে মনে হ'ল। মনে হ'ল এ সুর যেন আমার অনেক দিনের চেনা।

থমকে দাঁড়ালাম। বিষয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মুখে একরাশ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখের কোণে ময়লা জমেছে। চোখে জল চিকচিক করছে। মুখের দিকে তাকিয়ে আমার পরিচিত স্বরকে খুঁজতে চাইলাম। না, কিছু বোঝা গেল না।

মুখ দিয়ে আবার বেরিয়ে এল একগাদা আকৃতি। আর একবার তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলাম। শতচ্ছিন্ন ময়লা কাপড়। হাতে একটা লাঠি, মাথার চুলে জট বেঁধেছে।

কিন্তু কে! আমার পরিচিত কি কেউ! মনে হ'ল, যে হয় হোকগে, আমার কি দরকার? কিন্তু আমি মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলেও পরিচিত কর্তব্যকে চাপা

দিতে পারলাম না। একবার মনে হল জিজ্ঞাস করি তার নাম, কে সে? কিন্তু ক্লান্তিতে কিছুই ভাল লাগছিল না। পকেট থেকে দশটা পয়সা বার করে দিয়ে বাড়ীর দিকেই এগোলাম।

রাত্তিতে বার বার সেই দাড়ি-গোঁফে ভরা মুখখানি মনে পড়তে লাগল। স্মৃতির পটে ঐ জলভরা চোখ আর বেদনা-ব্যথাতুর মুখখানি আমাকে ছেড়ে যেতে চাইল না। কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পারলাম না, সে কে।

তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল, একবারে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। দিন পনের পর আবার ঐ রাত্তা দিয়ে বাড়ী ফিরছি। কালীবাড়ীর সামনে এসে প্রণাম করে দাঁড়ালাম। আবার সেই পরিচিত কর্তব্য ডাক এল—বাবু একটা পয়সা দিন।

আবার সেই বিষয়। আবার সেই জিজ্ঞাসা, তবে ও কে? মনে করলাম, আজ আমাকে জানতেই হবে, কে সে?

কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। বললাম—শোনো, তোমার নাম কি?

আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে কি যেন দেখলে। হয়ত চিন্তা করল, কি ব্যাপার আমি তার নাম জানতে চাই কেন? সে হয়ত এমন উদ্ভট প্রশ্নে কিছুটা হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর সে একটু হাসল, কেন জানিনা—আমার এই উদ্ভট প্রশ্নে, না তার ব্যথা-জনিত কোন দুঃখে! তারপর বাড়ি নিচু করে বলল—কেন বলুন তো।

আমি বললাম—তোমার কর্তব্য যেন আমার বহু পরিচিত মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে তুমি আমার অনেক চেনা। কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছি না, তুমি কে?

আমার মুখের দিকে সে আর একবার তাকাল। মনে হ'ল আমাকে চিনতে চেষ্টা করছে। তবে ওকি আমায়



চিনতে পেরেছে? মনে হ'ল যেন পেরেছে।

—কি হবে আমার নাম জেনে?—আমাকে ও প্রশ্ন করল।

প্রশ্নের উত্তর না নিয়েই সে চলে যাচ্ছিল। আমি আবার তাকে ডাকলাম, শোন।

যেন বিরক্তি ডরেই আবার ফিরে দাঁড়াল। অন্তত মুখ দেখে তার সেইরকম মনে হ'ল।

বললাম—বল না তোমার নাম কি?

আমার কথার উত্তর না দিয়ে সে নিজেই বলে চলল, মনে পড়ে দীপঙ্কর, সেই স্কুলের Annual sports-এর কথা?

একি তাহ'লে আমায় ও চেনে! বললাম, হ্যাঁ মনে পড়ে।

ও বলেই চলল, সেই স্কুলের মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হচ্ছে। বিভিন্ন খেলায় বিভিন্ন ছেলে অংশ গ্রহণ করেছে। কেউ বা হাই জাম্প, লং জাম্প, রিলে রেস, ব্রেকিং-দেজার, দৌড়, সব খেলা একে একে হয়ে গেল। সব শেষে মাইকে ঘোষণা করা হ'ল, 'গো এজ ইউ লাইক'—এতে যারা অংশগ্রহণ করতে চাও তারা দশ মিনিটের মধ্যে সভাপতি ও প্রধান অতিথির সামনে এসে দাঁড়াও।

প্রধান অতিথি অংশগ্রহণ করেছিলেন এই বাংলা দেশেরই একজন শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ অঞ্জন রায়। মনে পড়ে দীপঙ্কর এ সব কথা?

বললাম, সব মনে পড়ে। কিন্তু তুমি কি.....

—বলছি, বলছি, ব্যস্ত হতে না। নামটা পরেই বলছি। 'গো এজ ইউ লাইক'-এতে অনেকে অনেক রকম মেক আপ নিয়েছিল। কেউ বা মুচি, কেউ বা খাড়ুদার, কেউ বা কৃষক, কেউ বা পাঞ্জাবী, কেউ বা সাহেব। কিন্তু যে ছেলেটাকে তোমরা কেউ চিনতে পারোনি, সেই খোঁড়া, লাঠি হাতে, ছেঁড়া লুঙ্গি, দাড়ি লাগানো, একটা কোটো হাতে নিয়ে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে—পেরেছিলে কি তাকে চিনতে? তোমার কাছেও গিয়েছিলাম, কিন্তু তুমিও আমায় চিনতে পারোনি। কি আশ্চর্য, তাই না! সেই বেশ আর এই বেশ, সেই ভিক্ষকের সাথে আর আজ এই ভিক্ষকের সাথে আশ্চর্য রকম মিল আছে, না দীপঙ্কর?

কৌতূহল সংবরণ করতে পারলাম না। বললাম—

তুমি অশ্রু!

—এতক্ষণে চিনেছ! মনে করেছিলাম, চিনতে পারবে না। হ্যাঁ আমি সেই অশ্রুময় ঘোষ।

উঃ, কি সাংঘাতিক জীবনের পরিণতি! মানুষের জীবনে যে এইরকম পরিণতি ঘটতে পারে তা আমার কল্পনারও বাইরে ছিল। ক্লাসে ভাল ছেলেই ছিল অশ্রু। বিধবার একমাত্র সন্তান। ওর মা খিয়ের কাজ করতো। কত দুঃখের মধ্যে ওদের জীবন কেটেছে, তা অবর্ণনীয়। কোনদিন হয়তো খাওয়া জুটতো, কোনদিন হয়ত তাও জুটতো না।

একদিন একটা ঘটনার কথা ও আমাকে বলেছিল। ওর মা যে বাড়ীতে কাজ করতো তারা ছিল খুব বড়লোক। ভদ্রলোকের এক ছেলে ছিল, তার নাম সোমনাথ রায়। একটা অন্ন ছেঁড়া জামা ওরা বাদ দিয়েছিল। অশ্রুর মা না বলে সেই জামাটা নিয়ে এসেছিল অশ্রুর জন্তে। অশ্রুর মা মনে করেছিল একটু সেলাই করে নিলেই বেশ কিছুদিন পরতে পারবে তার ছেলে। অশ্রু সেই জামাটি গায়ে দিয়ে স্কুলে গিয়েছিল একদিন। সোমনাথও সেই স্কুলে পড়ত। জামাটা দেখে ও চিনতে পারল। সোমনাথ বাড়ী গিয়ে বলল সব ঘটনা। তারপর তার মায়ের কাজ ঐ বাড়ীতে শেষ হয়ে গেল। কোন অনুন্নয়-বিনয় তারা মানল না।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ওর মায়ের টাইফয়েড হয়, ওষুধের অভাবে মারা গেল অশ্রুর মা। সে সময় অশ্রু ক্লাস টেন-এ পড়ে। ফাইনাল পরীক্ষা আর দেওয়া হ'ল না তার।

আমি সেই সময় চলে আসি কলকাতায় মামা-বাড়ীতে। তারপর আর অশ্রুর সাথে দেখা হয়নি। জীবনের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমি বি-এ, পাস করেছি। সরকারী অফিসে চাকরিও পেয়েছি। পরিবর্তন হয়েছে পৃথিবীর। পরিবর্তন হয়েছে অশ্রুর জীবনের।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার এ দশা কি করে হ'ল?

ওর চোখ দিয়ে দরদর করে জল ঝরে পড়ল। বলল—মা মারা যাবার পর আমি আর পড়াশুনা করতে পারিনি। আমি দিশাহারা হয়ে গেলাম। কি করব! এখানে সেখানে একটা কাজের জন্ম ঘরে বেড়ালাম। তাও কিছু



হ'ল না। তারপর এলাম এই শহর কলকাতায়। দু' দিন কিছু খাইনি। রাস্তা চলতে পারছি না। রাস্তা পার হতে গিয়ে একটা ট্যাক্সি এসে ধাক্কা মারল। তারপর আর আমার জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান ফিরলে দেখি, হাসপাতালে গুয়ে আছি। তারপর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এই বৃত্তি অবলম্বন করেছি।

অশ্রুর নামের সাথে তার সেই 'মেক্ আপে'র সাথে যে তার জীবনের এমন আশ্চর্য মিল হবে তা অশ্রুই কি ভাবতে পেরেছিল? আমার চোখের জল বাধা মানল না। গড়িয়ে

পড়ল ফুটপাথের কঠিন মেঝেতে।

আমি বললাম—অশ্রু তুমি আমার বাড়ী চল।

—তা কি করে হয় দীপঙ্কর! বিধাতা আমার জন্তু এই-ই ঠিক করেছেন। তাতে তুংখ কি বল?

পকেট থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট তার হাতে দিয়ে চলে এলাম। আমার গতিপথের দিকে সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আর বিড়বিড় করে কি বলল শুনতে পাইনি। হয়ত ও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিল—আমার জীবনের সুখ, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি।

## সচিত্র শিশির

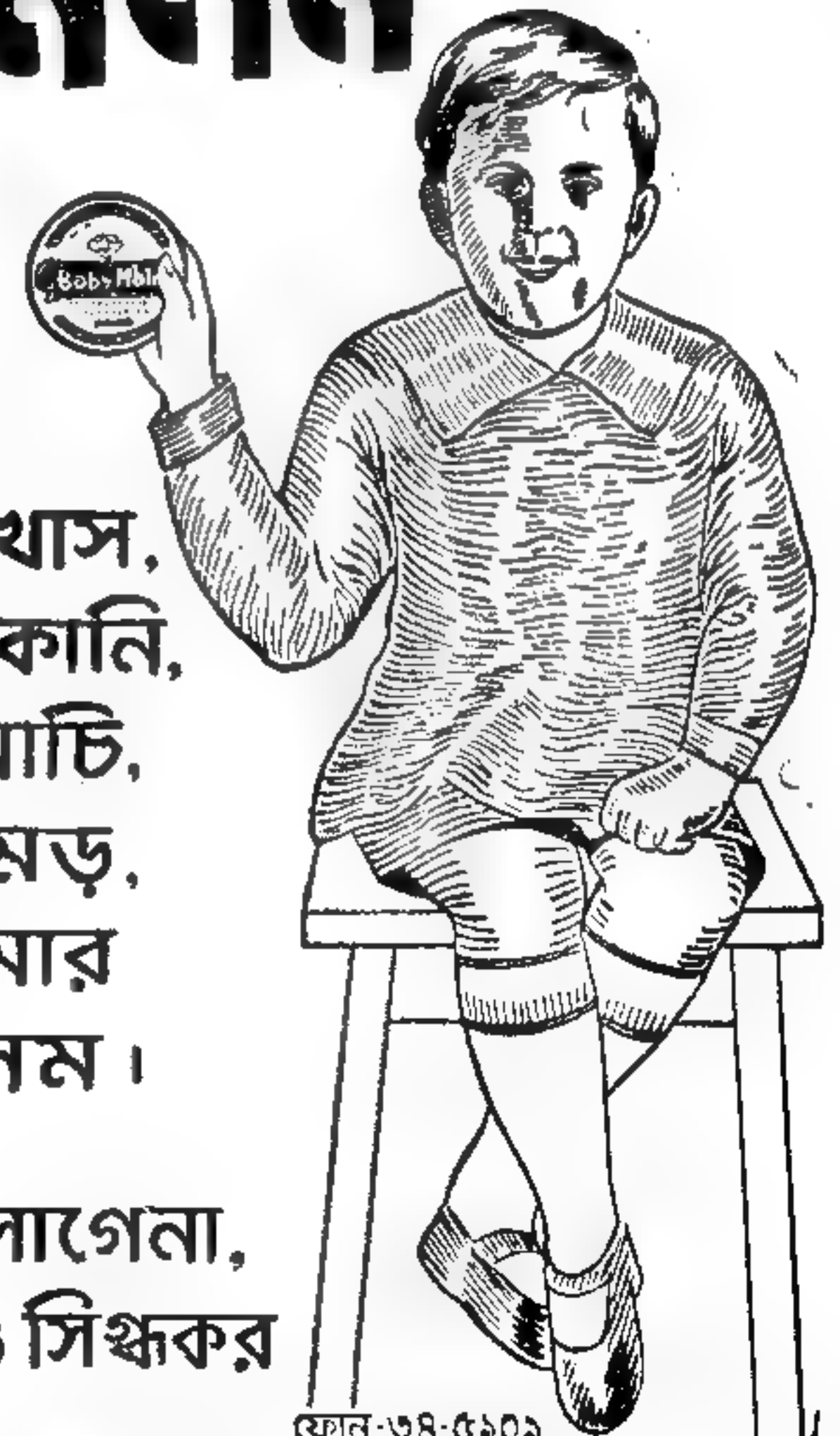
মাসিক পত্রিকা আষাঢ়, ১৩৭৩ হইতে ৪৬শ বর্ষ, আরম্ভ হইয়াছে। সডাক বার্ষিক মূল্য ৪/- সডাক বাৎসরিক মূল্য ২৪/-। পূজা সংখ্যা বর্ধিতাকারে প্রকাশিত হয় কিন্তু গ্রাহক-দের বর্ধিত মূল্য দিতে হয় না। আষাঢ় হইতে গ্রাহক হইতে পারেন। গ্রাহক-মূল্য মনি-অর্ডারে পাঠানই শ্রেয়, কারণ, ভ্রি-ণিতে লইতে হইলে ৬০ পয়সা অতিরিক্ত খরচ পড়ে। নগুনা-সংখ্যা পাইতে হইলে ৩০ পয়সা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইবেন।

শিশিরে গল্প রচনা দি যে কেহ পাঠাইতে পারেন, ছাপাইবার যোগ্য হইলে ছাপা হয়। অনেক সময়ে মনোনীত রচনাও স্থানান্তরের জন্ত বিলম্বে ছাপা হয়। শিশিরের জন্ত প্রেরিত রচনাগুলির নকল রাখিয়া পাঠাইবেন।

শিশির কার্যালয়

২২১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।

# ববী মলম



দাদ, হাজা, খোস,  
পাঁচড়া, চুলকানি,  
ফোড়া, ঘামাচি,  
পোকাকামড়,  
ও একজিমার  
অব্যর্থ মলম।

কাপড়ে দাগ লাগেনা,  
বেদনা নাশক ও সিন্ধকর

ফোন-৩৪-৫১০১

শ্রীমতী মাধব এণ্ড কোং জোড়াসাঁকো, কলি-৭

# স্মৃতি তুমি আগুন

( গল্প )

এস. দত্ত

দিন কেটে যায়, পাড়ে থাকে স্মৃতি। মানুষ ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই করতে পারে। কেবল পারে না স্মৃতিকে ভুলে যেতে। আমিও পারিনি ভুলে যেতে আমার অতীতকে, মনের ছায়ার বাইরে ফেলে দিতে পারিনি স্মৃতির জঞ্জালকে। হয়তো এটাই স্বাভাবিক। নিখুম রাতে ফাইল দেখতে দেখতে বা কোন ঘটনার রিপোর্ট লিখতে লিখতে বিরক্ত হয়ে বন্দী জীবনটাকে অবজ্ঞা করে দোতলার করিডরে দাঁড়িয়ে ধোঁয়াটে আকাশের দিকে উদাসীন চাউনি মেলে ধরলেই কেন জানিনা লগনের দিনগুলো মনের পাতায় আজও ভেসে ওঠে। মাত্র ছ'বছর ছিলাম লগনে। তবু এই ছ'বছরই আমার জীবনের একটি অধ্যায়—সবচেয়ে সুখের অধ্যায়। জীবনের সব কিছু ভুলে যেতে পারলেও লগনের সেই মোহময় দিনগুলোকে আমি ভুলে যেতে পারবো না। শত চেষ্টা করেও নয়। লগনের দিনগুলোকে ভুলে যেতে চাইলে জীবন থেকে মুছে ফেলতে হবে রোজমেলীকে। না-না, তা আমি পারব না—কোনদিন পারব না। লগন থেকে চলে এসেছি বছর পাঁচেক হল, তবু মনে হচ্ছে এইতো সেদিন এলাম, এখনো বোধহয় সপ্তাহ পার হয়নি।

জার্নালিজিমে কোর্স সবে শেষ করেছি। পাস-পোর্টের জন্ম দরখাস্ত করেছি। পাসপোর্ট পেলেই ফিরে যাবো ইণ্ডিয়ায়। অনেক স্বপ্ন তখন চোখে, অনেক আশা মনে। আমি নাম করা সাংবাদিক হবো, সবাই আমাকে চিনবে। বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ হবে। নীল আকাশ আর চিমনির ধোঁয়া দেখে কর্মহীন দিনগুলো কাটাচ্ছিলাম। কুঁড়েমিতে যেন পেয়ে বসেছিল আশায়। চার তলার বরে ডানলোপিলোর গদিতে গুয়ে গুয়ে জানলা দিয়ে আমি চলমান লগনের দিকে চেয়ে থাকি দিনের পর দিন। ওরা যেন থামতে শেখেনি। সবাই চলেছে যে মার পথে। আশ্চর্য! ওদের কাজি নেই পথ হারিয়ে

ওরা কোনদিন থমকে দাঁড়ায় না। ওদের দেখে খুব হিংসা হয়েছিল আমার। মনে হতো ওরা কত সুখী! আর আমরা ইণ্ডিয়ানরা? কেবল বেঁচে থাকার তাগিদে ছ'বেলা ছুটাছুটি করছি। পৃথিবীর বিশাল পাহাশালায় আমরা অনেকেই ডিনারে যোগ দিচ্ছি, কিন্তু সাপারে যোগ দেবার সুযোগ পাচ্ছে ক'জন? আমরা অকালে বুড়িয়ে যাচ্ছি, যৌবন শুকিয়ে যাচ্ছে।

তিন চার দিন একটানা কুয়াশার পর সেদিন সূর্যদেবের দেখা মিলেছিলো। সকালটা ছিল অত্যন্ত সুন্দর। বিকেলটাও সমান সুন্দর। এক কথায় বলা যায়, একটা ঝকঝকে দিন। বিছানায় টান টান হয়ে গুয়ে কি একটা জার্নালের বই ওলটাচ্ছিলাম অলস ভাবে। রোজমেলী ঢুকলো ঘরে। বিছানার ওপর উঠে বসলাম। রোজ-মেলীকে বসন্তে বলতে হ'ল না। ও নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লো। উদাস ভাবে চেয়ে রইলো বিকেল বেলার সোনা ছড়ান আকাশের দিকে।

অনেকক্ষণ পরে কথা বললো রোজী (আমি রোজ-মেলীকে রোজী বলেই ডাকতাম)—রায়, বিকেল বেলাটা কেমন রোম্যান্টিক দেখছ?

বুঝলাম স্মৃতির অরণ্যে পথ খোঁজার বার্থ চেষ্টা করছে ও। স্লীপ পিল না খেলে আজ রাতে ওর ঘুম আসবে না। ওকে রাগিয়ে দেবার জন্ম একটু তাজিল্য প্রকাশ করেই বললাম, 'হয়তো সুন্দর! আমার উত্তর দেবার ধরন দেখে বোধহয় আঘাত পেলো রোজী।

রেগে গিয়ে বললো, তুমি দেখছি সব কিছুতেই উদাসীন! আচ্ছা, সত্যি ক'রে বলো তো আজকের স্বপ্নালু বিকেলটাকে দেখে তোমার মনে খুশী খুশী ভাব জাগছে কিনা?

অনেকটা ওকে সন্তুষ্ট করবার জন্মই বললাম, নিশ্চয়ই! কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, বিকেলটা আমার মনের



ওপর ভেঁমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। আমি নীরস সাংবাদিক। আমি কি বুঝবো ছাই বিকেলের সৌন্দর্য!

রোজী শিল্পী। তুলির একটা নিখুঁত টানে ও ধরে রাখতে পারে অতীতকে, মুহূর্তের অনুভূতিকে, সৌন্দর্যকে—রীয়াসি, সুন্দর ছবি আঁকে রোজী। ওর আঁকা অনেক ছবি আছে আমার কাছে। বিভিন্ন উপলক্ষে ও সেগুলি প্রেজেন্ট করেছে আমার। এই ষাট বছর বয়সেও প্রতিদিন রঙ আর তুলি নিয়ে বসে ও। সাদা কাগজের ওপর তুলির মাত্র কয়েকটা টানে অনেক কিছু বোঝায় রোজী। কিন্তু জানি না কেন ও ছবি আঁকে? ছবি আঁকে আর ওয়েষ্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দেয়। কোন পত্রিকায় কোন চিত্র প্রদর্শনীতে পুরস্কারের আশায় পাঠায় না। ফল বা অর্থ কোনটার ওপরই বোধহয় আকর্ষণ নেই রোজীর। কথায় কথায় প্রশ্ন করেছিলাম একদিন—ছবি আঁক কেন?

—ভালো লাগে বলে।—সহজ ছোট উত্তর।

—তাহলে ছবিগুলো এঁকে ওয়েষ্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দাও কেন?

—কারণটা জলের মতো সহজ। এখন যা ভালো লাগে, পর মুহূর্তে তা আর ভালো লাগে না।

আর কথা বাড়তে ইচ্ছা হয়নি আমার। রোজী সব কিছু খুলে না বললেও বুঝেছিলাম, জীবনের গভীরে ওর একটা অপ্রকাশিত বেদনা রয়ে গেছে। একটা কাঁটা সর্বদাই ওর মনে খচখচ বিঁধছে। রোজীর জীবনটাকে জানবার আগ্রহ আমার তীব্র হয়ে উঠেছিল। তবু ভরসা পাইনি। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর জীবন সম্বন্ধে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারিনি ওকে। মনে সাহস হয়নি। প্রায় দু'বছর আছি ওর কাছে। কিন্তু কোনদিন ওকে হাসতে দেখেছি ব'লে তো মনে পড়ছে না। যদি কোনদিন নিজের অজান্তে হেসেছে একটু, কিন্তু তা যেন হাসি নয় কান্না ঢাকবার প্রয়াস পেয়েছে মাত্র।

রোজীর জীবনের ট্রাজেডি আমি খুঁজে পেয়েছিলাম। স্বাচ্ছন্দ্য থাকতেও ওর সুখ নেই—এটাই বোধহয় ওর জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি। স্বামীকে হারিয়েছে

অল্প বয়সে। নিঃসন্তান সে। এটাও তার জীবনে আর এক ট্রাজেডি। সে তার নিজের জীবন সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র বলেছিল।

আমি আরো অনেক প্রশ্ন করেছিলাম তার অতীত সম্বন্ধে। কোন উত্তর সে দেয়নি আমার সেসব প্রশ্নের। শুধু বলেছিলো, "Excuse me স্মার্ট, তুমি এর বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করো না। না না, আমি আর কিছুই বলতে পারবো না।"

রোজীর বাড়ীতে আমি পেয়িংগেষ্ট ভাবেই এসেছিলাম। হঠাৎই এসেছিলাম। আর্থারলিওসে যখন তাঁর বাড়ী বিক্রি ক'রে দিয়ে স্টল্যাণ্ডে চ'লে গেলেন, তখন আমি খুব Stranded হয়ে পড়লাম। 'লগুন টাইমসে' একটা বিজ্ঞাপন দিলাম যে, কারো বাড়ীতে আমি পেয়িংগেষ্ট হ'রে থাকতে চাই। আমার আশ্রয়হীন অবস্থার কথাটাও জানাতে ভুললাম না।

যেদিন বিজ্ঞাপনটা ছাপা হ'ল সেদিন বিকেলেই একটা চিঠি এলো। এক ভদ্রমহিলা তাঁর বাড়ীতে থাকবার জন্ত আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমার। তিনি লিখেছেন—"রয়, তুমি ইণ্ডিয়ান। বিদেশে এসে বিপদে পড়েছ। তোমাকে সাহায্য করাই এখন আমাদের কাজ। না হ'লে লগুন সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা তোমার মনে গেঁথে যাবে। তুমি কাল দশটার মধ্যে আমার এখানে চ'লে এসো। কোন অসুবিধা তোমার হবে না এখানে। চার তলায় একটা ঘর খালি আছে, তাতেই থাকবে তুমি। চার তলায় থেকে মাটিকে হয়তো কাছে পাবে না। কিন্তু হাত বাড়ালেই আকাশ। আশা করি তুমি কাল দশটার মধ্যেই আসছ। তোমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

—রোজমেলী বাটলার"

পরদিন দশটার কিছু আগেই হাজির হয়েছিলাম উত্তর লগুনে রোজীর বাড়ীতে। রোজী আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো। চার তলায় একটা ঘরে পৌঁছে দিয়ে বললো, এই ঘরটা তোমার। ঘরটা চুকলাম। আশ্চর্য হ'তে হ'ল আমার। কী সুন্দর ভাবে সাজানো ঘরটা! মেঝের ওপর পাতা পাতলা কার্পেট। নীলাভ দেওয়ালে টাঙানো কতকগুলো সুন্দর ল্যান্ডস্কেপের ছবি, ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল। টেবিলের দু'পাশে দুটা



সোফা আর একখানা চেয়ার, ফ্রাওয়ার ভাসে রাখা এক-  
গুচ্ছ মেরিগোল্ড আর ক্রিসেনথিয়াম, দেওয়ালে একটা  
ফ্লোরেসেন্ট লাইট। ঘরের এক কোণে ডানলোপিলোর  
গদি বিছানো একটা খাট। আসবাবের বাহুল্য নেই,  
তবু ঘরটি পরিপাটি করে সাজানো। আমার মনে হ'ল,  
ঘরের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে রোজীর শিল্পী মনের পরশ  
রয়েছে।

রোজী বললো—কোন কিছু অসুবিধা হ'লে আমার  
জানাতে তুমি ভুলে যেও না কিয়।

—নিশ্চয় জানাব। হেসে বললাম আমি।

—তুমি ততক্ষণ জিনিসগুলো গুছিয়ে নাও। আমি  
কিচেন থেকে এখনি আসছি। তুমি কি খাবে—মাংসের  
কারী না রোট ?

—কারীই ভালো।

—জানতাম আমি। ইণ্ডিয়ানরা এতো কারী পছন্দ  
করে বলেই তো এতো দুর্বল।—হাসতে হাসতে চলে গেল  
রোজী।

ওকে অভ্যস্ত লাগলো আমার। বুঝা রোজী এত  
সহজ ভাবে কথা বললো যে আমার মনে হ'ল আমি  
বুঝি বাংলা দেশের কোন মায়ের কথা শুনছি। একটু  
বাদেই ফিরে এলো রোজী। আমি বইগুলো গুছিয়ে  
রাখছিলাম টেবিলের ওপর। ও চটপট করে সাজিয়ে  
দিল বইগুলো। গুছিয়ে রাখলো অসংখ্য জিনিসপত্র।  
আমি আপত্তি করলাম। ও শুনলো না।

কাজ শেষ করে একটা সোফার ব'সে পড়লো। যি  
ছ'কাপ কফি দিয়ে গেল। কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে  
দিতে বললো ও—জানো, আমি ইণ্ডিয়ানদের খুব ভালবাসি।  
জীবনে একবার ইণ্ডিয়ায় গিয়েছিলাম। বিবেকানন্দের  
দেশটা ঘুরে এসেছি। সেটা আজ থেকে বছর ত্রিশেক  
আগে। জ্যাক তখন বেঁচে ছিলো। মিস্ মেয়োর  
“মাদার ইণ্ডিয়া” বইটি পড়ে ইণ্ডিয়াকে ঘৃণা করতে  
শিখেছিলাম। কিন্তু ইণ্ডিয়াকে নিজের চক্ষে দেখে ঘৃণা  
পরিণত হ'ল শ্রদ্ধায়, রূপান্তরিত হ'ল ভালোবাসায়, তখন  
থেকেই আমি ইণ্ডিয়াকে ভালবাসি। হয়তো তোমাদের  
মত পারি না—কারণ ইণ্ডিয়া তো আমার মাদারল্যান্ড নয়।

তবু ভালবাসি।

একটানা অনেক কথা বললো রোজী। একজন  
বিদেশিনীর মুখে নিজের দেশের প্রশংসা শুনতে বেশ  
ভাল লাগলো। আমার ইণ্ডিয়াকে ও ভালবাসে এ কথা  
বুঝতে একটুও অসুবিধা হয়নি আমার ওর ঘরে ঢুকে।  
সুইং-ডোর ঠেলে শিল্পী রোজীর সাজানো ঘরে ঢুকতেই  
প্রথমে নজর পড়েছিলো একটা আলমারিতে ঠাসা ভারত  
সম্বন্ধে বিভিন্ন বই। বইগুলোর অধিকাংশই ভারতীয়  
লেখকদের লেখা। মিস্ মেয়োর ‘মাদার ইণ্ডিয়া’খানাকে  
দেখতে পেলাম না কোথাও। বুঝি না রোজী কেন  
আমাদের এই বুড়ো দেশটাকে আজও এতো ভালবাসে ?  
জানতেও চাইনি কোনদিন।

এই ভাবেই রোজীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এত বর্ধিত  
হ'য়ে উঠেছে দিন দিন। ও আমাকে ক্ষণেকের জন্তেও  
বুঝতে দেয়নি যে বাড়ী ছেড়ে আমি অনেক দূরে বাস করছি।  
এখানে আসার পর থেকে মৃত্যুর জন্তেও নিঃসঙ্গ বোধ  
করিনি আমি। মানে সব সময়ই সঙ্গ দিয়ে রোজী আমার  
নিঃসঙ্গতা ভুলিয়ে দিয়েছিল। এক কথায় বলতে গেলে  
আমাকে আপন করে নিয়েছিল বিধবা, নিঃসন্তান রোজী—  
অত্যন্ত আপন করে নিয়েছিল।

অনেকক্ষণ কি যেন ভাবলো রোজী। তারপর নিম্ন-  
স্বরে বললো,—মাই বয়, যাও একটু বেড়িয়ে এসো।  
মন রাখো বিকেলটাকে উপভোগ করে এসো। আর  
ক'দিনই বা থাকছো এখানে, পাসপোর্ট পেলেই তো চলে  
যাবে। যে ক'দিন আছে লগুনটাকে ভাল করে চিনে  
নাও। দেখেও নাও, আর হয়তো সুযোগ পাবে না  
কোনদিন, যাও যাও, একটু ঘুর এসো।

কথাগুলো খুব করুণ শোনালো আমার কানে। ওর  
গলার স্বর ভীষণ ভাবে কাঁপছিলো। মনে হ'ল বেহাগ  
রাগিনী কেঁপে কেঁপে বাজছে, অসহায় ভাবে সমস্ত প্রাণ  
ঢেলে গাইছে চিরবিদায়ের গান। বুঝলাম আসন্ন বিচ্ছেদ-  
বেদনা ভারাক্রান্ত করে তুলছে রক্তা রোজীর হৃদয়-পেয়াল।  
ওর কথার মধ্য দিয়ে চল্কে পড়লো এক ঝলক ব্যথা।  
হঠাৎ মনে হ'ল আমি-ই বা ওকে ছেড়ে থাকবো কি করে ?  
খুব ছোট বেলায় মাকে হারিয়েছি। ও আমার মনে মায়ের  
স্থান করে নিয়েছিলো।

আমি বললাম—তুমি তো টেগোর পড়েছ রোজী,

তিনি কি বলেছেন জানো?

—কি বলেছেন?

—যেতে নাহি দিব, হায়, তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়। চলিতেছে এমনি অনাদি কাল হতে।—আবৃত্তি করলাম আমি।

—টেগোর মানুষের মনের কথা এমন সুন্দর করে বলতে পারতেন বলেই তো তাঁকে বিখ্যকবি বলা হয়। তুমি কবিতা লিখতে পারো?

—না, কেন বলা তো? তার প্রশ্নটাতে একটু আশ্চর্য হলাম আমি।

—না, এমনি।

—তবে আমার এক বন্ধু ভাল কবিতা লেখে।

—তাই নাকি? তাকে বলবে তোমার আমায় নিয়ে একটা কবিতা লিখতে?

—বলবো।—ওকে সাধুনা দেবার জ্ঞা প্রতীকৃতি দিলাম আমি।

—জানো স্মৃণ্ট, আমার বয়স যখন কম ছিল, যখন স্কুলে বা কলেজে পড়তাম, অনেকেই তখন আমায় নিয়ে কবিতা লিখেছে। তারা লিখে আমার হাতে দিতো। আমি লেখাটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে তাদের সামনে উড়িয়ে দিতাম হাওয়ায়। কাগজের টুকরোগুলো বার কয়েক দোলা খেয়ে লুটিয়ে পড়তো মাটির বুকে। বেশ লাগতো। কিন্তু আজ আর আমায় নিয়ে কেউ কবিতা লেখে না। পুরুষ জাতিটা কি স্বার্থপর দেখেছ? যতদিন আমার যৌবন ছিল, ততদিন আমায় পূজা করেছে। আমার যৌবন ফুরিয়েছে বলে গোটা পৃথিবীটাই যেন আমায় ভুলে গিয়েছে। তুমি এখনো বসে, স্মৃণ্ট! যাও, একটু বেড়িয়ে এসো।

—তুমিও আমার সঙ্গে চলে। রোজী!—আবদারের সুরে বললাম আমি।

—না। এদিকে এসো, তোমার টাইটা ভাল করে বাঁধা হয়নি। কি বিশ্রী নড় হচ্ছে।

এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। নিপুণ হাতে টাইটা বেঁধে দিল ও। ও প্রায়ই আমার টাই বেঁধে দিত। না হলে ও তৃপ্তি পেত না। বললাম—অতদিন তো আমার সঙ্গেই যাও রোজী আজ আবার না বলছো কেন?

—আমার শরীরটা আজ ভাল নেই স্মৃণ্ট। তুমি একাই যাও।

রোজীকে অনেক অনুরোধ করলাম। তবু রোজী গেল না আমার সঙ্গে। বড় জিদ ওর। কি করবো বাড়ীতে বসে? একাই বেড়িয়ে পড়লাম আমি। টেম্‌সের পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে হাঁটছিলাম। জুন মাসের লগুন। দীর্ঘ একঘেয়ে ও কষ্টকর। শীতের পর এসেছে গ্রীষ্ম। দিকে দিকে সবুজের সমাহার। কচি ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে খুদে খুদে সাদা ডেইজি আর হলুদ বাটারকাপ ফুল ফুটেছে। অজস্র আগুন যদি লেগে থাকে কোথাও, তা'হলে খোঁজ নিতে হবে লাল টিউল্লি ফুলের বাগানে। গোটা বাগানটা যেন লালে লাল হয়ে গেছে।

রাত্রির ঘোমটা তখনো ঢেকে দেয়নি লগুনকে। আমি আস্তানায় ফিরে এলাম। রোজী ছবি আঁকছিলো। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ তুলে চাইলো একবার। তারপর আবার মুখ নীচু করে আঁকতে শুরু করলো। বুঝলাম ওর মনের গভীরে এখনো স্মৃতির এলোমেলো তরঙ্গ



ভোলপাড় করে চলেছে। বাস্তবিকই সেদিনগুলির কথা আমি আজও ভুলিনি।

আমি কলকাতায় ফিরবার জন্ত জাহাজে উঠেছিলাম। আমার সঙ্গে ডক পর্যন্ত এসেছিলো রোজী। জাহাজ ছাড়ার আগে দেখেছিলাম ওর চোখের কোল বেয়ে টস-টস করে গড়িয়ে পড়েছিল কয়েক ফোঁটা অশ্রু। জাহাজটা যতক্ষণ না ওর দৃষ্টি সীমার আড়াল হয়েছে, ততক্ষণ ও একভাবে দাঁড়িয়েছিলো ডকে। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখেছি ওর স্থাগুর মতো স্মৃতিটিকে। তারপর একসময় মিলিয়ে গেলো রোজীর মূর্তি। আমি ভিজে চোখে ফিরে এলাম কেবিনে।

তারপর পাঁচ বছর কেটে গেছে। এই সুদীর্ঘ পাঁচ বছরের মধ্যে রোজীর চিঠি পেয়েছি তিনখানা।—আমি লিখেছিলাম দশখানা। ইংরেজরা যত সহজে আপন

করতে পারে, পর করতে পারে আরও সহজে। আমি কিন্তু আজও ভুলতে পারিনি রোজীকে। ভুলতে পারিনি লগুনকে, ভুলতে পারিনি লগুনের দিনগুলোকে। কেন জানিনা, সেই বর্ণ মোহময় দিনগুলোর কথা চিন্তা করে অনুভব করি সুখের আমেজ, কখনো বা বিষাদের জালা।

দার্জিলিং মেল এসে থামলো সাঁইথিয়াম। নামবার জন্ত উঠে দাঁড়ালেন সাংবাদিক সুমন্ত রায়। যাবার আগে বললেন,—চলি ভাই। আবার হয়তো দেখা হবে কোনদিন।—বলে নেমে গেলেন তিনি। ট্রেন ছেড়ে দিল। চুপচাপ বসে রইলাম আমি। এখনো অনেক দেরি শিয়ালদ' পৌছাতে। স্মৃতিপটে ভেসে বেড়াচ্ছিল রোজীর চিন্তা-ক্লিষ্ট মুখের প্রতিচ্ছবি।

## রাতের পাখীর জন্য

নচিকেতা ভরদ্বাজ

তোমার বুকের মধ্যে আমি তবে ঘুমোব! আমাকে দেবে সে নিভৃত দুর্গে—অপরূপ সূচাকু খিলান—  
কী গভীর কারুকার্য—একটুকু স্থান দেবে? সমৃদ্ধ মস্তক  
তুমার নিরিবিলি আমাকে যে ডাকে—ঐ উজ্জল আকাশ—  
যেখানে সম্ভ্রান্ত গান—সুনিভৃত শান্তির সোপান—  
আমার করুণ দীর্ঘ রুগ্ন এই মাথাটাকে ঢেকে রেখে, দিন—  
দিনের সমস্ত দাহ—ব্যর্থতা ষড়যন্ত্র ক্ষুধা ভয়—মুছে দিয়ে সব  
দিতে কি পার না তুমি শৈশবের সুন্দর বিশ্বাস?  
নাস্তুর তীক্ষ্ণ ঝড়ে আমি আজ মৃতপ্রায়—কীট-দষ্ট শব—;  
আমাকে বাঁচাতে পার যদি তুমি ঐ সব আশ্চর্য নির্মাণ,  
গভীর মেঘের ছন্দ—ছুঁতে দাও—বিবর্ণ হ'হাতে।

আমি তো পাখীর মত যাযাবর নীল শূন্যে অনেক ঘুরেছি,  
তোমার নরম জলে—অন্তহীন আলোর দর্পণে

আমি যে দেখেছি মুখ; আমার করুণ ঠোঁটে বিশ্রামের গান  
নির্ভয়ে উঠেছে ফুটে; বৃষ্টি দাও, নীল বৃষ্টি—স্পর্শের প্লাবনে  
পরিচ্ছন্ন অন্তরাগ্না—তাই ফের অঙ্গনে এসেছি।  
তোমার শুভ্রতা, স্বাদ—খেতপল্ল ফোটা তরুতীর  
আমাকে ডেকেছে। জন্মলগ্নে রুদ্ধ গ্রীষ্ম—জ্যোষ্ঠের অগ্নির,  
আমার হৃদয়ে মনে তোমার শুভ্রতা স্পর্শ বর্ষা হয়ে ঝরক  
তাহলে—;

বৃষ্টি বৃষ্টি শুভ্রতার নয় বৃষ্টি—তুমি হও তরুণ আষাঢ়,  
আমাকে প্লাবিত কর; ডানা থেকে মুছে দাও হৃৎথের ক্লান্তির  
সব ধুলো। সন্ধ্যাদীপ জ্বালো তবে নির্জন আঁচলে।  
এখন বিশ্রাম নেই। কাল ভোরে সূর্যের ছয়ার  
খুলে গেলে চলে যাব। এখন সর্বদা তোমো স্পর্শের ঝংকার।  
তোমার বুকের মধ্যে শান্তি আছে রাতের পাখীর।



# শেষ ক'টি পাতা

( গল্প )

সুদত্ত

“প্রখ্যাত আইনজীবী স্বর্গতঃ প্রাণতোষ মজুমদারের একমাত্র কন্যা রাখী মজুমদার অধিক পরিমাণে ট্রাক্সলাইজার সেবনে লোক রোডের বাড়িতে আত্মহত্যা ক'রেছেন।”

যুগান্তরের প্রথম পাতার শেষের দিকে বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছিল খবরটা। সংবাদটা সারা শহরে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। উঠতি রোমীয়রা চারের কাপে তুফান তুলছিলো রোমান্সের বাঁজ মেশানো সংবাদটাকে কেন্দ্র ক'রে। অনাবশ্যক সিগারেটের চিতা জালিয়ে আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধানে মেতে উঠেছিলো গোটা কলকাতার বেকার গৌড়ী।

দলবল নিয়ে প্রাণতোষ মজুমদারের লোক রোডের চার তলা বাড়ির দরজায় যখন হাজির হলাম, বেলা তখন প্রায় দশটা। বাড়ির সামনে ছোটখাটো ভিড়। সবার চোখে বিস্মিত চাউনি। চারিদিকে কেমন যেন থমথমে ভাব। পুলিশ দেখে আশেপাশের জমায়েত হওয়া মানুষ-গুলো যেন একটু আড়ষ্ট হ'ল। ছলছল চোখে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো রঘুয়া। রঘুয়া এ বাড়ির পুরানো চাকর।

—অন্দর মে লে চল—ওকে বললাম।

—মেরা সাথ আইয়ে সাব—বিস্মল স্বরে বললো ও।

সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় উঠলুম রঘুয়ার সঙ্গে। একটা ঘরের সামনে থমকে দাঁড়ালো রঘুয়া। হাউহাউ করে কঁদে ফেললো ও।

কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম—রোডি কি'উ?

—সাব, ইয়ে হায় দিদিমণিকা ঘর, আপ অন্দর মে আইয়ে।

দরজায় একটা নাইলনের পর্দা ঝুলছিল, এমব্রয়ডারীর ডিজাইন তোলা একটা সুন্দর পর্দা। পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলুম আমি আর কলকাতা পুলিশের স্পেশাল অফিসার

ঘরটা বেশ বড়। ছিমছাম। একটা টেবিল, টেবিলের ছ'পাশে ছ'টো সোফা, একটা রেডিও সেট, দেয়ালে খান কয়েক বিদেশী শিল্পীদের আঁকা প্যাণ্ডস্কেপ, খান দুই ছবি—রবীন্দ্রনাথ আর অরবিন্দর। একটা কাচের আলমারিতে ঠাণ্ডা বেশ কিছু দেশী-বিদেশী উপগ্রাস। আলমারির মাথার ওপর টাঙানো সুদৃশ্য ফ্রেম বাঁধানো ক্যামেরায় ধরা রাখীর জীবনের একটি মিষ্টি-মধুর মুহূর্ত, মিষ্টি মিষ্টি হাসছে ও। কী সুন্দর উঠেছে ফটোটা। নয়ন-কোণায় চকিত কটাক্ষ, অধর কিনারে চটুল হাসি।

চুলগুলো কাঁধের ওপর দিয়ে উদ্ধত যৌবন-পৃষ্ঠ বুকের উপর এসে ঠেকেছে। এই সেই আদিম নারী—আরণ্যক প্রাণের হরত জীবন-যৌবনের রাশমুক্ত লালসার মূর্তিমতী প্রতীক যেন। ঘরের এক পাশে ডানলোপিলোর গদী আঁটা একটা খাটে কাত হ'য়ে পড়েছিল রাখীর স্পন্দনহীন বর তনু।

কে বগবে রাখী মারা গেছে? দেখলে মনে হয় যেন ও যুসুছে! কাজলতার মতো চোখ দু'টি অর্ধ নিম্নোন্মিত। ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত বেশমী স্ত্রীতার মতো কোমল নিতম্ব লম্বিত কেশদাম পিঠের দু'দিকে গোছা গোছা ছড়ানো। গুঁক ঠোঁট দু'টো অল্প একটু খোলা। মিষ্টার সোম দেয়ালে টাঙানো রাখীর ফটোটার দিকে ত্রিভুজ দৃষ্টিতে তাকিয়ে-ছিলেন। ফটোটার দিকে তাকিয়ে ভাজা মনের পাতায় হয়তো কল্পনার তুলি দিয়ে কোন ছবি আঁকছিলেন।

আমি ঘরের চারিদিকে একবার দ্রুত দৃষ্টিতে খুঁজলুম। না, তেমন কিছু পেলুম না। শুধু পেলুম একটা ওয়ূবের শিশি। তখনো গোটা কয়েক ট্রাক্সলাইজার ছিল তার মধ্যে। আর একখানা ডায়ারি, ডায়ারির লেখিকা স্বয়ং রাখী মজুমদার। একটা আত্মহত্যার কেসে তদন্ত করার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট। এতো আর মার্ডার কেস নয়। ডাক্তার তো প্রাথমিক পরীক্ষা করেই বলেছে

অত্যধিক ঘুমের ওষুধ খেয়েই রাখীর মৃত্যু ঘটেছে। তবে প্রশ্ন, রাখী কি ভুল করে বেনী স্লিপিং পিল খেয়ে ফেলেছে? না, ইচ্ছাকৃত সুইসাইড করেছে? বোঝাই যাচ্ছে যে, এটা সুইসাইড। কমপক্ষে আট থেকে দশটা ট্রান্সলুইজার একটা জীবন নষ্ট করতে পারে। আর ভুল করে কেউ অতোগুলো স্লিপিং পিল খায় না।

নিলয় সোম তখন মৃতদেহটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। আমি একটা চুরুট ধরলাম। নিঃশব্দে ভুল করে নিলয়বাবু বললেন—কি বুঝলেন, মার্ডার অর সুইসাইড?

—সিম্পল সুইসাইড।

—আই সি, বিখ্যাতীপবাবু, কিছু পেলেন?

—না, তেমন কিছু নয়। রাখী মজুমদারের লেখা একটা ডায়ারি আর গোটা কয়েক স্লিপিং ট্যাবলেট।

—তবে আর কি? চলুন এবার ফেরা যাক, বারটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। বাঁ হাতের সম্মল কবজিতে বাঁধা চৌকা ডায়ালের হাত ঘড়িটার দিকে তাকালেন নিলয় সোম।

—ডেড্‌ ঘড়িটা মর্গে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি, কি বলেন?

—হ্যাঁ। একটু তাড়াতাড়ি করুন।—ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন তিনি।

মৃতদেহটা মর্গে পাঠিয়ে যখন ধামায় ফিরলাম তখন বেলা ছ'টো।

আমি বাসায় ফিরবার জন্তু উঠে দাঁড়লাম। নিলয়বাবু বাধা দিয়ে বললেন—ডায়ারিটা না পড়েই যাবেন?

—বিকেল বেলায় পড়া যাবে, এখন চলি।

—আপনি তো মশাই আচ্ছা বেরসিক দেখছি। আপনার কোন কৌতূহল নেই? এই ডায়ারির মধ্যে একটা মেয়ে তার জীবন-কাহিনী লিখে গেছে, লিখে গেছে তার আনন্দ-বেদনার কথা, আর আপনি নির্বিকার চিত্তে বলছেন বিকেলে পড়া যাবে, যেন ওতে কিছুই নেই! আপনি তো আবার লেখক। লেখকদের কৌতূহল এত সীমিত হওয়া উচিত নয়।

—বসুন, কি—ন্—তু.....

—কিন্তু কি? বউদি না খেয়ে আপনার জন্তে ব'সে

থাকবেন, বাড়ি ফিরলে অভিমান ক'রে কথা বলবেন না, এইতো?

—মশাই বিয়ে তো এখনো ক'রলেন না। 'বউ' বস্তুটি যে কী সেটা বুঝবেন কি ক'রে?

—আমার বুকে কাজ নেই! আপনারাই বুঝুন।

কথায় পেরে ওঠা যায় না সপ্রতিভ নিলয় সোমের সঙ্গে। অগত্যা বসকে হ'ল। বেয়ার'কে দিয়ে চা-কেক আনালেন। সেগুলির সঙ্গবহার করে একটা চুরুট ধরলাম। উনি নস্ত্রি নিঃশব্দে।

সাংগে ডায়ারি পড়তে শুরু করলেন নিলয় সোম। আমি শুনতে লাগলাম। প্রতিদিনের তুচ্ছ ঘটনাগুলো সহজ সরল ভাষায় লিখেছে রাখী মজুমদার। অন্তরের মনিকোঠায় স্মৃতির শিকল দিয়ে ধ'রে রাখতে চেয়েছে প্রতিটি দিনকে, ছোট ছোট ঘটনাগুলোকে। ডায়ারি লিখ জীবন প্রবাহে বাধা দিতে চেয়েছে ও।

একসময় থামলেন নিলয় সোম, বললেন—কালকে রাতের লেখা অংশটুকু এবার পড়ছি। মন দিয়ে শুনুন, উপস্থাপনের প্লট পেতে পারেন।

—পড়ুন। চুরুটটা গ্রাসট্রেতে গুঁজে দিলুম, উনি আর একটুপ নস্ত্রি নিয়ে আবার পড়তে শুরু করলেন।

“জানি আত্মহত্যা পাপ, এমনকি আত্মহত্যার পরি-কল্পনা মন স্থান দেওয়াও পাপ। আর এও জানি আত্ম-হত্যা করলে নরকেও স্থান হয় না। যদিও আমি চিরকালই বিজ্ঞানের ছাত্রী ছিলাম, কোনরকম সুপারিশ্টিশান্ আমার নেই, তবু আমি হিন্দু। তাই হিন্দুধর্মের সংস্কারগুলোও আমার মজ্জাগত। আমার বাবা প্রচণ্ড নাস্তিক ছিলেন, হিন্দুধর্মের কোন সংস্কারই তিনি বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু মা ছিলেন বাবার সম্পূর্ণ বিপরীত। মা—যেমন নিষ্ঠাবতী ছিলেন, ঠিক সেই পরিমাণেই ধর্মভীরু। মনে হয়, মায়ের চরিত্রের এই বিশেষ দিকটা আমাকে প্রভাবান্বিত করেছে।

সব জেনে শুনেও আমি আত্মহত্যা করছি। আর এক মুহূর্তও আমি বাঁচতে চাই না। সব সময় কুনালের প্রতারণা আমার বুকে বাজছে। বেঁচে থাকা মানেই তো কুনালের প্রতারণার বিষাক্ত স্মৃতি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বহন করা। না তা আমি পারবো না। কি, বিয়ে করলে সুখী

হ'তে পারতাম? না, তাও পারতাম না। বিয়ে ক'রলে হয়ত দেহ দিতে হতো একজনকে, কিন্তু মন যে কুনালকে দিয়ে দিয়েছি। এইভাবে বিচারিণী হ'য়ে বেঁচে থাকা আমার পক্ষে লজ্জার, ভীষণ লজ্জার। শুধু আমার পক্ষে বলছি কেন? যে কোন মেয়ের পক্ষেই বিচারিণী হ'য়ে বেঁচে থাকা লজ্জার, এর চাইতে মরে যাওয়া অনেক ভালো, অন্তত আমার তো তাই মনে হয়।

কুনালের আগেও অনেক পুরুষ আমার জীবনে এসেছিল। স্কুল লাইফে প্রশান্ত মিত্র, কলেজ লাইফে প্রফেসর কিরণভূষণ দত্তের ছেলে অরিন্দম দত্ত ও আরও অনেক। আই গ্রাড্ মেনি বয় ফ্রেন্ডস্! কিন্তু কাউকে প্রেমের স্বীকৃতি দিইনি কোনদিন। ওদের আমি ফ্রাট্ করেছি, প্রশান্ত আমার জ্যেষ্ঠ পাগল হয়েছিল, সুইসাইড্ ক'রবে ব'লে ভয় দেখিয়েছিল, অরিন্দম আমাকে সংবেদনহীন পাথর ব'লেছিল, আমি কেবল মিষ্টি মিষ্টি হেসেছিলাম। সামান্য পাওয়াকেই ওরা চরম পাওয়া বলে ধ'রে নিয়েছিল। লোভী পুরুষগুলোকে হাতের পুতুল ক'রে রাখতে কেমন যেন মজা লাগতো আমার। তবে আমি অমিয়কে ভালবাসতাম। আর ওকে ভালবাসবো নাই-বা কেন? ও শিক্ষিত, তার ওপর আমার মোটা মাইনের সরকারী চাকরি করে। ওর সঙ্গেই আমার বিয়ের ঠিক ছিল।

কিন্তু কি কুক্ষণেই যে কুনালের সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল! Y. M. C. A.-র নাইট ক্লাবে ব্যাডমিণ্টন খেলছিলাম অমিয়কে পার্টনার নিয়ে। আমাদের বিপক্ষে ছিল কুনাল আর রুচিরা। খেলার ক্ষেত্রেই কুনালের সঙ্গে আমার পরিচয়। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব আর বন্ধুত্ব থেকে প্রেম। কুনালকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম। অমিয়র চেয়েও বেশি ভালবেসে ফেলেছিলাম। ও এঞ্জিনিয়ারিং পড়ত। কুনাল আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে পারে এ আমি কোনদিন কল্পনাও করিনি। কারণ আমার সঙ্গে যে পুরুষগুলো মিশেছে, সবাই তো আমার প্রেমে মজে গেছে। তাই কথায় কথায় একদিন বিয়ের কথা বললাম ওকে। হো-হো করে হেসে উঠে ও বললো—'বিয়ে! তোমাকে বিয়ে করার তো কোন কথা ছিল না। যু আর মাই গার্ল ফ্রেন্ড, অনলি ফ্রেন্ড—তার ওপরে নয়। রুচিরা

আমাকে বিলেত পাঠাবার কথা দিয়েছেন। বন্ধু হিসাবে তুমি বড় জোর একটা নেমস্তন্ন পাবে।'

কুনালের কথায় চাবুক খেলাম, কিন্তু কিছু বলতে পারলাম না, ওকে অপমান করতে পারলাম না। কারণ আমিও তো অনেককেই ঠিক এই কথাই বলেছি। তারাতো আমার মতই আঘাত পেয়েছে। রুচিরাও কাছে হেরে গিয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারবো না, তাই আত্মহত্যা করছি।'

থামলেন নিলয় সোম। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, সেন্টিমেন্টাল, কুল!

## নোটিশ

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী 'সচিত্র শিশির'-এর মালিকানা ও অগ্ৰাণ্য বিষয়ক বিবরণ।

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা—২২-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।

২। প্রকাশনার সময়-ব্যবধান—মাসিক।

৩। মুদ্রাকরের নাম—শ্রীতপনকুমার মিত্র, জাতি—ভারতীয়, বাসস্থান—২২-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।

৪। প্রকাশকের নাম—শ্রীতপনকুমার মিত্র, জাতি—ভারতীয়, বাসস্থান—২২।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।

৫। সম্পাদকের নাম—শ্রীতপনকুমার মিত্র, জাতি—ভারতীয়, বাসস্থান—২২।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।

৬। মালিকের নাম—শ্রীমতী মনোরমা মিত্র, জাতি—ভারতীয়, বাসস্থান—২২।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।

আমি, তপনকুমার মিত্র, ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সবই সত্য।

তারিখ—

স্বাক্ষর—তপনকুমার মিত্র,



ଆହମ୍ମଦ୍ଦିନ

# ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦର୍ଶନ

କଳିକାତା-୪୮



কলিকাতা বিশ্ব-ভা: মহাবিদ্যালয়  
এম. বি. বি. এস. । কলি: । ১৯৩৩ ।

# রোগের দাওয়াই

( গল্প )

শ্রীউমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত্রির ঘন অন্ধকারে বন-প্রান্তর বিভীষিকাময়। খোলা আকাশের নীচে সুবিস্তীর্ণ শূণ্য নির্জন প্রান্তর যেন বিরাট এক দৈত্য। এরই এক প্রান্তে কালীকপালী সিদ্ধিমাতার আশ্রম। বেশী দিনের নয়। কিন্তু খুব অল্প দিনের মধ্যেই এই আশ্রম প্রান্তর থেকে বহু গ্রামবাসীর অন্তরে মহিমাবিত্ত প্রদায় ও ভক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বহুলোকের আনাগোনা আজ নীরব প্রান্তর মুখরিত হয়ে উঠেছে। সকলের মুখে মুখে ফেরে সাক্ষাৎ-ভগবতী কালীকপালী সিদ্ধিমাতার নাম।

অম্বরপুর। কোলকাতা থেকে খুব বেশী দূর নয়। এখানকার মাটির সঙ্গে গাছপালার সঙ্গে মিশে আছে আমার জীবন প্রারম্ভের আদি-ইতিহাস। গঙ্গার বুকে মিশে আছে কত ছপুকের ছরস্তু দস্তিপনার উপাখ্যান।

অম্বরপুরকে ভোলা মানে আমার নিজের অতীতকেই ভোলা। তাই ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে হাজির হলাম সেখানে। অনেক দিন পরে আমাকে পেয়ে গাঁয়ের সকলেই আনন্দিত; কিন্তু তারা সন্তুষ্ট হতে পারল না আমার শরীরের দিকে তাকিয়ে। নানা প্রশ্নে তারা জানতে চাইল আমার সত্যিকারের অসুখটা কি? বয়সের সঙ্গে যদি শরীরের সমতা না থাকে তা' হলে প্রশ্ন আপনাই এসে যায়।

আবার সেই সঙ্গে অর্থ যদি কোন অনর্থ না ঘটায় তা' হলে অতীতকে দৃষ্টি ফেরাতেই হয়। তাই নিমুমামা বললেন—শহরে থাক, পয়সাও রোজগার কর ভাল; চিকিৎসার জন্যে কিছুই রাখনি নিশ্চয়ই। তবু আমার একটা কথা শুনবে কি?

আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালাম তাঁর মুখের দিকে। আমার বাড়ীর কেউ আর এখন এখানে থাকে না। নিমুমামাই একমাত্র এখন প্রতিনিধি।

আগের কথার জের টেনে তিনি বললেন—ঐ যে 'চরণ-খোলার মাঠ', সেখানে কলির দেবতা সাক্ষাৎ ভগবতী মা 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী'র আশ্রম। যে কোন কঠিন ব্যাধি মায়ে

কৃপায় কর্পূরের মত উবে যায়। ইচ্ছা হয়তো বল তোমাকে একদিন সেখানে নিয়ে যাই।

—কি আশ্চর্য! ওখানে আবার সিদ্ধেশ্বরী মা কবে উদয় হলেন?

—বেশী দিন নয়। কবে যে কোন ফাঁকে এক সন্ন্যাসিনী ওখানে আশ্রম করে বসেছেন, সঠিক কেউ তা বলতে পারে না। সেইটাই আরও আশ্চর্য। আজ অনেক বড় বড় লোকের ও নেতার আনাগোনা ওখানে। ঐ মাঠ আর ফাঁকা থাকবে না। আমি বলছি, মায়ের কৃপায় শহর হতে বেশীদিন লাগবে না।

—বল কি মামা! কিন্তু কে ঐ সন্ন্যাসিনী?

—সে খোঁজে আমাদের দরকার কি বাপু। উপকার হলেই হ'ল।

—কিন্তু মামা, আজকের জগতে শিক্ষিত লোকেরা এতে সন্তুষ্ট হতে নারাজ। তারা সব কিছুই জানতে চায়, বুঝতে চায়। অন্ধবিধানে কোন কিছুই মেনে নিতে চায় না।

—দেখ বাপু, সব জিনিসেরই একটা রীতি আছে। ঠাকুর-দেবতাকে যদি বুঝতে চাও তাহলে বনে জঙ্গলেই যেতে হবে। ঘরে বসে বৈজ্ঞানিক সূত্রে তাঁর তথ্য আবিষ্কার করা যায় না। যে জিনিসের যে নিয়ম। যাক বাপু। এ নিয়ে তোমার সঙ্গে শুধু শুধু বাজে তর্ক করতে রাজী নই। তোমার ভালর জন্তই বললাম। ইচ্ছা হয়তো আমাকে বোলো। নিয়ে যাবো। কাল অমাবস্তা। মায়ের মহাপূজা।

—তুমি যখন অত করে বলছো। তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

পরের দিন যথারীতি অশ্রান্ত যাত্রীর মত আমিও যাত্রা করলাম নিমুমামা সমভিব্যাহারে আশ্রমের দিকে। বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া সেই চরণখোলা মাঠের স্মৃতি মনের মধ্যে উদ্ভিত হ'ল। কত অজানা ভয় ও রহস্যের উপাখ্যানে ঘেরা ছিল এই মাঠ। সীমানার কাছ দিয়ে যেতে গেলে

আগে বুক কাঁপতো। কুল, বঁইচি ও বাবলা গাছে বেরা প্রান্তর আজ জন-কলরবে মুখর হয়ে উঠেছে। রাতের অন্ধকারে সারি সারি মানুষের আনাগোনা। হাতে হারিকেনের স্বল্প আলো পথের নিশানা বলে দেয়।

আমি অগ্রমনস্কভাবে পথ চলতে চলতে ভয়ে আঁতর্নাদ করে উঠলাম। আমার সামনেই এক বিষধর সাপ। নিম্ন-মামা 'হো হো' করে হেসে উঠলেন।

—না, তুই আর আগেকার মত নেই। একবারে ভীতু হয়ে গেছিস। ওরে, ওরা সাপ নয়—সাপের খোলস। খোলসকে অত ভয়।

—খোলসকে ভয় পাওয়াই ভাল। আসলকে ভাল ভাবে বুঝতে আর কষ্ট হয় না।

মাঠের পূর্ব-দক্ষিণের কোণে জাগ্রত আরান্যা দেবী ক্রীত্ৰীসিদ্ধিমাতার আশ্রম। টিনের একটা লম্বা হল ঘর। হাজাকের আলোয় উদ্ভাসিত চারিদিক। হল ঘরের পরই পাগোডা আকারে তৈরী টিনের ঘর। তারই মধ্যে দেবী অধিষ্ঠিতা। দেবী এবং যাত্রী সাধারণের মধ্যে ব্যবধান করে রেখেছে একটা বাঁশের বেড়া ও চিক। দেবীর কাছে অত কোন আলো নেই। মিটিমিট করে ঘিয়ের স্বল্প প্রদীপের আলো-আঁধারে মাঘের মূর্তিটিকে রহস্যময়ী করে রেখেছিল।

নিম্নমামা নিঃশব্দ করে বললেন—মূর্তিটা অনেক বকম দেখতে পানো। ওর অভিব্যক্তি কিছু নেই। আগল হচ্ছে ওর ভেতর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা। শক্তি দিয়ে ওর কৃপা করণ। মানব কল্যাণে ব্যয় করতে পারো। তবেই মহাত্মা। আর তখনই মা জাগ্রতা জগদ্ধাত্রী। মা কালীকপালীর সাধন বলে ক্রীত্ৰীসিদ্ধেশ্বরী জাগ্রতা জগৎ জননী, অভয় দায়িনী।

দেখলাম মাঘের কৃপায় আর কিছু হোক আর না হোক। নিম্নমামা অনেক ভাল ভাল কথা আয়ত্ত করে ফেলেছেন। অধীর আগ্রহে কোতূহলের সঙ্গে মা সিদ্ধেশ্বরীর অলৌকিক কৃপালাভের আশায় নীরবে বসে রইলাম। টু-টুং-টুং তিনবার ঘণ্টার শব্দ কানে ভেসে এল। যাত্রী সাধারণ চঞ্চল ও উদ্গীর। করণ আকুলতা ব্যাকুলতা সকলের হৃদয়ে। মোহান্ত মহারানী কালীকপালী

করলেন। সকলে 'মা মা' বলে হর্ষে করতালি দিয়ে মাটিতে মাঠাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হল। নিম্নমামাও বাদ গেলেন না। আমি একেবারে শুক্ক শুস্তিত।

সকলে নিজ নিজ অভীষ্ট মনস্কামনা একটা খাতায় লিখে দিতে লাগলেন। সে এক ছড়োছড়ি ঠেলাঠেলি কাণ্ড! বিরাট হইচই শুরু হয়ে গেল। আমিও আমার রোগের বর্ণনা লিখে নাম সহ করে দিলাম। একজন ভদ্রলোক এসে খাতাটা নিয়ে গেলেন। পরে জানলাম, ঐ ভদ্রলোকই আশ্রমের ম্যানেজার। তাঁরই সুদক্ষ কর্ম-দক্ষতার ওখানকার কাজকর্ম সুচারুরূপে পরিচালিত হয়।

মোহান্ত মহারানী তাঁর হাত থেকে খাতাটি নিয়ে প্রতিমার সম্মুখস্থ বেদীতে স্থাপন করে ধ্যানস্থ হলেন। সকলেই নীরব। গভীর নিতুন্মত্ততা বিরাজ করতে লাগল। পূজা-অন্তে মা সকলকে অভিবাদন করে ভিতরে অদৃশ্য হলেন।

নিম্নমামা আমাকে আশ্রিত করে বললেন—হবে, হবে। অত তাড়াতাড়ি কোন গুণ্ড কার্য সমাধা হয় না। তুমি বস, আমি অফিস ঘর থেকে জেনে আসছি।

নিম্নমামা তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি নীরবে বসে রইলাম। প্রায় আশ বন্টা পরে নিম্নমামা ফিরে এসে বললেন—বোঁব কপালে এখনও ভোগ আছে। তোর আজ কোন আদেশ হ'ল না। সময় নেবে তিন দিন।

—বল কি মামা! এই তিন দিন অনিশ্চয়তার মধ্যে আমাকে এখানে শুধু শুধু বসে থাকতে হবে।

—সকল বড় কাজেরই প্রথমে খানিকটা অনিশ্চয়তা থাকে বই কি! আর শুধু শুধু বলছো কেন? রোগে ভুগছো, সেটা যদি মা'র কৃপায় আরোপ্য হয়,—তার চেয়ে আনন্দের আর কি আছে?

আমি নীরব হ'লাম। আমার মনের পুরনো পাতা উলটিয়ে অস্পষ্ট স্মৃতি ভেসে উঠল। বোঝা না-বোঝার বিধায় মন চিন্তাবিহীন হয়ে উঠল।

কেদার মুদীর দোকান ছিল ঠিক আমাদের বাড়ীর সামনেই। অতি সামান্য মাল নিয়ে সে তার ব্যবসা চালাতো। সংসারে তার আপনার বলতে ছিল মা মরা



হরিণী। নেচে নেচে সে গাঁয়ের লোকের মেহ-আদর কুড়িয়ে বেড়াত। সম্পর্কহীন ব্যক্তির সঙ্গেও ছিল তার অবাধ মেলামেশা। যৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাসে একেবারে ভেসে গিয়েছিল। কেউ খোঁজ পায়নি তার। কিছুদিন পরে নিজেই আবার সহসা ধূমকেতুর মত এসে হাজির হল। সহজ ভাবে মিশল, কথা বলল সকলের সঙ্গে। কোন কুঠা বা লজ্জা নেই নিজের স্বৈচ্ছাচারী বৈরিণী জীবনের জন্ত। কিন্তু সেবারে পূজার ছুটিতে গিয়ে শুন্লাম, টাঁপা বাপের সঙ্গে অগড়া করে স্থায়ীভাবে গাঁ ছেড়েছে। ফিরে আর আসবে না বলে গেছে। কেদার মুদীকে দেখলাম। পরিবর্তনহীন ঐতিহ্য বহনকারী। একই ভাবে চলেছে। নতুনের দিকে কোন আকাঙ্ক্ষা নেই—ফেলে আসা পুরনোর প্রতি নেই কোন মোহ।

কয়েক বছর পরে টাঁপাকে দেখেছিলাম সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউয়ের মোড়ে। বেশভূষায় সুন্দর পারিপাটা, বহুমূল্য অলঙ্কারে সুসজ্জিত। কাছেই তার বাসা ছিল। আমাকে আমন্ত্রণও জানিয়েছিল। কিন্তু আমার আর যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মনের তলে হারিয়ে গিয়েছিল সে কথা।

মোহান্ত মহারানীকে দেখে আজ হঠাৎ টাঁপার কথা মনে পড়ে গেল। মহারানী যখন হাত তুলে সকলকে অভিবাদন করছিলেন, তখন টাঁপার সালঙ্কার হাতটির কথা সহসা স্মৃতিপটে উদয় হ'ল। কিন্তু টাঁপার রূপ ছিল সত্যিই অপূর্ব। যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি! রং ছিল সত্যাকারের টাঁপা ফুলের মত। কিন্তু মোহান্ত মহারানী যেন মা সিদ্ধেশ্বরীর জীবন্ত প্রতীক—আধার-কালো অমাবস্যার রাত্রি। বৃথা চিন্তার অবসান ঘটিয়ে তখনকার মত নিমুমামাকে অনুসরণ করলাম।

তিন দিন পরে ষষ্ঠারীতি আদেশ পেলাম। নিমুমামা গিয়ে জেনে এলেন। ছোট্ট একটা কাগজে লেখা ছিল—ছোটবেলায় গাছের ওপর থেকে পড়ে যাওয়ায় পেটে আঘাত লেগেছিল। সেই আঘাত এখন ক্ষতে পরিণত হয়েছে। ক্ষত পেটের খুব গভীরে। ডাক্তারদের নিকৃপণের ক্ষমতার বাইরে।

মাথায় হাত দিয়ে ঘুঘড়ে পড়লাম। সত্যিই তো ছোটবেলায় গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। পেটের সবগাম

তিন মাস শয্যাশায়ী ছিলাম। ডাক্তাররা তো কিছুই ধরতে পারছে না। শুধু খাওয়া-দাওয়ার ওপরই তাদের নজর। অতৃদিকে দৃষ্টি নেই। আর ভাবতে পারলাম না। মনে মনে ঠিক করলাম, আজই একবার মায়ের কাছে যেতে হবে। জানতে হবে নিরাময়ের ঔষধ।

নিমুমামাকে প্রণাম করলাম--আচ্ছা মামা, দিনের বেলা মোহান্ত মহারানীর সঙ্গে দেখা করা যায় না, কথা বলা যায় না?

—ফেপেছি! দিনের বেলা মাঠের ত্রিসীমানায় কারও যাবার ক্ষমতা নেই। আর মা নিজে কারও সঙ্গে কথা বলেন না। সবই তাঁর ঐ ম্যানেজার মারফত। এটা দেখেও বুঝলি না?—মামা উত্তর দিলেন।

—তাইতো মামা, আচ্ছা থাক!

নিমুমামাকে থাক বললেও মন কিছু প্রবোধ মানছিল না। অধৈর্য হয়ে উঠলাম। রাত্রে অন্ধকারে একা একা চুপিসারে গিয়ে হাজির হলাম আশ্রমে। আশ্রমের কাজ তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি একা। ম্যানেজারবাবু এসে আহ্বান জানালেন আমাকে ভিতরে। আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেলাম। মা'র তা'হলে আমার ওপর কৃপা হয়েছে। কল্পিত বগে অগ্রসর হলাম অন্তঃপুরের দিকে। ম্যানেজারবাবু আমাকে একটি সুসজ্জিত ঘরে বসিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মুগ্ধ হলাম ঘরের অভিজাত্য দেখে। কবে কোথা দিয়ে এই তেপান্তরে এসব এল! সত্যিই অলৌকিক! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বসে আছি, এমন সময়ে সহসা ঘরের নিহকৃত ভেঙ্গে কে যেন বলে উঠল—নাস্তিক ঘেঁটুবাবু, মনে বিশ্বাস এসেছে এতক্ষণে!—বিশ্বাসে মিলয় বস্তু তর্কে বহুদূর!

কালিদাস রায়, কবিশেখর সম্পাদিত

## কুতিবাসী রামায়ণ

ছক্কহ শব্দের পাদটীকা সম্বলিত সচিত্র সংস্করণ। ভাল কাগজে ছাপা। মূল্য ১০৮ টাকা মাত্র।

শিশির পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা-৬।

একি! আমার ডাক নাম ধরে ডাকে কে? নিখাস বন্ধ হয়ে আমার উপক্রম হ'ল। ঘন রাত্রির অন্ধকারে চারিদিকে গভীর নিস্তর্রতা বিরাজ করছিল। শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

সহসা দরজার পর্দা কেঁপে উঠল। আমি উৎকীর্ণ হলাম। একি! আমি স্বপ্ন দেখছি, না সত্য! এক জ্যোতির্ময়ী দেবী মূর্তি আমার সামনে উপস্থিত। আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। ভাল করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ধরে দেখি, এ যে আমার চির পরিচিতা চাঁপা—কেদার মূর্তির মেয়ে।

—কিগো, ঠাকুর, অমন অবাক হয়ে দেখছো কি? চিনতে পারছো না আমাকে, আমি তোমাদের সেই চাঁপা।

—এও কি সম্ভব!

—অসম্ভব কেন? এ-যুগে সবই সম্ভব। এ-যুগ ধাপ্পার যুগ। সোজা পথে কিছু হয় না। তাই এ পথে পা বাড়িয়েছি। কতখানি সফল হয়েছে ভবিষ্যতই তা' বলে দেবে। ব্যাঙ্কে আমার মোটামুটি সুখে থাকবার মত কিছু জমেছে। ওটা বিত্ত হতে বেশী সময়ও লাগবে না। তুমিও আসতে পার আমাদের সঙ্গে। ঐ যে দেখছো ম্যানেজার, উনিই আমার গুরুদেব,—বুদ্ধির জাহাজ। কোন জেলই ওঁকে এক মাসের বেশী আটকে রাখতে পারেনি। এ-রকম জেল খেটেছেন দশবার। এখন কিন্তু একেবারে অতরুপ। ওঁর বুদ্ধি আর আমার রূপ—এই আমাদের ব্যবসার মূলধন।

আমি বোবা-দৃষ্টি মেলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

—নাগো, ঠাকুর না, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। বলতো—একদিন তোমরাই আমার কত বদনাম করেছ। প্রকারান্তরে আজ আবার তোমরাই.....

কথা শেষ হয় না। একজন পরিচারিকা ত্রস্তে ঘরে প্রবেশ করে বলে—শেঠ আনন্দলাল এসেছেন কোলকাতা থেকে সোজা মোটরে।

—তাতে কি হয়েছে? বীণাদিকে ডেকে দেগে যা।

—কিন্তু তিনি আপনার.....

—আমি যা বললাম তাই করগে। তাতে যদি তিনি

না শোনেন, যা ভাল বোঝেন করুনগে। আমি এখন যেতে পারবো না।

—তাহলে বুঝতে পারছো অসীম, কোটীপতি শেঠ আনন্দলাল সেও ছুটে আসে এখানে। রাতের অন্ধকারে দেশের অনেক গণ্যমাত্র লোকই আসেন এখানে। আমাকেও ব্যবস্থা করতে হয়। আমাদের স্বার্থ ওদের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আমার প্রয়োজন টাকার, আর ওদের প্রয়োজন—চল নিজের চোখেই তা দেখবে।

আমি অহুসরণ করি তাকে। একের পর এক সুসজ্জিত কক্ষ নীরব রাতের অভিসারে মাতোয়ারা। আমিই নীরবতা ভঙ্গ করে বলি—সেদিন অন্ধকারে সন্দেহ যে আমার হয়নি, তা নয়। কিন্তু কালো রং আমার সব গুলিতে দিয়েছিল।

—সেটা আমার খোলস। এখন খোলা আছে। আজকের ছুনিয়ার সকলেই তো আসল রূপ ঢেকে খোলস গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই ওতে আমার কোন দোষ নেই।

—কিন্তু শহর ছেড়ে এই অজ পাড়ার গায়ে কেন?

—সেটাও কি তোমার মত বুদ্ধিমানকে বলে দিতে হবে? শহরে আর আমাদের কোন চটক নেই। বরোয়া রূপসীরা আমাদের ব্যবসা নষ্ট করে দিয়েছে। তাদের চাহিদা অল্প। সিনেমার টিকিট, লাড়ী কিম্বা খুব বড় জোর হালকা একখানা গয়না। কিন্তু আমাদের খিদে অত অল্প মেটে না। তাছাড়া কারও সেবা দাসীর প্রত্যাশায় দিন গুনতে আমি নারাজ।

এরপর আর কিছুই অস্পষ্ট থাকে না। দিনের আলোর মত সবই চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। সামনে সিদ্ধেশ্বরীর নামাবলী টাকা দিয়ে পিছনে চলছে পাপের বেসাতী। অন্ধবিশ্বাসী মোহগ্রস্ত গ্রামের লোক প্রচারের মহিমায় উদ্ভ্রান্ত। গায়ে গায়ে ছড়িয়ে রয়েছে এদের 'এজেন্ট'। তারাই সব তথ্য যোগাড় করে। কে জানে নিয়ুমাণও তাদেরই একজন কিনা!

নিজের উদরের রোগ সারাতে গিয়ে সমাজের সর্বান্তে যে ক্যান্সার রয়েছে তাই প্রত্যক্ষ করে এলাম! কিন্তু আমরা কি কেউ রেহাই পাব?





৪৬শ বর্ষ

চৈত্র, ১৩৭৩

১০ম সংখ্যা

## সম্পাদকীয়

### যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমনীতির পুনর্বিব্যাস দরকার

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ায় সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের মনে যথেষ্ট আশা ও উৎফুল্লের সঞ্চার হয়েছিল। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও বেদনার কারণ এবার হয়ত দূর হ'তে পারে—এরকম একটা প্রত্যাশা অনেকেই করেছিলেন। জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা তাঁদের নীতি নির্ধারণ করবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের ঐকান্তিক আগ্রহান্বিত্যে এখানে অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। পূর্বতন সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধন ও প্রগতিধর্মী নীতি অবলম্বনের দ্বারা দেশ তথা জনসাধারণের সর্বাত্মক উন্নয়নের এক প্রতিশ্রুতি পাওয়া

বাস্তবে যুক্তফ্রন্ট সরকারের নীতি কার্যকরী করতে গিয়ে এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের শ্রমনীতি বর্তমানে কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। শ্রমিকদের দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে মালিক পক্ষকে ঘেরাও করার নীতিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমর্থন করার এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার শ্রমিকদের সম্পূর্ণ ত্রায়সঙ্গত অধিকার। এই দাবি সমর্থনের পিছনে যুক্তি আছে। কিন্তু 'ঘেরাও' সমর্থনের পিছনে যে কি যুক্তি থাকতে পারে, তা' একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হয়ত জানা আছে। সাধারণতঃ শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক মোটেই প্রীতিদায়ক হয় না। অতএব সেখানে এমন কোন নীতি গ্রহণ না



পারে।

একথা অনস্বীকার্য যে, 'ঘেরাও' একটি জবরদস্তি নীতি। বলপ্রয়োগের দ্বারা কোন দাবি আদায় করা, সে দাবি যতই যুক্তি সম্মত হোক না কেন, মোটেই সমর্থনীয় নয়। সুস্থ পরিবেশে ও সম্মানজনক শর্তে যে কোন সমস্তার মীমাংসা বাঞ্ছনীয়। হুমকি দিয়ে বা বলপ্রয়োগের ভয় দেখিয়ে দাবি আদায় করাকে কখনওই সমর্থন করা যায় না। সুস্থ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন কেউই একে নৈতিক সমর্থন জানাতে পারেন না। স্বভাবতঃই এর ফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য।

শ্রমিকদের যেমন জায্য দাবি আদায়ের যুক্তি আছে, তেমনি মালিক পক্ষেরও বলপ্রয়োগের দ্বারা দাবি আদায় নীতির বিরুদ্ধে কিছু বক্তব্য থাকতে পারে। অধিকার বোধ কখনওই একতরফা হ'তে পারে না। তার সঙ্গে কিছুটা দায়িত্ব বোধের মিশ্রণ থাকা বাঞ্ছনীয়। অবিমিশ্র অধিকার বোধ বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। সম্ভবতঃ আমাদের নব গঠিত সরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন নন।

শ্রমিক পক্ষের যেমন ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও তাদের জায্য দাবি আদায়ের মৌলিক অধিকার আছে, তিক তেমনিই মালিক পক্ষেরও মৌলিক অধিকার আছে স্বাধীনভাবে শিল্প বা ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করার। যে কোন পক্ষেরই মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ শুধু অবাঞ্ছনীয় নয়, গুরুতর অপরাধ।

এইভাবে 'ঘেরাও' নীতি সরকারী সমর্থন পুষ্ট হলে

আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আইন ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব যাদের উপর চ্যুত, তাঁরা যদি নিরপেক্ষ ভাবে পরিচালিত না হ'ন, তা হলে স্বভাবতঃই জনসাধারণ নিরাপত্তার অভাব অনুভব করবেন। এরকম এক অস্বাভাবিক অবস্থা কোন সরকারই বরদাস্ত করতে পারে না।

পুলিসের বাড়াবাড়ি মোটেই সমর্থন করা যায় না। কিন্তু তাই জন্তে তাকে জনসাধারণের ভৃত্য মাজিয়ে নিষ্ক্রিয় করে রাখলে রাষ্ট্রের শাসন-যন্ত্র পরিচালনা করা কিছুটা কষ্টকর হয়ে পড়ে। ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন—পুলিসের এই কর্তব্য। পালনে শৈথিল্য দেখা দিলে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। তার উপর আছে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের নানা ফন্দি ফিকির। এই সবের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি না রাখলে যুক্তফ্রন্ট সরকার যে সব উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, সেগুলি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বৃহত্তর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের এমন কোন নীতি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নয়, যার ফলে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। রাজ্য সরকারের কি শ্রমনীতি, কি ভূমিনীতি উভয় বিষয়েই কিছুটা মধ্যপথ অবগম্বন করা উচিত। হঠকারিতার দ্বারা সাধু উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পরবর্তে বরং পণ্ড হওয়ার আশঙ্কাই অধিক। আমরা আশা করি রাজ্য সরকার তাঁদের গৃহীত শ্রমনীতি পুনরায় পর্যালোচনা করে দেখবেন ও উভয়পক্ষ-সম্মত কোন নীতি নির্ধারণ করতে সমর্থ হবেন।

## হাতে চাই, কিন্তু হায় !

বীথি সেন

কবি হতে চাই, কবিতা যে আসে না—  
হতে চাই শিল্পী, তুলি হাতে থাকে না!  
শিক্ষিত হতে চাই, পাঠে মন বসে না  
ধার্মিক হতে চাই, ধর্মে যে মতি মোর লয় না,  
রাজনীতিক হতে চাই, কূটনীতি আসে না,

ব্যবসায়ী হতে চাই, ভিজাপ ত হাতে ওঠে না!  
স্বয়ংসহীন হতে চাই, স্বয়ং তা বোঝে না—  
সংসারী হতে চাই, পয়সা যে আসে না  
যমালয়ে যেতে চাই, যম মোরে নেয় না—  
এই পৃথিবীর এই যে নিয়ম, কেউ যে তা বোঝে না!

# রঙ্গ চিত্র

কনে দেখা



—আজকের ঘেরাওয়ার দিনে অফিসার ছেলের জন্তে একটি জাঁদবেল  
বউ না হলে পালটা-ঘেরাওয়ার ব্যবস্থা করবে কে? স্মিথ ফিগার  
থিয়োরী কিন্তু আপাততঃ অচল! অতএব.....

# সাতপাঁচ

শ্রীনাথ

একটি সংবাদপত্রের শিরোনাম, “কংগ্রেসের পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে শ্রীকামরাজ, ‘মুখে সমাজতন্ত্র অথচ কাজের বেলায় কিছু নয়’।”

—কেবল বাক্যাতুরি!

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কলা বিভাগের বিভিন্ন শ্রেণীতে এ-বছর ছাত্র অপেক্ষা ছাত্রীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

—নারী-প্রগতির চাক্ষুষ প্রমাণ!

—‘পাগলা ছাড়া কেহ বর্তমানে মস্তিষ্কের পিছনে দোড়াইবে না’ বলে স্বতন্ত্র দলের নেতা সি. রাজ-গোপালাচারী মন্তব্য করেছেন।

—“ক্ষাপা খুঁজিয়া ফেরে পরশ পাথর।”

সংবাদে প্রকাশ, খড়দহ খালে যে লক গেট দেওয়া হয়েছে পরীক্ষাগারে তার মালমশলা পরীক্ষার পর প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে যে, নিযুক্ত প্রথম শ্রেণীর সরকারী ঠিকাদার মহোদয় সিমেন্টের বদলে স্রেফ গঙ্গামাটি আর বালি দিয়ে ওই গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ কার্যটি সমাধা করছিলেন।

—আমরা পরীক্ষা না করেই বলতে পারি, ঠিকাদার যখন প্রথম শ্রেণীর তখন নিশ্চয় মাটিটা খাঁটি গঙ্গামাটিই ব্যবহার করা হয়েছে।

সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ কে. এল. রাও বলেন পরিকর!

যে, স্বাক্ষর করা গাদা গাদা কাগজপত্রের ঠেলায় তিনি প্রায়ই ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

—মস্তিষ্কের ফ্যানাদ আর কি—তবু এর একটা মোহ আছে!

লোকসভায় সদস্য বৃন্দের ক্রমাগত প্রশ্নবানের মধ্যে শ্রীদেশাই স্বীকার করেছেন যে, মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে যে সুফল আশা করা গিয়েছিল, সে আশা পূরণ হয়নি।

—স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিধির মত নাকি!

সংবাদে প্রকাশ, সরকারী দুগ্ধ কেন্দ্রে (ডিপো নং—৭০৯) যে দুধ দেওয়া হয় তার একটি গরুর দুধের বোতলের মধ্যে অসংখ্য সাদা সাদা পোকা আর আরশোলার ঠ্যাং ও ডানা পাওয়া গিয়েছিল।

—উপরি পাওনা আর কি!

মধ্য কলকাতার ডাঃ জগবন্ধু লেনের একটি বাড়ীতে জন্মের কগ থেকে কয়েকটি সর্প জাতীয় জীব বের হ'লে ঐ এলাকায় বিশেষ চাক্ষুণ্যের সৃষ্টি হয়।

—এতো নতুন নয়, এত চঞ্চল হুলে চলবে কেন?

প্রেসিডেন্ট আয়ুব বলেছেন, ‘ভারতের জন্তেই পাকিস্তানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি’।

—অর্থাৎ ভারতকে জব্দ করার জন্তে আয়ুব বদ্ধ



# মুহূর্তের জগ্নে

## সংক্ষিপ্ত

ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন এক যুগান্তকারী বিপ্লব এনে উপস্থিত করেছে। এই নির্বাচনে জনসাধারণ অধিকতর সচেতনতার সঙ্গে তাঁদের অমূল্য রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করায় কেন্দ্রে ও রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় বেশ কিছুটা পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গেছে। অতীত বারের মত এখন আর কোন এক দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, যার জোরে সেই দলের স্থায়িত্ব কালের নিশ্চয়তা থাকতে পারে।

আবার রাষ্ট্রপতির নির্বাচনও অদূরবর্তী হয়ে এসেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা আরও অনেক বেড়ে গেছে। সংবিধান মতে, রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। এর আগে কি কেন্দ্রে, কি রাজ্যে সর্বত্রই কংগ্রেস দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। এবারে ১টি রাজ্য কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং কেন্দ্রে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও বিরোধী দল যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছে।

এবারে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে একদিকে ঘেরাপ বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা, অপর দিকে সেইরূপ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রপতি পদের জগ্নে অতীত বহু প্রার্থী থাকলেও প্রধানতঃ কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীজাকির হোসেন ও বিরোধী দল সম্বন্ধিত শ্রীকোকা সুব্বা রাওয়ের মধ্যে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলবে। পদ-মর্যাদানুযায়ী উপ-রাষ্ট্রপতি পদের জগ্নে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে, তার তীব্রতা স্বভাবতঃই অনেক কম।

ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীকোকা সুব্বা রাও তাঁর অসাধারণ মনোবা প্রভাবে আইন জগতে

ইতিমধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। সুপ্রীম কোর্টে প্রথমে বিচারপতি ও পরে প্রধান বিচারপতি থাকা কালীন সময়ে তাঁর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় সমগ্র ভারতবর্ষে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। তাঁর মধ্যে সাম্প্রতিক সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত মামলার রায়, পাশপোর্ট মামলার রায় প্রভৃতির মধ্যে তাঁর অসাধারণ মনোবা-প্রতিভার এক বিশেষ দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে অবতীর্ণ হবার জগ্নে বিরোধী দল সমূহ একযোগে তাঁকে অস্বীকার করলে তিনি সে প্রস্তাবে সম্মতি দেন এবং প্রধান বিচারপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

পর পর দু'বার উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার পর শ্রীজাকির হোসেন আর একই পদে থাকতে চান না। তাই কংগ্রেস দল তাঁকেই রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত করেছে। আর বিরোধী দল সমূহের সমর্থন পুষ্ট হয়ে শ্রীসুব্বা রাও রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হয়েছেন।

সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি সমাজ-পাঠিক হারে অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। বলা বাহুল্য এই অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনে পার্টির ছইপ অনুযায়ী নির্বাচক মণ্ডলী তাঁদের ভোট দানের অধিকার প্রয়োগ করে থাকেন। সেক্ষেত্রে যোগ্যতা নিরূপণের কোন প্রশ্ন নেই।

এই নির্বাচনে বিজয়লক্ষ্মী কার গলায় মালা দেবে সে কথা বলা খুবই কঠিন। তবে যোগ্যতম প্রার্থী যদি পরাজিত হয়—যেটা হওয়ার সম্ভাবনা মোটেই কম নয়—সেটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

# রঙ বদলায়

শ্রীঅজিত রায়

—কেমন আছেন?—পাশ থেকে কে যেন নরম গলায় প্রশ্ন করে।

রাস্তায় লোক চলাচলের বিরাম নেই। সকালের সূর্যের আলো সারা শহরটার ওপর ছড়িয়ে পড়েছে, ছড়িয়ে পড়েছে চৌরাস্তার মোড়ে, আড়ড়ে পড়েছে ট্রাম রাস্তার ওপর। বাসগুলো যাচ্ছে ভীষণগতিতে। বাসের মানুষ-গুলোর মুখে অহমস্বভাব ছাপ। আশেপাশের মনিহারী দোকানগুলিতে নানা ধরনের জিনিস সাজানো। মোড়ের এককোণে বাজার। বাজারে তখনও লোকের ভিড় হয়নি।

অনিমেষ যাচ্ছিল ছেঁড়া পাঞ্জাবিটা গায়ে চাপিয়ে ময়লা একটা ধুতি পরে, রক্ষ চুলে খালি হাতে বাজার করতে। শহরের সকালের এই মিঠে রোদ আর চৌরাস্তার এই ব্যস্ত শোভা উপভোগ করবার মনও যেন তার নষ্ট হয়ে গেছে—অবকাশ তো নেই-ই! আকাশের দিকে না তাকিয়েই সূর্যের অবস্থান অনুমান করা যায়।

এই শব্দ প্রভাতের স্নিগ্ধ স্পর্শ মনকে সজীব করে, কিন্তু ভোগ করবার স্বেচ্ছা নেই তার। বাড়িতে গৃহিণী আর দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। গলির মধ্যে ছোট বাড়ী। সামান্য বা রোজগার তার ভাই দিয়ে সংসার চালানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। মাসের প্রথম দিকেই মাইনে যায় শেষ হয়ে। মাসের শেষে ধার করতে হয়। বিয়ে করেছিল বাধ্য হয়ে। যৌবনের আদর্শবাদের প্রভাব তখন ম্লান হয়ে এসেছে, আত্মীয়স্বজন সবাই মোটামুটি গুহিয়ে নিয়েছে, বড় ভাই ভাল একটা চাকরি পেয়েছে, ছোট বোনের সচ্ছল পরিবারে বিয়ে হয়েছে—মেজ ভাই Competitive পরীক্ষা দিচ্ছে, সে-ই তখন একলা পড়ল। আদর্শ নিয়ে মাতামাতি করে এখন চাকরি জোটানোই শক্ত হ'ল।

পাশের স্কুলটায় একটা শিক্ষকতার কাজ পেল। তাই নিয়েই চলে যাচ্ছিল তার। এমন করেই হয়ত দিন কাটত, এমন সময়ে এক আত্মীয়ের মুখে এক অল্প বয়সী অনুভব কণ্ঠার গুণপনার কথা শুনল সে। অগৃহিণী হবে। আর

এই বয়সেই তো বিবাহ হয়। সংসারে একটি শান্ত লক্ষ্মী না এলে ঘরের শোভাই বাড়ে না। নানাদিক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করাই স্থির করল সে।

বিয়ে ক'রে প্রথম দু' একটা বছর ভালই চলেছিল। মনে হয়েছিল উদ্দাম সক্রিয় যৌবনের দিনগুলোর পর ঘরের শান্তির মধ্যে নতুন করে স্থিতি পাবে সে। কিন্তু লক্ষ্মী মেয়েটি এবার নতুন রূপ ধরলেন। সংসারের জন্ত আজ এটা চাই, কাল সেটা চাই—অর্থ রোজগারের ক্ষমতা নেই কেন—এই সামান্য আরে কি হয়—ইত্যাদি নানা মন্তব্য কানে আসতে লাগল।

স্ত্রীর নাম মমতা। বাপের বাড়িতে স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত পড়েছে। বাবা কেরানী ছিলেন, কাজেই সচ্ছলতা। তাদের সংসারে কোনোদিনই ছিল না। সেই পরিবারে মানুষ হবে মনের ঔদার্য, দৃষ্টির প্রশারতা কিছুই যেন ছিল না মমতার। আর সব প্রাণ করে স্কুলমাষ্টারি নিয়েও অনিমেষের দৃষ্টিভঙ্গী এতটা বদলায় নি যে সংসারের দিন যাপনের আর প্রাণ ধারণের দায়িত্বকে একমাত্র বর্তব্য বলে স্বীকার করে নেবে সে। কাজেই সামান্য ব্যাপারেই মমতার সঙ্গে বিরোধ শুরু হতে লাগল অনিমেষের।

অনিমেষ নিজে রোজই বাজার করতে যায়। একটা পাঞ্জাবি আর একটা কাপড় তোলা আছে বাজারে যাবার জন্ত। রোজ সকালে তাই পরে খলে হাতে বাজারের দিকে রওনা হয়। অস্তিত্ব দিনের মত সে আজও তাই যাচ্ছিল।

এমন সময়ে পাশ থেকে নারীকণ্ঠে কে যেন বললো, কোথায় যাচ্ছেন?

বিশ্বাস হয় না অনিমেষের। আজ থেকে সাত বছর আগে দেখা হয়েছিল প্রথম। ক্ষীণ পেলব দেহ। শাড়ীটা যেন লতার মত জড়ানো থাকত দেহে। মুখটা শুভ্র। সুন্দর দাঁত বার করে হাসলে আরও ভাল দেখাত।

সেই ১৯৫৬ সাল। ১৭ বছরের একটি স্ত্রী মেয়ে ডায়ালিসি উঠে বলল, সমাজতন্ত্রে ঋণের ভার চাপানো উচিত যাদের বিত্ত আছে তাদের ওপর;—যারা বিত্তহীন,

বিকৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাদের সম্পর্ক ক্ষয়িষ্ণু—তারা কি করে গ্রহণ করবে উন্নয়ন বোঝার ভার? পরিকল্পনা চলছে সারা দেশ জুড়ে। কোথাও গড়ে উঠছে ভারী শিল্প, কোথাও জলসেচ পরিকল্পনার ভার। কিন্তু রসদ কে যোগাবে? তাই নিয়ে এই বিতণ্ডা। যে কোনো জনগণের হিতকামী সমাজ ব্যবস্থায় এর ভার চাপানো হ'ত সম্পদশালীদের ওপর।

বিস্মৃতিটা বেশ ভাল লাগল অনিমেষের। তারপর আর ঘিণা করেনি অনিমেষ। আলাপ করে নিয়েছিল রীতার সঙ্গে। রীতা ধনী গ্র্যাডভোকটের মেয়ে। কিন্তু দেশের সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা সম্পর্কে তার আগ্রহ আছে। মানুষের দীন অবস্থা সম্পর্কে সে অচেতন নয়। তার মনে হয়, সত্যকার পরিকল্পনা সেটাই যা মানুষের মনুষ্যত্বকে স্বীকার করে, ব্যক্তি স্বাধীনতাকে মূল্য দেয়, দেশের আয় বণ্টনে অসাম্য দূর করার চেষ্টা করে।

অনিমেষ কথা প্রসঙ্গে তাকে আরও বাস্তব ভূমিতে নামাতে চেষ্টা করে। বলে, ধরুন যদি এক জনসাধারণের দল ক্ষমতা পায়—কি করবে তারা? কি করবে তারা ভূমির উন্নতি বিধানের জন্ত? কোন্টার ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করবে—খাওয়ার ওপর না ভারী শিল্পের ওপর?

সামনের রাস্তা দিয়ে পতাকা সামনে রেখে এক শোভাযাত্রা যায়। রীতা ভাবে, যদি এই দেশে সাম্য-বাদের প্রতিষ্ঠা হ'ত—কি হ'ত তাহলে? মানুষে মানুষে হৃদয়ের উপশম হ'ত কি? সাধারণ মানুষ পেত মর্যাদা, পেত মনুষ্যত্বের অধিকার? রীতার ইচ্ছা করে, সমস্ত সামাজিক ও পারিবারিক বাধা নিষেধ পূজ্যন করে সেও নেমে আসে মাটিতে—যোগ দেয় এই উত্তাল উদ্দাম শোভাযাত্রায়। এগিয়ে চলে এই উৎসাহী প্রাণচঞ্চল যুবক-যুবতীদের সঙ্গে।

একদিন ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিল বেরোয়—অনিমেষ জাতে যোগ দেয়। এক জায়গায় পুলিশের সঙ্গে মিছিলের বিরোধ বাধে। পুলিশ লাঠি চার্জ করে—অনিমেষের মাথায় পুলিশের লাঠির আঘাত লাগে।

রীতা যায় তাকে হাসপাতালে দেখতে। বিছানায়

শোওয়া মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অনিমেষের চোখ দুটো উত্তেজনায় জলছিল। সে বলছিল পার্শ্ববর্তী একজনকে উদ্দেশ্য করে,—সাধারণের কাছে থেকে বিদেশী কোম্পানি অর্থ লুটবে—এ অসহ্য। জাতীয়করণ করো এইসব বিদেশী প্রতিষ্ঠান, এর থেকে দেশের উন্নতির অর্থ মিলবে। তার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

রীতার বাবা বলেছিলেন, গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশে পার্লামেন্টের মধ্য দিয়েই মতামত জানানো সম্ভব—তার জন্ত মিছিল বার করবার প্রয়োজন নেই। রীতা তবুও এনেছে। তারও ইচ্ছা হয়, বাসনা হয় আন্দোলনে যোগ দিতে—সাধারণ মানুষের কাছে আগতে, তাদের সুখ-দুঃখের ভাগী হতে, সমাজের সত্যকার পরিচয় জানতে, নিজের মতামত ব্যক্ত করতে। কিন্তু পারে না সে। তার অনেক বাবা। বাবা তার এ সমস্তর বোর বিরোধী। সমাজ তার প্রতিকূল। সে খুব বেশী হ'লে পারে একটি বই পড়ে Review করতে বা সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে। কিন্তু জীবনে জীবন যোগ করার জন্ত যে মনের প্রয়োজন, তা তার নেই। তার সমস্ত পরিবেশ তার চেতনার বিরোধী। তার মা চান I. A. S. Officer-এর সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে হোক। তার আত্মীয়-পরিজনরা সমাজের শ্রেণী বিভেদ সম্পর্কে ও নিজেদের মৌলীক সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।

একদিন সে অনিমেষের সঙ্গে এক রেষ্টোরাঁয় বসেছিল। মনের কথা তুলে ধরেছিল অনিমেষের সামনে। সে আরাম করে বসে বলছিল তার ভবিষ্যৎ জীবনটা কিরকম হবে। ইতিহাস খুব ভাল করে পড়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-উত্তর কালের ইতিহাস লিখবে। পরিশ্রম ক'রে রসদ জোগাড় করবে।

অনিমেষ ভাবছিল রীতার সামাজিক পরিবেশ সুস্থ বিপ্লবী জীবনের কত পরিপন্থী। রীতার উচিত তার সামর্থ্য নিয়ে, বুদ্ধি নিয়ে কাজে যোগ দেওয়া। বোঝাতে চাইল রীতাকে সেকথা অনিমেষ। কিন্তু রীতা তার অসামর্থ্যের কথা বলে। বলে, সে ভবিষ্যৎ জীবনে ইতিহাসের লেখিকা হবে—সেও তো এক ধরনের কাজ। কিন্তু I. A. S. পাত্রের জন্ত আগ্রহ তার মায়ের এতটুকুও কমেনি। অনিমেষ তাদের বাড়ীতে গেলে আর বিশেষ



আমলই পায় না।

তারপর কলেজের পাঠ শেষ করেছে রীতা। আবার সে মিশে যায় তার সেই পরিবারের উপর তলাকার অবরুদ্ধ আবহাওয়ায়। বিকলে টি পার্টিতে যোগ দেওয়া—এখন তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। তা সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে যখন রীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় অনিমেষের, রীতা তার মনের কথা বার বার বলে—সে স্রষ্টা হবে, ইতিহাস লিখবে—যাতে থাকবে সাধারণ মানুষের দুঃখ-আনন্দের পরিচয়।

এরপর অনেক বছর কেটে গিয়েছে। অনিমেষও অবস্থার চাপে সাধারণ চাকরি নিয়ে সাধারণ গৃহস্থ সেজেছে। তার মনের উত্তাপও গেছে কমে। বিপ্লবী চেতনা কেমন খিতিয়ে গেছে। দেশের বৈপ্লবিক সম্ভাবনার চাইতে স্ত্রীর সঙ্গে কোনো চলতি বাংলা ছবি নিয়েই তার আড্ডা জমে বেশী। প্রতি রবিবার গৃহিণীকে কোনো ছবি দেখাতে নিয়ে যেতে হয়। মাঝে মাঝে শুধু অতীত দিনের সেই ঝড়, যা হৃদয় মনকে নাড়া দিয়েছিল তার কথা মনে হয়।

আজ সে যখন বাজার যাচ্ছিল, পাশ থেকে যে নারীটি ডাকল—তাকিয়ে দেখল অনিমেষ—হ্যাঁ, মাথার ঘোমটা

আর শিশির লাল সিঁদুর—সেই ১০ বছর আগেকার সুন্দরী মেয়েটিকে চেনা যায়।

রীতা বলে, আমার স্বামী High Court-এর Advocate. এইতো কাছেই বাড়ী—একদিন আসুন না, আলাপ করিয়ে দেব। আবার শুরু করে রীতা—উঃ, কি ঝামেলাতেই না পড়েছি, ননদের জন্ত একখানা শাড়ী কিনতে হবে, আর পারি না আমি। দেখুন না, এই মোটা চেহার। নিয়ে কি নড়াচড়া করা যায়।—সত্যিই সে মোটা হয়েছে। নাঃ, ইতিহাস লেখার কথা একবারও বলল না রীতা। শুধু ওর ওনার গল্প আর সাংসারিক ঝামেলা নিয়েই বলে চলল। দেখে মনে হল সুখীই হয়েছে সে।

দশ বছর আগেকার সেই কথাগুলো আর ওঠে না ওদের মধ্যে। কেউ কাউকে এড়িয়েও যায় না। কিন্তু আলাপের পটভূমিকা যেন বদলে গেছে। ১৯৫৬ সাল আর ১৯৬৬ সাল—দশ বছরে দেশের অংগু হযতো অল্পই পালটেছে—একই সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলেছে—কিন্তু একটি বিশেষ অবস্থায় দুটি মানুষ যা করণা করেছিল, জীবনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে তাদের সে করণা মেলেনি। তাদের সেই অতীত দিনের চিন্তার সাক্ষীও আজ আর কেউ নেই।

## দীঘির নিটোল বুক

শ্রীনারায়ণ পাত্র, সাহিত্যমণি

ঐ জল টল্ টল্ দীঘির নিটোল বুক  
পদ্মকলি পদ্মপাতায় জড়িয়ে আছে মুখে।

ওর কালো ডেউএর তালে,

পদ্মফুলে ভ্রমর মধু ঢালে,

পানকোড়ি বিফল আশায় ঘুরছে বিরস মুখে—

দীঘির নিটোল বুক !

ঐ ঝির্ ঝির্ ঝির্ ঝাউএর পাতা কাঁপে,

কোকিল বধু কাঁদছে একা গভীর মনোভাপে।

(তাই) ছিঁড়ে গেছে প্রেমের ফুল-ডোর,

চথাবধু ওরি ব্যাধায় ভাসছে গভীর দুখে—

দীঘির নিটোল বুক !

ঐ ছম্ ছম্ ছম্ রাতের আকাশ ভলে।

জল্ জল্ জল্ তারার জোনাক জলে।

কার নীরব বাঁশীর সুরে,

বিরহিণী কাঁদছে কোথার দূরে,

তার চাওয়া-পাওয়া চিরন্তনে গেছে বুঝি চুকে—

# রাতের মন

( গল্প )

শ্রীমুশোভন দত্ত

বাসন্তী সকালের মিষ্টি রোদের আলতো চুমা বড় ভালো লাগছিল অশ্রু। বড় বড় আকাশ-ছোয়া অট্টালিকাগুলোর ফাঁক থেকে চোরের মতো উঁকি মারছিল মুঠো মুঠো স্বচ্ছ নীল আকাশ। বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। কাল শুতে শুতে রাত দু'টো বেজে গিয়েছিলো। কতক্ষণই বা ঘুমিয়েছে? এর মধ্যেই সকাল হ'য়ে গেল। রোদ্দুর উঠলো। বার কতক এপাশ ওপাশ করলো ও। শাড়িটা এলোমেলো হ'য়ে গিয়েছিলো। গুছিয়ে পরলো। তারপর ক্রান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গেল স্নাইটের এ্যাটাচড্ টয়েলেটের দিকে। শাওয়ার বাথে গরম জলে চান করলো ভাল ক'রে।

একটা হালকা জাফরান রঙের শাড়ি পরলো ও। ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে পিঠের ওপর ছড়ানো নিতম্পর্শী কুঞ্চিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদামে অলস হাতে চিকনি বুলাল কিছুক্ষণ। না, চুল বাঁধলো না ও। একটা লাল রিবন জড়িয়ে নিলো এলোচুলে। ছোট্ট কপালে কুমকুমের টিপ পড়লো। পাউডারের পাপটা মুখে য'য়ে নিলো একবার। যথেষ্ট! এর বেশি আর প্রয়োজন নেই। প্রকৃতি ওকে যা দিয়েছে, কোন পুরুষের চোখে নেশা জাগাতে তাই যথেষ্ট। কিন্তু মেয়েরা স্বভাবতই একটু প্রসাধন-প্রিয়। প্রসাধন যেন নারী দেহের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই ওটাকে বাদ দিলে স্ত্রীজাতি অচল।

হাত ঘড়িটার দিকে একবার আড় চোখে তাকালো অশ্রু, ন'টা বাজে। এখনো এক ঘণ্টা দেরি আছে। দশটার সময় এর কুস্তলের সঙ্গে বেকুবের কথা। দু'দিনের মধ্যে গোটা প্যারিটাকে অন্তত একবার দেখে নিতে হবে তো! ফিপথ্ মে-ই তো ফিরে যেতে হবে ইণ্ডিয়ায়। তারপর বিয়ে ক'রবে ওরা। ছোট্ট সংসার, ছিমছাম একটা ছোট বাড়ি। ইশ! ভাবতে কি ভালই যে লাগছে! তখনো ও এয়ার হোস্টেস থাকবে। কুস্তলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে। জাপান, যুরোপ, ফ্রান্স, রাশিয়া—আরও, আরও অনেক জায়গায়। সারা বিশ্ব জুড়ে হবে ওদের

সংসার। মনের সাগরে করনার তরী ভাসিয়ে সোফার ওপর ব'সলো অশ্রু। একটা সিনেমা সাপ্তাহিক খুলে এলোমেলো ভাবে পাতা ওলটাতে লাগলো। রাবিশ! যতো সব মুড্ পিকচারস্! পত্রিকাটা বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়ায় অশ্রু। স্নাইং ডোর ঠেলে হাসি হাসি মুখে হাজির হয় কুস্তল।

—কি ব্যাপার, আধ ঘণ্টা আগেই হাজির হ'লে যে?  
—মুচকি হেসে প্রশ্ন করলো অশ্রু।

—তোমার তো সাজতে এক ঘণ্টা লাগে, তাই।

—বাজে কথা। তোমার প্যান্ট-কোট-টাই পরতে যা সময় লাগে, তার চেয়েও কম সময় লাগে আমার।

—তাই নাকি? দেখি কতক্ষণ লাগে। নাও শুরু করো।

—আমি রেডি।

—মাই গড্! এতক্ষণ খেয়ালই করিনি। সত্যি তোমাকে আজ খুব চার্মিং লাগছে।

—মোটাই না।

—বিলিভ্ মি। ভাবছি অচেনা দেশে তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে কিনা।

—কেন, হারিয়ে যাবো নাকি?

—হারিয়ে না যেতে পারো, কিন্তু কেউ কেড়েও তো নিতে পারে।

—উঃ, কেড়ে নিলেই হ'ল।—কপট ক্রোধে ঠোঁট ওলটালো অশ্রু।

—সত্যি!—অপূর্ব আবেশে অশ্রুর কমনীয় মুখখানা বুকের ভেতর টেনে আনলো ও। ওর কপোলে উষ্ণ অধর ছোঁয়ালো একবার।

অশ্রু সেন আর কুস্তল চ্যাটার্জী। একজন এয়ার হোস্টেস, আর একজন পাইলট। প্রায় এক বছর আগে-পরে এয়ার ইণ্ডিয়ার সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলো ওরা। ধনী হুলাল কুস্তল বি. টেক্. পাস ক'রে ট্রেনিং নিয়ে শখ ক'রে পাইলট হয়েছে। আর অশ্রু নিতান্ত অভাবের

ভাড়নায় এই পথে পা বাড়িয়েছে। সেবার হিন্দু বিদ্যেবা দাসায় সব হারিয়ে পাকিস্তান থেকে চ'লে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন হিন্দোল সেন। অশ্রুর বাবা। মধ্যমগ্রামের একটা প্রাইমারী স্কুলে মাষ্টারি জুটিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অত অল্প টাকায় কি আর সাতজনের একটা সংসার চলে? —চলে, তবে স্বচ্ছল ভাবে নয়। ওদের সংসারটার গতি মধুর থেকে মধুরতর হয়ে আসছিলো দিন দিন। বাবার দায়িত্বের জোয়ারের খানিকটা নিজের কাঁধে তুলে নিতে চাইলো অশ্রু। ভাই-বোনদের মধ্যে বড় ও। ভাই ছ'টো তো একেবারে বাচ্চা। অফিসের দরজায় দরজায় ঘুরতে শুরু করলো চাকরির খান্দায়। আশা দিলো অনেকে, কিন্তু চাকরি দিলো না কেউ। আর ভদ্র চাকরি করবার মতো কিই বা যোগ্যতা আছে ওর? উচ্চপদস্থ পরিচিত কোন মামা বা কাকা তো ওর নেই। নেই কোন উচ্চশিক্ষা। ওর সম্বল শুধু টাকা যুনিভার্সিটির ইন্টারমিডিয়েট পাসের সার্টিফিকেট। হাজার হাজার M. A. পাস চাকরির জগৎ হাঁক'রে আছে। লক্ষ লক্ষ Graduate হ'বেলা অফিসে অফিসে চাকরির উমেদারি করছে, হতাশ হচ্ছে। তাদের পাশে ইন্টারমিডিয়েট পাস অশ্রু সেনের দাবি কতটুকু? তাও আবার টাকা যুনিভার্সিটির সার্টিফিকেট! চূড়ান্ত ভেঙে পড়েছিলো ও।

সুযোগ সব সময় আকস্মিক ভাবেই আসে। ওর জীবনেও একটা সুযোগ জুটে গেল। এয়ার হোস্টেস হওয়ার সুযোগ। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের ঠিকানা মিলিয়ে একটা দরখাস্ত পাঠালো ও। সময় মতো ইন্টারভিউ লেটারটাও হাতে এলো। সময় মতো ইন্টারভিউ দিলো ও। কয়েকটি প্রশ্ন ক'রেছিলেন মেজর সেন। ও উত্তর দিয়েছিলো কাঁপা কাঁপা স্বরে। মেজর সেন ওকে আশা দিলেন, অশ্রু সিলেকটেড হ'ল। এক বছরের ট্রেনিং, তারপরই এয়ার হোস্টেস।

কুন্তলের সঙ্গে ওর পরিচয় লগুনে। একই বোর্ডিং প্লেনের পাইলট ছিল কুন্তল, আর অশ্রু এয়ার হোস্টেস। নিতান্তই পরিচয় হ'য়েছিল। ঘনিষ্ঠতা হয়নি। ঘনিষ্ঠতা হ'ল রোমে। এবারও একই প্লেনে ডিউটি পড়েছিলো ওদের। এয়ার পোর্টের রেস্টহাউসে ছিল ওরা। কুন্তল অসুস্থ হ'য়ে পড়লো হঠাৎ। ভীষণ জ্বর। হাই

টেম্পারেচার, আর ভুল বকা। অক্লান্ত সেবায় কুন্তলকে সুস্থ ক'রে তুলেছিলো অশ্রু। একান্ত আপন জনের মতো ওর মাথার কাছে ব'সে কুন্তলের পরিচর্যা বেশ কয়েকটা রাত বিনিদ্র কাটিয়ে দিয়েছিল। কুন্তল সুস্থ হ'য়ে উঠলো। কিন্তু ততক্ষণে একটি হৃদয়ের কাছে অপর একটা হৃদয় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেছে।

তারপর আরও অনেক জায়গায় যেতে হ'য়েছে ওদের। ভেনিস, ফ্রান্স, মস্কো, বন—বেশ কয়েক বার গিয়েছে, এক সঙ্গেই গিয়েছে। মনের গ্রহিষ্ঠা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে দিন দিন। ওরা বিয়ে করবে ঠিক করেছে। কুন্তল অশ্রুকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। ভারতে ফিরেই বিয়ে করবে ওরা। হঠাৎ এভাবে প্যারিসে আসতে না হ'লে ওদের বিয়েটা আরও আগেই হয়ত হ'য়ে যেত।

প্যারিসে এসে আবার নতুন ফ্যানসি হ'ল। হোটেল জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। বসন্তের প্যারিসে একটা ভালো হোটেল পাওয়া আর হাতে টাঁদ পাওয়া অনেকটা একই রকম। তার ওপর অল্প খরচায় ভালো হোটেল। অতএব ভালো হোটেলের আশা ত্যাগ করতে হ'ল ওদের। তবে হোটেল একটা জুটলো, ল্যাটিন কোয়ার্টারে 'দেস ভুজেন'। চার তলায় সিঙ্গল বেডের পাশাপাশি ছ'টো রুম। মাঝখানে একটা ছোট্ট স্যুইং ডোর। ঘরগুলো অপরিচ্ছন্ন আর অন্ধকার। হ'লেই বা, তবুও তো হোটেল; আর ভাড়াটাও সস্তা, দৈনিক পাঁচ ফ্রাঁ মাত্র।

এক তলায় এলে হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হ'ল ওদের। জ্যা লা ভালজা। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ভদ্রলোক আলাপী। ওদের দেখতে পেয়েই এগিয়ে এলেন তিনি। সবত্রে পালিত গুন্ডে পাক দিয়ে কুন্তলকে প্রশ্ন করলেন তিনি—মশিয়ঁ, প্যারি দেখতে চললেন বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা ফিরবেন কখন?

—একটু রাত ক'রে।

—ডিনার তো এখানে খাবেন না। সাপারও কি বাইরে খেয়ে আসবেন?

—না, সাপার হোটলে ফিরে এসেই খাবো।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। একটা কোচটার



দাঁড়িয়েছিল সামনে। তাতেই চেপে বসলো ওরা। প্রথমে প্যারিটাকে দেখলো। ফলিস বার্জার, আর্চ ডু ট্রান্সফ, ইফেল টাওয়ার। একটা বড় রেস্টোরাঁয় ডিনার খেল। তারপর মাইল দশেক দূরে ইতিহাসের ভাসিঁই।

সূর্য বিদায় নিলো প্যারির আকাশের বুক থেকে। তারার চুমকি বসান শাড়ি পরলো আকাশটা। এবার টাঁদ আসবে অভিসারে। তাই বেশ পরিবর্তন করলো প্যারি। নতুন ক'রে সাজলো।

এবার ফিরতে হবে হোটেলে। একটা ট্যাক্সি মিলল। হোটেলের ঠিকানা ব'লে দিল কুস্তল। ট্যাক্সি ছুটতে লাগলো। একটা সিগারেট ধরালো ও। অশ্রু তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। বিভোর হ'য়ে দেখছে রাতের প্যারিকে। স্বপ্নময় প্যারি। যুরোপের বাগদাদ, কল্পনার স্বর্গ। গত হু'হাজার বছর ধ'রে মানব জাতির কতো উত্থান-পতন ঘটে গেল এই প্যারির বকের উপর দিয়ে বয়ে চ'লা সেইনের তীরে। প্যারির আত্মা তবু স্নান হয়নি এতটুকু।

হাত ঘড়িটার ওপর চোখ পড়লো কুস্তলের, দশটা বাজে। প্যারির বোধহয় সবে সন্ধ্যা হ'য়েছে। কাফে-গুলো ভর্তি। বারগুলো মদে ডুবছে। রাস্তার ফুটপাথের ওপর প্রকাশ্য জুয়ার আসরগুলো জমজমাট হচ্ছে। রাজ-পথের এখানে ওখানে দেহোপজীবিনীদের ভিড়। মাত্র কয়েক ফাঁর বিনিময়ে হাতছানি দিয়ে রাত্রি অভিসারের আহ্বান জানায় তপ্ত যৌবনা ললনা। সারা শহরটা যেন নেশার মাতোয়ারা। এই হ'ছে রাতের প্যারি। যেন আরব্য উপন্যাসের পঠিত কোন স্বপ্নালু রজনী। অশ্রুর এপিয়ে পড়া নগ্ন বাহু দু'টো নিজের হাতের মধ্যে নেয় কুস্তল। আন্তে আন্তে চাপ দেয়।

—এই কি হচ্ছে?—ফিসফিস ক'রে ব'লে অশ্রু।

—কাছে এগিয়ে এসো।

—ভালো হবে না বলছি।—রাগের ভান করে অশ্রু। হাত দু'টো ছাড়িয়ে নিতে চায়, পারে না। ওকে কাছে টেনে আনে কুস্তল। মুহূ হাসিতে সমর্থন জানায় অশ্রু।

—জানো অশ্রু, মাথাটা ভীষণ ধ'রেছে।—কুস্তল ব'লে।

—এসো, আমি হাত বুলিয়ে দি। বারণ করলে তো

শুনবে না। বললাম আজ ভাসিঁই দেখে কাজ নেই, কাল দেখলেই হবে। তা নয়, আজই দেখা চাই।

—তোমার বোধহয় খুব কষ্ট হয়েছে?

—হয়েছেই তো। সারা দিন টোটো ক'রে ঘোরা। আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু তোমার তো মাথা ধ'রলো।

—ও কিছু না। এখনি ঠিক হ'য়ে যাবে। অশ্রুর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে কুস্তল। আন্তে আন্তে কুস্তলের মাথায় হাত বুলাতে থাকে ও।

বিকট শব্দ ক'রে থেমে যায় ট্যাক্সিটা। গাড়ি থেকে নেমে পড়লো কুস্তল। ওর পেছনে পেছনে নামে অশ্রু। মিটার দেখে ভাড়া মিটিয়ে দেয় কুস্তল।

—সাপার খেয়ে একবারেই সুাইটে যাবো, কি বলো?  
—অশ্রু জিজ্ঞাসা করে।

—সেই ভালো।—মাথা নেড়ে সমর্থন জানায় কুস্তল।

দোতলার ডাইনিং হল ঢোকে ওরা। সাপার খায়। শুতে চ'লে যায় কুস্তল। ও আজ ভীষণ ক্লান্ত। রাত অনেক হয়েছে। অশ্রুকেও শুয়ে পড়তে বলে। একুশ বসন্ত পেরিয়ে যাওয়া দেহটাকে বিছানায় এলিয়ে দেয় অশ্রু। কিন্তু ঘুম আসে না। চোখ বুজে ঘণ্টা খানেক পড়ে থাকে বিছানায়, তবু ঘুম আসে না। বিছানা থেকে উঠে পড়ে ও। কম পাওয়ারের নীল আলোটা জ্বলে। কুস্তল কি ঘুমিয়ে পড়েছে? মাঝখানের দরজাটা অল্প একটু ফাঁক করে দেখে, কুস্তল ঘুমুচ্ছে। বড় ঘুম কাতুরে ও! ঘুমুতে পেলে ও আর কিছুই চায় না—অসহ্য মনে হয় অশ্রুর। নিঃশব্দে কুস্তলের ঘরে ঢোকে। ওর বিছানার কাছে এগিয়ে যায়। ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। বেচারী! ওর বিছানার এক পাশে ব'সে পড়ে অশ্রু। আন্তে আন্তে ওর মাথায় হাত বুলাতে থাকে; টাপার কলির মতো আঙুলগুলো দিয়ে কুস্তলের চুলে বিলি কাটতে শুরু করলো ও। হঠাৎ কুস্তল ধ'রে ফেলে ওর হাতখান। অশ্রু পালিয়ে যেতে চায়, কিন্তু পারে না। কুস্তলের সবল বাহুপাশে ও ততক্ষণে আবদ্ধ। মিটিমিটি হাসতে থাকে কুস্তল। লাজে আবীর-রাঙা হ'য়ে যায় ও। সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করে।

(শেষাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# ভালবাসা

( গল্প )

রাজা সেন

—দেখ, এখনও বলছি তুই বাড়ি ফিরে চল। এসব বাজে খেয়াল ছাড়!—বললেন অমলা দেবী।

—তোমার কাছে এটা বাজে খেয়াল হতে পারে মা! আমার কাছে এটা জীবন-মরণ সমস্যা। আমি কিছুতেই আর বাড়ি যেতে পারবো না।—বললো অণিমা।

—খুকী, তোর মা যা বলছে সেই মতো কাজ কর। নতুবা জোর করে তোকে আমরা এখান থেকে নিয়ে যাবো।—বললেন অণিমার বাবা সমর বোস।

—আমাকে কেটে অর্ধেক করে নিয়ে যেতে পারো—সম্পূর্ণ আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না।

—খুকী!—হুঙ্কার ছাড়লেন অণিমার বাবা।

—তোমার কথায় এখন আর আমি ভয় পাই না বাবা! আমি প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছি। স্বাধীন ভাবে চিন্তা করে কাজ করবার, চলাফেরা করবার অধিকার আমার আছে। তবে তোমরা কেন আমাকে সে অধিকার দিতে চাইছো না?

অবাক হয়ে যান সমর বোস। এই কি তাঁর সেই ছোট মেয়ে! যে মেয়ে মুখের উপর উত্তর দেওয়া দূরে থাক—তাকাতে পর্যন্ত ভয় পেতো। কি দেখলো ওই নেপালী যুবক বীরবাহাদুরের মধ্যে! বীরবাহাদুরকে এত ভালবাসলো অণিমা। যার জন্য আজ সে মা-বাবাকে পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারে। একি হৃদয়ের সত্যকার ভালবাসা—না ফণিকের উত্তেজনা? হঠাৎ বেগে উঠে বলেন এখনও বলছি বাড়ি ফিরে চল—নতুবা জোর করে

আমরা নিয়ে যাবো। ঘোঁকের মাথায় পালানামি করিস না!

—তোমরা অবশ্য কেন বাধা দিতে আসছো! তাছাড়া, এ বিয়ে আমি করবই—যতো বাধা আসে আমুক। আর এ কাজ তো ঘোঁকের মাথায় করছি না। চার বছর ধরে বাকে মনে-প্রাণে ভালবেসেছি, নাইবা হলো সে একজাত, তার সাথেই তো মিলতে যাচ্ছি। এতে তো কোন অণ্ডায় দেখছি না!

নরম হয়ে যান সমর বোস। বলেন—দেখ, তোর দিদিও পাঞ্জাবীকে ভালবেসে বিয়ে করলো। আবার তুইও করতে যাচ্ছিস নেপালীকে। আমার তোরা দুটি মাত্রই মেয়ে ছিলি—হুজনেই একরকম কাজ করতে চাইছিস। এরপর, তুইই বল, কি করে লোকের কাছে মুখ দেখাবো।—করুণ কান্নার মতো শোনার স্বর।—তোমাদের লোক-লজ্জা ঠেকাতে হলে আমাকে তবে আত্মহত্যা করতে হয়। তা আমি পারবো না। কারণ তাতে প্রেমের স্বীকৃতি নেই।

—অণি, এতদিন যারা তোকে মাহুষ করলো, বড় করলো, তারাই আজ পর হলো। আর এই বাহাদুরই হলো তোর আপন জন—একান্ত আপনার জন।

—বাবা, তোমাদের তো আমি পর করতে চাইনি—তোমরাই তো আমাকে পর করে দিচ্ছ!—করুণ কান্নাঝরা কণ্ঠে বলে অণিমা।

—আমরা ইচ্ছা করে করছি না, তুই বাধ্য হয়ে

( পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেবাংশ )

—ও, তুমি তা'হলে এখনো ঘুমাও নি!—মিষ্টি করে ভয় করছে।  
হেসে প্রশ্ন করে অশ্রু।

—না।

—কেন?

—তাহ'লে তুমি এলে যে টের পেতাম না।

—জানো, আমিও ঘুমুতে পারছি না। কেমন যেন জোর ক'রে নিজের পাশে গুইয়ে দেয় কুস্তল।

ভয় করছে।

—কিসের ভয়। তুমি তা'হলে আমার কাছেই গুয়ে পড়।

—কি করে শোব? খাটটা খুব ছোট যে।

—হোক গে! এতেই হুঁজনার হবে যাবে। অশ্রুকে

জোর ক'রে নিজের পাশে গুইয়ে দেয় কুস্তল।

করাচ্ছিস। তাছাড়া বাহাদুরের আয়ও বেশী নয়—তাকে সুখে রাখতেও পারবে না সে।

—কোন রকমে ভাল-ভাত খেয়ে চলে গেলেই আমি সন্তুষ্ট। আমি অর্থের সুখ চাই না। আমাদের ভালবাসা যেন অক্ষয় হয়, এই আশীর্বাদ করো বাবা।—বসে বাবার পায়ে হাত দেয় অণিমা।

ইঠাৎ কেমন উদ্ভ্রান্ত হয়ে গিয়ে সমর বোস বলেন—না-না, আশীর্বাদ করবো না—করতে পারবো না।—কয়েক পা পিছিয়ে যান তিনি।

—চলুন জামাইবাবু, বাইরে চলুন।—উত্তরের অপেক্ষা না করে হাত ধরে বাইরে টেনে নিয়ে যান অলোক দত্ত—অণিমার ছোট মামা। অমলা দেবীও বেরিয়ে আসেন ওদের সঙ্গে।

অণিমার ছু-চোখ বেয়ে অঝোর ঝরে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। জীবনের চরম মুহূর্তে ওরা পিতা-মাতার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হ'ল।

সেই মাস রাত্রেই কেমন যেন উদ্ভ্রান্তের মতো বাড়িতে ফিরে যান অণিমার মা-বাবা।

বীরবাহাদুর ছোটবেলা থেকেই বাংলা দেশে আছে। তার মা ও এক ভাই থাকে বিহারের এক ছোট শহরে—ব্যবসা করে সেখানে। আগে তারা বাংলা দেশেই থাকতো। মা-ভাই যাবার পর আর পড়তে পারেনি বাহাদুর—দশম শ্রেণীতে উঠেই পড়া ছেড়ে দিতে হয়েছে। তবুও মা-ভাইয়ের সঙ্গে বিহারে যাননি—বাংলা দেশ তার ভালো লেগেছে। বাংলাই এখন তার একরকম মাতৃভাষা। পেটের তাগিদে কুড়ি বছর বয়সে রাণাঘাটের এক মেয়েদের স্কুলে দারোগানের কাজ নিলো। এখানেই পরিচয় হলো চন্দ্র বছরের সুন্দরী ছাত্রী অণিমার সঙ্গে। পরিচয় ধীরে ধীরে ভালবাসায় পরিণত হলো। ছু-বছর পরে অর্থাভাবে পড়া ছেড়ে দিলো অণিমা। স্কুল ছেড়ে দেওয়াতে দেখা-সাক্ষাতের অসুবিধা হতে লাগলো। দেখা-সাক্ষাৎ না করেও থাকা যায় না। অগত্যা ছোট মামার শরণাপন্ন হলো অণিমা।

ছোটমামা অণিমাকে খুব স্নেহ করেন। সব শুনে বললেন—এখন মা-বাবাকে জানাস না। পরে আমি ব্যবস্থা

করবো। আমার বাড়িতে তোরা দেখা-সাক্ষাৎ করিস। কাউকে জানাতে তোর মামীমাকে নিষেধ করে দেবো।

অণিমার পড়া ছাড়ার পরের বছর বীরবাহাদুরও স্কুলের কাজ ছেড়ে দেয়। একটা সরকারী অফিসে দারোগানের কাজ পায় সে। মামার পরামর্শ মতই এরা দুজনে মামার বাড়িতে দেখা-সাক্ষাৎ করতে থাকে। মামীমাকে মামা নিষেধ করে দিয়েছে। কাজেই কোন ভয় নেই। অণিমাদের বাড়ি থেকে মামার বাড়ি মাত্র আধ মাইল পথ।

একদিন একদিন করে এদের পরিচয়ের মোট চারটি বৎসর কাটে। যৌবনের প্রচণ্ড ঢেউ দুজনকেই অস্থির করে তোলে। মামার সঙ্গে পরামর্শ হয়। কথা হয়, রাত বারোটা নাগাদ বীরবাহাদুর রিক্সা নিয়ে অণিমাদের গেটের কাছে যাবে। অণিমা যেন নজর রাখে। বীর-বাহাদুরকে দেখলেই যেন সঙ্গে সঙ্গে অণিমা রিক্সা করে এখানে চলে আসে। পুরুত এনে রাখা হবে। সেরকম চেনা লোকও দু-চারজন আসবে। রাত্রি দুটো কয়েক মিনিটে যে লগ্ন সে লগ্নেই শাস্ত্রমতে দুজনের বিয়ে হবে। তারপর পরের দিন আবার রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হবে।

ব্যবস্থা অনুযায়ী সব ঠিক হলো। বীরবাহাদুর গিয়ে অণিমাকে আনলো।

ওদিকে অণিমা চলে আসার একটু পরেই ঘুম ভেঙে গেলো অণিমার বাবার। কি মনে করে উঠলেন। ভেতর দিয়ে অণিমার ঘরে ঢুকলেন। বিছানা খালি। দরজা বাইরে থেকে শিকল আঁটা। দ্রীকে ডাকলেন। ঘর, উঠন, বাথরুম, পাখানা খুঁজলেন। ডাকলেন বার বার, তবু সাড়া নেই। ঘরে তালি দিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনে বেড়িয়ে পড়লেন। প্রথমে থানায় যাবেন, ভাবলেন। তারপর ভাবলেন, আগে অলোকের পরামর্শ নেওয়া ঠিক। অলোকের বাড়ির উদ্দেশ্যেই চললেন।

অলোকের ঘরে ঢুকেই চমকিয়ে উঠলেন। তারপর জ্বলে উঠলো তাঁর ছু' চোখ। অগ্নিজ্বালা চোখে অলোককে বললেন—কার, অণিমার বিয়ে!

—হাঁ।—কোনরকমে বললো অলোক।

—কার সাথে?

—বাহাদুর বলে এই.....।—অলোকের কথা শেষ



হলো না।

—বাহাদুর!—রাগে চীৎকার করে উঠলেন। তারপর বললেন—তাইতো বলি মাঝ রাত্রে মেয়ে গেলো কোথায়! আমি ধারণা করিনি তুমি এইসব নষ্টের মূলে।

—রাস্তাঘাটে কোথায় বিপদে পড়তো!—আমতা আমতা করলো অলোক।

—থামো!—অলোক চুপ করে গেলো।

তারপর মেয়ের দিকে অগ্নিজালা চোখে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কথা বলতে থাকেন সময় বোস।

রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করতে বেকুবাব আগে বাহাদুর একটু বাইরে বেড়িয়েছিলো। অমনি ওখানকার ছেলেরা ধরে তাকে বেদম প্রহার দিলো। নেপালী হয়ে বাঙ্গালী মেয়ে বিয়ে করার এত চুসোহস! শেষে অলোক দত্তের হস্তক্ষেপে ব্যাপারটা মিটে যায়।

মামা বাহাদুরকে পরামর্শ দেয়—আজ রাত্রেই তুমি অগ্নিমাঝে নিয়ে তোমার বাসায় চলে যাও। লোকের রাগটা আগে একটু পড়ুক, তারপর কোর্টে গেলেই হবে। আর জামাইবাবু যাতে পুলিশের খামেলা না করেন—তার ব্যবস্থা আমি করবো। কোন ভয় নেই।

সেদিন রাত্রেই বাহাদুর অগ্নিমাঝে নিয়ে রিক্সা করে চুপি চুপি তার বাসার দিকে আসে। তার ইচ্ছা, কাউকে না জানিয়ে ঘরে ঢুকবে। কি জানি, ঘরে ঢুকতে এরা আবার যদি বাধা দেয়।

বাহাদুর জানেনা, এখানকার ছেলেরা আগেই খবর পেয়ে গেছে। তাকে মারবে বলে পথের উপর একদল ছেলে অপেক্ষা করতে থাকে। দূর থেকে একদল ছেলে দেখেই বাহাদুরের ভয় হলো। এরা আবার কি জন্তু দাঁড়িয়ে আছে! পাশ দিয়ে রিক্সা যাচ্ছিলো। একজন বলে উঠলো, রিক্সায় কে যায়?

—বাজারের ওখান থেকে লোক আনছি!—বললো রিক্সাওয়ালা।

—থামা বেটা!—গর্জে ওঠে কয়েকজন।

—ভেতরে স্বামী-স্ত্রী আছে বাবু!—রিক্সার গতি আঁস্তে হলো।

—তই থামা বলছি বেটা!—অনেকেই গর্জে ওঠে।

রিক্সাওয়ালা ভয়ে ভয়ে থামালো।

—এইতো শালা বাহাদুর! বাটার জান এবার শেষ করবো! নেমে আস বেটা!—একসঙ্গে গর্জে ওঠে অনেকে।

বুকটা কাঁপে বাহাদুরের। আবার বুঝি মার খেতে হয়। আর এতগুলি ছেলে যদি মারে তবে তো তার আর বাঁচার আশা নেই। আকুল মনে প্রার্থনা জানায়, প্রভু আমায় রক্ষা কর!

অগ্নিয়ার হাত-পা ভয়ে ঠক্ঠক করে কাঁপতে থাকে। মনে হয়, রক্ত চলাচল বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায়, আমরা তো তোমার পায়ে কোন অত্যাচার করিনি প্রভু! আমাদের বাঁচাও—রক্ষা কর—স্বামীকে বাঁচাও!

আর সময় নেই। অগ্নিমাঝে আগে রিক্সা থেকে নেমে সাহস করে বলে—দেখুন, আপনারা একে মাপ করুন। এর কোন অপরাধ নেই। এ আমাকে বিয়ে করতে সাহস করেনি। আমিই জোর করে একে বিয়ে করেছি। কারণ একে না পেলে আমি বাঁচব না। যদি দোষ কোন হয়ে থাকে সেটা আমি করেছি—ও নয়। বলেন তো আপনাদের সবার পা ধরে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি!

ধমকে যায় ছেলের দল। মুখে কোন কথা যোগায় না। বাহাদুরের প্রার্থনাত্তে—না অগ্নিয়ার প্রার্থনাত্তে, কে জানে! দেবতার দয়া হয়। যে অফিসে বাহাদুর দারোয়ানের কাজ করে, সে অফিসের হুজুন লোককে বাহাদুর এই দলের মধ্যে দেখতে পায়। আর এই দুই-জনই বাহাদুরকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে। তাড়াতাড়ি রিক্সা থেকে নেমে গিয়ে তাদের পায়ে পড়ে বাহাদুর বলে—এ বিয়েতে আমার কোন দোষ নেই। আমাকে না পেলে ও আত্মহত্যা করবে বলেছিলো, তাই বিয়ে করলাম। আপনারা একটু দয়া করে এদের বুঝিয়ে বলুন। আমাকে বাঁচান।

এরা অনেক বোঝাবার পর দলটা কোনরকমে ঠাণ্ডা হলো। মনে হলো কিছুটা ক্ষুণ্ণও হয়েছে। এদের হুজনের কথা অমাত্য করতে না পেরেই ঘেন ধামা। সকলে চলে গেলো।

লোক দুটি বাহাদুরকে পরামর্শ দিলো, তুমি এক

ভোরবেলা উঠে চলে যাও। ক'দিন বাইরে বাইরে কাটাও। এদের রাগটা পড়ুক। নতুবা কবে আবার মেয়ে বসবে। আর ও বাসায় তোমার বউয়ের ক'দিন একা থাকতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। চারিপাশের ঘরে মেয়েছেলে ভর্তি। তারাই নিশ্চয় দেখবে।

লোক দুটির পরামর্শ মতই বাহাদুর ক'দিন বাইরে বাইরে কাটালো। তারপর সবার রাগ পড়ে গেলে ক'দিন পর ফিরে এসে কাজ করতে লাগলো। এখন দেখলে ছ-একটা কথা ভিন্ন তারা আর বিশেষ কিছু বলে না। ক'দিন পর কিছুই বলবে না। এর মাঝে একদিন মামার মাথোঁ গিয়ে বিয়ে রেজিস্ট্রি করে এলো।

মাস তিনেক হোতে যায়।

মাঝে মাঝে একা বসে ভাবেন সময় বোস। এই যে তাঁর ছুই মেয়ে ভিন্ন জাতের লোককে ভালবেসে বিয়ে করলো, এর জন্ত দায়ী কি সে নিজে? তার অর্থহীনতা? না আধুনিক সমাজ? যদি তার অর্থহীনতা দায়ী হবে, তবে অর্থহীন বাহাদুরকে ভালবাসলো কেন তার মেয়ে? আর যদি বাসলোই, সে নিজে কেন স্বীকার করতে পারছে না! একি শুধু লোকলজ্জা! লোকলজ্জা বড়, না জীবন বড়?—নানা প্রশ্নই মনে আসা-যাওয়া করে। কোন উত্তর খুঁজে পান না তিনি।

অমলা দেবীও আর থাকতে পারেন না। স্বামীকে না জানিয়ে অলোককে নিয়ে একদিন ছপুয়ে বেড়িয়ে পড়েন অগ্নিমার বাসার দিকে। তাঁর ইচ্ছা, স্নেহের কান্ডালিনী কণ্ঠকে একবার আশীর্বাদ করবেন। মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া সে জীবন-সংগ্রামে সুখী হবে কি করে?

ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই অগ্নিমা ও বাহাদুর এসে মা ও মামাকে প্রণাম করলো। অগ্নিমা আশপাশের লোকের সাথে মা ও মামার পরিচয় করিয়ে দিলো। কিছুক্ষণ কথা বলে একে একে সবাই চলে গেলো।

অমলা দেবী বললেন, এখন তোদের দেখে যে কি শান্তি পেলাম, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি নে। তোরা ভাবিস, মা-বাবা কি পাষণ! কেন পাষণ হয়েছে সে খবর রাখিস না। আজ তোর বাবাকে না জানিয়ে এসেছি। কেন এসেছি জানিস না! মা-বাবার হৃদয় আছে। শুধু

—তা বোঝাতে পারি না। তোরা ভুল বুঝে শুধু মা-বাবার ওপর অভিমান করিস।—টপ্‌টপ করে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে তাঁর চোখ দিয়ে।

—না মা তোমাদের ওপর ভুল বুঝে অভিমান করিনি। জানি আমাদের জন্ত তোমাদের প্রাণ কত ব্যাকুল হয়।—অগ্নিমাও কেঁদে ফেলো।

—কাঁদিস না মা, ছোটো পান-সুপারি নিয়ে আয়, তোদের আশীর্বাদ করে যাই।—মেয়ের চোখ মুছিয়ে দেন অমলা দেবী।

অগ্নিমা পান-সুপারি নিয়ে আসে।

বাহাদুর ও অগ্নিমাকে আশীর্বাদ করে অমলা দেবী বলেন, আশীর্বাদ করি জীবনে তোরা চিরসুখী হ। তোদের ভালবাসা বেন অক্ষয় হয়ে নতুন দিনের, নতুন পথের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। শেষে থেমে বলেন, পারিস তো ছুখী মা-বাবার কথা একটু মনে রাখিস।

অশ্রু দিলে চোখেই অগ্নিমা ও বাহাদুর মাকে প্রণাম করে।

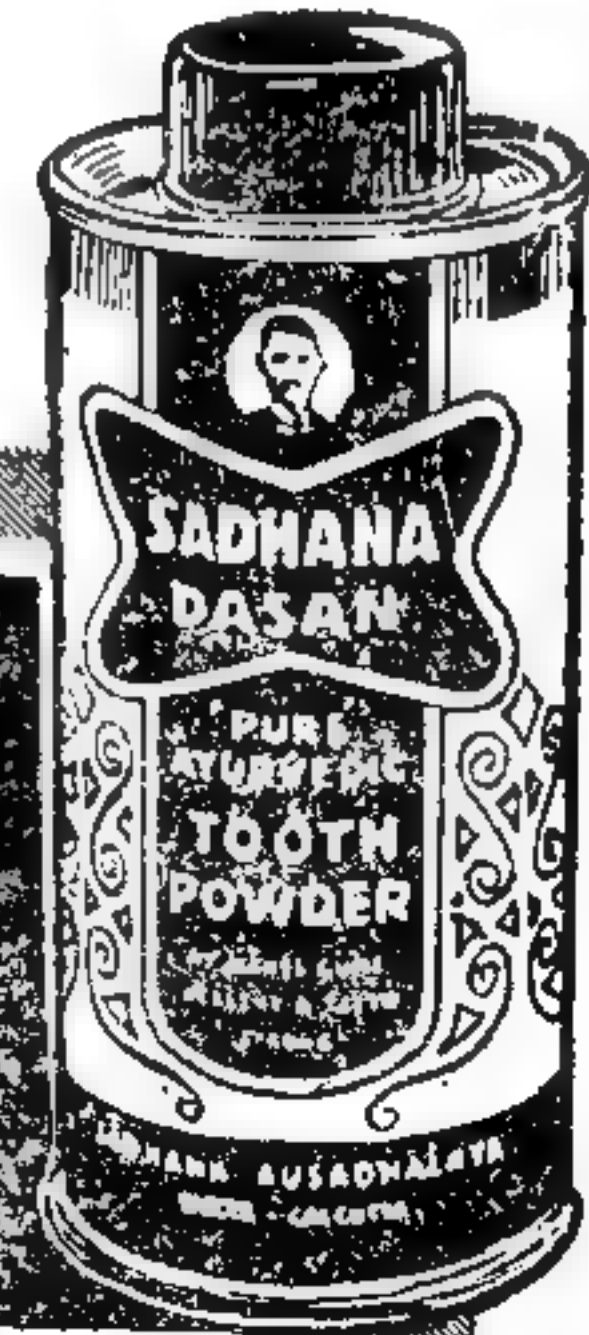




# মুখের দুর্গন্ধ অতি অস্বীতিকর!



মুখে দুর্গন্ধ থাকিলে সমাজে  
অবাধ মেনামেশা করা যায় না।  
কাজেই ইহা অনেকের জীবন  
দুঃখময় করে। প্রতিদিন সাধনা  
দশন ব্যবহার করিলে মুখের  
দুর্গন্ধ দূর হয়, মুখ জীবাণুমুক্ত  
হয়, ও দস্তরাজি সুস্থ, সবল  
ও সুন্দর হয়।



আমাদের  
স্বাস্থ্যের  
জন্য

সাধনা ঔষধালয় - ঢাকা

১০৬নং কর্ণওয়ালিস ট্রাট, কলিকাতা - ৬

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর

কলিকাতা-৩৮



অধিক - ত্রিযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.  
আমর্ত্যেন্দু-শাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লওন)  
এম. সি. এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর  
কলকাতার রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,  
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) আমর্ত্যেন্দুশাস্ত্রী



# ক্ষুধা

ডী. আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রিয় নবীন সাংবাদিক—

সাংবাদিকের চাকরি নিয়ে প্রথম দিনেই তুমি যে চাকল্যকর আত্মহত্যা কাহিনী রিপোর্ট সংগ্রহ করেছো এবং অপূর্ব লেখনীতে সংবাদপত্রে পরিবেশন করে শহর স্তম্ভ মানুষকে তাক লাগিয়ে দিয়েছো, সেজন্য তোমায় ধন্যবাদ!

দেখেছো একটা ফটো বা পিতৃদত্ত নাম প্রকাশের জন্তে কত বড় বড় মানুষ পর্যন্ত কেমন ছাংলাপনা করে? আমরা ম'রে একদিনের জন্ত কটো সহ নাম করে গেলাম বাংলা-দেশে। আঃ, কি আরাম! অজানা অধ্যাত্ত এ পরিবারের কাহিনী কত লোকের চোখে পড়বে, হয়তো-বা তোমার লেখনী-প্রসাদে দু-চারজনের চোখের কোণও চিকচিক করে উঠবে। ইশ, একসঙ্গে দু-জোড়া খুন।

পুলিসের লোকগুলো যখন আমাদের লাশগুলো গাড়ীতে তুলছিলো তুমি কেমন যেন ভ্যাঁচাকা হয়ে গিয়েছিলে। তুমি যেন সাংবাদিক নও, আমাদের পারিবারিক বন্ধু!—আমাদের ছেলে-মেয়ে নীরদ আর বুল্লর চেহারা দেখলে? দু'ভাই-বোন যেন দুটি গোলাপের কুঁড়ি, অথচ দুটি তাজা ফুল আমাদের তথ্য দেশের কত উজ্জ্বল সম্ভাবনার বীজ অকালে বিনষ্ট হল। আর ওদের বাপ যেন সব অপরাধের কালিমা মুখে লেপে বিষাদমগ্ন হৃদয়ে যুগুচ্ছে! কিন্তু আমার চেহারা দেখলে? শাস্তির প্রতিচ্ছায়া। আমার স্বামীও পর এতটুকু ফোঁড় নেই, অভিমান নেই—সে বেচারার দোষ দিতে পারি না। ক্ষমা করলে ছোট করা হয়, তাই ভগবানের কাছে পূর্বাহ্নেই প্রার্থনা জানিয়েছি, আমাদের এ খুনের জন্ত সে দায়ী নয়, হে জগদীশ্বর তুমি তাকে মাপ করো।

আমি জানি, তুমি কাগজের অফিসে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছো, আমাদের পার্শ্ববর্তী বাসিন্দাদের কাছে যতটুকু আমাদের কথা জানতে পেরেছো এবং পুলিসের লোক ধারণার ভিত্তিতে কল্পনা করেছে সেসব তথ্যের ওপর নির্ভর করে তুমি সাংবাদিকের প্রথম দিন নামে একটা ডায়েরী লিখবে কিন্তু তার আগে আমি তোমায় অনুরোধ করবো,

সংবাদ বিকৃত হলেও ডায়েরী যেন বিকৃত না হয়। তাই তোমার প্রথম ডায়েরীর পাতা সত্যো পূর্ণ করে নাও—তুমি সাংবাদিকতায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করো, এই কামনা করি।

শোন তবে—

আমার স্বামী অভয়বাবুকে তোমরা দেখেছো?—কালীপুর থেকে যে প্রতিদিনে কগেজ স্কোয়ার পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া-আসা করে চাকরি বজায় রেখেছিলো? তোমর, বলবে ট্রাম-বাসে গেলে এলে কি এমন ক্লান্তি হতো। ফুটপাথে ষাট-সত্তর পরমা দামের বাতিল টায়ারের চটি দেখেছো, তা'ও তার পায়ে এক জোড়া ছিল। অনুযোগ করবে, অভয়বাবু কি বিংশ শতাব্দীর মানুষ?—পকেটে একটা টিফিন কোটা দেখেছো, যার ভেতরে দুখানা ছোট রুটি আর একটা কাঁচা লক্ষা থাকতো এবং ষা' সহকর্মীদের লুকিয়ে গোপনে গলাধঃকরণ করতে হতো তাকে।

চা-বিড়ি-সিগারেটের কথা তুলো না। তা' হলে সে বর্তমান সমাজ জীবনে অপাণ্ডুস্ত্রয় হয়ে যাবে। দৃষ্টি শক্তির অভাবে যে চশমা জোড়া কিনেছিলো পাঁচ বছর আগে, কিছুদিন পর তার একটা কাঁচ কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছিলো—কেনবার পরমা জোটেনি একটা বছরেও, অথচ একচক্ষু হরিণের মত তাকে তাতেই কাল পর্যন্ত কাজ চালাতে হয়েছে।—একটা চোখ একরকম চলেই গিয়েছিলো বলা চলে।

একটা চোখ যেমন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক দৃষ্টির অধিকারী নয়, তেমনি আমাদের সংসারটাও আয় দৃষ্টে অস্বাভাবিকতায় ভরা ছিলো। বসন্তের ঝরা পাতাগুলো যেমন সারাদিন রোদে পুড়ে একদিন গুঁড়ো হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়, আমরাও তেমনি সমাজ জীবনে ঝরা পাতার মত ঝরেই গেলাম অকালে। দুঃখ নেই, অনুযোগ নেই আছে শুধু অনুতাপ আর আমাদের মত মানুষগুলোর ভবিষ্যৎ কি ধরনের হবে, তা' জানবার কৌতূহল।

আমার স্বামী একশো টাকা মাইনের চাকুরে ছিলো। আগেকার একশো টাকা হলে আমাদের মত মানুষের

রীতিমত ভাবতো টাকাটা কিভাবে খরচ করবে, কিন্তু এখন একশো টাকায় কি হবে? সে একশো টাকা ছাড়া মাস মাস কমপক্ষে আরও ত্রিশ-চল্লিশ টাকা বাড়তি খরচ হতো আমাদের। আমি সংসারের কাজকর্ম সেরে কায়-ক্লেশে কাগজের ঠোঙা তৈরী করে প্রায় ঐ টাকাটা যোগাড় করতাম। চলছিলো অননি করে, তার মানে কোনপ্রকারে জীবন ধারণ করেছিলাম আমরা। ক্রমশঃ আমাদের বাজেট ছাড়িয়ে গেল কালোবাজারের দৌলতে। নীরদ নতুন শ্রেণীতে উঠলে তার বই কিনে দিতে পারলাম না। সে ব্যাকুল হয়ে বলত, অর্ধেকগুলো কিনে দাও, বাকীটা অল্প ছেলের বই পড়ে চালিয়ে নেবো।

তার বাবা তত অশ্রুজলে ভাসে, 'অনেক টাকার বই—ক্ষমতা নেই নীরু—তা' হলে তোদের একমাস উপোস করিয়ে রাখতে হবে।'

বলুকে ত জোর করে পড়া ছাড়িয়ে দিতে হয়েছিলো দু-বছর আগে।

আমার বা' দু-একখানা গহনা ছিল, আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কোনমতেই বই কিনে দিতে পারলাম না। ছেলেটা গোপনে প্রকাশকদের দরজায় দরজায় ধরনা দিয়ে দু-চারখানা বই ভিক্ষে করেছিলো। কিন্তু—কিন্তু হঠাৎ একদিন সে এক প্রকাশকের কাছে বই ভিক্ষা করতে গিয়ে বিনা দোষে চোর বলে ধরা পড়ে গেল। আদালতের বিচারে হতভাগার দিনকতক মাজা হল। ও যেদিন ফিরে এলো ছাড়া পেয়ে আমার মনের দুঃখ সহস্র গুণ বেড়ে গেল। আমার পা-ছুঁয়ে বললে, 'মা তুমি বিশ্বাস করো, আমি চোর নই—আমি—'

—জানি নীরু, আমার ছেলে চোর নয়। হতে পারে না—এসব আমাদের দুর্দৃষ্ট!

নীরদের পরকাল গেল। ঘেন্নায় দুঃখে সে দিনের পর দিন কেমন যেন মনমরা হয়ে গেল। মেয়েটার বিয়ের সময় হয়েছে অথচ তার বিয়ে দেওয়া আমাদের কাছে অসম্ভব! বিশ্বজ্বলার ভরে গেল আমাদের মন। এ সংসারে কি প্রয়োজন? যে মা-বাবা ছেলে-মেয়েকে শিক্ষা দিতে পারে না, এমনকি পেট পুরে দুমুঠো খেতে দিতে পারে না, তাদের মৃত্যুই ভাল নয় কি? আমাদের জীবনগুলো কি কাগজের ঠোঙা?

তারপর শোন—

মাস মাস দু-দশ টাকা করে যে ঋণ না হতো আমাদের তা' নয়—এমনি করে বেশ কিছু ঋণের বোঝাও চেপে গেল। পাওনাদারদের তাগিদে নিরাপদে বাস করাও কঠিন হয়ে পড়লো আমাদের।

বিশ্বাস করো ভাই, অশেষ দুঃখ, প্রভূত লাজনা সহ করতে হয়েছে আমাদের। ব্যবসায়ীরা যেমন জিনিসপত্রে ভেজাল দিয়ে, ওপরওয়ালাদের ঘুষ দিয়েও লাভ করে আমরা তেমনি আমাদের আহারে-বিহারে এত ভেজাল দিয়েও লাভ দেখতে পেলাম না। বুঝলাম, জীবনটা লোকসানে ভর।

আত্মহত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই আমাদের। কিন্তু আত্মহত্যা করা কি এতই সোজা ব্যাপার? সবাই পারে?

আমরা হাসি মুখে খুন হলাম। আমার স্বামী আমাদের সকলকে শেষ করে নিজেকে নিজে শেষ করেছে—নয় কি?

এ সংবাদ ছেপে কি হবে? যদি পার ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমাদের মত মানুষগুলোকে বাঁচাও। মানুষগুলো যেন দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পায়। আমাদের মত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব, পাওনাদারদের কড়া তাগিদ মর্মান্তিক!

বর্তমান পৃথিবীর মানব সমাজের এ করুণ চিত্র যে কবে মুছবে!—আমাদের আত্মাগুলো সেদিকেই বইলো করুণ ভাবে চেয়ে।

কালিদাস রায়, কবিশেখর সম্পাদিত

## কুণ্ডিবাসী রামায়ণ

দুঃকৃত শব্দের পাদটীকা সম্বলিত সচিত্র সংস্করণ। ভাল কাগজে ছাপা। মূল্য ১০৮ টাকা মাত্র।

শিশির পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা-৬।

# কৃতিত্বের স্বীকৃতি

সুদর্শন চক্রবর্তী

সবার মুখে শুভেন্দুর সুখ্যাতি আর ধরে না। লোক ভাল এই শুভেন্দু। খুবই পরোপকারী, ভারী ঠাণ্ডা মেজাজ তার আর বেশ বিনয়ী। কেউ অভাবে পড়ে শুভেন্দুর কাছে হাত পাতলে তার হাতে এক পরসী না থাকলেও ব্যবস্থা একটা হবেই। হয়ত কেউ জানাল যে তার ক'টা টাকা আজ না হলেই নয়; শুভেন্দু আর স্থির থাকতে পারে না। কোন বন্ধুর কাছ থেকে ধার ক'রে এনে তাকে দিয়ে তবে শান্তি। শুধু কি তাই? পাড়াপড়শীর অমুখ-বিস্মুখে শুভেন্দু এ অঞ্চলের প্রথম ও প্রধান সহায়। এরপর কারও মড়া পড়ে আছে, সেখানেও শুভেন্দুর ডাক পড়ে। এ ছাড়া শুভেন্দু আবার ইউনিয়নেরও পাণ্ডা। সেসব নানা ঝামেলাও তাকেই পোহাতে হয়। এরপরও একটা দিক আছে তার। সেটা হ'ল শুভেন্দুর সাহিত্য সেবা। দেশে, জনসমাজে যখন যে সমস্যাটা দেখা দেয়, শুভেন্দু কাউকে রেহাই না দিয়ে অমনি তার সমাধান পাঠায়।

এই সব নানাদিকে তার ব্যস্ত থাকার জন্ত সংসারের সব কাজ দেখা তার পক্ষে সব সময় ঠিকমত হয়ে ওঠে না। এইত সেদিন আধিক অসচ্ছলতার জন্ত মীনাফী বলল, এই সব ইউনিয়ন-টিউনিয়নে সময় নষ্ট না ক'রে বৈকালে ছেলে-মেয়েদের পড়াগুলো একটু দেখিয়ে দিলে হয়। শুভেন্দু তখন খুব কড়া ক'রে জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু পারল না শুধু মাইনের দিকে তাকিয়ে। কেবল বলল, তা বটে।

পরসার অভাবে একদিকে যেমন বেশী বেশী জিনিস এক সঙ্গে কিনতে পারে না, তেমনি আবার সময়ের অভাবে রোজ সকালবেলা বাজার করাও শুভেন্দুর হয়ে ওঠে না। তাই ছেলেটাকে সকালবেলা যখন আলুভাতে দিয়ে শুকনো ভাতগুলো ধ'রে দিতে হয়, মীনাফীর মনে সেটা লাগে। এক আধ দিনের ব্যাপার নয়, প্রায়ই আজকাল এইরকম হয়। কারণ শুভেন্দু যেদিন বাজার করে, সেদিনও নানা লোকের নানা কথার জবাব দিয়ে বাড়ী ফিরতে তার দশটার আগে হ'য়ে ওঠে না। তাই মীনাফী সেদিন বলেছিল, তু একটা ডিম এনে রাখতে। শুভেন্দুও না

বলেনি। বাজারে গিয়ে ডিমের দিকে তাকিয়েও ছিল সে। কিন্তু পকেটে হাত দিয়ে শুভেন্দু দেখল, অসম্ভব। কাজেই সে ফিরে না এসে পারল না।

কিন্তু ক'দিন কাটাবে সে এমন ক'রে এতগুলো পোষা নিয়ে? বড় ভয় তার দেনাকে। দেনায় মানুষ বিকিয়ে গেলে তার আর নিজস্ব সত্তা কিছু থাকে না। দেনায় শুধু নিজেকেই ছোট করা হয় না, সম্বন্ধটাও ছোট হয়ে যায়। তাছাড়া মধ্যবিত্ত উপায়ী মানুষ সে। মাসের শেষে গোনা ক'টা টাকা। এতেই এতবড় সংসার তাকে চালাতে হয়। কাজেই দেনা করলে সে শোধ দেবে কেমন ক'রে? তাই দেনার নাম শুনলে মুখটা তার শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে যায়।

কিন্তু উপায় কি? ছেলেটার জ্বর হয়েছে আজ ক'দিন হ'ল। ডাক্তার ডাকতে হবে। অনেক কষ্টে সে ভাল হ'য়ে উঠল। আবার মীনাফীর হ'ল এপেন্ডিসাইটিস্। তখনই অপারেশনের ব্যবস্থা না করলেই নয়। মাইনের কটা টাকা কবে শেষ হ'য়ে গেছে। শুভেন্দু আর ভাবতে পারে না।

পাড়ার আবীদা ডেকে বলেন, এই নে টাকা। তাকে ভাবতে হবে না শুভেন্দু, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর।

সন্ধ্যা সন্ধ্যা হাতটা তার কঁপে ওঠে। কিন্তু সে শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্তে। এ ধার যে তার না করলেই নয়। কিন্তু শুধবে কি ক'রে? তা বলে চোখের সামনে ত সে এসব অচল অবস্থা দেখতে পারে না। যতক্ষণ পারে তাকেই ত চালিয়ে যেতে হবে।

পাড়ায় একটা সম্মিত অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। নগরের সেরা সেরা অভিনেত্রীরা আসবেন। টাঁদা হিসাবে তাকে অন্ততঃ পাঁচটা টাকা দিতেই হবে। পাড়ার ছেলেরা আরও বলতে থাকে, শুভেন্দু হ'ল পাড়ার একজন মুরুব্বী ধরনের লোক। কাজেই তার পক্ষে এটা না হ'লেই নয়। এমনই সব কত কথাই না তারা বলে যায় একে একে। ফলে শুভেন্দু তা থেকে পাঁচটা টাকা তাদের আর না দিয়ে পারল না। জল যে নীচু দিকেই গড়ায়, এ ত আর অজানা



নয়, তবু দিতে হয়।

পরের দিন এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া তার এগার বছরের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে শুভেন্দুর বাড়ী এসে ওঠে। একঘেয়ে জীবনে বড়ই কাহিল হ'য়ে পড়েছে, তাই কিছুদিন একটু হাওয়া বদল করে যাবে। শুভেন্দু গুনল সবই। কিন্তু দোকানী যে আর ধার দিতে চায় না। ছেলে-মেয়েগুলো বড় হয়েছে। কলেজে পড়বার সাধ্য তার নেই। কোথাও একটা চাকরির হিল্লোও করতে পারেনি এতদিন। অথচ এইভাবে যে আর একটা দিনও তার কাটতে চায় না! কি করতে পারে সে এখন?

ধুকতে ধুকতে অফিস করে সে। চিঠি টাইপ করতে করতে আনমনা হ'য়ে চিন্তার মধ্যে ডুবে যায় শুভেন্দু।

বড় সাহেবের একটা জরুরী চিঠি টাইপ করতে হবে। এত দেরি হচ্ছে দেখে বড় সাহেব নিজেই উঠে এলেন। —একি শুভেন্দুবাবু, কতক্ষণ লাগে এই সামান্যটুকু টাইপ করতে?— বলে ওঠেন বড় সাহেব শুভেন্দুর পাশে এসে।

কিন্তু শুভেন্দু নিরুত্তর। টাইপ মেশিনের উপর মাথাটা রেখে সে যে বেশ আরামেই ঘুমিয়ে চলেছে! রাগে, অভিমানে ও বিব্রন্ধিতে বড় সাহেব মাথায় একটা হাত দিয়ে মুখটা তুলে ধরতেই দেখেন এক ঝলক রক্ত মুখ থেকে গড়িয়ে সমস্ত কাগজপত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। এসব দেখে বড় সাহেবের হাই ব্লাড প্রেসারটা সহসা নেচে ওঠে। তা ছাড়া ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও কাল রাত্রে একটু বেশী রকম খেয়ে পেটটা আজ ভালও ছিল না। এ অবস্থায় এই দৃশ্য দেখে তিনি আর সামলাতে না পেরে সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

কাজে কাজেই এখন দুটো রোগীকেই হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। এদের মধ্যে একজন খেতে না পেয়ে মরতে বসেছে, আর অপর জন খেয়ে খেয়ে মরমর হচ্ছেন এই একই পৃথিবীতে।

এরপর আর কয়েকটা দিন মাত্র যেতে না যেতেই দেখা গেল, বিকেলে একদিন জাঁকজমক করে সভা বসেছে। শুভেন্দুর ফটোর উপরে মালা দিয়ে ধূপ জ্বলে শোক প্রকাশ করা হচ্ছে। নার্সিং হোম থেকে ফিরে এসে বড় সাহেব সভাপতির বক্তৃতায় যখন শুভেন্দুর দেশ সেবার স্মৃতি করছিলেন, তখন একজন বলতে চাইলেন যে, এই যে শুভেন্দু-

বাবু অভাবের তাড়নায় এভাবে পলে পলে মৃত্যুকে বরণ করলেন নীরবে, এটা আমরা কেন এতদিন দেখিনি?

কিন্তু তাকে কিছু বলতে না দিয়ে সভাপতি তার সমাপ্তি ভাষণ শেষ করলেন—এই জীবন সকলকে প্রেরণা দিক বলে!

যাকে অব্যক্ত কথাটি বলতে দেওয়া হ'ল না সে এখন পথ চলতে চলতে কেবল একটা কথাই ভাবতে লাগল যে, এমনই করে দেশে ও সমাজে শুভেন্দুদের কাছ থেকে আমরা শুধু নিয়েই যাব যুগ যুগ ধরে, দেবার কি আমাদের কিছুই নেই? ক্রমশঃ তার এ প্রশ্নও আজ মিলিয়ে গেল জনতার ভিড়ে, চাল-ডাল-মুন-তেলের চাহিদার চাপে।

## সচিত্র শিশির

মাসিক পত্রিকা আষাঢ়, ১৩৭৩ হইতে ৪৬শ বর্ষ, আরম্ভ হইয়াছে। সডাক বার্ষিক মূল্য ৪\ সডাক বাৎসরিক মূল্য ২৫। পূজা সংখ্যা বর্ধিতাকারে প্রকাশিত হয় কিন্তু গ্রাহকদের বর্ধিত মূল্য দিতে হয় না। আষাঢ় হইতে গ্রাহক হইতে পারেন। গ্রাহক-মূল্য মনিঅর্ডারে পাঠানই শ্রেয়, কারণ, ভি-পিতে লইতে হইলে ৬০ পয়সা অতিরিক্ত খরচ গড়ে। নমুনা-সংখ্যা পাইতে হইলে ৩০ পয়সা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইবেন।

শিশিরে গল্প রচনাদি যে কেহ পাঠাইতে পারেন, ছাপাইবার যোগ্য হইলে ছাপা হয়। অনেক সময়ে মনোনীত রচনাও স্থানানুসারে জল্প বিলম্বে ছাপা হয়। শিশিরের জল্প প্রেরিত রচনাগুলির নকল রাখিয়া পাঠাইবেন।

শিশির কার্যালয়

২২।১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।

# প্রণতি

( মৃতের প্রতি )

শ্রীভার্যাপদ দাশ

হে নীরব-যাত্রী !

লহ মোর নমস্কার ।

নির্মল নির্মাল্য তুমি পবিত্র কুসুম,  
বিশ্ব-বিধাত্রী,—স্নেহময়ী অধরার ॥

সুহৃৎসহ অতীতেরে দিয়ে জলাঞ্জলি,  
অজানা বিস্ময় পানে আছ মুখ তুলি ;  
সুকতার সুপ্তিবক্ষে নিম্পন্দ, নির্বাক,  
আশার পুলক চিত্র—মহাসাধনার ॥

তুচ্ছ করি জড়তার পার্থিব বন্ধন,  
ভুলে গিয়ে সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন,  
সঙ্কুচিত বেদনার অন্ধ কশাঘাত—,  
মহাগঙ্গানের পথে আজ অভিসার ॥

হাসি-অশ্রু, ক্রান্তি-দৈন্ত, বিরোধ-বিদ্বেষ,  
বিস্মৃতির আবরণে হউক নিঃশেষ ;  
অবিশ্রান্ত জীবনের যাত্রাপথ তব  
হোক দীপ্তিময়, বিদূরিত হোক অন্ধকার ॥

তাঁহার আস্থানে, হে শুভ ইচ্ছা যত  
হউক সার্থক—, সুনির্মল অনাহত  
কল্যাণ সৌরভে ব্যাপ্ত হোক দিগন্তর,  
পূর্ণ হোক, শান্ত হোক, ব্যথা উপচার ।

হে বিদেহী ! তোমার চলার পথে  
লহ মোর ক্ষুদ্র নমস্কার ॥

## কায়ার মায়া

শ্রীশ্যামলেশ্বর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

মধুর হেসে মধুর বেশে  
উদিল চাঁদ গগন 'পর,  
কিরণ-সুধা প্লাবিতা দিক্  
ঝরিয়া পড়ে যেন নিঝর !  
তাহারে হেরি' সরসী-জলে,  
কুমুদী-হিয়া ব্যথায় জলে,  
কিরণ ঝরে বৃকের 'পরে  
তবু না ঘোচে দূরান্তর ।  
দূরের চাঁদ আসে না কেন  
তুষিত তার বৃকের 'পর !

হাসিল চাঁদ সূদূরে রহি',  
নিকটে তবু এল না হায়,  
আবেশময় নয়ন মেলি'  
কুমুদী পানে কেবলি চায় !  
তবু যে হায়, দেয় না ধরা,

কত যে প্রেম হৃদয় ভরা,  
কুসুম-হিয়া ভরে না তাই  
বিরহ-তাপে পরান ছায় !  
হাসিল চাঁদ সূদূরে রহি'  
নিকটে তবু এল না হায় !

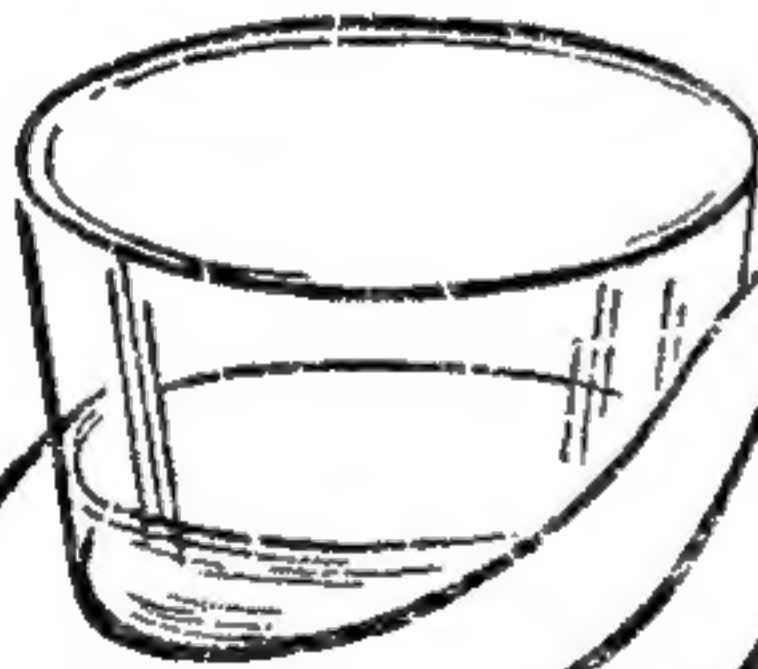
আকাশ হ'তে সরসী-জলে  
নামিয়া এল চাঁদের ছায়া,  
কুমুদী বলে—“কোথা সে প্রিয়,  
এষে গো শুধু কায়ার মায়া !”  
জোছনা-ধারা ঢলিয়া পড়ে,  
কুমুদী-হিয়া কাঁদিয়া মরে,  
বিরহ-তাপে নিজেই দহি'  
ঝরালো তার কোমল-কায়া !  
কুমুদী-হিয়া পেল না চাঁদে,  
পেল সে শুধু কায়ার মায়া !



আহারের পর  
দিনে দু'বার..

দু'ব খাতুতে  
খাঁখী লাভের  
শ্রেষ্ঠ উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান



মহাদ্রাষ্ট্র  
(৬ বৎসরের পুরাতন)

মৃতসঞ্জিবনী

সাধনা ও স্বধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র  
ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদ-  
আচার্য, ৩৬, গো মা ল পা ডা  
রোড, কলিকাতা-৩৭



অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,  
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লন্ডন),  
এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর  
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

দু' চামচ মৃতসঞ্জিবনীর সঙ্গে চার চামচ অর্ধ-  
ড্রাক্সারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার  
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-  
ড্রাক্সারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি,  
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ করতে অত্যধিক  
ফলপ্রসূ। মৃতসঞ্জিবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও  
বলকারক টনিক। দু'টি ঠোঁট একত্র সেবনে  
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে  
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ  
স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।



# সবুজ সঙ্কত

( গল্প )

শ্রীনিরঞ্জন সেন

তারপর সন্ধ্যা এলো ঠিক আমার সময়েই। রোজ যেমন ভাবে আসে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা থাকে তারপর চলে যায়। তবুও ওদের ভাল লাগে নির্জনে এই গোপন মিলনটুকু। অকৃত্রিম সত্যকার ভাল লাগা। মিলন সেনের নির্জনতা-প্রিয় কবি-মন ঠাই নেয় কল্পনার উৎসে।

আজ যেন নতুন মনে হয় মিলনের সন্ধ্যাকে। সন্ধ্যা বিশ্বাস। মাথার খোঁপাটি সুন্দর করে সবজ্রে জড়িয়েছে সন্ধ্যা।

—এই, আমার মাথার খোঁপাটির কি নাম বলতো?—  
ছোট্ট হেসে প্রশ্ন করে সন্ধ্যা।

মিলন চুপচাপ।

—কি? পারলে না তো! তবে আমিই বলে দিচ্ছি—  
'প্রজাপতি খোঁপা'। এ ছাড়াও আরো কত রকমের খোঁপা আছে শোন,—'নাগ খোঁপা', 'শিব-কামিন খোঁপা', 'অজন্তা খোঁপা', 'পান খোঁপা', 'অভিসারিকা খোঁপা'—ইত্যাদি ইত্যাদি!—মিলন!—শান্ত গলার স্বর সন্ধ্যার।

—বল—জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে ধরে সন্ধ্যার মুখের ওপরে মিলন।

সন্ধ্যার মনোবীণায় নেপথ্যে একটু মধুর অনুরণন হলো।

—আজ আর তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না—  
আবেশ জড়ানো কণ্ঠ সন্ধ্যার।

—বেশ! যেও না—বলো মিলন সন্ধ্যাকে কাছে টেনে আনে।

ছায়া জড়ানো পরিবেশ। বনানী শ্রামল প্রান্তরে ওরা বসে আছে।—সন্ধ্যা বিশ্বাস আর মিলন সেন। বসন্ত এসেছে—নতুন পোশাক পরেছে বনানী—সবুজ পোশাক। সবুজ স্বপ্ন ওদের চোখে।

—মিলন! ভয় হয় যদি নিয়তির নিষ্ঠুর হাত আমাদের সব আশা ছিঁড়ে দেয়। তবে কি হবে বলতে পার।

শুধু কি তাই মিলন, আরও কত কি.....

—থামলে কেন সন্ধ্যা, বল—প্রশ্ন করে মিলন।

—আচ্ছা মিলন, সমাজ কি স্বীকৃতি দেবে আমাদের এই প্রেমকে—সমাজ এক অদ্ভুত সংস্কার জড়ানো সংস্থা—  
তাই বলছিলাম।

—শুধু তুমি আমি কেন, তোমার আমার মত অনেকেই হেরে গেছে সমাজের কাছে—গেছে—যাবেও—যাচ্ছে। মনের সব সাবলীলতা শেষ হয়ে যাবে—এই অফুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্য কোথায় চলে যাবে! সংস্কারাক্ত সমাজের কাছে প্রেমের কোন মূল্য নেই—স্বীকৃতিও।

সন্ধ্যাকে আরও কাছে টেনে আনে মিলন। সন্ধ্যার সুন্দর কমনীয় মুখখানা তুলে নিয়ে নিজের মুখের কাছে রাখে। সন্ধ্যার লাল গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট দুটির ওপর নিজের ঠোঁট দুটি রাখে মিলন।

—এই ছাড়, কেউ এসে পড়বে—একটা সলজ্জ ভাব ফুটে ওঠে সন্ধ্যার চোখে মুখে।

\* \* \*

সত্যিই সংস্কারাক্ত সমাজের কাছে হেরে গিয়েছিল ওরা—সন্ধ্যা বিশ্বাস আর মিলন সেন। হৃদয়হীন সমাজ! ব্যর্থতার মর্মান্তিক পরাজয় সহ্য করতে পারেনি মিলন, তাই গ্রাম ছাড়ল। আর সন্ধ্যা রতনপুরের দাসেদের বাড়ীর বউ হয়ে চলে গেছে। রতনপুরের লোকে বলে ঘর আলো করা বউ! মৃগাক্ষ দাসের পুত্রবধূর রূপের প্রশংসা রতনপুর ছাড়িয়ে গেল।

সন্ধ্যার কিন্তু রতনপুরের মিলন-হারা জীবনটা ভাল লাগে না। যা-হোক একটা কিছু করতে হবে—জোর পায় সন্ধ্যা মনে—ভালবাসার তাগিদে! পরিবর্তন এলো সন্ধ্যার—কেমন যেন হয়ে গেল সে।

এবার সন্ধ্যার নিন্দায় আর গ্রামে কান পাতা যায় না। কেউ বলে, কেমন মায়ের মেয়ে—আর বাপ মাতাল, চরিত্রহীন! ওর মা ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল—ছি! ছি!

সেই মায়ের মেয়ে তো সন্ধ্যা-বউ ।

মিলনের ঠিকানা পেল ফুলকুমারীর কাছ থেকে—  
ফুলকুমারী ওর সই। ইলোরার ফুলকুমারী। ইলোরা  
ওদের পাশের গ্রাম ।

মিলন,

তোমাকে আমি ভুলিনি। স্বরূপ (অর্থাৎ আমার  
স্বামী) আমাকে ছলনার আশ্রয় নিয়ে তোমার কাছ থেকে  
দূরে সরিয়ে এনেছিল—তাকে তো আমি স্থগী হতে দিই  
নি। স্বাভাবিকই।

কেবলমাত্র ফুলশয্যার রাতটা একঘরে ছিলাম—তাও  
ওর সঙ্গে একটি কথাও বিনি—কাছেও যাইনি। তারপর  
থেকে আর কোন রাত এক ঘরে কাটাই নি। সব দিক  
থেকে আমি তোমারই আছি—থাকবও। কেবল আছে  
এখন সিঁথিতে একটা সিঁড়রের দাগ—কৃত্রিম লাল দাগ।

মিলন, আমি আর সেই সন্ধ্যা নেই। সেই মিষ্টি মধুর  
হাসি ভুলে গেছি। তুমি এখানে এসে দাসেদের বাড়ীর  
বউরূপে আমাকে দেখলে ভয় পাবে। সংসারটা ওদের  
ভেঙ্গে দিয়েছি—যেটুকু আছে তাও ভেঙ্গে দেব—দেবই ত।

সবাইকে কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি—স্বরূপকেও  
—কেবল তোমার কাছে যাব—আরও আপন করে কাছে  
পাব বলে।

তুমি আমাকে স্বীকৃতি দেবে তো তোমার জীর্ণরূপে?  
উত্তর দিও।

তোমার-ই সন্ধ্যা

সুধাশনী বউ-এর সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করল। বাড়ীর  
ঝি-চাকররাও ছেড়ে যেতে লাগল। নতুন যারা এলো  
তারাও ছাড়ল। সুধাশনী স্বামীকে বলে—রূপ! রূপ  
দেখে সন্ধ্যাকে ঘরের বউ করলে। আমি তো আগেই  
বলেছিলাম—ওর মা-বাবার কথা। কে না জানে ওর  
মায়ের ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাটা!—তারপরে  
মিলন আছে। মিলন সেন। সন্ধ্যা ওকে ভালবাসতো।

সুধাশনীর সংসার ভাঙছে। ভাঙছে কেন সন্ধ্যা-বউ  
ভেঙ্গে দিল একেবারে। সুধাশনী পাগল হয়ে যাবে এমন  
অবস্থা হলো।

প্রতিশোধ—প্রতিশোধ নিয়েছে সন্ধ্যা। এবার দাস  
বংশের ইতিহাসে সে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।  
“বউ পালিয়েছে দাস বংশের”—একথা ছড়িয়ে পড়বে  
চারদিকে। তা হলে আর কেউ ওদের ঘরে কুটুম করবে  
না।

স্বরূপ তো জানতো মিলন আর সন্ধ্যার ভালবাসার  
কথা—তবুও অন্ধুত।

মিলন সন্ধ্যার চিঠির উত্তর দিয়েছিল বধাসময়ে। তাতে  
সন্ধ্যার প্রশ্নের উত্তরও ছিল—উত্তর মানেই সবুজ সঙ্কেত—  
নতুন দিনের ডাক। সন্ধ্যা আসছে—মিলনের প্রিয়া—  
মনের মাহুয। নীড় বাঁধবে ওরা। ছোট্ট একটি শান্তির  
নীড়।

অকৃত্রিম সত্যাকার ভালবাসার মৃত্যু নেই—তাই সন্ধ্যার  
প্রশ্নের উত্তর মানেই সবুজ সঙ্কেত, তা আর বুঝতে কষ্ট  
হয়নি—হবেও না।

শ্রী ৪২০

শ্রীপথের সাথী

সুট বুট পরে যায়  
বাবু যেন বড়লাট  
চোখে চশমা, হাতে ঘড়ি  
পকেটটি গড়ের মাঠ।  
বাবার হোটেল খায় দায়  
আর সিগারেট ফোঁকে

বন্ধুর পরমা মেরে  
সিনেমা হলে ঢোকে  
চায়ের দোকানে আড্ডা জমায়  
তরুনী দেখে দেখ শিশ  
তাদের কেউ বলে বোম্বটে  
আবার কেউ বলে ৪২০।